ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মদ আবেদুর রহমান ওছমানী

সেপ্টেম্বর ২০২২

ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত

গবেষক
মুহাম্মদ আবেদুর রহমান ওছমানী

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত" শীর্ষক অভিসন্ধর্ভটি আমার একান্ত মৌলিক গবেষণা ও শ্রমের ফসল। এই অভিসন্ধর্ভটি বা এর কোনো অংশ ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(মুহাম্মদ আবেদুর রহমান ওছমানী)

পিএইচডি গবেষক
রেজি. নং- ১৮০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মুহাম্মদ আবেদুর রহমান ওছমানী কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণা।

গবেষককে তাঁর এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য জমা দেয়ার অনুমতি প্রদান করছি।

(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, পিএইচডি কোর্স
ও
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দুই হাজার আঠারো খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে পিএইচডি কোর্সে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে গবেষণাকর্ম শেষ করা ছিল আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। এই টার্গেট বাস্তবায়নে অযাচিত আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয় বৈশ্বিক মহামারি করোনা। মহামারি ছিল যুগে যুগে প্রতিটি মুমিনের জন্য আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত। সহীহ বুখারী শরীফে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মহামারি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান আযাব দেন। তবে মুমিনদের জন্য তিনি এটিকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি মহামারিতে আক্রান্ত হবার পর সওয়াবের আশা পোষণপূর্বক ধৈর্যধারণ করে নিজ এলাকায় অবস্থান করে এবং সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করেছেন তাই ঘটবে। ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে"। মহামারির লকডাউনপর্ব ছিল আমার জন্য গবেষণার এক সুবর্ণ সুযোগ। অবসরকালীন এই সময় আমার স্বপ্নপূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা ও অফিসিয়াল সিস্টেমের কারণে অভিসন্দর্ভ জমাদানে খানিকটা বিলম্ব হয়। পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি নির্ব্যস্ত ও সুস্থ শরীরে থিসিস সম্পন্ন করার সুযোগ দান করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুটি নেয়ামতের কারণে অনেক মানুষ ধোঁকাপ্রাপ্ত হয়। একটি হলো সুস্থতা। দ্বিতীয়টি অবসর। এমন দুটি নেয়ামত লাভ করার কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন এ নেয়ামতের অবহেলার কারণে শয়তানের প্রতারণার শিকার না হই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক। গবেষণাকর্মে এমন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা পরম সৌভাগ্যের। নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার পাশাপাশি তাঁর আমল-আখলাক দ্বারাও আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক হায়াতে বরকত দান করুক। আমি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গল কামনা করছি। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার সন্ধর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার প্রতি স্যারের এ মহানুভবতা কখনো ভোলার মতো নয়। আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিক আহমাদ ও ড. আ.ক.ম আবদুল কাদের স্যার এর পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমাকে বাধিত করেছে। আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাযা'আতুল্লাহ ফারুকী'র অকৃত্রিম সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ছিল অকৃত্রিম ও বন্ধুসুলভ। যা গবেষণাকর্মকে গতিময় করেছে। তাঁর নিকট আমার ঋণ অপরিশোধযোগ্য। একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক ড. হুমায়ুন কবির ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ নাসিম এর সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা আমাকে ঋদ্ধ করেছে। প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন প্রফেসর মাইদুল ইসলাম মাহমুদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমার প্রিয় বৎস বি এম উকাশা। তাছাড়া অভিসন্ধর্ভ প্রণয়নে যাদের পরামর্শ ও দোয়া আমার জন্য অহর্নিশ ছিল তাদের মধ্যে রয়েছেন, বন্ধুবর অলি আহমাদ ও সাঈদ আহমাদ । গবেষণাকর্মে যার সহযোগিতার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমার সহধর্মীনি জান্নাতুল ফেরদাউস। তিনি সংযম অবলম্বনপূর্বক পারিবারিক অনেক দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। যা গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছে এবং বন্ধুর পথ সুগম করেছে। আমি সকলের সর্বাঙ্গীন সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন

أ	=	আ
إ	=	ই
أُ	=	উ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	ছ/স
ض	=	দ/দ্ব/য
ط	=	ত/ত্ব
ظ	=	য
ع	=	আ
غ	=	গ/ঘ
ف	=	ফ
ق	=	ক/ক্ব
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
ه	=	হ
و	=	ও/ভ/অ
ي	=	য়

শব্দ সংক্ষেপ

আ = আলাইহিস সালাম
ই. ফা. বা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ = খণ্ড
খ্রি. = খ্রিষ্টাব্দ
ড. = ডক্টর
তা./বি. = তারিখবিহীন
নং = নম্বর
পৃ. = পৃষ্ঠা
মৃ. = মৃত্যু
র = রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা = রাদিয়াল্লাহু আনহু
সা = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি. = হিজরী

ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়
ইজতিহাদ: প্রকৃতি ও পরিধি
পরিচ্ছেদ- ১
ইজতিহাদের পরিচয়

পরিচ্ছেদ- ২
মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগে ইজতিহাদের প্রকৃতি ও পরিধি

পরিচ্ছেদ- ৩
তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদ এর প্রকৃতি ও পরিধি

২য় অধ্যায়
মুজতাহিদ: যোগ্যতা ও শর্তাবলি
পরিচ্ছেদ- ১
মুজতাহিদের পরিচয়, প্রকরণ ও বিধি

পরিচ্ছেদ- ২
মুজতাহিদের যোগ্যতা ও শর্তাবলি

পরিচ্ছেদ- ৩
মুজতাহিদের দলীল

তৃতীয় অধ্যায়
মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগে ইজতিহাদ
পরিচ্ছেদ- ১
মহানবী (সা) এর ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ২
খুলাফায়ে রাশেদূন এর ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ৩
মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ

চতুর্থ অধ্যায়
তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ১
মুজতাহিদ তাবিঈগণের যুগে ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ২
মক্কার মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ৩
কূফা ও অন্যান্য অঞ্চলের মুজতাহিদ তাবিঈদের ইজতিহাদ

ভূমিকা

ইজতিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শক্তি ও সক্ষমতা। এটি جَهد বা جُهد ধাতুমূল থেকে নির্গত। কুরআন-সুন্নাহর মূল উৎস থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে (রা) এর প্রশিক্ষণ দিয়ে ইজতিহাদ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ইজতিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় বহুবিধ গবেষণা পরিচালিত হলেও ইজতিহাদের ক্রমবিকাশে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। হিজরী দুই শতাব্দী পর্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ শিরোনামে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গবেষণা খুবই অপ্রতুল। উপরন্তু বাংলা ভাষায় ইজতিহাদ বিষয়ক গবেষণার অভাব চোখে পড়ার মতো। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের ইজতিহাদ বিষয়ক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা পূরণে "ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত" শিরোনামে পরিচালিত এ গবেষণা জ্ঞানের জগতে ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। বিষয়টি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জ্ঞানপিপাসার বদ্ধ দুয়ার খুলে দেবে এবং নব-দিগন্তের সন্ধান দেবে বলে মনে করি। গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ইজতিহাদের পরিচিতি, প্রকৃতি ও পরিধি সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বনি আদমের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত প্রণেতা ও প্রধান মুজতাহিদ। তিনি উম্মাহর জন্য ইজতিহাদের যে নজির স্থাপন করেছেন তা মানবেতিহাসে বিরল। সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদের শিক্ষাদান ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবূওয়াতী দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ পদ্ধতি ছিল বহুমুখী। তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা ও সাহাবীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে ইজতিহাদের একটি স্বচ্ছ বিকাশধারা উম্মাহর জন্য উৎসর্গ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা কুরআন-সুন্নাহর নস এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। নস এর অবর্তমানে পারস্পরিক পরামর্শ ছিল তাদের ইজতিহাদের প্রধান উৎস। জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধান পেশ করা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাবিঈ যুগে ইজতিহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতিতে কিছুটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। তারা সম্মিলিত (الاجتهاد الجماعي) ও ব্যক্তিগত (الاجتهاد الانفرادي) উভয় পদ্ধতিতে ইজতিহাদ করতেন। শরীয়তের মৌলিক নীতিমালায় সাহাবীদের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে তাদের সঙ্গে তাবিঈদের আনুসঙ্গিক বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও পরিধি সুবিস্তৃত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি গণ্ডিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। মানবজীবনে নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলি অগণিত ও উন্মুক্ত। মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে সুবিন্যস্ত করেন। এই অধ্যায়ে প্রথম দুই শতকের ইজতিহাদের পরিধি সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুজতাহিদ এর পরিচয়, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সম্পর্কে আলাচনা করা হয়েছে। শরীয়তের মূল উৎস থেকে আমলযোগ্য বিধি-বিধান উদ্ভাবনে সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফকীহ-আলিমকে মুজতাহিদ বলা হয়। মুসলিম উম্মাহর একটি অতি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ খেতাব হলো মুজতাহিদ। ফকীহ-মুজতাহিদগণ কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিয়োজিত। তাঁরাই নবী-রাসূলগণের যথাযোগ্য প্রতিনিধির আসনে অধিষ্ঠিত। একজন মুজতাহিদ স্বীয় ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুটি সওয়াব লাভ করেন। আর ইজতিহাদে ভুলের কারলেও একটি সওয়াব লাভের অধিকারী হন। মুজতাহিদের উপর দীনের অনেক বিষয় নির্ভর করে। ইজতিহাদে পারঙ্গমতা অর্জনের জন্য মুজতাহিদের মধ্যে বহুমুখী গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন। গুণান্বিত হতে হয় বহুবিধ গুণ-বৈশিষ্ট্যে। এই গুণ বিভিন্ন প্রকারের। ব্যক্তিগত ও জ্ঞানগত। মুজতাহিদের জন্য যেভাবে শরীয়তের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, তেমনিভাবে মানবিক গুণসম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আরবী ভাষাজ্ঞানে দক্ষতা, কিতাবুল্লাহ

সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ও সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজতাহিদ হবার প্রধান শর্ত। ফিক্‌হ, উসূলসহ দীনের মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন, যুগের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ও ইজতিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকাও অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে বিবেচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগের ইজতিহাদ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামগ্রিক জীবনাদর্শ ছিল ইজতিহাদের অনন্য নজির। তিনি ইবাদত-বন্দেগী ও দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে রাজনীতি, কূটনীতি, সমাজকল্যাণ, পররাষ্ট্র ও সমরনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে ইজতিহাদ করেছেন। সাহবায়ে কেরামের ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের অনবদ্য দলীল। তারা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদের একটি সুষ্ঠু কাঠামো মুসলিম উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদূন ছিলেন এই উম্মাহর অনুকরণীয় আদর্শ ও হেদায়তের দিকদর্শন। তাদের ইজতিহাদ পরবর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের জন্য মাইলফলক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন উম্মতের প্রধান অভিভাবক। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) খলীফা নিযুক্ত করে তিনি কেবল বিচক্ষণ খলীফা ও দরদী ত্রাণকর্তার ভূমিকাই পালন করেননি, গোটা উম্মতকে বিপর্যয়ের হাত থেকেও রক্ষা করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন নবুওয়াতী যোগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রজ্ঞাবান সাহাবী ও আদর্শ মুজতাহিদের বাস্তব প্রতিভূ। বদরের যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত-পবিত্র বিবীগণকে পর্দাবৃত করা, মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করা ও মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর জানাযার নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইমামতী না করাসহ উমার (রা) এর ইজতিহাদের অনুকূলে রয়েছে ইসলামী শরীয়তের একুশটি বিধান। উসমান ও আলীসহ (রা) অনেক সাহাবীর ইজতিহাদী যোগ্যতার গুণকীর্তনে নামে বে-নামে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। নবী পত্নিদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) এর ইজতিহাদ ছিল সাহবায়ে কেরামের মধ্যে কিংবদন্তিতুল্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের ইজতিহাদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত হবার পর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণ বিভিন্ন এলাকার প্রশাসক, বিচারক, মুফতী ও মুয়াল্লিম হিসেবে নিয়োজিত হন এবং প্রয়োজনের তাগিদে ইজতিহাদের এ পদ্ধতি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেন। মদীনার প্রসিদ্ধ 'সপ্ত মুজতাহিদ তাবিঈ' ইজতিহাদের ইতিহাসে খ্যাতির শীর্ষ অবস্থান লাভ করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) ছিলেন তাদের সর্বশীর্ষে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর শিষ্যগণ মক্কায় ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে ইজতিহাদের পরিমণ্ডলে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। মুজাহিদ ইব্‌ন জাব্‌র ও আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাবিঈদের একটি জামাত বিজিত কূফার উর্বর ভূমিতে ইজতিহাদের একটি অঙ্কুরিত চারাগাছ বপন করেন। আলকামা ইব্‌ন কাইস, ইবরাহীম আন নাখায়ী ও হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান (র) তাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়। এছাড়াও শাম, হেজায, ইয়ামান, ইয়ামামা, মিসর ও স্পেনসহ মুসলিম বিশ্বের বিজিত অঞ্চলে ফকীহ-মুজতাহিদগণের একটি চৌকস জামাত ইজতিহাদী চিন্তাধারার আলোকে ফিক্‌হ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন ।

পঞ্চম অধ্যায়ে মুজতাহিদ ইমামদের যুগে ইজতিহাদী কর্মকাণ্ড সন্নিবেশিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইজতিহাদী কর্মযজ্ঞের পাশপাশি বিভিন্ন মাযহাবের সুপ্ত গোড়াপত্তন হয়। এ যুগে ইজতিহাদে পারদর্শী ও প্রাগ্রসর সাহবায়ে কেরামের নামে মাযহাবের অঘোষিত উদ্ভব ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী বলেন, হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত যে সকল মুজতাহিদের উন্মেষ ও তাদের মাযহাবের গোড়াপত্তন হয় তা হলো, কূফায় ইমাম আবু হানীফা নুমান ইব্‌ন সাবিত (র) এর নামানুসারে হানাফী মাযহাব ও সুফ্‌য়ান সাওরী (র) এর বিলুপ্ত মাযহাব। মক্কায় সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র), মদীনায় মালিক ইব্‌ন আনাস (র), বাসারায় হাসান বসরী (র), শামে আওযাঈ (র), মিসরে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ

শাফিঈ (র) ও লাইস ইব্‌ন সাদ (র) এবং নিশাপুরে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ (র) এর মাযহাব ছিল খুবই জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বর্তমানে তাদের অনেকের মাযহাবের আলোচনা শুধুমাত্র কিতাবের সুবিন্যস্ত ছত্রেই সীমাবদ্ধ। বাস্তব জগতে এ সকল মাযহাবের কোনো অনুসারী এখন পাওয়া যায় না। ইমাম আবু হানীফা নুমান ইব্‌ন সাবিত (র) সাহাবায়ে কেরামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আলোকে মাযহাবের আনুষ্ঠানিক শুভ-যাত্রায় রাহবার এর ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে মদীনার ইমাম (امام دار الهجرة) হিসেবে খ্যাত ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) এর নামানুসারে মালিকী মাযহাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ শাফিঈ (র) এর নামাঙ্কিত শাফিঈ মাযহাব এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এর শিষ্যগণ তার নামে হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

গবেষণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুমোদিত বানানরীতি ও গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণায় বেশিরভাগ তথ্য আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলি থেকে গৃহীত হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যসূত্র ও পাদটীকা উল্লেখের সময় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সর্বাধিক প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ যথাক্রমে লেখক বা গ্রন্থকারের নাম, অনুবাদ হলে অনুবাদকের নাম, সম্পাদকের নাম (যদি থাকে), সংস্করণ সাল (যদি থাকে), খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্করণসাল অনুল্লিখিত হলে প্রথম সংস্করণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে সংকলিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথমেই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। এর পর সংকলক ও সম্পাদকের নামসহ অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম মানবমুক্তির সর্বশেষ সনদ ও জীবন কাঠামো। ইজতিহাদ হলো দীনের জীবনীশক্তি। একমাত্র ইজতিহাদের মাধ্যমেই এটি কিয়ামত অবধি প্রাণবন্ত থাকতে পারে। গবেষণায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মে কোনো গবেষক এখান থেকে যদি দিকনির্দেশনা লাভ করেন কিংবা কোনো জ্ঞানপিপাসু পাঠকের ন্যূনমত উপকার সাধিত হয়, তবে এ কর্মপ্রয়াস সার্থক বলে মনে করবো।

ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়
ইজতিহাদ: প্রকৃতি ও পরিধি

পরিচ্ছেদ- ১
ইজতিহাদের পরিচয়

ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিধান। যা সমাজ জীবনে কার্যকর করার পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের অন্যতম উৎস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে ইজতিহাদ করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদ এর অনুমতি দিয়ে এর বিকাশধারায় গতি সঞ্চার করেন। । ইজতিহাদ ও কিয়াস প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো'।[১] এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আদমের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও মেধাবী সত্তা। সুতরাং তিনি এ নির্দেশের প্রথম ও প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশে বলেন, 'আপনি কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন'।[২] পরামর্শের এ নির্দেশ হলো ঐ সকল বিধানের ক্ষেত্রে, যেখানে ওহি নাযিল হয়নি। কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নস এর অবর্তমানে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইসলামী শরীয়তের বিধিবদ্ধ নীতি। স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হবার সুবাদে কুরআন সুন্নাহ'য় বর্ণিত নস এর হুকুম মতো আমল করা বেশ সহজ। পক্ষান্তরে ইজতিহাদপূর্বক আমল করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এখানে মুজতাহিদকে পর্যাপ্ত সাধনা ও কঠোর শ্রম ব্যয় করতে হয়। হাদীস শরীফে পরিশ্রমের অনুপাতে সওয়াবের কথা বিবৃত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রা) এর উদ্দেশে বলেন, 'হে আয়িশা! তুমি পরিশ্রম অনুযায়ী সওয়াব লাভ করবে'।[৩] তদুপরি সঠিক ও বিশুদ্ধ ইজতিহাদের সওয়াব হলো দ্বিগুণ।

১.১.১. ইজতিহাদ এর সংজ্ঞা

ইজতিহাদ শব্দটি جَهد ও جُهد ধাতুমূল থেকে শক্তি ও সক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত। وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ (এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না।[৪]) এবং وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ (তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছে[৫]) আল কুরআনে উল্লিখিত جهد শব্দটি পরিশ্রম ও শক্তি অর্থে ব্যবহৃত

---

[১] আল কুরআন, ৫৯;২

[২] আল কুরআন, ৩;১৫৯

[৩] আয়াতুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ মাহদী শামসুদ্দীন, (বৈরুত: *আল ইজতিহাদ বাইনাত তাসীলি ওয়াত তাজদীদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: আল মুয়াস্সাসাতুদ দুয়ালিয়্যাহ, ১৪১৯ হি/১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৪।
নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দান: মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৪৪।

[৪] আল কুরআন, ৯;৭৯।

[৫] আল কুরআন, ৬;১০৯ ।

হয়েছে। المجهود বলা হয় ঐ দুগ্ধকে, যা থেকে মাখন তৈরি হয়। যা একটি কষ্টসাধ্য কাজ।[৬] ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনুল ফারিস বলেন, جهد অর্থ কষ্ট ও পরিশ্রম, তবে শব্দটি বিভিন্ন ভাবার্থে ব্যবহৃত।[৭] اجتهاد ও تجاهد অর্থ হলো, কোনো কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। হাঁটা-চলা ইত্যাদি দৃশ্যমান কাজ বোঝানোর ক্ষেত্রে যেভাবে اجتهاد শব্দটি ব্যবহৃত হয়, অদৃশ্য সব ধরনের কাজে সাধনা করার ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ শব্দের ব্যবহার বহুলপ্রচলিত। এ দৃষ্টিকোণে আমলযোগ্য শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় যথাসাধ্য চেষ্ট-সাধনাকে ইজতিহাদ বলে" ।[৮]

ইমাম আবু বকর আর রাযী (৫৪৪-৬০৬হি.) বলেন, ইজতিহাদ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক. القياس الشرعي (শরঈ কিয়াস) ।

দুই. الظن الغالب من غير علة (ব্যতিক্রমিকভাবে প্রবল ধারণা)।

তিন.الاستدلال بالأصول (স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে দলীল উপস্থাপন)।[৯]

اجتهاد এর পারিভাষিক অর্থ

উসূলে ফিক্হ এর ইমামগণ সামান্য কিছু মতপার্থক্যসহ ইজতিহাদের সংজ্ঞায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আবুল কাসেম আল কালবী (৭৫৭-৬৯৩ হি.) اجتهاد এর সংজ্ঞায় বলেন,

هو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية،

"শরীয়তের বিধি-বিধানে গবেষণার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাকে ইজতিহাদ বলে" ।[১০]

মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (মৃ. ১১১৯ খ্রি.) বলেন,

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعيّ ظنيّ ،

"শরীয়তের বুদ্ধি বা ধারণাসঞ্জাত আনুষঙ্গিক বিধান অবগত হবার লক্ষ্যে ফকীহ এর যথাসাধ্য শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করা হলো ইজতিহাদ" ।[১১]

আল কারাফী (১২২৮-১২৫৮ খ্রি.) ইজতিহাদ এর সংজ্ঞায় বলেন,

بذل الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط،

"আমলযোগ্য শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় যথাসাধ্য চেষ্ট-সাধনাকে ইজতিহাদ বলে"। [১২]

---

[৬] اجهد جهدك في هذا الأمر (ইজতিহাদ হলো এ বিষয়ে তোমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) আরবী বাক্যটি কোনো কাজ সম্পাদনে সর্বশক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত। جهده المرض বলা হয়, যখন কোনো ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। কোনো কাজে চেষ্টা-সাধনা করাকে ইজতিহাদ বলে। সহজ কাজ সম্পাদনে সাধনার ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ নয়। আরবীতে বলা হয়, اجتهد في الصخرة (পাথরটি বহনে সে অনেক কষ্ট করেছে)। اجتهد في حمل القلم (কলমটি আনতে সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে) এমন বলা হয় না। কেননা কলম বহন করতে কোনো কষ্ট করতে হয় না।

[৭] ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়া আল কাযবীনী, *মাকায়ীসুল লুগাহ*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।

৮. সাইফী, সাদ ইসমাঈল, *আল ইজতিহাদুল মাকাসিদী ফী আসরিল খুলাফাইর রাশিদীন*, (গাযা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩২ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩।

[৯] লেখকমণ্ডলি, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২য় সংস্করণ, ২০১৪), পৃ. ৪৪৪।

[১০] আল কালবী, আবুল কাসেম মুহাম্মদ আল গারনাতী, *তাকরীবুল ওসূল ইলা ইলমিল উসূল*, (কায়রো: মাকতাবা ইব্ন তাইমিয়া, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৪২১।

[১১] বিহারী, মুহিব্বুল্লাহ, *মুসাল্লামুস সুবূত*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.) খ. ২, পৃ. ৩১৮।

[১২] আল কারাফী, আবুল আব্বাস শরফুদ্দীন, *শারহু তানকীহিল ফুসূল ফী ইখতিসারিল মাহসূল ফিল উসূল*, সম্পাদনা; তাহা আবদুর রউফ সাদ, শিরকাতুত তাবাআতিল ফন্নিয়্যাতিল মুত্তাহিদাহ, ১৩৩৯ হি.), পৃ. ৪২৯।

১.১.২. ইজতিহাদের উৎপত্তি

ইজতিহাদের আক্ষরিক অর্থ হলো উদ্ভাবনী শক্তি। এ বিবেচনায় মানব সৃষ্টির মূল পরিকল্পনায় ইজতিহাদের উপাদান নিহিত। ভালো-মন্দ দুটি পথের একটি নির্বাচনের প্রতিভা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ তায়ালা উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন একটি জাতি সৃষ্টির পরিকল্পনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি তাকে দুটি পথ দেখিয়েছি "।[১৩] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ "সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক"।[১৪] ইজতিহাদ ছিল যুগে যুগে নবী-রাসুলদের শরীয়া পালনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল। প্রত্যেক নবী-রাসুলই তাওহিদভিত্তিক জীবন গঠনের লক্ষ্যে একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে আল্লাহর প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করছেন। কন্টকাকীর্ণ এ পথে তারা অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনের নিরিখে তারা এ প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছেন। ইজতিহাদ এর উৎপত্তি মানবেতিহাসের সূচনা থেকেই। নবী-রাসুলদের নিকট এটি ইসলামী শরীয়তের চিরাচরিত দলীল হিসেবে গৃহীত। মূল কথা হলো, প্রত্যেক নবী-রাসুলই যুগে যুগে নিজেদের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ইজতিহাদ করেছেন। ইমাম শাতিবী (৫৩৮-৫৯০ হি.) বলেন,

ان نشأةالاجتهاد كانت في عهد النبوة؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول المجتهدين في هذه الأمة، وإنما قلنا: في هذه الأمة؛ لأن الاجتهاد كان من دأب الأنبياء من قبل،

"নবীযুগই ছিল ইজতিহাদের সূচনাকাল। এই উম্মতের জন্য ইজতিহাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 'এই উম্মত' বলার কারণ হলো, অন্যান্য নবী-রাসূলগণ ও তাদের সময়ে ইজতিহাদ এর বিকাশধারা অব্যাহত রেখেছেন"। [১৫]

সুলায়মান (আ.) এর ইজতিহাদী প্রতিভার বর্ণনায় আল কুরআনের ভাষ্য হলো,

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،

"এবং আমি সুলায়মান আলাইহিস সালামকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছি এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান"।[১৬]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুলায়মান (আ.) এর ইজতিহাদের বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। পক্ষান্তরে দাউদ (আ.) এর ইজতিহাদ ছিল এর বিপরীত।[১৭]

শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবীদের মধ্যে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ। সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইজতিহাদ বা উম্মতের উদ্ভাবনী শক্তিই ইসলামকে প্রাণবন্ত রাখবে কিয়ামত অবধি। দীন ও দুনিয়ার সামগ্রিক বিষয়ে ইজতিহাদ ছিল নবুওয়াতী জীবনের একটি চলমান প্রক্রিয়া। জীবনঘনিষ্ঠ অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তিনি যে ইজতিহাদ করেছিলেন তা ছিল পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক।

---

[১৩] আল কুরআন, ৯০;১০।

[১৪] আল কুরআন, ১৮;২৯।

[১৫]https://www.alukah.net/sharia/0/108529/#ixzz6d5CqnbG7

[১৬] আল কুরআন, ২১;৭৯।

[১৭] শাতিবী, ইবরাহীম ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুয়াফাকাত*, সম্পাদনা: আবু উবাইদা মাশহুর, (কায়রো: দারু ইব্‌ন আফ্‌ফান, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন। তিনি সময়, অবস্থা ও ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনায় বিভিন্নমুখী উত্তর দিয়ে ইজতিহাদের গতিধারা অব্যাহত রাখেন। সহীহ বুখারী শরিফে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ،

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আমল কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হলো, এর পর কোন আমল উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় প্রশ্ন করার পর তিনি আবার উত্তর দিলেন, কবুলকৃত হজ্ব"।[১৮]

একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের ভিন্নধর্মী জবাবে ইজতিহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা প্রতিভাত হয়। বুখারী শরীফের নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওয়াক্তমতো নামায পড়া। পুনরায় প্রশ্ন করার পর তিনি আবার উত্তর দিলেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা"।[১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদের স্ফুরণ ঘটে। নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। জাবির (রা) থেকে বর্ণিতঃ

لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে (খুতবা দেয়ার জন্য) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বসো। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) নির্দেশটি শোনামাত্র মসজিদের দরজায় বসে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, হে আবদুল্লাহ! এগিয়ে এসো।[২০]

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সম্পর্কেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন আবদিল বার (৩৬৮-৪৬৩ হি.) বর্ণনা করেন,

عن عبدالله بن رواحه رضي الله عنه وهو بالطريق: سمع رسول الله صلى بالله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس في الطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك ؟فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة

وفي رواية أخرى زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله،

"আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাস্তা দিয়ে আসার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি (اجلسوا) 'বসো' নির্দেশটি শুনতে পেলেন। অমনি তিনি রাস্তায় বসে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াস্‌সাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ১৫১৯।

[১৯] প্রাগুক্ত, খ. ৮,পৃ. ২, হাদীস নং- ৫৯৭০।

[২০] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দানঃ মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২০।

ওয়াসাল্লাম তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, তোমার কী হলো? তিনি জবাব দিলেন। আমি আপনার 'বসো' নির্দেশটি শুনতে পেয়েছি। তাই বসে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোআ করে বললেন, 'আল্লাহ তোমার আনুগত্য করার স্বভাব আরো বৃদ্ধি করুক'।[২১]

উপর্যুক্ত সাহাবীদ্বয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বসে যাওয়ার নির্দেশটিতে ইজতিহাদপূর্বক প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে বসে গেলেন।

এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবর্তমানে বিভিন্ন ঘটনায় ইজতিহাদ করেন। তারা জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে ইজতিহাদ এর একটি মজবুত কাঠামো তৈরি করেন। উম্মতের একটি শ্রেষ্ঠ জামাত উদ্ভূত ঘটনায় সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদান করে জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। যেখানেই তারা কুরআন-সুন্নাহর 'নস' এর অনুপস্থিতি দেখতে পেতেন, ইজতিহাদপূর্বক সংঘটিত সমস্যার সমাধান বের করতেন। তাবিঈগণ সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক ইজতিহাদী কর্মধারার ব্যাপক প্রচলন করেন। তারা সাহাবায়ে কেরামের মূলনীতি অনুসরণপূর্বক ইজতিহাদকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

১.১.৩. ইজতিহাদের হিকমত

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। কিয়ামত পর্যন্ত আগত বিশ্ব মানবতার মুক্তির সর্বশেষ সনদ। ইসলামী বিধি-বিধানের মৌলিকত্ব ও অকাট্যতার পাশাপাশি এর 'নস'সমূহও সুনির্ধারিত। অথচ জীবনসমস্যার বহুমুখিতার পাশাপাশি এর গতি-প্রকৃতি সদা চলমান। প্রতিটি যুগে মানুষের সামনে এমন কিছু বাস্তব সমস্যার উদ্ভব হয়, পূর্বকালে যার কোনো নযির নেই। এমন বাস্তবতার নিরিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নব-উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের নির্ভুল পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের সামগ্রিক দলীল-প্রমাণ থেকে ঘটমান জীবনসমস্যার সমাধান বের করার অনুশীলন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে ভবিষ্যত ফকীহ ও মুজতাহিদগণ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনাগত মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ইসলামকে গতিশীল ও বিজয়ী জীবনব্যবস্থা হিসেবে কায়েম রাখতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবীদের এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে ইজতিহাদের উজ্জ্বল রাজপথের সন্ধান দিয়েছেন। যাতে বিশ্ব সভ্যতার সমৃদ্ধি ও যুগের সচল চাকার অনুকূলে ইসলামী শরীয়ত শাশ্বত ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় অনেক ঘটনা সংঘটিত হবার পর তার হুকুম বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেক্ষাপট, কারণ, অন্তর্নিহিত ভাব ও রহস্যেরও বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুম আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,[২২]

أنها من الطوافين عليكم و الطوافات،

"এগুলো তোমাদের চারপাশে সর্বদা ঘোরাফেরাকারী জীব"।[২৩]

খেজুরসিক্ত পানি (নাবিয) দ্বারা ওযু করার বিধান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[২১]আলী আল মুত্তাকী, আলাউদ্দীন ইব্ন হুসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল*, সম্পাদনাঃ বাকরী হায়ানী, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৪৪৯, হাদীস নং- ৩৭১৭১।

[২২] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্র, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৬৬।

[২৩] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*,(বৈরুতঃ মাকতাবাতুল আস্‌রিয়্যাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ), খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস নং- ৭৫,৭৬।

تمر طيبة وماء طهور،

"এটি পরিচ্ছন্ন খেজুর ও পবিত্র পানীয়" ।[২৪]

খালা অথবা ফুফু এবং তাদের কন্যাকে একসঙ্গে বিয়ে করার ক্ষতিকর দিক আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

انكم أذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم،

"এমন কাজের মাধ্যমে তোমাদের বংশের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়ে যাবে" ।[২৫]

ওহি নাযিলের প্রাক্কালে আল কুরআনের কোনো গ্রন্থবদ্ধ রূপ ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় যে কোনো সময় আল কুরআন নাযিলের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এ ধারা তিরোহিত হয়। আবু বকর সিদ্দীক (রা) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হবার পরপরই ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে বহুসংখ্যক হাফেজে কুরআন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। মুসলিম উম্মাহর এমন ক্রান্তিলগ্নে উমার (রা) খলীফা আবু বকরকে (রা) আল কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। খলীফা আবু বকর প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে উমার (রা) এর কথায় একমত হয়ে যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর উপর কুরআন সংকলনের মতো একটি গুরুদায়িত্ব অর্পন করেন।

খলীফা হিসেবে আবু বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন মুসলমানদের অভিভাবক। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন খলীফার প্রধান সহচর ও পরামর্শদাতা এবং নবুওয়াতের যোগ্যতাসম্পন্ন সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনসায়াহ্নে উম্মতকে দুটি বিষয় মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়ে গেছেন। আল কুরআন বিলুপ্তির সমূহ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা সংকলন করার কোনো নির্দেশ কুরআন সুন্নাহর কোথাও বিদ্যমান নেই। উম্মাহর এমন ক্রান্তিলগ্নে উমার (রা) উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের প্রাক্কালে আল কুরআন হারিয়ে যাবার প্রবল আশঙ্কার প্রেক্ষিতে আবু বকর ও উমার (রা) ইজতিহাদপূর্বক আল কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কুরআন সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ এ অবদান ইসলামের প্রধান দুই খলীফার সম্মিলিত ইজতিহাদের সমন্বিত রূপ, যা যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর নেতৃত্বে একদল নেতৃস্থানীয় সাহাবীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

১.১.৪. ইজতিহাদের কারণ

ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান জগতে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর বিস্তৃত অঙ্গনে তারা সবাই সমান যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এমন নয়। অনেকের জ্ঞান ছিল পর্বতসম। আবার অনেকে ছিলেন মহাসাগরতুল্য। বিশিষ্ট তাবীই মাসরুক (র.) বলেন,

جالست أصحاب محمد فوجدتهم كالأخاذة فالأخاذة تروي الرجل وتروي الرجلين والأخاذة تروي العشرة والأخاذة تروي المئة والأخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যগর্ব অনেক সাহাবীর সঙ্গে আমার ওঠা-বসার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদেরকে আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল জলাশয়ের মতো দেখেছি। কোনো জলাশয় এক বা দুজন লোকের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম ছিল। অনেকে দশ জনের তৃষ্ণা মেটাতে পারতেন।

[২৪] ইব্‌ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ আল কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (কায়রোঃ দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি,), খ. ১, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ৩৮৪।

[২৫] ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমদ, *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, সম্পাদনাঃ শোআইবুল আরনাউত, (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৪ হি), খ. ৯, পৃ. ৪২৬, হাদীস নং- ৪১১৬।

আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৬৭।

অনেক জলাশয় একশ জনকে পরিতৃপ্ত করতে পারতো। আবার এমন অনেক বিশাল জলাশয়ও দেখেছি, যা ভুখণ্ডের সব মানুষের পিপাসা মেটাতে সক্ষম।[২৬]

আল কুরআন হলো ইজতিহাদের উৎসকেন্দ্র ও প্রধান ঝর্নাধারা। যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা সর্বাগ্রে। কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সমজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। আরবী ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও আল কুরআনের ভাষাজ্ঞানে তারা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিলেন। অনেকে ছিলেন প্রশস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। আল কুরআনের স্বল্প ও বহুলব্যবহৃত প্রতিটি শব্দজ্ঞানে পারদর্শী। অনেক সাহাবী ছিলেন এর পরবর্তী স্তরের। অনেক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে আল কুরআনের শানে নুযূল সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবগত। যা কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে প্রভাবক ভূমিকা পালন করে।

আল কুরআনের মর্ম অনুধাবনের মতভিন্নতা ইজতিহাদে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে এ মতভিন্নতার কারণে আল কুরআন থেকে মাসআলা ইসতেম্বাত এর ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ ،

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে"।[২৭]

এ আয়াতে কুরূ (قروء) শব্দের অর্থ নির্ণয়ে ইখতেলাফের কারণে অনেক মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। সাহাবীদের এশটি দল 'শুরূ' শব্দটি 'ুহর' তথা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরেকটি দল (حيض) ঋতুস্রাব অর্থ গস্থহণ করেন। আল কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে স্তরভিন্নতার কারণে (ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ) "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম")[২৮] আয়াতটি নাযিল হবার পর একদল সাহাবী আনন্দ প্রকাশ করেন। তারা মনে করলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের পরিপূর্ণতার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ আয়াত নাযিল হবার পর কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ما بعد الكمال الا التقوي "দীনের পরিপূর্ণতার পর সংযম অবলম্বন ছাড়া কোনো উপায় নেই"।[২৯]

তিনি এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। বস্তুত এ আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবনে তিনিই সঠিক ইজতিহাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত নাযিলের পর মাত্র একাশি দিন জীবিত ছিলেন।

কোনো সমস্যায় আল কুরআনে সমাধান পেতে অপারগ হলে সাহাবায়ে কেরাম সুন্নাহর আশ্রয় নিতেন এবং এতে সমাধান তালাশ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের নিকট মুখস্ত বা জানা ছিল তা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল মজলিসে একসঙ্গে সকল সাহাবীর উপস্থিতি সম্ভবও ছিল না। অনেক সাহাবী কম হাদীস বর্ণনা করতেন, আবার অনেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন। আবু বকর ও উমার (রা) এর মতো রাসূলুল্লাহর ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ খুব কম হাদীস রেওয়ায়েত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপ হবার আশঙ্কায় তারা অন্যদেরকে হাদীস বর্ণনায় নিরুৎসাহিত করতেন। উমার (রা) অনেককে

---

[২৬] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০।

[২৭] আল কুরআন, ২;২২৮।

[২৮] আল কুরআন, ৫;৩।

[২৯] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌র, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৭৬।

এ বিয়য়ে ভীতি প্রদর্শন করতেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এশটি ঘঁনা প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রাকে (রা) প্রশ্ন করা হলো,

أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته،

"ধাপনি উমার (রা) এর যুগেও কি এত বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, এখন যেভাবে আমি আপনাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করি, উমার (রা) এর যুগে বর্ণনা করলে ছড়ি দিয়ে তিনি আমাকে আঘাত করতেন"।[৩০]

হাদীস এর রাবী নির্ভরযোগ্য হলে তার বর্ণনা গস্থহণযোগ্য হবার ক্ষেত্রে কোনো এখতেলাফ নেই। বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য না হলে তা অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত হয়। সুন্নাহ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান অথবা রাবীর অনির্ভরতার কারণে মাসআলা ইসতেম্বাতে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। আবার কোন্ ধরনের সুন্নাহ গস্থহণযোগ্য হবে তার প্রকরণেও সাহাবীদের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম যাহাবী (মৃ.৭৪৮ হি.) থেকে বর্ণিত, ইব্ন শিহাব কাবীসা ইব্ন যুআইব (র) থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদী আবু বকর (রা) এর নিকট উল্টরাধিকার সম্পদের অধিকার লাভ করার উদ্দেশে আগমন করেন। আবু বকর (রা) তাকে বললেন, আমি আল কুরআনে তোমার কোনো অংশ পাইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার অংশের ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণনা করেছেন বলেও আমার জানা নেই। তিনি এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতামত জানতে চান। মুগীরা (রা) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি দাদীকে উল্টরাধিকার সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবু বকর (রা) তাকে প্রশ্ন করলেন। এ হাদীসের সপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি? মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা[৩১] তার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। এরপর তিনি তার অংশ দিয়ে দেন।[৩২]

১.১.৫. ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় কুরআন ও সুন্নাহই ছিল ইজতিহাদের প্রধান উৎস। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদূনসহ জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী শরীয়তের খুলাফায়ে রাশেদূন হিসেবে গণ্য হয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি আরব উপদ্বীপের গণ্ডি পেরিয়ে মিসর, সিরিয়া ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেখানকার মুসলিম শাসক ও বিচারকগণ এমন কিছু নতুন নতুন ঘটনার মুখোমুখি হন, তাদের পূর্বের জীবনে যার কোন নযির ছিল না। এ বিষয়ে তাদের পূর্ব কোনো ধারণাও ছিল না। মুসলিম সমাজে উদ্ভূত এ সমস্যার সমাধান ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তরও ছিল না। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ'র ফকীহ ও মুজতাহিদগণ কুরআন সুন্নাহর সামগ্রিক মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন। কারণ তারা ইতোপূর্বে ইজতিহাদের কর্মকৌশল ও পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। ভুল

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯।

[৩১] মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা দাওস গোত্রীয় একজন জলীলুল কদ্‌র আনসারী সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তিনি তাবুক ছাড়া সকল জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে অনেক সময় তাকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করতেন। সকল প্রকার ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে দূরে থাকতেন। তিনি ৪৩ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

[৩২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ), পৃ. ১২১, খ. ৩, হাদীস নং- ২৮৯৪।

হোক বা শুদ্ধ হোক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উৎসাহ লাভ করেছিলেন। মাসআলা ইসতেম্বাতে ভুল হলে একটি সওয়াব, আর শুদ্ধ হলে দুটি সওয়াব লাভের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

মানুষের জীবন ও কর্মধারা বৈচিত্র্যময়। রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে জিন-ইনসানকে শরীয়তের বিধানের বাইরে চলার কোনো সুযোগ নেই। সৃষ্টিজীবের জন্য স্রষ্টার বিধান মতো জীবন পরিচালনার মধ্যেই রয়েছে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। আল্লাহর আইনের পরিপন্থি জীবন পরিচালনা করার পরিণতি হলো তাঁর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম। সুতরাং গতিময় জীবনের শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে ইজতিহাদের বিকল্প নেই। জীবনকে মহান আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালনা করতে হলে তাঁর বিধিবদ্ধ সংবিধান অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান কোথাও স্পষ্ট। কোথাও দুর্বোধ্য। সকল মানুষের পক্ষে জীবন সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। মানব জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে একটি পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ দলের ইজতিহাদের গতিধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। যাতে সাধারণ মানুষ তা দ্বারা নিজেদের পথনির্দেশ খুঁজে বের করতে পারে।

সাহাবায়ে কেরাম শুধুমাত্র উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানেই কার্যকর ভুমিকা পালন করেছিলেন। এমন কোনো সমস্যার ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করেননি যা এখনো সংঘটিত হয়নি।[৩৩]

১.১.৬. ইজতিহাদের হুকুম (কার্যকারীতা)

ইজতিহাদের হুকুম সম্পর্কে ইলমে ফিকহ এর ইমামগণ থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

১. ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.) (রহ.) এর মতে শরীয়তের মূল উৎস থেকে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন (استنباط) করার লক্ষ্যে ইজতিহাদ করা ওয়াজিব।[৩৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তর্ধানের পর ইজতিহাদ জায়েয হবার বিষয়ে কারো মতভেধ নেই। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা বৈধ। তাঁর উপস্থিতিতে কারো পক্ষে ইজতিহাদ করা জায়েয নেই।[৩৫]

২. ইমাম শাফিঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আবু ইউসূফ (১১৩/১১৭-১৮২) (রহ.) বলেন, ইজতিহাদপূর্বক উম্মতের জন্য যে কোনো বিধান জারি করার অধিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন।

---

[৩৩] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্র, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৭৬।

[৩৪] ইমাম শাহরাস্তানীর মতে ইজতিহাদ ওয়াজিবে কেফায়াহ। কোনো যুগে সকল মুসলমান সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ ত্যাগ করলে সবাই গুনাহগার হবে। শরীয়তের কোনো বিধান ইজতিহাদের উপর নির্ভর হলে সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের পক্ষে তার জন্য ইজতিহাদ করা আবশ্যক। ইজতিহাদ করা কখনো ফরজে আইন বিবেচিত হয়। যেমন মুজতাহিদ নিজের উপর কোনো সমস্যা উদ্ভব হলে তার জন্য ইজতিহাদ করা ফরজে আইন। কেননা মুজতাহিদের জন্য কারো তাকলীদ করা জায়েয নেই।

[৩৫] প্রফেসর আবু মনসূর বাগদাদী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা বৈধ হবার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইমামুল হারামাইন ও ইমাম গাযালী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক ফারসাখ বা আট মাইল বা দুই ফরসাখ দূরে অবস্থানকারীর জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয। ইমাম বাকিল্লানীও এ বিষয়ে ইজমার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ ও মুতাকাল্লিম এর মতও তাই।

৩. অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, ইজতিহাদ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত নন। প্রয়োজনের মুহূর্তে ওহি নাযিল হবার কারণে তিনি ইজতিহাদের প্রতি মুখাপেক্ষীও নন।[৩৬]
৪. ইমাম আবু বকর আস সাইরাফী (জন্ম- ৪৬৭ হি.) ইমাম শাফিঈ (র) (রহ.) এর দ্বিতীয় একটি মত উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ইজতিহাদ বৈধ বা অবৈধ হবার বিষয়ে নীরব থাকাই উত্তম। কেননা ইমাম শাফিঈ (র) ইজতিহাদের বিধান উল্লেখ করার পর কোনো মতকে প্রাধান্য দেননি।
৫. ফকীহদের একটি দল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে ইজতিহাদ করা জায়েয, অন্য বিষয়ে জায়েয নেই। ইমাম শাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর আল কুরআনে ভিন্ন হুকুম নাযিল হলে নিজের সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করতেন। অন্যথায় নিজ ইজতিহাদের উপর অটল থাকতেন। উম্মতের জন্যও এই হুকুম বলবৎ রয়েছে। اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী)। এই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে তিনি বলেন, উম্মতের জন্য ইজতিহাদ জায়েয না হলে উত্তরাধিকার হবার কোনো অর্থই থাকে না।[৩৭]
৬. কোনা মুজতাহিদ থেকে দুটি উক্তি বর্ণিত হলে পরবর্তী উক্তিটি তার পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। যদি দুই উক্তির সময়কাল জানা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তির মধ্যে সময়কাল নির্ণয় করা অসম্ভব হলে উভয় মতই মুজতাহিদের মত বলে বিবেচিত হবে। কোনো মতকে প্রধান্য দেয়া জায়েয হবে না। একই সময়ে মুজতাহিদ এর দুটি মত বর্ণিত হলে বুঝতে হবে, তার নিকট উভয় উক্তিই সমান ও দলীলসম্মত। যদি কোনো মত গ্রহণযোগ্য হবার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে মুজতাহিদের পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করা জায়েয। নতুবা তার পক্ষ থেকে উভয় উক্তিই বর্ণিত হবে।
৭. মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে একবার ফতোয়া প্রদান করার পর যদি তাকে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা হয়, তার জন্য উচিত হলো, প্রথমবারের অনুরূপ ফতোয় প্রদান করা, যদি পূর্বের ইজতিহাদের কথা মনে থাকে। পূর্বের ফতোয়া মনে না থাকলে নতুনভাবে ইজতিহাদ করাই উত্তম। দ্বিতীয় ইজতিহাদ প্রথম ইজতিহাদের বিপরীত হলে দ্বিতীয় ফতোয়াই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৩৮]
ইয়াহয়া মুহাম্মদ ইমাম আমীদী (র) (মৃ. ৬৬১ হি.) এর উক্তি বর্ণনাপূর্বক বলেন, সাহাবীদের বেলায় শুধুমাত্র বিচার সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা জায়েয। তাদের জন্য এমন ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ করা জায়েয হবে, যখন সংঘটিত ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সমাধান পাওয়া অসম্ভব হয়। যে সব সাহাবীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করার সাধারণ অনুমতি রয়েছে, তাদের জন্যও ইজতিহাদ করা জায়েয। উসূল শাস্ত্রবিদ মুহিব্বুল্লাহ বিহারীও (মৃ. ১১১৯ হি.) উপর্যুক্ত মত ব্যক্ত করেন। ইয়াহয়া মুহাম্মদ বলেন, ঘটনার আকস্মিকতা অথবা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব না হলেও ইজতিহাদ করা জায়েয। সাহাবী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিধান হলো, যে সকল বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোনো বিধি-নিষেধ পাওয়া না যায়, সে

---

[৩৬] কালবী, আবুল কাসেম মুহাম্মদ আল গারনাতী, *তাকরীবুল ওসূল ইলা ইলমিল উসূল*, (কায়রোঃ মাকতাবা ইব্ন তাইমিয়া, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৪২৩।

[৩৭] আমীদী, আবুল হাসান সাইয়িদুদ্দীন আলী ইব্ন আবী আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্যাক আফীফী, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.), খ .৪, পৃ. ১৬৫।

[৩৮] এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য উচিত হলো, প্রশ্নকারীকে পূর্বের মত থেকে ফিরে আসার বিষয়ে অবহিত করা। যাতে প্রশ্নকারী পূর্বের ফতোয়া মতো আমল অব্যাহত না রাখে। মুজতাহিদ পূর্ব মত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর পূর্বের ফতোয়া মতো আমল করার সুযোগ নেই। এটি মনসূখ দলীলের মতো পরিত্যক্ত ও বর্জিত।

সব ক্ষেত্রে সাহাবী হোক বা না হোক সবার জন্য কিয়ামত অবধি ইজতিহাদ করা জায়েয হবে।[৩৯] ইব্‌ন হাযম আন্দালুসী (মৃ. ৪৫৬ হি.) এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, যে সকল বিধান জায়েয ও বৈধ, ওয়াজিব কিংবা হারাম নয়; সে সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতেও ইজতিহাদ করা বৈধ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ করা অবৈধ মত পোষণকারীদের দলীল হলো,

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় সাহাবীদের জন্য সরাসরি শরীয়তের বিধি-বিধান জানার অপূর্ব সুযোগ ছিল। ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সকল বিধান অকাট্যভাবে সত্য বলে বিবেচিত হতো। পক্ষান্তরে ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানে ভুল-ত্রুটির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ইজতিহাদ নির্ভুল হলেও তা অনুমাননির্ভর বা ظنيات এর অন্তর্ভুক্ত। অকাট্য দলীল-প্রমাণ মজুদ থাকার কারণে ইজতিহাদ করে বিধি-বিধান ইসতেম্বাত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২. ইজতিহাদপূবর্ক শরীয়তের বিধান ইসতেম্বাত করা অনেকটা বিধানদাতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের পক্ষেই শোভনীয়। অপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ সর্বদা বর্জনীয়। তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান তাঁর আলীশান মসনদে অধিষ্ঠিত হবার সমতুল্য।

৩. সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় সংঘটিত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সমাধান তালাশ করতেন। যথাসম্ভব নিজেরা ইজতিহাদ করা থেকে বিরত থাকতেন। যাদের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা সর্বদা জায়েয তাদের দলীল হলো, ইজতিহাদের ঐ সকল ঘটনা যা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। যেমন ‘আমর ইবনুল আসকে (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘটনায় সিদ্ধান্ত দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উপস্থিতিতে আমি কীভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়! সিদ্ধান্ত সঠিক হলে তোমার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব, আর ভুল হলে তুমি একটি সওয়াবের অধিকারী হবে।[৪০]

১.১.৮. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

ইজতিহাদের বিপরীত বহুলপ্রচলিত একটি পারিভাষিক শব্দ হলো তাকলীদ। তাকলীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো,

وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى قلادة والجمع قلائد،

[৩৯] ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ, *আল ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম*, সম্পাদনা: শাইখ আহমাদ মুহাম্মদ শাকির, (বৈরুত: দারুল জীল প্রকাশনা, তা/বি.), খ. ৫, পৃ. ১৩৪।

[৪০] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৫।

"কোনো বস্তুকে পুরোপুরি নিজ কাঁধে বহন করা। এটি قلادة শব্দ থেকে নির্গত। বহুবচন قلائد।[৪১]
উসূলবিদ ইমামগণ তাকলীদ এর বিভিন্নমুখী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ইমাম গাযালী, ইব্‌ন হাজিব, ইব্‌ন কুদামা ও ইমামুল হারামাইন এর সংজ্ঞা প্রায় কাছাকাছি। নিম্নে ইব্‌ন কুদামা এর সংজ্ঞাটি প্রদত্ত হলো,

قبول قول الغير من غير حجة،

"দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো কথা গ্রহণ করা হলো তাকলীদ"
ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনী তাকলীদ এর সংজ্ঞায় বলেন,

قَبُول قَول الْقَائِل وَلَا يدْرِي من أَيْنَ يَقُول مَا يَقُول،

"এমন কোনো ব্যক্তির উক্তি গ্রহণ করাকে তাকলীদ বলে, যাতে গ্রহণকারী জানে না তিনি কোন উৎস থেকে কথাটি বলেছেন"।[৪২]
তিনি নিম্নের সংজ্ঞাকে উত্তম সংজ্ঞা বলে উল্লেখ করেন।

هُوَ اتِّبَاع من لم يقم باتباعه حجَّة وَلم يسْتَنَد إِلى علم،

তাকলীদ এর পাশাপাশি আর একটি শব্দ হলো (اتباع) অনুসরণ বা অনুকরণ। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো কথা বা আমল এর অনুসরণকে তাকলীদ বলে। পক্ষান্তরে দলীল-প্রমাণ সহকারে কারো কথা বা আমল এর অনুসরণকে اتباع বলে।[৪৩]

তাকলীদের বৈধতা-অবৈধতা

তাকলীদের বৈধতা ও অবৈধতা বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যে বলেন, সাধারণভাবে ইজতিহাদ ও তাকলীদ দুটিই জায়েয বিষয়। এ দুটি কারো জন্য একক অর্থে হারামও নয়, আবার নিঃশর্তবাবে গ্রহণ করাও ওয়াজিব নয়। যে মুজতাহিদের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, তার জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ। ইজতিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা জায়েয।
বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্নে তাকলীদ তিন প্রকার।

ক. সর্বসম্মত বৈধ তাকলীদ

সাহাবায়ে কেরাম থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত কারো মধ্যে এ বিষয়ে ইখতিলাফ নেই যে, শরীয়া বিষয়ে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিমের জন্য ফতোয়াদানে সক্ষম কোনো আলিমের তাকলীদ করা জায়েয। ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। এই প্রকারের তাকলীদ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল বহুলপ্রচলিত। সাধারণ সাহাবীগণ আসহাবে রাসূল এর মধ্যে **যে** কারো থেকে শরীয়তের অজানা বিষয় জেনে নিতেন। তারা জিজ্ঞাসিত মাসআলার জবাব দিতেন। সাধারণ সাহাবীগণও তাদের নির্দেশনামতে আমল করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ،

"তোমরা যদি তা না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।"।[৪৪]

---

[৪১] ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমদ, *মুজামু মাকায়ীসিল লুগাহ*, সম্পাদনা: আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯), খ. ৫, পৃ. ১৯।

[৪২] আল জুয়াইনী, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়ূসুফ, *আল ইজতিহাদ*, সম্পাদনা: কাযী আবদুল হামীদ আবু যানিদ, (দামেস্ক: দারুল কলম, খ. ১. পৃ. ৯৫।

[৪৩] রাজিহী, শাইখ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *আত তাকলীদ ওয়াল ইফতা ওয়াল ইসতেফতা*, (তারিখ ও স্থান বিহীন), পৃ. ৯।

[৪৪] আল কুরআন, ১৬;৪৩।

তবে মিথ্যা ও অন্যায় কাজে কারো তাকলীদ করা আল কুরআনে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ،

"বরং তারা বলে আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক করছি"।[৪৫]

খ. সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ তাকলীদ

তাকলীদ এর এমন একটি প্রকার রয়েছে, যা না জায়েয হবার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দ্বিমত নেই। তা হলো, একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো হুকুম উদ্ভাবনের পর তার ঐ বিষয়ে অন্য মুজতাহিদের ভিন্ন হুকুমের উপর আমল করা। কেননা এ বিষয়ে উসূলবিদদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন মুজতাহিদের নিকট ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো হুকুম লাভ করার পর তার জন্য অন্য মুজতাহিদের ইজতিহাদ মতো আমল করা জায়েয নেই। এ ক্ষেত্রে তার জন্য সকল দলীল-প্রমাণ যাচাই করে একটি দিককে প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ রয়েছে। এটি ইজতিহাদ ও তাকলীদ এর মধ্যবর্তী একটি স্তর। উসুলে ফিক্হ এর পরিভাষায় এটিকে التبصر বা الاتباع বলে । নিম্নের আয়াতটি এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দলীল ।

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَاب،

"সুসংবাদ দান করুন তাদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন"।[৪৬]

গ. বিরোধপূর্ণ তাকলিদ

শরীয়তের সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ (تقليد شخصي) বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের তাকলীদ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ'র কতিপয় আলিমের ইখতিলাফ রয়েছে। ব্যক্তিগত তাকলীদের বিষয়টি বর্তমান কালে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জমহুর উলামায়ে কেরাম থেকে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়নি। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ব্যক্তিগত তাকলীদের অনেক নযির রয়েছে, যা খাইরুল কুরুন (ইসলামের প্রথম তিন যুগ) থেকে এ যাবত অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিককালে কতিপয় আলিম এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির তাকলীদ করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নির্দেশনা নেই। মূলত চার মাযহাবের তাকলীদ এমন একটি বিষয়, যা ছাড়া একজন মুসলিম পূর্ণাঙ্গ শরীয়া পালনে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয় তার যাপিত জীবন। এতদ্ব্যতীত চার মাযহাবের মধ্যে শরীয়তের আনুষঙ্গিক সকল মাসআলা ও মানব সমস্যার অণুপুঙ্খ সমাধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ হাত্তাব আল বুওয়াইনী বলেন,

قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَرَأَيْت لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّلَاحِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ التَّقْلِيدَ يَتَعَيَّنُ لِهَذِهِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ انْتَشَرَتْ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى ظَهَرَ فِيهَا تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِّهَا وَشُرُوطُ فُرُوعِهَا فَإِذَا أَطْلَقُوا حُكْمًا فِي مَوْضِعٍ وُجِدَ مُكَمَّلًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ،

"ইমাম কারাফী বলেন, আমি শাইখ তাকিউদ্দীন ইবনুস সালাহ এর নিকট চার মাযহাবের তাকলীদ এর যথার্থতা ও অন্য ইমামের অনুকরণের অসারতার প্রমাণ পেয়েছি। কারণ এ মাযহাব চতুষ্টয় পৃথিবীময় সুবিন্যস্ত আকারে প্রসার লাভ করেছে। এমনকি সাধারণ বিষয়কে শর্তযুক্ত ও বিশেষায়িত প্রসঙ্গকে

---

[৪৫] আল কুরআন, ৪৩;২২।

[৪৬] আল কুরআন, ৩৯;১৭-১৮।

বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি আনুষঙ্গিক মাসআলার যাবতীয় শর্তাবলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি বিষয়ের বিবরণ কোনো অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেলে তা অন্য স্থানে বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায়।[৪৭]

ইব্‌ন আলান সিদ্দীকী 'রিয়াদুস সালিহীন' এর ভাষ্যগ্রন্থ 'দলীলুল ফালিহিন' কিতাবে চার মাযহাবের তাকলীদ এর যৌক্তিকতা উল্লেখ করে বলেন,

أمّا في زماننا فقال بعض أئمتنا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة : الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد ، لأنّ هؤلاء عرفت مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً وحكماً حكماً ، فقلّ أن يوجد فرع إلاّ وهو منصوص لهم إجمالا أو تفصيلا بخلاف غيرهم فإنّ مذاهبهم لم تحرر وتدوّن كذلك ، فلا يعرف لها قواعد يتخرج عليها أحكامها فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم ،

"বর্তমান সময়ে চার ইমাম তথা শাফিঈ, মালিক, আবু হানীফা ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ব্যতীত অন্য কোনো ইমামের তাকলীদ জায়েয হবে না। কেননা এ সব মাযহাব মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রতিটি মাসআলার বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ সব মাযহাবের অনুসারীগণ প্রতিটি মাসআলার বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। মানবঘনিষ্ঠ এমন কোনো সমস্যা পাওয়া যাবে না, যার সমাধান সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাযহাবসমূহে মাসআলাসমূহ সুবিন্যস্ত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সংকলন করা হয়নি এবং এ সকল মাযহাবে এমন কোনো মূলনীতিও প্রণীত হয়নি, যার আলোকে অন্যান্য মাসআলা উদ্ভাবন করা যায়। অতএব এ সব মাযহাবের বর্ণিত মাসআলাসমূহের আলোকে মাযহাবের ইমামদের তাকলীদ করা জায়েয হবে না।[৪৮]

১.১.৯. উন্মুক্ত ইজতিহাদ ও গণ্ডিবদ্ধ ইজতিহাদ

মুসলিম উম্মাহ শরীয়া পালনে নতুন নতুন সমস্যা ও বহুমুখী জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে আসছে ইসলামের অভ্যুদয়কাল থেকে। ফুকাহায়ে উম্মত নানাবিধ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর বিধান অবগত হবার লক্ষে প্রাণান্তকর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। নব-উদ্ভাবিত এ সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো ইজতিহাদ। সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবদ্দশায় শরীয়তের উৎসমূলে অনুসন্ধানপূর্বক ইজতিহাদের গতিধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাবিঈগণও অনুসরণ করেছেন তাদের পদাঙ্ক। যুগে যুগে ফকীহ-মুজতাহিদগণের সীমাহীন আত্মত্যাগের ফলে ইজতিহাদপ্রসূত সকল মাসআলা আজ মুসলিম উম্মাহ'র নখদর্পনে। ইসলামের আগমনের কয়েক শতাব্দী পর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নৈতিক পদস্খলন ঘটে। ইজতিহাদের সঙ্গে জড়িত আলিমগণের মধ্যেও এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্যণীয়। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও পর্যাপ্ত যোগ্যতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অনেকে মুজতাহিদ হবার দাবি করে। মূলত এক শ্রেণির কথিত ফকীহ-মুজতাহিদ কর্তৃক শরিয়তকে খেলনায় পরিণত করার পথটি এর মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যায়। যদি শরীয়তে এমন নতুন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, যার মূলনীতি ইসলামের ইতোপূর্বেকার শতাব্দীতে পাওয়া না যায়, তাতে নতুনভাবে ইজতিহাদ করা এ মতের পরিপন্থি নয়। জমহুর উলামায়ে কেরাম এ মতের অনুসারী। অযোগ্য ব্যক্তিদের ইজতিহাদ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন,

---

[৪৭] হাত্তাব আর রুআয়নী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, *মাওয়াহিবুল জালীল ফী শারহি মুখতাসারিল খলীল*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ, ১, পৃ. ৩০।

[৪৮] মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলান, *দলীলুল ফালিহীন শরহু রিয়াদুস সালিহীন*, (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪১৫।

الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منك وعليه عول الصحابة بعد أن استأثر الله برسوله صلى الله عليه وآله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا ولا يستقل به أحد ولكن لابد من أوصاف وشرائط ،

"ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবগতি লাভ করার পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাদের অনুসারী পরবর্তী যুগের আলিমগণও অদ্যাবধি এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে ইজতিহাদের শর্তাবলির সমাহার না থাকলে কারো পক্ষে ইজতিহাদ করা বৈধ নয় "।[৪৯]

ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হওয়া ও সুবিন্যস্ত মাযহাবসমূহের অনুসরণের অর্থ এই নয় যে, তাকলীদ শরীয়তের একটি মৌলিক বিষয়। বরং এটি ঐক্যের একটি সামিয়ানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিচ্ছিন্নতা ও কলহ-বিভেদের কবল থেকে মুসলিম উম্মাহ'কে রক্ষা করার একটি মজবুত হাতিয়ার। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,

إنّ تقليد المذاهب الأربعة كان أهون الشرين لإنقاذ الأمة من الشتات والضياع من ناحية الأحكام الشرعية ومعرفتها، فإن هذا لا يعني: أنّ هذا التقليد كان هو الخير الذي تبتغيه الأمة ويرضاه الدين بل أنّ هذا التقليد بمثابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه،

"চার মাযহাবের তাকলীদ ইসলামের মৌলিক বিধিসমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নয়। বরং এটি হলো উম্মতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কৌশলমাত্র। যাকে বলা হয় মন্দের ভালো। এর মাধ্যমে উম্মত বহুধা বিভক্তি থেকে রক্ষা পায়"।[৫০]

ইমাম শাওকানী এ মতের বিপরীতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাকলীদকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন।

إنّ سكوت العلماء عن إنكار هذه البدعة إنّما هو سكوت تقية لا سكوت موافقة مرضية،

"তাকলিদের মতো একটি নব উদ্ভাবিত পন্থাকে আলীমগণের অস্বীকার না করা একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির লক্ষ্যণ নয়"।[৫১]

এই শ্রেণির আলিমগণ যে সকল কারণে ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হবার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

ক. অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের মুজতাহিদ হবার দাবি করা এবং ফতোয়া ও বিচারালয়ে আনাড়ি লোকদের অধিষ্ঠান।

খ. মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্তি এবং শরীয়তের 'নস'সমূহকে নিজস্ব অভিপ্রায় ও সম্প্রদায়গত চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

গ. মুজতাহিদ আলিমদের চিন্তার ভিন্নতা এবং তাদের অনুসারীদের মুক্তচিন্তার পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে দালীলিকভাবে ঘায়েল করার প্রবণতা।

ঘ. মুসলমানদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। সঠিক দলীল-প্রমাণ দ্বারা এক পক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর অন্য পক্ষের বিদ্বেষবশত তার বিপরীত মত ব্যক্ত করা।

ঙ. রাজনৈতিক প্রভাব এবং এক শ্রেণির আলিমের দরবারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

---

[৪৯] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মানখুল*, সম্পাদনাঃ ড. মুহাম্মদ হাসান হাইতো, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯০ হি./১৯৭০ খ্রি.) পৃ. ৪৬২।

[৫০] আল মাজমাউল আলমী লিত তাকরীব বায়নাল মাযাহিবিল আরবাআ, *রিসালাতুত তাকরীব*, ৩য় সংখ্যা, ১৪১৪ হি. ফিকহুশ শাইখিস সামি আল গারীযী।

[৫১] প্রাগুক্ত।

চ. মাযহাবগত বাড়াবাড়ি। এক মাযহাবের আলোকে একটি হুকুম সাব্যস্ত হবার পর অন্য মাযহাবের অনুসারীগণ তার বিপরীত হুকুম প্রদানে সচেষ্ট থাকা।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পর ফকীহদের মধ্যে এমন একটি দাবির জনশ্রুতি রয়েছে যে, চতুর্থ শতাব্দীর পর কারো পক্ষে ইজতিহাদ করার অবকাশ নেই। তাদের যুক্তি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল মাযহাব সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং তাদের পূণ্যবান অনুসারীগণ এ সব মাযহাবের আনুষঙ্গিক সকল প্রকার মূলনীতি ও মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, পরবর্তী যুগের আলিমগণ প্রচলিত মাযহাবসমূহের মধ্যে কোনো একটির অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। তাদের যুক্তি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সর্বস্তরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর যে তাকওয়া, পরহেযগারী ও নৈতিকতা ছিল, পরবর্তী যুগের অনেক বিশিষ্টজনের মধ্যেও তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ইজতিহাদের শর্তাবলির অভাব কিংবা স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের অবাধ অনুমতি থাকলে শরীয়ত খেলনায় পরিণত হবার সমূহ আশঙ্কা থেকে যাবে। এ বিষয়ে মুহিব্বুল্লাহ বিহারী মুজতাহিদগণের উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي واختتم الاجتهاد به وعنوا الاجتهاد في المذهب وأما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة،

"একদল মুজতাহিদ ইমাম নাসাফী এর পরে ইজতিহাদ যুগের পরিসমাপ্তির দাবি করেন। মুজতাহিদগণের এ উক্তির মর্মার্থ হলো, ইজতিহাদ ফিল-মাযহাব এর যুগের পরিসমাপ্তি। ইজতিহাদে মুতলাক সম্পর্কে তাদের অভিমত হলো, প্রসিদ্ধ চার ইমামের পর ইজতিহাদ এর যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাদের পর উম্মতের জন্য এ চার মাযহাবের যে কোনো ইমামদের তাকলীদ করা ওয়াজিব"।[৫২]

মুসলিম উম্মাহ'র অপর একদল আলিমের অভিমত হলো, ইজতিহাদ ইসলামের এমন একটি অভিনব ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে অন্য ধর্ম থেকে এটিকে পৃথক করা যায়। মুক্ত চিন্তার আলোকে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অবগত হবার মাধ্যমেই ইসলাম কালোত্তীর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকবে। মূলত ইজতিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ-শক্তি। এ পথ রুদ্ধ হলে ইসলাম তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলবে।

ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হলে মুসলিম উম্মাহ সম্ভাব্য যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করো হলো।

ক. ইসলাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ জীবন বিধান। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইজতিহাদের পথ বন্ধ হলে ইসলাম তার স্বকীয়তা ও গতিময়তা হারিয়ে ফেলবে। নব উদ্ভাবিত সমস্যার সামাধানে এ বিধান অকার্যকর হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. ইজতিহাদ এর ভাবার্থ হলো, শরীয়তের বিধান অবগত হবার লক্ষে চিন্তার উৎকর্ষতাসাধন। ইজতিহাদ বন্ধ থাকার অর্থ হলো, চিন্তাশক্তির বৈকল্য ও বিবেকের অকার্যকারিতা। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সৃজনশীল প্রতিভার অবমূল্যায়ন করা হয়।

গ. ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের স্থায়িত্ব ও সচলতা স্থগিত হলে মানব রচিত বিধি-বিধান তার স্থান দখল করবে। এতে আল্লাহর বিধান পরাজিত হবে এবং মানব-বিধান বিজয়ী হবে।

ঘ. ইজতিহাদের পথ বন্ধ হলে কুরআন-সুন্নাহর পথে আহ্বানকারীগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং গবেষণা মুখ থুবড়ে পড়বে। জাতি হিসেবে মুসললিমগণ নিথর ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে।

---

[৫২] বিহারী, মুহিব্বুল্লাহ ইব্‌ন আবদুশ শাকুর আল হিন্দী, *ফাওয়াতিহুর রাহমূত বি শারহি মুসাল্লামুস সুবূত*, সম্পাদনা: আবদুল্লাহ মাহমুদ মুহাম্মদ উমার, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৯০।

ইজতিহাদের পথ বন্ধ হলে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিশাল শাখা 'উসূলে ফিক্হ' তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে।

পূর্ববর্তী ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মধ্যে যারা ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা হলেন, ইমাম ইব্ন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনুল আরবী, যামাখশারী, জালালুদ্দীন সিয়ুতী, আবুল ফাত্হ শাহরাস্তানী, ইমাম শাতিবী, শাওকানী, কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী, তাজুদ্দীন সুবকী ইত্যাদি। পরবর্তী যুগের ফকীহগণের মধ্যে রয়েছেন, জামালুদ্দীন আফগানী, শাইখ মুহাম্মদ আবদুহু, মুহাম্মদ রশিদ রেজা, শাইখুল আযহার মাহমুদ শালতূত ও আহমাদ আমীন।

১.১.১০. ইজতিহাদের প্রমাণ

ইজতিহাদ শরীয়তের নস দ্বারা প্রমাণিত একটি বাস্তব বিষয়। কুরআন-সুন্নাহ'য় ইজতিহাদের অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইজতিহাদ করে এর বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। প্রাগ্রসর সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবী তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেছেন। যুগে যুগে এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর আলিমদের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। যুক্তি ও বিবেক ইজতিহাদের বাস্তবতা প্রমাণ করে। নিম্নে ইসলামী শরীয়তের দলীল চতুষ্ঠয়ের আলোকে ইজতিহাদের প্রামাণিকতা আলোচনা করা হলো।

ক. আল কুরআনে ইজতিহাদ

আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব মানবতার সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেন, তার অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি একটি শাশ্বত ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা। যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইজতিহাদ হলো ইসলামের জীবনীশক্তি সমতুল্য। শরীয়া বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমদের দ্বারা এ ইজতিহাদ কার্যকর হয়। কুরআন সুন্নাহ'য় রয়েছে যার অকাট্য দলীল। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নির্দেশনা হলো, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ "অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো"।[৫৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরকে তাদের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আমীদী বলেন, এখানে মুজতাহিদ আলিমদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন শরীয়তের নসসমূহে চিন্তা-গবেষণা করেন। যাতে সংঘটিত সমস্যায় সঠিক সমাধানে পৌঁছতে পারেন।[৫৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ

"এবং স্মরণ করুন, দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর কথা তারা যখন তারা বিচার করতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।"[৫৫]।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،

---

[৫৩] আল কুরআন, ৫৯;২।

[৫৪] রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, *ইজতিহাতুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবীয়্যি*, (নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৭।

[৫৫] আল কুরআন, ২১;৭৮।

"অতঃপর আমি সুলায়মানকে (আ) ফায়সালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও হিকমাহ দান করেছি" ।[৫৬]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিতে 'বিচার ফায়সালা' ও 'জ্ঞান দান করা' শব্দ দুটি দ্বারা ইজতিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ওহির কথা বোঝানো হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا،

"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা উপস্থাপন করো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো। আর এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর" ।[৫৭]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ،

"আর যখন শান্তি অথবা শংকার কোনো সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা এটি প্রচার করে বেড়ায়। তারা যদি এটি রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এটির যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।"[৫৮]

এই আয়াতে 'উলুল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম।

ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, `لعلمه الذين يستنبطونه منهم` এর অর্থ হলো, যারা চিন্তা-গবেষণা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা জটিল বিষয়ের সমাধান করেন।[৫৯]

এই আয়াতের আলোকে মুজতাহিদ হলেন ঐ সকল ফকীহ, যারা গভীর গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল বিষয়ের সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখেন, যেখানে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট কোনো 'নস' বিদ্যমান নেই।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় ইজতিহাদ

ইজতিহাদ এই উম্মতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে ইজতিহাদ বিষয়ে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ،

"বিচারক যখন ইজতিহাদপূর্বক ফায়সালা প্রদান করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার জন্যে দুটি সওয়াব রয়েছে। আর ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও একটি সওয়াব লাভ করবে" ।[৬০]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের একটি বিশেষ হুকুম। মুজতাহিদ এখানে বিশুদ্ধ ইজতিহাদের কারণে যেভাবে পূণ্যের অধিকারী হন, ভুল করলেও সওয়াব লাভ করেন।

---

[৫৬] আল কুরআন, ২১;৭৯।

[৫৭] আল কুরআন, ৪;৫৯।

[৫৮] আল কুরআন, ৪;৮৩।

[৫৯] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *ফাতহুল কাদির*, (বৈরুত: দারু ইব্ন কাসীর, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৫২।

[৬০] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বৈরুত: দারু ইব্ন কাসির, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৬. পৃ, ২৬৭৬, হাদীস নং- ৬৯১৯।

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদপূর্বক যে উত্তম ফায়সালা প্রদান করবে, তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় বলে বিবেচিত। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার অন্তরসমূহের প্রতি নজর দিয়ে দেখলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তর হলো সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং তাঁকে রিসালতের জন্য নির্বাচন করেন এবং ঐশী জ্ঞানের জন্য মনোনীত করেন। অতঃপর অন্যান্য বান্দার অন্তরের প্রতি নজর দিয়ে দেখতে পেলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের অন্তর সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং তাদেরকে তাঁর সাহাবী হবার জন্য মনোনীত করেন। তাদেরক তাঁর দীনের সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা নিয়োগ করেন। অতএব মুমিনগণ যা উত্তম মনে করবেন, তা আল্লাহর নিকট উত্তম। আর যা মুমিনগণ অনুত্তম মনে করবেন, তা আল্লাহর নিকটও অনুত্তম"।[৬১]

গ. ইজমা'র আলোকে ইজতিহাদ

ইজতিহাদ শরীয়তের দলীল হবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উম্মতের নির্ভরযোগ্য ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামদের উক্তি দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইজতিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, খুঁটি-ভিত্তি এবং এটি শরীয়তের দলীল হবার ব্যাপারে ইব্ন কুদামা (৫৪১-৬২০) বলেন,

ومعنى ذلك: أن العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نص معين على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، وروحها السمحة،وعلى أساس دلالات الألفاظ اللغوية، باعتبار أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين وكذلك السنة النبوية فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،

"এ ইজতিহাদের ভিত্তি হবে শরীয়তের বিধিবদ্ধ মূলনীতি, উদারনৈতিক প্রাণশক্তি ও মুসলিম উম্মাহর সমাগ্রিক কল্যাণ। কুরআন সুন্নাহর ভাষালংকারও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য। কেননা আল কুরআন এমন একটি কিতাব, যা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর ভাষাও হলো আরবের সর্বাধিক প্রাঞ্জল।[৬২]

হিজরী প্রথম শতক ছিল ইজতিহাদের উর্বর যুগ। এ যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী পাঠশালার প্রধান শিক্ষার্থী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা, তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ। এ শতকের মুসলমানদের বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের নিকট ইজতিহাদের এ যোগ্যতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যা বিশুদ্ধতার মানদণ্ডেও ছিল উত্তীর্ণ। এ শতকের মুসলমানদের ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ইব্ন কুদামা (৫৪১-৬২০ হি.) বলেন,

وهذه الأهلية كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا أفقه الناس لروح الإسلام وأعلمهم بمقاصده ومراميه فقد تربوا في الحضرة النبوية وعاشوا نزول الآيات

---

[৬১] তায়ালিসী, আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইবনুল জারুদ, *মুসনাদু আবি দাউদ আত তায়ালিসী*, সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মুহসিন তুর্কী, (মিসরঃ দারু হাজার, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৯।

[৬২] মাকদিসী, ইব্ন কুদামা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ মুয়াফ্ফাকুদ্দীন, *রাওদাতুন নাজির ওয়া জান্নাতুল মানাজির*, (বৈরুত: মাকতাবাতুর রাইয়ান, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯।

وأسبابها وورود الأحاديث النبوية مع سلامة الفطرة ونور البصيرة وجودة الفهم وتمكن من اللغة حيث كانت سليقة وسجية طبعوا عليها منذ نعومة أظفارهم،

"এ শতকের মুসলমানদের বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের নিকট ইজতিহাদের এ যোগ্যতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামী শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্যক জ্ঞাত। তাদের প্রতিপালন হয়েছে নবুওয়াতের পুত-পবিত্র দরবারে। আল কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও হাদীস বর্ণনার নেপথ্য কারণ সম্পর্কেও তারা ছিলেন অত্যধিক অবগত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ-বিশ্বাসের স্বচ্ছতা ও স্বভাবের বিশুদ্ধতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সর্বোপরি আরবী ভাষা-ভাষী হবার সুবাদে কুরআন সুন্নাহর মর্মবাণী আত্মীকরণের ব্যাপারে তাদের দক্ষতা ছিল আজন্ম। তারা নববী দরবার থেকে কুরআন সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট নস এর অবর্তমানে সমস্যা সমাধানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। ইজতিহাদ ও সুরুচিসম্পন্ন আহলে ইলমদের পারস্পরিক মতবিনিময়ই হলো তার উত্তম পন্থা"।[৬৩]

ইজতিহাদের প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে জলীলুল কদর তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض لك فيه سنّة؟ فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا له العالمين أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد،

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন অনেক সমস্যার মুখোমুখি হই, যে বিষয়ে আল কুরআনে কোনো বিধান বর্ণিত নেই। আর আপনার কোনো সুন্নাহতেও তার কোনো সমাধান পাই না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ ক্ষেত্রে আলিমদের অথবা আবিদদের জমায়েত করো এবং পারস্পরিকভাবে পরামর্শ করো। কখনো একক সিদ্ধান্তে ফায়সালা প্রদান করো না"।[৬৪]

ইজতিহাদ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন,

من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به،

"কোনো ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও মুসলিম ফকীহদের ইসতেম্বাতকৃত মাসআলা সম্পর্কে সম্যক অবগত হলে এবং কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে তার জন্য ঐ সকল সমস্যায় ইজতিহাদ করা জায়েয। তার জন্য নামায, রোযা, হজসহ যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সমাধান দেওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি সে সদৃশ বিষয়ে কিয়াস করে এবং চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদ করে এতে কারো আপত্তি করার সুযোগ নেই। তার কথা মতো আমল করা শরীয়ত মতে বৈধ। আর যদি সে ভুল করে তবে তার ভুল স্বীকার করা উচিত"।[৬৫]

ইজতিহাদের এ নিপুণ পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে সযত্ন প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) খেলাফতের দায়িত্ব আদায়ের পাশাপাশি ইজতিহাদের দায়িত্বও যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহ'র জন্য ইজতিহাদের প্রয়োগ-পদ্ধতির

---

[৬৩] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০।

[৬৪] কুরতুবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবি বকর, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, (সউদি আরব, দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫২ ।

[৬৫] ইবনুল কায়্যিম, আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৬।

সার্থক ও বাস্তব উপমা পেশ করেছেন। প্রথম খলীফা'র ইজতিহাদ পদ্ধতির একটি খণ্ডচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো,

روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم وإن لم يجد في كتاب الله نظر: هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنّة؟ فإن علمها قضى بها فإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا... فلم أجد في ذلك شيئًا فهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم قضى بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا فإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به،

"ইমাম বায়হাকী (৪৫৮ হি.) ও দারিমি (২৫৫ হি.) মাইমুন ইব্‌ন মিহরান থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা) এর নিকট দুই প্রতিপক্ষের কোনো সমস্যা উত্থাপিত হলে প্রথমে আল কুরআনে তার সমাধান তালাশ করতেন। আল কুরআনে তার সমাধান পাওয়া গেলে তিনি দুই পক্ষের মধ্যে আল কুরআনের আলোকেই সমাধান দিতেন। আল কুরআনে তার সমাধান পাওয়া না গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় তার সমাধান তালাশ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় এ সংক্রান্ত কোনো সমাধান সম্পর্কে অবগত হলে তিনি তা দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার সামাধান করতেন। এতেও কোনো সমাধান পেতে অপারগ হলে সাধারণ মুসলমানের নিকট এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সুন্নাহ আছে কিনা? তা জানার জন্য বের হয়ে যেতেন। তিনি মুসলমানদের নিকট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলতেন, আমার নিকট এই ধরনের সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ'য় এ সংক্রান্ত কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। আপনাদের নিকট কি এমন কোনো তথ্য আছে যে, এ ধরনের সমস্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সমাধান পেশ করেছেন? এমন পরিস্থিতিতে অনেকের পক্ষ থেকে ইতিবাচক ফায়সালা পেয়ে যেতেন। অনেকে বলতেন, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের সমস্যায় এমন ফায়সালা দিয়েছেন। তখন আবু বকর (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফায়সালা অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করতেন। এ সময় তিনি আনন্দ প্রকাশপূর্বক আল্লাহর প্রসংশা করে বলতেন, সমস্ত প্রসংশা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মধ্যে এমন লোকদের সৃষ্টি করেছেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। সাধারণ মুসলমানের নিকট কোনো সমাধান পাওয়া না গেলে তিনি নেতৃস্থানীয় মুসলমান ও আলিমদের আহ্বান করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন"।[৬৬]

দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন মুজতাহিদের একজন বাস্তব প্রতিভূ। ন্যায়বিচার, সাম্য ও নীতি-নৈতিকতার পাশাপাশি এ যুগটি ছিল ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ। উমার (রা) এর যুগে নিযুক্ত মুসলিম জাহানের প্রধান বিচারপতি শুরাইহ (র) এর নিকট খলীফা'র লিখিত একটি পত্র ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।

قال الشعبي: قال عمر بن الخطاب ما في كتاب الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقض به فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم فما قضى به أئمة العدل وما لم يقض به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك وأن شئت تؤامرني ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك،

---

[৬৬] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪।

"ইমাম শাবী (২১-১০০ হি.) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, কিতাবুল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিচারব্যবস্থার মূলনীতি অনুয়ায়ী আপনি বিচারালয় পরিচালনা করবেন। যদি আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উদ্ভব হয়, যার কোনো সমাধান আল কুরআনে নেই অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংক্রান্ত কোনো সমাধান পেশ করেননি। তবে আপনি ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বিচারনীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যদি ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বিচারে তার কোনো উপমা না থাকে, তবে এ ব্যাপারে আপনার পূর্ণ ও স্বাধীন অধিকার থাকবে যে, আপনি চাইলে ইজতিহাদ করবেন অথবা আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আমাদের পারস্পরিক পরামর্শমূলক সিদ্ধান্ত আপনার জন্য অধিক নিরাপদ"।[৬৭]

কাজী শুরাইহ (র) এর নিকট খলীফা উমার (রা) এর লিখিত পত্রখানা নিম্নের ভাষায়ও পাওয়া যায়।

إذا جاءك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ رسول الله فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شئت فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك وإن شئت فأخره ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك،

"যদি কিতাবুল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় তার কোনো সমাধান পাওয়া না যায়, তবে মুসলমানদের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মীমাংসা করবেন। যদি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলে তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া না যায় এবং মুসলমানদের কারো উক্তিও বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার নিকট দুটি পথ খোলা থাকবে। একটি হলো, আপনি সামনে অগ্রসর হবেন এবং ইজতিহাদপূর্বক নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। অথবা চিন্তা-গবেষণার জন্য বিচার খানিকটা বিলম্বিত করবেন। চিন্তা-গবেষণার লক্ষ্যে বিলম্বিত বিচার আপনার জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক"।[৬৮]

দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) এর কর্মপন্থাও তাই ছিল। তিনি কুরআন-সুন্নাহ'য় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না পেলে অনুসন্ধান করে দেখতেন, এ বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর কোনো ফায়সালা আছে কি না? আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর কৃত সমাধান পেয়ে গেলে তিনি সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। নতুবা শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের আহ্বান করতেন এবং সর্ববাদী মতামত অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করতেন"।[৬৯]

ইজতিহাদের এ ক্রমধারা প্রথম চার খলীফা, উমাইয়া-আব্বাসিয়াসহ খেলাফতের সকল যুগে একটি জীবন্ত বিষয় হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। যা ইসলামী শরীয়তের গতিকে রেখেছে সঞ্চালিত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, যাতে ইজতিহাদের নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। 'উসূলে ফিক্হ' নামক যে শাস্ত্রে ইজতিহাদের নীতিমালা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, তার মৌলিক উপাত্ত সাহাবায়ে কেরামের নীতি-পদ্ধতি থেকে সংগৃহীত। ইমাম মালিক (রহ.) সংকলিত 'মুয়াত্তা' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মদপানকারীর শাস্তি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের নিকট জানতে চাইলেন। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বললেন, আমার মতে তাকে আশি বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন।

وإنّما كان يُعزَّر ويُضرب ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قرَّر بطريق الاجتهاد أن يُجلد أربعين جلدة ولما كان زمن عمر رضي الله عنه أقبل الناس على الخمر وأكثروا فيها فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في زيادة الحدّ فأشار عليّ رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أن يزيد الحدَّ إلى ثمانين جلدة لأنَّه إذا سكر هذى ومن هذى افترى فيُقام

---

[৬৭] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসর: আল মাকতাবতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, সম্পাদনা: আবদুল আযীয মুস্তফা আল মারাগী, ১৩৬৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৬ ।

[৬৮] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬।

[৬৯] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭১।

عليه حدّ المفتري ثمانين جلدة واتفق الصحابة على ذلك فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين جلدة،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মদ পানকারীকে শাস্তিস্বরূপ জুতোপেটা করা হতো। আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর যুগে ইজতিহাদের মাধ্যমে চল্লিশ বেত্রাঘাত শাস্তি নির্ধারিত হয়। উমার (রা) এর যুগে এ অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাদের শাস্তি বৃদ্ধির জন্য সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। কেননা মদ পান করার কারণে মানুষ নেশাগ্রস্থ হয়। আর নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। আর অসংলগ্ন ব্যক্তি অপবাদ আরোপ করে। সুতরাং তার ব্যাপারে আমি (قذف) অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা সমীচীন মনে করি। অতঃপর খলীফা উমার (রা) মদপানকারীর শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন"।[৭০]
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, যে স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার ইদ্দতকালীন সময় হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এ সময় অল্প হোক বা বেশি হোক। এ বিষয়ে তিনি আল কুরআনের এ আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،

(আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত) [৭১]
তার দৃষ্টিতে [৭২] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে) সূরা নিসা'র এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা মনসুখ হয়ে গেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এ বিষয়ে 'মুবাহালা'[৭৩] করতে প্রস্তুত আছি যে, সূরা নিসা'র পূর্বোক্ত আয়াতটি সূরা তালাকের আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ঘ. কিয়াস এর নিরিখে ইজতিহাদ

ইসলাম একটি প্রাণবন্ত ও বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো ইজতিহাদও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত একটি বিধান। এ বিষয়ে ইমাম আমীদী (৫৫১-৬৩১ হি.) বলেন, ইজতিহাদ করা উম্মতের উপর ফরযে কেফায়া। প্রতিটি যুগে এমন কোনো মুজতাহিদ আলিম থাকা অপরিহার্য, যারা শরীয়তের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। কোনো যুগে এমন মুজতাহিদ আলিম অনুপস্থিত থাকলে সমগ্র উম্মত গুনাহগার হবে। কেননা এতে পুরো জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত হলো, এই উম্মত কখনো সামগ্রিকভাবে গোমরাহ হতে পারে না। এই উম্মত যতদিন জামায়াতবদ্ধ থাকবে ততদিন তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত থাকবে। এ কারণে জাতির একটি নির্দিষ্ট দলের উপর জ্ঞানার্জন ও ফিক্হ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৭৪]
ইসলামে কিয়াস এর প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ،

---

[৭০] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৫৬ ।

[৭১] আল কুরআন, ৬৫;৪ ।

[৭২] আল কুরআন, ২;২৩৪ ।

[৭৩] আল কামূসুল মুহীত প্রণেতা বলেন, আল বাহলু শব্দটি লানত ও অভিশাপ অর্থে ব্যবহৃত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মোবাহালা বলা হয়, পরস্পর বিরোধী দুজন অভিশাপদানকারীর মধ্যে প্রত্যেক জন মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লানত নাযিল হবার দোয়া করা।

[৭৪] ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা: শাইখ আহমাদ মুহাম্মদ শাকের (বৈরুত: দারুল জীল প্রকাশনা, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ২৩৪ ।

"আল্লাহর নিকট নিশ্চয় ঈসা আলাইহিস সালাম এর উদাহরণ হলো আদম আলাইহিস সালাম এর ন্যায়। তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার পর বললেন, ('কুন') হয়ে যাও। অমনি (তিনি সৃষ্টি) হয়ে গেলেন"।[৭৫] এখানে আল্লাহ তায়ালা ঈসাকে আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে একটি বিষয়ে তুলনা করেছেন। তা হলো, আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির পেছনে পিতা-মাতার কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আদমকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনিভাবে পিতা ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতে আল্লাহর কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত ঘটনায় কিয়াসের বৈধতার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায়। উমার (রা) বলেন, আমি একদিন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে এই মর্মে ঘটনার বিবরণ দিলাম যে, আমি আজকে একটি মারাত্মক অপরাধ করেছি, রোযা রেখে চুম্বন করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি রোযা রাখাবস্থায় কুলি করো এতে কি রোযার কোনো অসুবিধা হয়? আমি বললাম, না। কোনো অসুবিধা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটাও অনুরূপ"।[৭৬]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভঙ্গ না হবার ব্যাপারে চুম্বন করাকে কুলি করার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দুটি কাজের মধ্যে একটি বিষয়কে অভিন্ন কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তা হলো নিষিদ্ধ কাজ না করেও তার প্রতি মনোভাব পোষণের দিকে অগ্রগামিতা। সুতরাং পানি পান না করে কুলি করলে যেভাবে রোযার কোনো অসুবিধা হয় না, স্ত্রী সঙ্গম না করে চুম্বন করলেও রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করার একটি ঘটনা সহীহ মুসলিম শরিফে আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا،

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের পর কুরবানির গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বকর বলেন, এটি আমি উমরা (রা) এর নিকট আলোচনা করলাম। তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন, আমি আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কুরবানীর সময়ে গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবার দলে দলে মদীনায় আগমন করে। এটা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তিনদিন পর্যন্ত কুরবানীর গোশত জমা করতে পারো। এর পর তা সদকা করে দেবে। পরবর্তী সময়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ এখন কুরবানির গোশত দ্বারা পাত্র ভর্তি করছে এবং তা থেকে চর্বি সংগ্রহ করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণ কি? উত্তরে তারা বলল, কারণ আপনি তিনদিনের পর গোশত খেতে বারণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন দলের আগমনের কারণে এটা আমি

---

[৭৫] আল কুরআন, ৩;৫৯।

[৭৬] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুত:আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ,তা/বি.), পৃ. ১৪৭, খ. ২, হাদীস নং- ২৩৮৫।

নিষেধ করেছি। এখন চাইলে তোমরা খেতেও পারো। জমাও করতে পারো এবং সদকাও করতে পারো।[৭৭]

কুরবানীর গোশত তিনদিনের অধিক জমা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকজনের মদীনায় আগমন। নিষেধজ্ঞা মুলতবী হবার কারণ হলো অভাবমোচন এবং সাহায্যপ্রার্থী দলের প্রস্থান। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্যপ্রার্থী দলের আগমন ও প্রস্থানের কারণ উল্লেখপূর্বক হুকুম জারি করেছেন। সুতরাং যখনই এ কারণ বিদ্যমান থাকবে হুকুম বহাল থাকবে। আর যখন এ কারণ তিরোহিত হবে হুকুম মুলতবী হবে।

১.১.১১. ইজতিহাদের ইতিহাস

ইজতিহাদের বর্তমান প্রচলিত সংজ্ঞা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদ্যমান ছিল না। মুআয ইব্‌ন জাবালকে (রা) ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্তির পর এ পরিভাষা সাহাবায়ে কেরামের নিকট পরিচিতি লাভ করে। সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) কুরআন-সুন্নাহয় সমস্যা সমাধানের কোন সূত্র খুঁজে না পেলে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে সমাধান বের করার নীতি অবলম্বন করতেন। উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় এটিকে সম্মিলিত ইজতিহাদ (الاجتهاد الاجتماعيَ) বলে। দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ করলেও তা পারিভাষিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। কাজী শুরাইহ (র) এর নিকট লিখিত উমার (রা) এর পত্র দ্বারা সর্বপ্রথম এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। উমাইয়া খেলাফতের প্রায় শতাব্দীকাল ও আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিককালে খুলাফায়ে রাশেদুন ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নীতির আলোকে ইজতিহাদী কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। মুজতাহিদ সাহাবী ও তাবিঈগণ ইজতিহাদের মূলনীতির আলোকে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করতেন। তাদের অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ইসলামের সূচনাকালের কয়েক শতাব্দীতে ইজতিহাদের কর্মধারা এত বেশি প্রসারিত হয় যে, তৎকালে এমন অনেক মুজতাহিদ এর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের কোনো অনুসারী পাওয়া যায়নি। আব্বাসী খলীফা মনসুর ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাসকে (রহ.) মুসলিম উম্মাহর জন্য অভিন্ন শরীয়া পালনের নিমিত্তে একটি গ্রন্থ রচনার তাগিদ দেন, যাতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) শরীয়া আইন পালনে যে সহজ পন্থা গস্থহণ করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন তাতে সমন্বয় সাধন করা যায়। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.) এর নিকট খলীফার এ প্রস্তাব সমীচীন মনে হয়নি। যার কারণে তিনি এ সংক্রান্ত এশটি কিতাব রচনা করলেও তা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে নির্ধারণ করার পক্ষে মত দেননি। অবশেষে ৩৮১ হিজরীতে খলীফা আল কাদীর এর শাসনামলে চার মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় চার জন আলীমকে তাদের মাযহাবের পক্ষে চারটি গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দেন। যার ফলে শাফিঈ মাযহাবের পক্ষে আল মাওয়ারদি 'ধাল ইকনা' হানাফী মযিহাবের পক্ষে আবুল হুসাইন আল কুদুরি 'ধাল মুখতাসার ফিল ফিক্‌হ' মালিকী মাযহাবের পক্ষে আবদুল ওয়াহহাব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসার ও এশটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাম্বলি মাযহাবের পক্ষে কে গ্রন্থ রচনা করেন তা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এর পর থেকে চার মাযহাবের মূলনীতির আলোকে শরীয়া পালন মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করে।[৭৮]

---

[৭৭] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৬১, হাদীস নং- ১৯৭১ ।

[৭৮] আয়াতুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ মাহদী শামশুদ্দীন, *আল ইজতিহাদ ওয়াত তাজদীদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: আল মুআসসাসাতুদ দুয়ালিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৬৪।

১.১.১২. ইজতিহাদ ও কিয়াস

উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে ইজতিহাদের পাশাপাশি যে পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা হলো কিয়াস। ইজতিহাদ এর সংজ্ঞা এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং কিয়াসের সংজ্ঞা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি পরিভাষার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। উসূলবিদদের মধ্যে অনেকে ইজতিহাদ ও কিয়াস এর মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকেই উভয়টির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[৭৯]

ইজতিহাদ ও কিয়াসঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

ইজতিহাদ ও কিয়াস এর মধ্যে সাদৃশ্য

ক. ইজতিহাদ ও কিয়াস উভয়ের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান অবগত হওয়া যায়।

খ. ইজতিহাদ ও কিয়াস উভয়টির মূল উৎস হলো কুরআন-সুন্নাহ ।

গ. ইজতিহাদ ও কিয়াস উভয়টির প্রয়োগ অন্যটির উপর প্রযোজ্য।

ইজতিহাদ ও কিয়াস এর মধ্যে বৈ-সাদৃশ্য

জমহুর উসূলবিদদের মতে ইজতিহাদ কিয়াস থেকে ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে একজন মুজতাহিদ এর সব ধরনের পদ্ধতিই হলো ইজতিহাদ। পক্ষান্তরে কিয়াস হলো ইজতিহাদের একটি পদ্ধতিমাত্র। উসূলবিদ ইমাম গাযালী এর মতে কিয়াস ইজতিহাদ থেকে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন পরিভাষা।[৮০]

১.১.১৩. সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের সূত্র

ইজতিহাদ-ইসতিম্বাতের মূল উৎস হলো কুরআন-সুন্নাহ। ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহর নস দ্বারা ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের উৎস হিসেবে প্রমাণিত। ইজতিহাদের দলীল শিরোনামে এ বিষয়ে কুরআনিক দলীল আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সুন্নাহর যে সকল উৎস থেকে ইজতিহাদের সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে তার কতিপয় সূত্র আলোচনা করা হলো।

সূত্র- ১

বৈধতা প্রতিটি বস্তুর আসল

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই বস্তুটি হালাল না হারাম ? উত্তর হবে, যদি বস্তুটি হারাম হবার বিষয়ে কোনো নস পাওয়া না যায়, তা হলে তা হালাল। আর হারাম হবার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে তা হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই সূত্রের বিবেচনায় ইসলামী শরীয়তে হালাল বস্তুসমূহের তালিকা দীর্ঘ। আর হারামের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। কোনো বস্তুর হারাম হবার বিষয়ে শরীয়তের নস হাতেগোনা। সুতরাং যে

---

[৭৯] আবদুস সালাম আল হুসাইন, *মুযাক্কিরাহ ফী মাবহাসিল ইজতিহাদ*, (আল খাস্সাহ ওয়াল মাহদুদাহ লিন নাশরিল ইলেক্টোনি, ৩য় সংস্করণ), পৃ. ২৪।

[৮০] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮১।

সকল বস্তুর হারাম হবার বিষয়ে কোনো নস পাওয়া যায় না, তা এ মূলনীতির আলোকে হালাল বলে বিবেচিত হবে।

এ মূলনীতি গৃহীত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে।

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا،

"আল্লাহ তায়ালা নিজ কিতাবে যা হালাল ঘোষণা করেছেন তা হালাল। যা হারাম ঘোষণা করা করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ কোনো কিছু ভুলে যান না"।[৮১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا ،

"নিশ্চয় আল্লাহ কিছু বিষয় ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা তা বিনাশ করো না। তিনি কতগুলো সীমানা নির্ধারণ করেছেন, তা লঙ্ঘন করো না। কিছু বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তোমরা তার অসম্মান করো না। কিছু বিষয়ে সুযোগদানের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।"[৮২]

সূত্র- ২

হালাল ও হারামের সমাবেশ হলে হারাম প্রাধান্য পায়

কোনো বস্তুর হালাল ও হারাম হবার বিষয়ে বিতর্ক ও সন্দেহ হলে শরীয়তে সতর্কতা অবলম্বনের বিধান বলবৎ রয়েছে। ইসলামী শরীয়তের 'নস'সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিষ্ট বিষয়ের প্রতিপালনের চেয়ে নিষিদ্ধ বিষয়ে সতর্কতার বিষয়টি অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং হালাল-হারাম সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি প্রধান বিধান হলো, হালাল হারাম একত্রিত হলে হালালের উপর হারাম প্রাধান্য পায়।

নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এ মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ،

"হালাল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট। হারাম বিষয়সমূহও সুস্পষ্ট। উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত কিছু বিষয়। যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকলো, সে নিজের দীন ও আত্মসম্মান রক্ষা করলো। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হলো, সে যেন হারাম কাজে লিপ্ত হলো। এটির উদাহরণ হলো ঐ রাখালের মতো, যে নিষিদ্ধ এলাকার চারপাশে পশু চারণ করে, যার ফলে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। সাবধান! রাজা-বাদশাহদের কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর আল্লাহর যমিনে তার সংরক্ষিত অঞ্চল হলো হারাম বস্তুসমূহ।[৮৩]

---

[৮১] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দান: মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪০৬।

[৮২] বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুসা, *আস সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২১।

[৮৩] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০।

সূত্র- ৩

প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে সিদ্ধ করে

মানুষ মারাত্মক কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে, তার জন্য নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করা জায়েয হয়ে যায়। যথা- কোনো ব্যক্তি এমন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেলো যে, পানাহার না করলে সে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আহার্য হিসেবে তার নিকট কোন হালাল দ্রব্য নেই। এমতাবস্থায় তার জন্য মৃত জন্তু আহার করা কিংবা অপরের সম্পদ বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করার ন্যায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ বৈধ বলে গণ্য হয় এবং বাধ্যগত অবস্থায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করাও তার জন্য বৈধ। এই সূত্রটি মূলত আরেকটি মূলনীতির অনুগামী। তাহলো, 'কষ্ট সহজতা কামনা করে'।

আল কুরআনে এই সূত্রটির উৎস হলো এই আয়াত,

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"[৮৪]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

"তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচল"।[৮৫]

হাদীস শরীফে এই সূত্রের উৎস হলো,

عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا،

"আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজে পাঠানোর সময় বলতেন, তোমরা মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করো, দূরে ঠেলে দিও না। সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন করে ফেলো না।[৮৬]

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ،

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনো কাজের নির্দেশ দিলে এমন কাজের নির্দেশ দিতেন, যা পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।[৮৭]

সূত্র- ৪

সন্দেহের কারণে দণ্ড বাতিল হয়ে যায়

অপরাধ প্রমাণে সন্দেহের সৃষ্টি হলে দণ্ড বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া অপরাধ সংঘটিত না হওয়ার মতো। ইসলামী শরীয়ত যথাসম্ভব দণ্ডবিধি প্রয়োগ পরিহার করার পক্ষে। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এ সূত্রের সমর্থন মেলে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ،

---

[৮৪] আল কুরআন, ৫;৩।

[৮৫] আল কুরআন, ১৬;১০৬।

[৮৬] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৫৮ ।

[৮৭] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ.১, পৃ. ২১।

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যথাসম্ভব মুসলমানদের দণ্ডবিধি বাতিল করে দাও। কোনো সুযোগ পাওয়া গেলেই তাদের মুক্ত করে দাও। কেননা ক্ষমা করার ক্ষেত্রে বিচারকের ভুল করা শাস্তি প্রয়োগে ভুল করার চেয়ে উত্তম"।[৮৮]

সূত্র- ৫

হারাম কাজে কৌশল অবলম্বন করাও হারাম

ইসলামী শরীয়তে হারামের তালিকা সুস্পষ্ট। প্রকাশ্যে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যেভাবে হারাম। শয়তানের প্ররোচনায় কৌশলপূর্বক গোপনে হারাম বিষয়ে অবতীর্ণ হওয়াও সামান অপরাধ। এ সূত্র যে হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدني الحيل،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইহুদিরা যে সকল অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তোমরা তাতে লিপ্ত হয়ো না এবং সামান্য কৌশলপূর্বক হলেও হারাম বিষয়সমূহ হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না"।[৮৯]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا،

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক মদকে ভিন্ন নাম দিয়ে পান করবে"।[৯০]

সূত্র- ৬

একটি ইজতিহাদ আরেকটি ইজতিহাদ দ্বারা বাতিল হয় না

বিচার ও ফায়সালার ক্ষেত্রে কৃত বিশুদ্ধ কোনো ইজতিহাদ অন্য একটি নতুন ইজতিহাদ দ্বারা বাতিল হতে পারে না। বিশেষত যখন এটি কার্যকর হয়। কেননা প্রথম ইজতিহাদ দ্বারা দ্বিতীয় ইজতিহাদ বাতিল হলে তৃতীয় ইজতিহাদও চতুর্থ ইজতিহাদ দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে শরীয়তের কোনো ইজতিহাদই কার্যকর থাকবে না। এ সূত্রের পক্ষে যে হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় তা হলো,

جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُكَ بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُكَ بِلِسَانِكَ أَخْرَجَنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: وَيْحَكُمْ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ وَلَا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَكَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لَاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ،

"নাজরানের অধিবাসীরা উমার (রা) এর ফায়সালাকৃত একটি বিচার নতুনভাবে নিষ্পত্তির জন্য আলী (রা) এর নিকট আগমন করলো। তারা বলল, উমার (রা) আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। আপনি আমাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দিন। এ বিষয়ে লিখিত দলীল ও মৌখিক সুপারিশ আপনার নিকট সংরক্ষিত

---

[৮৮] বগবী, মুহিউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল ফার্রা, *শরহুস সুন্নাহ*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩/১৯৮৩), খ. ১০, পৃ. ৩৩০ ।

[৮৯] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইগাসাতুল লাহফান*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৭ ।

[৯০] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ৬১৫।

আছে। আলী (রা) বলেন, তোমাদের ধ্বংস হোক! উমার (রা) ছিলেন যে কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তদানে সিদ্ধহস্ত। তার কোনো ফায়সালা আমি বাতিল করতে পারি না"।[৯১]

সূত্র- ৭

কোনো বস্তুর মালিকানা পরিবর্তনে মূল বস্তুতেও পরিবর্তন আসে

অর্থাৎ কোনো বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হয়ে গেলে যদিও দৃশ্যত ঐ বস্তুতে কোনো পরিবর্তন দেখা না যায়, প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তুর বাস্তবতায় পরিবর্তন আসে। এই সূত্রের মূল ধারণা পাওয়া যায় আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে।

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু গরুর গোশতের হাদিয়া আসলো, তাঁকে বলা হলো, এটা বরিরা (রা) এর জন্য সদকাকৃত গোশত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তার জন্য সদকা, আমাদের জন্য হাদিয়া"।[৯২]

হাদীসের মর্ম হলো, বরিরা (রা) যখন মালিকের নিকট থেকে গোশত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তা ছিল তার জন্য সদকা। আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হলো, তখন তা উপহার বলে গণ্য হলো। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, কোনো বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হবার কারণে ঐ বস্তুর বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায়। এখানে গোশতের হাতবদল হবার কারণে হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে। যে সদকা রাসূলের জন্য হারাম ছিল, মালিকানা পরিবর্তনের কারণে তা হালাল হয়ে সদকায় পরিণত হলো।

সূত্র- ৮

দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় চাক্ষুষ দর্শনতুল্য

অর্থাৎ শরীয়তের দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত, তা চোখে দেখার মতো বাস্তব। কেননা দলীল যদি চোখে দেখার মতো শক্তিশালী না হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরীল ও শপথ দ্বারা ফায়সালা দিতেন না। এ সূত্র প্রবর্তিত হয়েছে বান্দার জন্য কোনো বিষয় সহজ করা এবং কারো হক ধ্বংস না হবার জন্য। নিম্নের হাাদিস দ্বারা এ সূত্র প্রমাণিত।

الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ،

"দাবিদারকে দলীল উপস্থাপন করতে হবে, যার উপর দাবি উত্তাপিত হয়েছে, তাকে শপথ করতে হবে"।[৯৩]

---

[৯১] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: কামাল ইয়ূসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৫৭, হাদীস নং- ৩২০০৪ ।

[৯২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৭৫৫ ।

[৯৩] ইব্‌ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ আল কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (কায়রো: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি,), খ. ২, পৃ. ৭৭৮ ।

সূত্র- ৯

বিচারকের ভুলের ক্ষতিপূরণ নেই

বিচারব্যবস্থাকে নির্বাঘ্ন করার লক্ষ্যে এ সূত্র প্রণীত হয়েছে। বিচারক হলো শরীয়ত প্রণেতার স্থলাভিষিক্ত। যিনি অন্যের তরে কাজ করার জন্য নিবেদিত। ভুল-ত্রুটি থেকে তারা সাধারণত বেঁচে থাকতে পারে না। বিচারকের ভুলের কারণে তার উপর জরিমানা আরোপ করা হলে মানুষ এ কাজ থেকে বিরত থাকবে। বিচারব্যবস্থা ভুলুণ্ঠিত হবে। যার ফলে জনস্বার্থ হবে উপেক্ষিত। শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

নিম্নের হাদীস দ্বারা সূত্রটি প্রমাণিত।

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،

"বিচারক ইজতিহাদপূর্বক কোনো সঠিক ফায়সালা দিলে, তার জন্য দুটি সওয়াব। আর ইজতিহাদ করে ভুল ফায়সালা দিলে, তার জন্য একটি সওয়াব"।[৯৪]

সূত্র- ১০

শরীয়তবিরোধী সকল শর্ত বাতিল হবে

বেচা-কেনার ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো শর্ত আরোপ করা হয়, যা শরীয়তবিরোধী। তাহলে বেচা-কেনার ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়, তবে ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি শর্তটি চুক্তির মূল বিষয় হয়। যেমন বিয়ে-শাদীর মধ্যে এ শর্ত আরোপ করা হলো যে, স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। অথবা বেচা-কেনার মধ্যে শর্ত আরোপ করা হলো যে, ক্রয়কৃত মাল ক্রেতা ভোগ করতে পারবে না। যদি শর্তটি চুক্তির মূল উদ্দেশ্য না হয়, তবে শর্ত বাতিল হবে। যেমন- বিয়ের মধ্যে এ শর্ত আরোপ করা হলো যে, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী সঙ্গম করতে পারবে না।

সূত্রটি নিম্নের হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জনসমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা করার পর তিনি বললেন, ঐ সকল মানুষের কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করছে, যা শরীয়তের মূল দলিলে নেই। কিতাবুল্লাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও একশত শর্ত আরোপ করা হয়। আল্লাহর ফায়সালা অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহপ্রদত্ত শর্ত সবচেয়ে মজবুত।[৯৫]

এখানে কিতাবুল্লাহ অর্থ কেবলমাত্র আল কুরআন নয়। বরং শরীয়তের ঐ সকল মূল দলীল, যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে নির্গত হয়েছে। এখানে মাসদার (মূলধাতু) মাফউল (কর্মকারক) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের সমর্থনে আল কুরআনের অন্য আয়াতটি হলো,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ،

"নির্দিষ্ট সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য"।[৯৬]

---

[৯৪] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ .৩, পৃ. ১৩৪২।

[৯৫] তাহাবী, আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা, *শরহু মাআনিল আসার*, (মদীনা: আলামুল কুতুব, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৩।

[৯৬] আল কুরআন, ৪;১০৩

সূত্র- ১১

সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না

এটি ইজতিহাদের একটি মূল সূত্র। যার উপর ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনেক মাসআলা নির্ভরশীল। বান্দার জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান সহজ করার লক্ষ্যে এ সূত্র প্রণীত হয়েছে। সন্দেহ মানুষের মজ্জাগত বিষয়। নামায রোযা ইত্যাদি আদায়ে মুমিনদের বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়। সন্দেহের কারণে তারা নানা রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। শরীয়তের বিধি-বিধান আদায়ে সহজ পন্থা অবলম্বনের লক্ষে সন্দেহের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। আর নিশ্চিত জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদান করে তা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে এ সূত্রে মত প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নের হাদীস থেকে এ সূত্রের সমর্থন পাওয়া যায়।

- إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا،
- "তোমাদের কারো পেটে সমস্যা অনুভূত হবার পর পেট থেকে কোনো কিছু বের হয়েছে কি না সন্দেহ হলে, আওয়ায শোনা ও গন্ধ অনুভব হওয়া পর্যন্ত সে যেন মসজিদ থেকে বের না হয়"।[৯৭]
- এ সূত্রের সমর্থনে বুখারী শরীফের বর্ণনাটি নিম্নরূপ,
- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا،

"আব্বাদ ইব্‌ন তামীম তার চাচা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এ অভিযোগ করলো যে, নামাযরত অবস্থায় তার পেট থেকে কোনো কিছু বের হবার ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তিনি বললেন, সে স্পষ্ট আওয়ায অথবা গন্ধ পাওয়া পর্যন্ত নামায ছেড়ে দেবে না"।[৯৮]

পরিচ্ছেদ- ২
মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগে ইজতিহাদের প্রকৃতি ও পরিধি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কি জীবনের তেরো বছরসহ প্রথম হিজরী থেকে এক শতাব্দী পর্যন্ত সময়-কালকে মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের শতাব্দী-অধিক এই সময় ছিল ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ। এই সময়-কাল দুই ভাগে বিভক্ত। নবীযুগ ও সাহাবীযুগ। রাসূলের ভাষায় যে যুগকে 'খাইরুল কূরুন' তথা সর্বোত্তম যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইজতিহাদের সূচনা হয়। তারাই এ সংক্রান্ত নির্দেশের প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নবী-রাসূলের পর বনি আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। এ শতকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে ইজতিহাদ সম্পাদিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির অবর্তমানে ইজতিহাদ করেছেন এবং অভিনব পন্থায় সাহাবীদের ইজতিহাদ এর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কখনো সরাসরি নিজে ইজতিহাদ করে তার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তার চর্চা করতেন। সাহাবায়ে কেরাম বিশুদ্ধ

---

[৯৭] বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, *আস সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.) ,খ. ১, পৃ. ১৮৮।

[৯৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯।

মূলনীতির আলোকে যে সকল ইজতিহাদ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সত্যায়ন করছেন। এতে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করেছেন। কোথাও সংযোজন-বিয়োজন বা পরিমার্জন করেছেন। কখনো নীরব থেকে তার প্রতি মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। কখনো মৃদু-মুচকি হেসে সমর্থন দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণপূর্বক নিজেদের জীবনে উদ্ভাবিত সমস্যাবলি সমাধান করতেন

১.২.১. নবীযুগে ইজতিহাদের প্রকৃতি

ক. মৌন সমর্থন দ্বারা ইজতিহাদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইজতিহাদ এর বহুমুখী প্রকৃতির মধ্যে অন্যতম একটি প্রকৃতি হলো, মৌন সমর্থন দ্বারা সাহাবীদের ইজতিহাদের অনুমোদন করা। নিম্নের ঘটনাটি তার একটি বাস্তব উদাহরণ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صلاة الصبح قال لما قدمت علي رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا،

"'আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, (ذَاتِ السُّلَاسِلِ) 'যাতুস সালাসিল' নামক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রচণ্ড এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। গোসল করলে ঠাণ্ডাজনিত কারণে আমার প্রাণ সংহারের আশঙ্কা করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম করে ফজরের নামাযে ইমামতি করেছি। যুদ্ধ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিষয়টি আলোচনা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমর! তুমি কি গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নামাযের ইমামতি করেছো? আমি ঠাণ্ডাজনিত কারণে তা করেছি বলে রাসূলের নিকট স্বীকারোক্তি দিলাম। তখন আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার ঐ বাণীর কথা স্মরণ হলো, তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا '

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু"।[৯৯]

আমর (রা) এর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু বলেননি।[১০০]

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আস (রা) এর ইজতিহাদ সঠিক বলে প্রত্যয়ন করেছেন। আমর (রা) এর কথায় নিজে হেসে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।[১০১]

---

[৯৯] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ১৭৮১২।

[১০০] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল হাকিম, আল *মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, সম্পাদনা আবদুল কাদির আতা, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৬২৯।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় নীরব থাকার মাধ্যমে সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রতি সম্মতি প্রদান করেছেন। বনু কুরাইজা গোত্রের অবরোধকল্পে প্রেরিত সাহাবীদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আহযাবের যুদ্ধ শেষের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযা অবরোধের লক্ষ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গের মতো মারাত্মক অপরাধ করেছে। কাফেলার যাত্রাকালে তিনি বলেন,

لايصلين أحد العصر الا في بني قريضة،

"বনু কুরাইজা না পৌঁছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে"।

এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ পালনে সাহাবায়ে কেরাম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল সাহাবী বনু কুরাইজা পৌঁছার পূর্বেই যথাসময়ে আসরের নামায আদায় করে নেন। আরেক দল কুরাইজা গোত্রে পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশমতো বিলম্বে আসরের নামায আদায় করেন। অভিযান শেষে সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় ফিরে আসার পর দুই দলই নিজেদের কৃত ইজতিহাদ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই তিরস্কার করেননি। বরং নীরব থেকে দুই দলের ইজতিহাদের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন।[১০২]

বুখারী শরীফে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ،

খ. অনুকূল আমল দ্বারা সম্মতি প্রদান

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের আমলের অনুরূপ আমল করে তাদের ইজতিহাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সাহাবায়ে কেরামের কোনো অভিযানের প্রাক্কালে আরবের এক গোত্রনেতাকে সর্প দংশন করে। সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঐ ব্যক্তির ঝাড়ফুঁক করে। এতে ঐ ব্যক্তির আরোগ্য লাভ হয়। চুক্তি অনুযায়ী গোত্রের সর্দার তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করে। সাহাবায়ে কেরাম ঐ বিনিময় গ্রহণ করার বৈধতা-অবৈধতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যাচাই না করা পর্যন্ত তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি বলেন,

و ما أدراك أنها رقية؟ أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم بسهم،

"সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলে যে রোগী আরোগ্য লাভ করে, তা তোমরা কীভাবে জানলে? তোমরা সঠিক কাজ করেছো। বিনিময় হিসেবে প্রাপ্ত মাল তোমাদের মধ্যে বন্টন করে নাও এবং আমাকেও একভাগ দাও।[১০৩]

---

[১০১] আবু বকর আর রাযী 'আল ফুসূল ফিল উসূল' কিতাবে উপর্যুক্ত হাদীসের টীকায় লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমর ইবনুল আস (রা) এর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করাকে সমর্থন করেছেন, তেমনিভাবে অন্য সাহাবীদের গোসল ওয়াজিব মনে করার ইজতিহাদকেও অস্বীকার করেন নি।

[১০২] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১২, হাদীস নং- ৪১১৯।

[১০৩] প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদীস নং- ৫৭৩৬। ।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ উপযোগী বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ ইজতিহাদের অনুকূল আমল দ্বারা সম্মতি প্রদান করেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন।

গ. ভুল ইজতিহাদ সংশোধন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামের ভুল ইজতিহাদ সংশোধন করতেন তাই নয়; বরং ভুল সংশোধনের পাশাপাশি তাদের ইজতিহাদের পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিও শোধরে দিতেন। নিম্নের ঘটনাটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রচণ্ড শীতের রাতে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাতের বেলায় তাদের উভয়ের স্বপ্নদোষ হয়। আম্মার ইব্ন ইয়াসির পবিত্রতা লাভের উদ্দেশে মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন, আর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নামায ছেড়ে দিলেন। উভয়ে নিজেদের কৃত ইজতিহাদের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাদের ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে (রা) তায়াম্মুম করার পদ্ধতি নিজ আমল দ্বারা দেখিয়ে দেন।

إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه،

"তিনি দুই হাত মাটিতে স্থাপন করে ডান হাতের উপর বাম হাত মাসেহ করেন এবং দুই হাতের তালু ও মুখমণ্ডল মাসেহ করে দেখান। তিনি বলেন, তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল"।[১০৪]

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জন সাহাবীর কারো ইজতিহাদ সমর্থন করেননি। তবে আম্মার এর ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলেও তাতে পদ্ধতিগত যে ত্রুটি ছিল তিনি তা সংশোধন করে দেন। এখানে আম্মার জানাবতের (جنابت) গোসলকে অযুর পরিবর্তে যে তায়াম্মুম করা হয় তার উপর কিয়াস করেছেন। আম্মার (রা) এর উচিত ছিল, এটাকে পানির অবর্তমানে অযুর পরিবর্তে যে তায়াম্মুম করা হয় তার উপর কিয়াস করা। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ হয় এবং পানি না থাকার কারণে নামায হারিয়ে (فوت) যাবার আশঙ্কা হয়, এ ক্ষেত্রে তার উচিত হলো, অযু না থাকার কারণে যেভাবে তায়াম্মুম করতে হয় অনুরূপ তায়াম্মুম করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে (حدث أكبر) গোসল ওয়াজিব হয় এমন অপবিত্রতা ও (حدث أصغر) অযু ওয়াজিব হয় এমন অপবিত্রতার মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকার সূক্ষ্ম বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের অশুদ্ধ ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যানের আরেকটি উদাহরণ হলো সুনানু আবী দাউদ এ বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস।

قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ قَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা প্রদানের সময় জনৈক ব্যক্তিকে সূর্যের খরতাপে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে জানতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তার নাম আবু ইসরাইল। সে এ মর্মে মানত করেছে যে, শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে;

[১০৪] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং- ৩৬৮।

কখনো উপবিষ্ট হবে না। ছায়া গ্রহণ করবে না। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না এবং অনবরত রোযা রাখবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে গিয়ে বলো, সে যেন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং উপবিষ্ট হয়। আর সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে।[১০৫]

এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, ঐ সাহাবী নির্দিষ্ট কিছু কাজকে ইবাদত মনে করে ভুল ইজতিহাদ করেছেন। তিনি তার ভুল ইজতিহাদ প্রতাখ্যান করেন এবং বিশুদ্ধ ইজতিহাদের সত্যায়ন করেন। কেননা কথাবার্তা বর্জন করা, সূর্যতাপে অবস্থান করা এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কোনো ইবাদত হতে পারে না। কিন্তু তিনি রোযা রাখার যে মানত করেছেন, তা ছিল একটি ইবাদত। তার এ ইজতিহাদও ছিল সহীহ। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন প্রদান করেন।

ঘ. বিপরীতধর্মী ইজতিহাদের সত্যায়ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দুইজন সাহাবীর বিপরীতধর্মী ইজতিহাদের শুদ্ধাশুদ্ধ নিরুপণপূর্বক সঠিক ইজতিহাদ এর সত্যায়ন করেছেন, তেমনিভাবে অধিকতর বিশুদ্ধ ইজতিহাদ এর প্রতি জোরালো সমর্থনপূর্বক ইজতিহাদের সুনিপুণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَلْقَى خَاتَمَهُ وَجُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ أُذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْرَضْتَ عَنِّي قَبْلُ حِينَ جِئْتُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍوَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنٍ عَنَّا شَيْئًا إِلَّا مَا أَغْنَتْ حِجَارَةُ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَالَ الرَّجُلُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ الذَّهَبِ،

“আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাজারান থেকে আগমন করল। তার হাতে ছিল একটি স্বর্ণের আংটি। হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এড়িয়ে গেলেন। তার সঙ্গে কোনো কথা-বার্তা বললেন না। লোকটি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর নিকট এ প্রসঙ্গে কথা বলেন। স্ত্রী বলল, নিশ্চয় আপনার কোনো আচার-আচরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপছন্দ হয়েছে। আপনি আবার তাঁর নিকট যান। এবার লোকটি আংটি ও জুব্বা খুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। এবার তিনি লোকটির সালামের জবাব দিলেন। সালামের জবাব পাওয়ার পর লোকটি বলল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! একটু আগে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার প্রতি বিমূখ ছিলেন। এর কারণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তোমার হাতে আগুনের একটি জ্বলন্ত আঙ্গার ছিল। লোকটি বলল, তবে তো আমি অনেক আঙ্গার নিয়ে এসেছি। তিনি বাহরাইন থেকে অনেক স্বর্ণালংকার নিয়ে এসেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার আনিত অন্যান্য স্বর্ণলংকারে ক্ষতিকর কিছু নেই। তোমার নিকট সঞ্চিত অন্য স্বর্ণ এবং পাহাড়ের পাথরের মধ্যে কোনে পার্থক্য নেই। এটা হলো পার্থিব জীবনের সম্পদ। লোকটি বলল, তবে আমাকে সাহাবীদের নিকট নির্দোষ ঘোষণা করুন। তারা যেন এ ধারণা পোষণ না করে যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট

---

[১০৫] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, সুনানু আবী দাউদ, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ২৩৫, হাদীস নং- ৩৩০০।

হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি আরো বলেন, লোকটির নিকট একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। এটিই ছিল তার একমাত্র অপরাধ।[১০৬]

নাজারান থেকে আগত সাহাবী স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। প্রথমত পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহারের বিষয়টি তার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত জীবন যাত্রার প্রয়োজনে স্বর্ণ সঞ্চয়ে রাখার মাসআলাটিও তার অজানা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, অঙ্গসজ্জা ও শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্য না হলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তার ব্যবহার জায়েয। স্বর্ণ ব্যবহারের এই পার্থক্য ঐ সাহাবীর নিকট জানা না থাকার কারণে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাল্টা প্রশ্ন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই ভুল সংশোধন করে বলেন, স্বর্ণের ব্যবহার অঙ্গসজ্জার উদ্দেশ্যে না হলে তা পাহাড়ের কালো পাথর ও স্বর্ণের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাবশ্যকীয় লেনদেন ও ব্যবহার্য স্বর্ণের পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন, পাহাড়ের শক্ত কালো পাথর ও স্বর্ণ উভয়টি খনিজদ্রব্য হলেও তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বিপরীতধর্মী ইজতিহাদের সত্যায়ন প্রসঙ্গে নিম্নের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে দুইজন ব্যক্তি ভ্রমনে বের হলো, নামাযের সময় হবার পর দেখতে পেল, তাদের নিকট পবিত্রতা হাসিলের পর্যাপ্ত পানি মজুদ নেই। তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিল। কিন্তু নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরেই পানি পাওয়া গেলে তাদের একজন পুনরায় অযু করে নামায আদায় করে নিল। অথচ আরেকজন অযু-নামায কোনোটিই পুন আদায় করেনি। তারা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিষয়টি আলোচনা করল। যে সাহাবী অযু-নামায পুনরায় আদায় করেনি তার উদ্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أصبت ألسنة وأجزأتك صلاتك،

"তুমি সঠিক সুন্নাহ পালন করেছো এবং আদায়কৃত নামায তোমার জন্যে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে"।
আর যে সাহাবী অযু ও নামায পুন আদায় করেছে তার উদ্দেশে বললেন,

لك الأجر مرتين،

"তুমি দুটি সওয়াবের অধিকারী হয়েছ"।[১০৭]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন সাহাবীর বিপরীতধর্মী ইজতিহাদ দুটিরই সত্যায়ন করেছেন। তাদের কারো ইজতিহাদের নিন্দা করেননি। তবে যে ব্যক্তি অধিকতর বিশুদ্ধ ইজতিহাদ করেছেন, তাকে এই মর্মে উৎসাহিত করেছেন যে, তিনি অধিক সওয়াব প্রাপ্ত হয়েছেন।

ঙ. ভুল ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যান

সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদের কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তবে নস এর মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো সাহাবী নস এর একটি অর্থ গ্রহণ করলে অন্য সাহাবী ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে আমল করেছেন। যার কারণে অনেকের

---

[১০৬] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ১৮০।
নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব ইব্‌ন আলী আল খোরাসানী, *সুনানু নাসায়ী*, সম্পাদনাঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, (হালাবঃ মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ), খ. ৮, পৃ. ১৭৫।

[১০৭] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), পৃ. ৯৩, খ. ১।

ইজতিহাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ،

"আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে কোনো অভিযানে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন আনসারী সাহাবীর উপর কাফেলার দায়িত্বভার ন্যস্ত করে আমীর নিযুক্ত করেন এবং অন্য সাহাবীদের তার আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেন। একদিন ঐ আনসারী সাহাবী রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমার আনুগত্য করার জন্য কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নির্দেশ দেননি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। আমীর বললেন, তোমরা লাকড়ি সংগ্রহ করো। লাকড়ি একত্রিত হবার পর তিনি আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। আগুন জ্বালানোর পর সঙ্গীদের তাতে ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং এ নির্দেশ পালনে নিজেদের বিরত রাখলেন। তারা বললেন, আগুন থেকে বাঁচার লক্ষ্যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এক পর্যায়ে আগুন নিভে গেলো এবং আমীরের রাগও নির্বাপিত হলো। এ খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, তারা আমীরের নির্দেশ পালনপূর্বক আগুনে ঝাঁপ দিলে সে আগুন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বের হতে পারতো না। আমীরের আনুগত্য কেবলমাত্র ভালো কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১০৮]

উপর্যুক্ত ঘটনায় আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ইজতিহাদ বলে আমীরের নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকেন। কারণ আমীরের এ নির্দেশ ছিল রাগান্বিত অবস্থায়। যা ছিল একটি ভুল নির্দেশ। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলে তাদের ইজতিহাদের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

এখানে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের সূক্ষ্ম দিকটি হলো, ইসলামের মৌলিক বিধানের উপর আমল করা। আমীরের নির্দেশ পালন শরীয়তের অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত হলেও রাগান্বিত অবস্থায় এবং আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে তা কখনো আমলযোগ্য হতে পারে না।[১০৯]

ভুল ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যানের আরেকটি উদাহরণ হলো খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) এর ঘটনা।

"সালিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে (রা) বনু জাযিমা গোত্রের (بنوجذيمة) নিকট প্রেরিত অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করে পাঠালেন, তিনি ঐ গোত্রের লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। তারা বলল, صبأنا صبأنا (আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি)। একথা বলার পর খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা করা শুরু করলেন এবং অনেককে করলেন বন্দী। তিনি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বে এক এক জন বন্দী তুলে দিয়ে তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার কয়েদিকে হত্যা করতে পারি না। এমনকি

---

[১০৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬১, হাদীস নং - ৪৩৪০।

[১০৯] রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, ইজতিহাদুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি, (নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১০৭।

আমাদের কোনো সঙ্গীও তাদের বন্দীকে হত্যা করবে না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করার পর তার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উপরের দিকে তুলে দুইবার বললেন, হে আল্লাহ! খালিদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমি আপনার নিকট দায়মুক্তি চাই"।[১১০]

এই ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অধীনস্তদের উপর আমীরের আনুগত্য করা ফরজ হলেও আমীরের নির্দেশ আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থি হবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম স্বীয় ইজতিহাদ বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। যা পরবর্তীতে বিশুদ্ধ ইজতিহাদ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যয়ন লাভ করে।

চ. হুকুমের অন্তর্নিহিত ও বিপরীতধর্মী অর্থ গ্রহণে সমর্থনদান

সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় রাসূলপ্রদত্ত হুকুমের এমন অর্থ গ্রহণ করতেন, যা দৃশ্যত তাঁর হুকুমের বিপরীত। তারা নিজেদের ইজতিহাদের আলোকে হুকুমের অন্তর্নিহিত কারণ বের করে সে মতে আমল করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অর্থ গ্রহণকে সমর্থনপূর্বক তাদের ইজতিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত,

عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي: اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر،

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জনৈক ব্যক্তি একজন কৃতদাসীর সঙ্গে যিনার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা) এর প্রতি নির্দেশ দিলেন, যেন তাকে হত্যা করা হয়। আলী (রা) লোকটির কাছে এসে দেখতে পেলেন। সে একটি কূপে অবতরণ করে শরীর ঠাণ্ডা করছে। তিনি তাকে উঠে আসার নির্দেশ দিলেন। লোকটি হাত বাড়িয়ে দেয়। লোকটিকে উপরে তোলার পর আলী (রা) বুঝতে পারলেন যে, তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত। ফলে তিনি লোকটিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন এবং বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সিদ্ধান্ত পছন্দ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'উপস্থিত ব্যক্তি অনেক কিছু অবলোকন করে, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখতে পায় না"।[১১১]

উপর্যুক্ত হাদীসে আলী (রা) এর প্রতি নির্দেশটি ছিল মুতলাক তথা শর্তহীন ও সাধারণ। কিন্তু আদেশপ্রাপ্ত সাহাবী আলী (রা) সাধারণ অর্থের বিপরীতে নির্দেশটি 'মুআল্লাল' তথা কারণযুক্ত অর্থে গ্রহণ করেন। যে কারণে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় তা বাস্তবে উপস্থিত না থাকায় আলী (রা) হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজতাহিদ আলী (রা) এর এ অর্থগ্রহণ সমর্থন করেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন।

---

[১১০] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৫, পৃ. ১৬০, হাদীস নং- ৪৩৩৯।

[১১১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ৫৯, হাদীস নং- ২৭৭১।

ছ. সাধারণ অর্থকে বিশেষ অর্থ গ্রহণের প্রতি সম্মতিপ্রকাশ

মুজতাহিদের জন্য হাদীসের কোনো অর্থকে সাধারণ অর্থের বিপরীতে বিশেষায়িত অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ প্রয়োজনে হাদীসের সাধারণ বক্তব্যকে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে শর্তযুক্ত করে আমল করতে পারেন। এ বিষয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) এর এ প্রকৃতির ইজতিহাদ প্রণিধানযোগ্য।

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا،

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে এক বাহনে আরোহী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজকে (রা) বললেন, হে মুআজ! তিনি বললেন, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল। তিনি আবার বললেন, হে মুআজ! উত্তরে তিনি বললেন, আমি উপস্থিত হে আল্লাহর রাসূল। তিনি পুনরায় বললেন, হে মুআজ! তিনি বললেন, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসূল। এভাবে তিনবারের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে সত্য জেনে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। মুআজ (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকজনকে এ সংবাদটি জানিয়ে দেবো? যাতে তারাও খুশি হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তাহলে তারা এ কথার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেবে। আনাস (রা) বলেন, মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) হাদীস গোপন করার অপরাধে অভিযুক্ত হবার ভয়ে মৃত্যুকালে এ হাদীস বর্ণনা করে যান"।[১১২]

বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, মুআজ (রা) এর প্রতি হাদীসটি প্রচার না করার নিষেধাজ্ঞাটি স্পষ্ট। এতে কোনো শর্ত যুক্ত করা হয়নি। অথচ তিনি বিধানটি নিজ জীবনকালের সঙ্গে শর্তযুক্ত মনে করে আমল করেন এবং নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত হাদীসটি মৃত্যুর পূর্বে প্রচার করে যান। এতে কোনো সাহাবী আপত্তি তো করেন নি; বরং মুজতাহিদসুলভ বিবেচনার জন্য তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا أَوْ قَالَ: تَمُوتَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ،

"আবদুর রহমান আস সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন আলী (রা) খুতবা দেন। এতে এ প্রসঙ্গটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, একজন কৃতদাসী যেনা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি যেন তাকে দোররা লাগিয়ে আসি। আমি গিয়ে দেখলাম যে, সে সবেমাত্র সন্তান প্রসব করেছে। আমার আশঙ্কা হলো, তাকে আমি দোররা মারলে সে হয়তো মরে যাবে। কাজেই আমি ফিরে

---

[১১২] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ১, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ১৩০।

লেখক মণ্ডলি, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২য় সংস্করণ, ২০১৪) খ. ১, পৃ. ৪৬৮।

আসি। বিষয়টি আমিরাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, তুমি খুব ভালো করেছ। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দাও"।[১১৩]
উপর্যুক্ত হাদীসে আলী (রা) এর নিকট আদেশটি সুস্থতা কিংবা অসুস্থতার কোনো শর্তযুক্ত ছিল না। অথচ তিনি এ শর্তহীন আদেশকে নিজ ইজতিহাদ দ্বারা শর্তযুক্ত জ্ঞান করে আমল করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, মুজতাহিদের জন্য মুতলাক (সাধারণ) নসকে ইজতিহাদ দ্বারা মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত) করে আমল করার অনুমতি আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজতাহিদের এ নীতিকে সমর্থন করেন

জ. সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণের অনুমতি প্রদান
কোনো কোনো নস এমনও রয়েছে, যা দ্ব্যর্থবোধক। একটি অর্থ বাহ্যিক ও প্রকাশ্য; অপরটি সূক্ষ্ম ও গভীর। আপাত দৃষ্টিতে অর্থ দুটি বিপরীতার্থক। এমতাবস্থায় মুজতাহিদের জন্য বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর তিনি এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। আনসারীদের সর্দার সাদ ইব্ন উবাদা (রা) এর ঘটনা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,
أن سعد بن عُبَادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم،
"সাদ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ যদি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে পর পুরুষকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায়, সে কী ঐ পুরুষকে খুন করতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, না। সাদ বললেন, কেন পারবে না? সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, শোনো! তোমাদের নেতা কী বলছেন?"।[১১৪]
এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সাদ (রা) এর মন্তব্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, সাদ রাসূলের কথাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদি তাই হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দিতেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। প্রকৃত অবস্থা হলো, তিনি একটি মুজতাহিদসুলভ উক্তি করেছেন এবং এ ইজতিহাদের পুরস্কার স্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'সাইয়িদ' (নেতা) খেতাবে ভূষিত করেছেন।

ঝ. কৃত ইজতিহাদ প্রত্যাহার
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ইজতিহাদ করে কৃত ইজতিহাদ প্রত্যাহার করে নিতেন এবং ইজতিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণনাপূর্বক সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদের বাস্তবমুখী নির্দেশনা প্রদান করতেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করে বলেন, "তোমরা অমুক অমুক ব্যক্তির নাগাল পেলে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে ফেলবে। আমরা অভিযানে বের হবার পূর্বক্ষণে তিনি আবার বললেন, আমি তো অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া একমাত্র আল্লাহর

[১১৩] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৯৯, হাদীস নং- ১৪৪১।
[১১৪] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১১৩৫,
লেখক মণ্ডলি, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২য়সংসকরণ, ২০১৪), খ.১, পৃ. ৪৭২।

জন্যই শোভা পায়। সুতরাং তোমরা তাদের নাগাল পেলে হত্যা করবে"। ইমাম আল বায্যায বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ,[১১৫]

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم سرية، وَكان أَبُو هُرَيرة فيهم فقال: إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عَبد عَمْرو فحرقوهما بالنار ولاَ تقتلوهما وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليهما حين خرجت من مكة إلى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فلم تزل ضنية حتى ماتت فلما ودعنا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنِّي كنت أمرتكم أن تحرقوا هبارا ونافعا فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فإن لقيتموهما فاقتلوهما،

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ইজতিহাদপূর্বক একটি নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে নির্দেশ বাস্তবায়িত হবার পূর্বে এ ইজতিহাদ প্রত্যাহার করে নেন। তিনি পূর্বের ইজতিহাদে কৃত ভুলের সংশোধন করে নেন এবং প্রত্যাহার করার কারণ সাহাবীদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। তিনি মুজতাহিদকে এই মর্মে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন যে, কৃত ইজতিহাদে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিনা ভেবে দেখতে হবে এবং ভুল হলে সে ইজতিহাদ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। উক্ত ঘটনায় ইজতিহাদ প্রত্যাহার করার দর্শিত কারণটি হলো, কোনো মাখলুককে আগুন দ্বারা শাস্তি দেবার একমাত্র অধিকার আল্লাহর। মানুষ কর্তৃক কোনো সৃষ্টিজীবকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া মারাত্মক অপরাধ।

১.২.২. নবীযুগে ইজতিহাদের পরিধি

ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্র ও পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হলেও তা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইজতিহাদের পরিধি ছিল অবারিত-উন্মুক্ত। বিশ্ব-জগতের সামগ্রিক কল্যাণই ছিল নবী-রাসূল প্রেরণের মূল লক্ষ্য। সুতরাং উম্মতের সকল সমস্যার সামাধানের দায়িত্ব ছিল শেষনবীর উপর। যে সকল বিষয়ে সরাসরি ওহি প্রেরিত হয়নি, তিনি ইজতিহাদ করে তার সমাধান পেশ করেছেন। আখিরাতের অদৃশ্য বিষয়ে যেভাবে তিনি নির্ভুল ও সত্য বাণীসমূহ প্রচার করেছেন। পার্থিব বিভিন্ন সমস্যার ব্যপারেও তিনি অনেক হৃদয়গ্রাহ্য সমাধান পেশ করে জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলীল ও উদাহরণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের ঐ সকল ঘটনা, যা রেসালতের বাণীপ্রচার সংক্রান্ত নয়; নিছক পার্থিব স্বার্থসংশ্লিষ্ট। ওহির অবর্তমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইজতিহাদ করতেন এবং সাহাবীদের ইজতিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। ওহি নাযিলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবার পর, তার ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। মানব সমস্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইজতিহাদের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হতে থাকে। তবে যে সকল বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি (نص) রয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ থাকে না।

যে সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার অবকাশ নেই

ইজতিহাদের সংজ্ঞাবিষয়ক আলোচনা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, ইজতিহাদ ঐ সকল আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা কষ্টসাধ্য (أحكام تكليفية) ও ধারণাগত (ظنيات)। শরীয়তের ঐ সকল মাসআলায়

---

[১১৫] বাযযায, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আমর, *মুসনাদুল বাযযায*, (মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং- ৮০৬৭।

ইজতিহাদ করা জায়েয হবে, যা অকাট্য বিধান দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকার কারণে মুজতাহিদকে তার হুকুম অবগত হবার লক্ষ্যে কঠোর সাধনা করতে হয়। ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১খ্রি.) ইজতিহাদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রেই কেবল ইজতিহাদ প্রযোজ্য। কালাম শাস্ত্র (الكلام) علم ও বুদ্ধিপ্রসূত (عقليات) মাসআলাসমূহে ইজতিহাদ করা ইসলামী শরীয়তের পরিধিভুক্ত নয়। এখানে মুজতাহিদ মাত্রই সওয়াবের অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে শরীয়তের মাসআলা উদ্ভাবনে ভুল করলেও মুজতাহিদ একটি সওয়াবের অধিকারী হয়। সুতরাং যে সকল মাসআলায় দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট, (محكمات) সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন ইসলামের পাঁচ রুকন, আকায়েদ ও তাকদীরের মাসআলা, দণ্ডবিধি (حدود) উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিধান, (ميراث) কাফফারা ইত্যাদি।[১১৬]

যে সকল বিধান সাব্যস্ত হবার বিষয়টি অকাট্য হলেও প্রমাণ অকাট্য নয় (قطعية الثبوت ظنية الدلالة) অথবা প্রমাণ অকাট্য হলেও তা সাব্যস্ত হবার বিষয়টি অকাট্য নয় (قطعية الثبوت ظنية الدلالة) অথবা সুবুত-প্রমাণ কোনোটিই অকাট্য নয়, (ظنية الثبوت والدلالة) এ সকল ক্ষেত্রই হলো ইজতিহাদের বিস্তৃত অঙ্গন ও মূল পরিধি। ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও পরিধি সুবিস্তৃত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি গণ্ডিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। ইসলামের অকাট্য বিধানসমূহ সীমিত ও গণনাযোগ্য। অথচ নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলি অগণিত ও উন্মুক্ত। আন্তর্জাতিক বলয়ে ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগ। ব্যবসায়িক লেন-দেন, ও ব্যাংকিং চুক্তির কলেবর ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঙ্গনে সম্পদের লেন-দেন, চাষাবাদ, শিল্প-কারখানা, বেচা-বিক্রি, ইজারা, কোম্পানী আইন, ভূমি আইন, খনিজ সম্পদসহ বিবিধ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকহারে অনুভূত। যাতে গবেষণার কপাটবদ্ধতা ও চিন্তা-ভাবনার বিকলতা মুসলিম জাতির জন্য মহা বিপদ সংকেত। তেমনিভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, সামরিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক মাসআলা এখনো অনুদঘাটিত। দাম্পত্য জীবনের পরিমণ্ডলে বিয়ে-তালাকে প্রযুক্তির ব্যবহার, টেস্ট টিউব বেবি, (Test Tube Baby) গর্ভ ভাড়া, মিল্ক ব্যাংক (Milk Bank) ও বীর্য ব্যাংকসহ নানামাত্রিক তথ্যের আদান-প্রদানে ইজতিহাদের বিকল্প নেই। প্রলয়ঙ্করী বৈশ্বিক মহামারির (Covid-19) ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে করোনার টিকা গ্রহণের বৈধতা-অবৈধতা প্রশ্নে শরীয়তসম্মত সমাধান উদ্ভাবন করা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি।

তথ্য-প্রযুক্তির ডিজিটালাইজেশনের (Digitalization) পাশাপাশি ইজতিহাদের উৎকর্ষতা সাধনে অসাধ্য সাধন করেছেন রাসূলুল্লাহর মুবারক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ। মুসলিম উম্মাহর ফকীহ-মুজতাহিদগণ তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ইজতিহাদের পরিধি নির্ণয়ে বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী পণ্ডিত ইয়ূসুফ আল কারযাবী বলেন,

والذي يظهر لي والله اعلم ان مجال الاجتهاد هو كل مسئلة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة سواء كانت من ا لمسائل الاصيلة الاعتقادية ام من المسائل الفرعية العملية،

"আমার মতে, যে সকল বিষয়ে শরীয়তের অকাট্য দলীল নেই, সেখানে ইজতিহাদ করা জায়েয। এটি আক্বিদাগত বিষয় হোক বা কর্মগত শাখা বিষয়। আক্বিদাগত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন করা ইজতিহাদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত"।[১১৭]

যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অবস্থানপূর্বক ইজতিহাদের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। চৌহদ্দির বাইরে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ মুজতাহিদের নেই। যে সকল বিধানাবলির ব্যাপারে শরীয়তের

---

[১১৬] রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী, *ইজতিহাদাতুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি*, (নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

[১১৭] কারযাবী, ইয়ূসুফ, *আল ইজতিহাদ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, (স্থান ও তা/বি.), পৃ. ৬৫।

অকাট্য উদ্ধৃতি (النص القطعي) বিদ্যমান, সেখানে মুজতাহিদের গবেষণাপ্রসূত মতামত প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। যেমন নামায-রোযা ফরজ হওয়ার বিষয়। মদ, জুয়া ও যেনা হারাম হওয়া সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করার কারো অধিকার নেই। ইয়ূসুফ আল কারযাবি বলেন, ইজতিহাদের পূর্বে মুজতাহিদের জন্য তার চৌহদ্দি নির্ধারণ করা জরুরী। তিনি ইজতিহাদের কয়েকটি নিষিদ্ধ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেন, যাতে ইজতিহাদ করা জায়েয নয়। যথা-

ক. আকিদাগত বিষয়

শরীয়তের যে সকল মাসআলা আক্বিদার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাতে ইজতিহাদ করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহর গুণাবলি, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল, তাকদীর, ফেরেশতাসহ এমন সব অদৃশ্য বিষয়ে অবগতি লাভ করার চেষ্টা করা, যাতে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অকার্যকর। এ সব বিষয়ে ইজতিহাদ করা মানে মানুষের আওতাবহির্ভূত বিষয়ে গবেষণা করা। এখানে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করার কারো অধিকার নেই। উপর্যুক্ত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নস দ্বারা যা প্রমাণিত, তাতেই জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এখানে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবার কোনো সুযোগ নেই।

খ. যে সকল ইবাদত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত

অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোনো ইবাদতে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তার রাকাত সংখ্যা, নামাযের রুকন ও তার আদায়পদ্ধতি। অনুরূপভাবে সিয়াম, যাকাত ও তার খাতসমূহ এবং হজ্ব এর যাবতীয় বিধি-বিধান। এ সকল আহকামের রুকন ও আদায় করার নিয়ম-কানুন শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নস দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং এ সকল বিধানের দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট ।

গ. দণ্ডবিধি ও কাফফারা

ইসলামী শরীয়তের অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা জায়েয হবে না। যেমন হত্যা, ব্যভিচার, অপবাদ ও চুরির দণ্ডবিধি। তেমনিভাবে ভুলক্রমে হত্যা, (ظهار) জিহার[১১৮] ও শপথের কাফফারাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ নেই। কেননা এ সব বিধি-বিধান শরীয়তের অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। দণ্ডবিধি ও কাফফারার পরিমাণও শরীয়তের স্পষ্ট নস দ্বারা সাব্যস্ত। এক্ষেত্রেও ইজতিহাদ করার কোনো অবকাশ নেই।

ঘ. উত্তরাধিকার স্বত্ব আইন

ইসলামী শরীয়তে উত্তরাধিকার আইন কুরআন-সুন্নাহর নস দ্বারা সুনির্দিষ্ট সীমারেখায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে আত্মীয়তার নৈকট্য ও দুরত্বের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুজতাহিদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা সংযোজন-বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই।

প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারে প্রভাবিত এক শ্রেণির গবেষকদের ধারণা হলো, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। তারা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সুযোগ সঙ্কুচিত ছিল। বর্তমান সময়ে উন্নত প্রযুক্তির সুবাদে নারী-পুরুষের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে তাই নয়; বরং তা দেশ ও

---

[১১৮] স্ত্রীর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বামীর মায়ের অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করাকে জিহার বলে। যেমন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে বললো, তুমি আমার জন্য আমার মাতার সমতুল্য।

জাতির সমৃদ্ধির লক্ষে অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখানে গবেষণাপূর্বক আইনের সংশোধন করা দরকার। মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষের সমতা বিধান করার এ যুক্তি সম্পূর্ণ অবান্তর। নারীরা বিভিন্ন কর্মস্থলে পুরুষের সঙ্গে কাজ করলেও ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। নারী যতই স্বাবলম্বী হোক তাদের অভিভাবকত্ব থেকে পুরুষদের দায়মুক্তি অর্জন করার কোনো সুযোগ নেই । মা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী হিসেবে এখনো পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। ধনী হোক বা দরিদ্র সর্বাবস্থায় তারা এ দায়িত্ব পালন করে। স্ত্রী হিসেবে তারা পুরুষ থেকে দেনমোহর লাভ করাসহ যাবতীয় ভরণ-পোষণ গ্রহণ করে। সুতরাং এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি দিয়ে ইজতিহাদ এর নামে শরীয়তের অকাট্য বিধানে কোনো প্রকারের সংযোজন-বিয়োজন করার সুযোগ নেই।

ঙ. হালাল ও হারাম

ইসলামে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা হালাল বা বৈধ। আর কিছু বিষয় রয়েছে হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলামের হালাল ও হারাম বিষয়গুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। কোনো জিনিস হালাল ও হারাম হবার বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল কুরআন ও সুন্নাহ'য় হালাল ও হারামের দীর্ঘ ফিরিস্থি দেয়া হয়েছে। যাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই হালাল। আর অশল্যাণকর সব কিছুই হারাম। সৃষ্টিকর্তাই বিশ্ব জগতের কল্যাণ ও অশল্যাণ সাধনের একমাত্র মালিক। এতে কারো হস্তক্ষেপ অন্যায্য ও অনভিপ্রেত। হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা হারাম বস্তুর তালিকা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ،

"তোমাদের জন্য হারাম হরা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে সকল জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে" ।[১১৯]

আল্লাহ তায়ালা হালাল হারামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ،

"তেমরা ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না" ।[১২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ،

"হালাল বিষয়সমূহ স্পষ্ট ও হারাম বিষয়সমূহও স্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সন্দেহযুক্ত" ।[১২১]

শূকরের গোশত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হারামের অন্তর্ভুক্ত। ইজতিহাদপূর্বক এঁাকে হালাল করার কোনো সুযোগ নেই। শূকরের গোশতকে হালাল করার নিমিত্তে যদি কোনো ব্যক্তি এই মর্মে গবেষণা করে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা হারাম হবার কারণ হলো, তষনকার সময়ে শূকর নোংরা পরিবেশে বাস করতো এবং দুষিত খাবার গস্থহণ করতো। যার কারণে তা হারাম সাব্যস্ত করা হয়। অনেক সময় এ সকল জন্তু পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং পরিশুদ্ধ খাবার খেয়ে সভ্য মানুষের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়।

---

[১১৯] আল কুরআন, ৫;৩।

[১২০] আল কুরআন, ৯;২৯

[১২১] দারিমী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *সুনানু দারিমী*, (সৌদি আরব: দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১২ হি. /২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৬৪৭ ।

সুতরাং এমন পরিবেশে পালিত শূকরের গোশত হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ ধরনের গবেষণা বাতিল বলে গণ্য হবে।

যে সকল বিষয়ে ইজতিহাদ করা জায়েয

ইসলামী শরীয়তের দালীলিক উৎসকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক.শরীয়তের যে সকল উদ্ধৃতি বা নস قطعية الثبوت ظنية الدلالة (প্রমাণ অশাট্য হলেও তা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অশাট্য নয়)। এ ধরনের নস আল কুরআনে অনুপস্থিত। কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতেই তা পাওয়া যেতে পারে।

খ. قطعية الثبوت ظنية الدلالة (সাব্যস্ত হবার বিষয়টি অশাট্য, কিন্তু প্রমাণ অশাট্য নয়) কুরআন ও সুন্নাহ'য় এ ধরনের নস পাওয়া যায়। এখানে নস এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ব্যাপারে তথা হুকুমটির প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুজতাহিদের গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

গ. ظنية الثبوت والدلالة (দলীল-প্রমাণ কোনোটিই অশাট্য নয়) এখানে নস এর سند (বর্ণনাসূত্র) ও متن (মূলবক্তব্য) এ ইজতিহাদ করা জায়েয।

যে সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সরাসরি কোনো নস বর্তমান নেই, মুজতাহিদের জন্য তাই হলো গবেষণার উর্বর ক্ষেত্র। বিশ্বে আবিষ্কৃত নতুন নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে (قياس) কিয়াস, (استحسان) ইসতিহসান ও (مصالح مرسلة) মাসালিহে মুরসালাহ ইত্যাদি দলিলের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালিত হতে পারে। মুজতাহিদ উপর্যুক্ত সমস্যার সমাধান পেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিককালের নব আবিষ্কারের যুগে ইজতিহাদের কয়েকটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। যেমন–

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের লক্ষ্যে পর-নারীর গর্ভ ভাড়া নেয়া। রক্ত ও বীর্যব্যাংক, মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা একজন বন্ধ্যাত্ম রোগে আক্রান্ত হলে সন্তান লাভের লক্ষ্যে পর-নারীর গর্ভ ভাড়া নেয়া কিংবা পর-পুরুষের বীর্য গস্থহণপূর্বক সন্তান লাভ করা যাবে কিনা এ বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে।

খ. অর্থনীতি

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং লেন-দেন। যথা শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিধি-বিধান, চলতি হিসাব ঋণ, মানি ট্রান্সপার, কোম্পানী আইন, জীবনবীমা ও সম্পদবীমা আইন ইত্যাদি। সম্প্রসারণশীল ব্যবসায়-বাণিজ্যের বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানামুখি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আধুনিককালে ব্যাংক-বীমা আর্থিক লেন-দেনের প্রধান উৎসকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। লেন-দেনের বৈধতা ও অবৈধতা নিরূপণপূর্বক হাজারো সমস্যার সমাধানকল্পে একজন মুজতাহিদ মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ইজতিহাদের জন্য এটি এশটি উর্বর ক্ষেত্র। তেমনিভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সম্মিলিত প্রয়াস বর্তমান সময়ের অনেকটা অপরিহার্য অনুসঙ্গ। এশাধিক ব্যক্তির সামগ্রিক উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়। এ সকল আইনে শরীয়তের অনুমোদন একজন মুসলিমের প্রধান জিজ্ঞাসা। এক্ষেত্রে শরয়ী ফায়সালা প্রদান করা মুজতাহিদ এর পরিধিভূক্ত।

গ. সামাজিক রীতিনীতি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংকলিত 'ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইজতিহাদের প্রযোজ্য ক্ষেত্র হলো, মুসলিম সমাজের সামনে উত্থাপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন সকল সমস্যা, যেগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান ইতোপূর্বের মুজতাহিদগণ থেকে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানামাত্রিক উন্নতির কারণে মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে সূচিত হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন। হাজারো পরিবর্তনের মধ্যে একজন মুসলমান শরীয়তের অনুকূলে জীবন যাপনে বদ্ধপরিকর। যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহ'র তরে বিশুদ্ধ পথ উদ্ভাবন করা মুজতাহিদের জন্য এশটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র।[১২২]
সামাজিক রীতি-নীতিতে বিয়ে-শাদী ইজতিহাদের এশটি অন্যতম ক্ষেত্র। বৈষয়িক উন্নতির সুবাদে বর-কণের অনুপস্থিতিতে বিয়ে-শাদী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সাক্ষী-সুবূত সরাসরি উপস্থিত না থাকলে বিয়ের হুকুম কী হবে? এ বিষয়ে একজন মুজতাহিদ গবেষণা করতে পারে।

ঘ. আইন ও বিচার বিভাগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় বিচার ও আইন বিভাগ ছিল সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় তিনি বিভিন্ন গোত্রের বিচার ফায়সালার জন্য বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও মুজতাহিদ সাহাবীদের নিয়োগ প্রদান করতেন। সাদ ইব্ন মুআয ছিলেন আনসারী সাহাবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও মুজতাহিদ সাহাবী। ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজার আত্মসমর্পনের প্রাক্কালে সাদ ইব্ন মুআযকে (রা) পরাজিত গোষ্ঠীর বিচার ফায়সালা করার জন্য নিযুক্ত করেন। ঘঁনাটি উদ্ধৃতিসহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. পারস্পরিক লেন-দেন ও আচরণ

লেন-দেনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন। মুসলিম-অমুসলিম সর্বসাধারণের সঙ্গে এমন আচরণ করতেন, যাতে তার উচ্চাঙ্গ চরিত্র-মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একজন অমুসলিমের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণ প্রণিধানযোগ্য। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ قَالَ: فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তি থেকে বাকিতে এশটি উট ক্রয় করেন। একদিন লোকটি তার পাওনা আদায়ের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে এবং তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে শুরু করে। সাহাবায়ে কেরাম লোকটির এ আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা তাকে বলতে দাও। কেননা পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমরা এশটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, বাজারে তার পাওনা উটের সমান উট পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো তার পাওনার চেয়ে বড় ও

---

[১২২] লেখক মণ্ডলি, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, (ই.ফা.বা. ২য়সংসকরণ, ২০১৪খ্রি.), খ.১, পৃ. ৪৬০।

উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা উত্তম উঁটিই তাকে কিনে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে পাওনা পরিশোধের সময় উত্তম জিনিস আদায় করে" ।[১২৩]

১.২.৩. সাহাবাযুগে ইজতিহাদের প্রকৃতি

সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম উম্মাহ'র অনুসরণীয় কাফেলা। তারা হলেন সত্যের অতন্দ্র প্রহরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যুগে অবস্থানের কারণে তাদের ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিল স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও প্রখর। তারা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দেন। যার ফলে তাদের ইজতিহাদ ছিল সবচেয়ে নিখুঁত, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ করার কারণে তাদের ইজতিহাদে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনাও কম। সাহবায়ে কেরামের ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। তারা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদের একটি সুষ্ঠু ধারা মুসলিম উম্মাহ'র সামনে উপস্থাপন করেন। নিম্নে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের প্রকৃতি আলোচনা করা হলো,

বিশিষ্ট তাবিঈ মাসরুক (র) বর্ণনা করেন, একদা উমার (রা) এর সচিব এক পত্রে লিখলেন, উমারকে (রা) আল্লাহ তায়ালা যা সঠিক বলে বোঝার সুযোগ দিয়েছেন, তার আলোকে আমি পত্রখানা লিপিবদ্ধ করছি। একথা শুনে উমার (রা) তাকে ধমক দিয়ে বললেন,

لا، بل أكتب هذا ما رأي عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن عمر،

"এমন কথা কখনো লিখবে না। বরং এভাবে লিখ। পত্রখানা উমার এর বিবেচনার আলোকে লেখা হচ্ছে। এটি সঠিক হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। আর যদি ভুল হয় তার দায়-দায়িত্ব উমার এর" । [১২৪]

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল, যে সকল বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নস বিদ্যমান নেই, সে ক্ষেত্রে উমার (রা) নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তিনি ভুল ইজতিহাদের আশঙ্কায় এবং তাকওয়ার কারণে এমন পরহেযগারী অবলম্বন করতেন।

এ বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ হলো আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর ঘটনা। তার নিকট থেকে এ ধরনের অনেক ইজতিহাদ বর্ণিত হয়েছে। যাতে তিনি নিজস্ব ইজতিহাদ ও মতানুযায়ী ফায়সালা প্রদান করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর নিকট এ বিষয়ে একটি ফতোয়া উত্থাপিত হয় যে, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার পর তার স্ত্রী মারা যায়। অথচ স্ত্রীর সঙ্গে তার সহবাসও হয়নি এবং তার কোনো মাহরও নির্ধারিত ছিল না। দীর্ঘ এক মাস যাবত তার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি। পরবর্তীতে আবারো বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি নিজ ইজতিহাদ দ্বারা এর উত্তর দিতে পারি। ভুল হলে তার দায়-দায়িত্ব আমার ও শয়তানের। আর সঠিক হলে বুঝতে হবে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। ঐ মহিলা একজন স্ত্রীর সমপরিমান মাহরের অধিকারী হবে এবং স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পদও লাভ করবে। তার উপর ইদ্দত পালন করাও জরুরী হবে। এ কথা শোনার পর আশজা গোত্রের একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি

[১২৩] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ২২৮, হাদীস নং- ৯৩৯০।

[১২৪] বায়হাকী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী, *আস সুনানুল কুবরা*, সম্পাদনাঃ আবদুল কাদের আতা, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং- ২০৩৪৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফায়সালার অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) লোকটির উদ্দেশে বললেন, তোমার এ কথার পক্ষে দুজন সাক্ষী উপস্থাপন করো। জাররাহ ও আবু সুফ্‌য়ান ও আরো দুইজন ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন'।[১২৫]

এ হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর পূর্ব অবগতি না থাকলেও তার ইজতিহাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সব সাহাবীর নিকট রাসূলের সকল সুন্নাহ পৌঁছেনি। যার কারণে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়।

ক. 'নস' এর বিধান থেকে ইজতিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন

সাহাবায়ে কেরামের সামনে অনেক সময় এমন সমস্যাও উদ্ভব হয়েছে, যা নস এর বিধান দ্বারা সমাধানের পরিবর্তে ইজতিহাদ ও রায় প্রয়োগ দ্বারা সমাধান করেছেন। তবে ইজতিহাদ ও রায়ের ক্ষেত্রেও সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা যায়। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) একটি বিচার ফায়সালার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়,

مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ بِكَذَا قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَضَيْتُ بِكَذَا قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَرُدُّكَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ إِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلْتُ وَلَكِنِّي أَرُدُّكَ إِلَى رَأْيِي وَالرَّأْيُ مُشْتَرَكٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَمْ يَنْقُضْ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَهُوَ يَرَى خِلَافَ مَا ذَهَبَا إِلَيْهِ فَهَذَا كَثِيرٌ لَا يُحْصَى،

"তুমি কি ভূমিকা পালন করেছো? উত্তরে লোকটি বললো, আলী ও যাইদ (রা) এভাবে ফায়সালা দিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, আমি হলে ফায়সালা অন্যরকম হতো। লোকটি বললো, সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও সঠিক ফায়সালা দিতে বাধা কোথায়? তিনি বললেন, আমি আল কুরআন ও সুন্নাহ মতে ফায়সালা দিলে এমন করতাম। কিন্তু বিষয়টি আমি ইজতিহাদ ও রায় অনুসারে করার পক্ষপাতি। আর সব মানুষের রায় এক রকম হয় না। বর্ণনাকারী আবু উমার বলেন, উমার (রা) যাইদ ও আলী (রা) এর ফায়সালা রদ করেননি। ইমাম কুরতুবী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন ঘটনার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায় ।[১২৬]

খ. কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ

ইজতিহাদ ও ইসতেম্বাতের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কিয়াস একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। শরীয়তের নস বর্ণনার পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কারণ বর্ণনা করে কিয়াসের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহ'য় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল স্তরের মানুষের জীবন বিধান হওয়া কিয়াসের বৈধতা প্রমাণ করে। ভবিষ্যৎকালে মানুষের সামনে এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হবে, যার সমাধান শরীয়তের সীমিত নস দ্বারা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো বিকল্প নেই।

---

[১২৫] রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, *ইজতিহাতুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি*, (নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১১০।

[১২৬] কুরতুবী, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব, দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫৪।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ উল্লেখপূর্বক যে সকল হুকুম জারি করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের তীক্ষ্ম মেধা দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ এর ভাষ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ان الصحابة كانويستعملون القياس في الأحكام ويعرفونهابالأمثال والأشباه والنظائروﻻيلتفت الي من يقدح في كل سند من هذه الاسانيد واثرمن هذه الاثار فهذه في تعددها واختلافها وجوهها وطرقها جارية مجري التواترالمعنوي الذي لا يشك فيه وان لم يثبت كل فرد من الاخبار به،

"সাহাবায়ে কেরাম কিয়াসের বিস্তর প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তারা ইসলামের বিধি-বিধানকে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করেছেন। এটি কারো অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সাহাবায়ে কেরামের কিয়াসের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাওয়া না গেলেও তা 'তাওয়াতুর[১২৭] এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে"।[১২৮]

যার কারণে সাহাবায়ে কেরামের জীবনে কিয়াসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করার অনেক নজির পাওয়া যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, আহযাব যুদ্ধের দিন বনু কুরাইযার ইহুদিগণ সাদ ইব্‌ন মুআয (রা) এর নির্দেশে দুর্গ থেকে অবতরণপূর্বক আত্মসমর্পন করে। তাদের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাদ ইব্‌ন মুআযকে (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সাদ একটি গাধায় আরোহন করে মসজিদের নিকট পৌঁছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের সর্দার অথবা উত্তম ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা আপনার নির্দেশে অবতরণ করেছে। সাদ বলেন, আমি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা এবং সন্তানদের বন্দী করার ফায়সালা দিলাম। তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আপনি আল্লাহর ফায়সালার অনুরূপ ফায়সাল দিয়েছেন। অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর মতো ফায়সালা দিয়েছেন'।[১২৯]

এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাদ ইব্‌ন মুআয (রা) এখানে কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করেছেন। তিনি আল কুরআনে উল্লিখিত মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত অমুসলিমদের শাস্তির উপর এ ঘটনাটি তুলনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ،

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা, শূলিতে ছড়ানো অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন করা। অথবা দেশত্যাগে বাধ্য করা। এটা হলো তাদের পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা। আর পরকালে রয়েছে মহা-শাস্তি"।[১৩০]

এ ঘটনায় তাদের অপরাধ হলো সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। যা মক্কার কাফেরদের কৃত অপরাধের সমান। কারণ তারা আহযাব যুদ্ধ সংগঠনে কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে, তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি প্ররোচিত করেছে এবং মুসলমানদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এমন জঘন্য অপরাধকে সাদ

---

[১২৭] কোনো ঘটনা এমন অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।

[১২৮] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৩ ।

[১২৯] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৫, পৃ.৩৫, হাদীস নং- ৩৮০৪।

[১৩০] আল কুরআন, ৫;৩৩।

ইব্‌ন মুআয (রা) বদরে যুদ্ধবন্দীদের অপরাধের উপর কিয়াস করেছেন। যাদের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে এই মর্মে ভর্ৎসনা করেছেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ،

"কোনো নবীর জন্য কয়েদিদের নিজের কাছে রাখা সংগত নয়, যতক্ষণ না দেশময় শত্রুদের পরাভূত করবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো। আর আল্লাহ কামনা করেন পরকালের কল্যাণ। আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি একটি বিষয় অবধারিত না হতো, যা আল্লাহ পূর্ব থেকে লিখে রেখেছেন। তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো সে জন্য মহা শাস্তি আপতিত হতো"।[১৩১]

গ. অন্তর্নিহিত কারণ বিবেচনা ও বিপর্যয় লাঘবের লক্ষ্যে ইজতিহাদ

'নস' এর বাহ্যিক রূপ থেকে যে বিধান প্রমাণিত হয়, হুবহু তার উপর আমল না করে নস এর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়পূর্বক জনসমস্যা লাঘবের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ করার অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আল কুরআন এর নস দ্বারা চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم،

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটি তার অপরাধের ফল ও আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[১৩২]

কিন্তু খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার খেলাফতকালে ইজতিহাদপূর্বক এ বিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। চৌর্যবৃত্তি আর্থিক খাতের একটি মারাত্মক ধরনের অপরাধ ও অপরের সম্পদে অনৈতিক হস্তক্ষেপ। এ অপরাধের শাস্তির বিধান কার্যকরণে তিনি কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। এ ইজতিহাদের প্রতিপাদ্য থেকে উসূলে ফিক্‌হ এর বিধান الضرورة تبيح المحظورات 'প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুর বৈধতা সাব্যস্ত করে' প্রণীত হয়। চৌর্যবৃত্তির শাস্তির বিধান কার্যকরণের ক্ষেত্রে তিনি যে শর্ত আরোপ করেন তা হলো, সাধারণ জনগোষ্ঠীর অভাবমুক্ত হওয়া। দুর্ভিক্ষের সময়ে অভাবের কারণে দেশের কোনো নাগরিক চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হলে তার হাত কাটার বিধান কার্যকর হবে না। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর ইজতিহাদের প্রকৃতি হলো, অভাবের সময় বিত্তশালী ব্যক্তিদের করণীয় হলো, তাদের সম্পদ দ্বারা সাধারণ মানুষের অভাব মোচন করা। এ দায়িত্ব পালনে ধনীদের অবহেলার কারণে কোনো দরিদ্র লোক বাধ্যগত চুরিতে লিপ্ত হলে এটি হাতকাটার মতো অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হবে না। ইমাম মালিক বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبِ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ، وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ، إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا،

"হাতিব ইব্‌ন আবি বালতা এর একজন কৃতদাস মুঝাইনা গোত্রের একটি উট চুরি করে তা জবাই করে দেয়। খবরটি উমার (রা) এর নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদান করার পর তাদের হাত কাটার নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুক্ষণ পর তাদের মনিবকে বললেন, তাদেরকে অভুক্ত রাখার কারণে সম্ভবত তারা বাধ্য হয়ে এ অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। তিনি আরো

[১৩১] আল কুরআন, ৮;৬৭।
[১৩২] আল কুরআন, ৫;৩৮।

বলেন, সামনে এমন অভিযোগ শোনা গেলে আমি এমন জরিমানা করবো, যা আদায় করা তোমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে। এই বলে তিনি তাদের দণ্ড মওকূফ করে দেন। অতঃপর উটের মালিককে মুল্য হিসেবে আট শত দিরহাম আদায় করে দিলেন।[১৩৩]

ঘ. মাসালিহ মুরসালাহ বা জনকল্যাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদ

'মাসালিহ মুরসালাহ' ইসলামী শরীয়তের একটি দালীলিক উৎস। জনকল্যাণ এর ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এটি সাহাবা যুগে ইজতিহাদের অন্যতম প্রকৃতি।

জনকল্যাণ বিবেচনায় ইজতিহাদ করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর ইজতিহাদ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা মক্কায় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। পরেও কারো জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু একটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস ও গাছ-পালা কর্তন করা যাবে না। শিকারী জন্তুকে ভয় দেখানো যাবে না। পরিচিত বস্তু ছাড়া পতিত কোনো জিনিস কুড়িয়ে নেয়া যাবে না'। এ হাদীস শোনার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু 'ইযখার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিলে জনস্বার্থ প্রধান্য পেতো। কারণ এ ঘাস আমাদের বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে এবং লাশ সমাহিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তা কাটার অনুমতি দেয়া গেলো।[১৩৪]

এখানে ইব্ন আব্বাস (রা) নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের মধ্যে 'ইযখার' নামক নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কর্তনকে জনকল্যাণের ভিত্তিতে বাদ দেয়ার আবেদন করেন। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন। কারণ এ উদ্ভিদ সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসূল এর জীবদ্দশায় তার সামনেই ইজতিহাদ করেছেন। আবার কখনো তার অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করে পরবর্তীতে তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছুটে যেতেন। তিনি সাহাবীদের কৃত ইজতিহাদের ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করে দিয়েছেন। আবার কিছু কিছু ইজতিহাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ বিশেষ নির্দেশের কারণে এবং নির্দিষ্ট সাহাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। প্রথম দুই প্রকার সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তৃতীয় প্রকার ইজতিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হলো।

---

[১৩৩] মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আমীর আল আসবাহী, *মুয়াত্তা*, সম্পাদনাঃ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৪৮, হাদীস নং- ৩৮।

আবদুল কারীম যিদান, *আল মাদখাল লি দারাসাতিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, (ইসকান্দারিয়্যাহঃ দারু উমার ইবনুল খাত্তাব, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২২।

[১৩৪] আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *মুখতাসারুস সহীহ লিল ইমামিল বুখারী*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২২/২০০২), খ. ১, পৃ. ৫৩২, ।

বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ১৩২, হাদীস নং- ১৩৪৯।

১.২.৪. সাহাবাযুগে ইজতিহাদের পরিধি

ইজতিহাদ হলো ইসলামের প্রাণশক্তি। জিহাদ ও ইজতিহাদই মুসলিম জাতিসত্তার প্রাণবন্ত শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন। উসূলে ফিক্‌হ এর ইমামগণ ইজতিহাদের পরিধিকে একটি গণ্ডিবদ্ধ পরিমণ্ডলে এবং সঙ্কুচিত অলিন্দে আবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে মৌলিকভাবে ইজতিহাদ শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের জন্যই প্রযোজ্য। উম্মতের অন্য কারো জন্য ইজতিহাদের বৈধতা আছে কি না তা নিয়ে মুসলিম উম্মাহ'র ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আবু আলী আল জুবায়ী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে বা তার যুগে সাহাবীদের জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবর্তমানে সাহাবীদের জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয আছে।[১৩৫]

অনেক উসূল শাস্ত্রবিদের অভিমত হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা তখনই জায়েয হবে, যদি যে কোনো প্রকার যোগাযোগের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ থাকে। অনেকেই এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তারা কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। আলিমদের একটি ভিন্ন অভিমত হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ যায়েয। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে ইজতিহাদ করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আমীদী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরামের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে ইজতিহাদ করা জায়েয। তবে তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয হবে না।[১৩৬]

উপর্যুক্ত উসূলবিদগণের দৃষ্টিকোণে ইজতিহাদের পরিসর খুবই সীমিত। ইমাম ইব্‌ন হাযম ইজতিহাদের একটি বিস্তৃত পরিধির অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সরাসরি বিধি-নিষেধ নেই, সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য ইজতিহাদের সুযোগ অবারিত রয়েছে।[১৩৭]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারা পর্যালোচনা করলে ইজতিহাদের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যা জীবনঘনিষ্ঠ অনেক সমাস্যার সমাধানে মানবজাতির কল্যাণ বহন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর উক্তি থেকে এর প্রমাণ মেলে। তিনি বর্ণনা করেন,

أتى علينا زمان لسنا نقضي وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغناما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ماليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضبه رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف،

"আমরা এমন একটি সময় অতিবাহিত করেছি, তখন আমাদের ইজতিহাদ করে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যা সবার দৃষ্টিগোচরে। অতএব আজকের পরে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে কিতাবুল্লাহর বিধান মতে ফায়সালা

---

[১৩৫] ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা: শাইখ আহমাদ মুহাম্মদ শাকির, (বৈরুত: দারুল জীল প্রকাশনা, তা/বি.), খ. ৫, পৃ. ১৩৪।

[১৩৬] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ.৩৫৪।

[১৩৭] আমীদী, আবুল হাসান সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবি আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্‌যাক আফীফী, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.), খ .৪, পৃ. ২৯৬।

করবে। আল কুরআনের বিধান মতে সমাধান করা সম্ভব না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করবে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল মতে ফায়সালা দেয়া সম্ভব না হলে, নেককার ফকীহ-মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তের আলোকে ফায়সালা করবে। সে এ কথা বলবে না যে, আমি সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাই"।[১৩৮]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, মুসলিম উম্মাহ'র বহুবিধ সমস্যা লাঘবে ইজতিহাদ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধান।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য প্রয়োজনের মুহূর্তে ইজতিহাদ করার অনুমতি ছিল বলেই তাদের নিকট থেকে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ও কর্মপন্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয এর উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولاً واحداً كان الناس في ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة،

"সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ না হোক আমি তা কামনা করি না। তারা সবাই একই কথায় অটল থাকলে মানুষের জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে যেতো। সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই উম্মতের অনুসরণীয় কফেলা। উম্মতের প্রত্যেকের জন্য তাদের যে কারো অনুসরণের সুযোগ রয়েছে"।[১৩৯]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয এর উক্তি দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের পরিমণ্ডলের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইমাম ইব্‌ন হাযম এর অভিমত থেকেও তাদের ইজতিহাদের চিত্র ফুটে ওঠে। সাহাবায়ে কেরামের সামগ্রিক জীবনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা ঐ সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেছেন, যেখানে শরীয়তের সরাসরি বিধি-নিষেধ নেই।

নিম্নে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের সংক্ষিপ্ত কর্মপরিধি আলোচনা করা হলো-

ক. কুরআন-সুন্নাহর নস এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ।

খ. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ইজতিহাদ।

গ. সম্মিলিত ইজতিহাদ।

ঘ. জনকল্যাণ অগ্রাধিকারমূলক ইজতিহাদ।

ঙ. সমাজে উদ্ভূত বাস্তব সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ।

চ. বিপরীতধর্মী শরীয়া পালনের ইঙ্গিতমূলক ইজতিহাদ (المدارس الفقهية المتنوعة) ও মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মাযহাবের আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত।

ক. কুরআন-সুন্নাহর নস এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ

সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ সরাসরি শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে গণ্য না হলেও শরীয়তের মূল উৎসের আলোকে ইজতিহাদ করার কারণে তা দালীলিক মর্যাদা লাভ করে। মানুষ হিসেবে তারা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। তাদের ঐ সকল ইজতিহাদই শরীয়তের উৎস হিসেবে গণ্য হবে, যা নির্ভুল ও কুরআন সুন্নাহর অনুকূলে। মূলত কুরআন-সুন্নাহই শরীয়তের মূল উৎস। অবশিষ্ট দলীলসমূহ এ দুটির শাখা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ বিষয়ে ড. মান্না আল কাত্তান বলেন,

---

[১৩৮] তাবরানী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব, *আল মুজামুল কাবীর*, (কায়রো: মাকতাবাহ ইব্‌ন তায়মিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.), খ, ৯, পৃ. ২১০।

[১৩৯] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব: মাকতাবাহ ইব্‌নুল জাওযী, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮০।

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصر ويكون مصدر التشريع في عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا غير،

"এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ শরীয়তের মূল উৎস ছিল না। এ যুগে কুরআন-সুন্নাহই ছিল একমাত্র উৎস"।[১৪০]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, তারা কুরআন-সুন্নাহর নস বিদ্যমান থাকাবস্থায় কখনো ইজতিহাদ করতেন না। আল কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় উদ্ভূত সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া না গেলে এই দুটি মুল উৎসের আলোকে ইজতিহাদ করতেন। মুআয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ইয়ামেনের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হবার প্রাক্কালে যে উক্তি করেছেন, এ ক্ষেত্রে তা সর্বোত্তম দলীল। তার মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন-সুন্নাহর নস থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিতকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে নির্দেশক হিসেবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) ও দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) এ কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন। এ পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরাম কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। প্রথম দুই খলীফার ইজতিহাদের পরিধি বিষয়ে উসূলে ফিকহ শাস্ত্রজ্ঞ হাজাবী'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

كان عمر كأبي بكر يجمع علماء الصحابة الماهرين في النوازل ويستشيرهم،

"উমার (রা) আবু বকর (রা) এর ন্যায় দক্ষ, অভিজ্ঞ ও মুজতাহিদ সাহাবীদের একত্রিত করে নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলির সমাধানে পরামর্শ চাইতেন"।[১৪১]

খ. সদৃশ বিধানের উপর কিয়াস করে মাসআলা ইসতেম্বাত করা

নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলির সমাধানে সাহাবায় কেরামের দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতি ছিল, হুকুম সাব্যস্ত হবার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে শরীয়তের নস পাওয়া গেলে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এমন বিষয়েও ঐ হুকুম উদ্ভাবন করা। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন এ পদ্ধতির প্রথম প্রবক্তা। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, উমার (রা) কোনো পন্থা উদ্ভাবন করলে, সে পথে পরিচালিত হওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়ে যেত। কেননা একজন ব্যক্তি স্ত্রী ও মাতা-পিতা রেখে মৃত্যুবরণ করার পর তার উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তিনি এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, স্ত্রী অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। আর মা অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে।[১৪২]

কাযী শুরাইহ এর নিকট লিখিত ফরমান দ্বারাও সদৃশ বিধানের উপর কিয়াস করে মাসআলা ইসতেম্বাত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মদীনায় নিযুক্ত কাযী শুরাইহ এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে,

اعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق،

"সদৃশ বিষয়সমূহ ভালোভাবে রপ্ত করে নাও। কোনো বিষয়ে মনে খটকা লাগলে, সত্যের পক্ষে যেটি বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ঐটি তার সঙ্গে যুক্ত করে দাও"।[১৪৩]

---

[১৪০] ড. মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী*, (কায়রোঃ মাকতাবাহ ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩১।

[১৪১] হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৯০।

[১৪২] দারিমী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *সুনানু দারিমী*, (সৌদি আরবঃ দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১২ হি. /২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৩ ।

[১৪৩] শানকীতী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আলাবী, *নাসরুল বুনূদ আলা মারাকিস সুউদ*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মাতবাআতু ফুজালা, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৪।

গ. শরীয়ত প্রণেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের (مقاصد الشارع) আলোকে হুকুম উদ্ভাবন করা

সাহবায়ে কেরামের ইজতিহাদের স্বভাবজাত মেধা ও ফিক্‌হ বিষয়ক বোধশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক সান্নিধ্যের বদৌলতে তারা এ অভিরুচি অর্জন করেছেন। ফতোয়ার ক্ষেত্রে জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে ইজতিহাদ করাই ছিল তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য বিষয়। আল কুরআনের অনেক আয়াতে এ বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়। সূরা আন নাহল এর নিম্নের আয়াতটি অনুধাবনযোগ্য।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ،

"আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন। তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে বারণ করেন"।[১৪৪]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইব্‌ন আবদুস সালাম বলেন, জনকল্যাণে উৎসাহ প্রদান ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। আয়াতের আদল (الْعَدْلِ) ও ইহসান (الإِحْسَانِ) শব্দ দুটির সঙ্গে যুক্ত (الْ) অব্যয়টি ব্যাপকতা ও সামগ্রিক (للعموم والاستغراق) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সব ধরনের সদাচরণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদল শব্দের অর্থ হলো, সমতা, ন্যায়বিচার ও সবার প্রতি সুবিচার করা। এটি সমাজকল্যাণমূলক হোক বা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের বেলায় হোক। তেমনিভাবে الفحشاء، المنكر البغي শব্দ তিনটিতেও সকল প্রকার পাপাচার, অন্যায় কর্মকাণ্ড, জুলুম ও বাড়াবাড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[১৪৫]

১.২.৫. সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ অনুশীলন

ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা প্রদান করতেন, তেমনিভাবে ইজতিহাদের বাস্তব অনুশীলনে উৎসাহ দিতেন। মুসলিম উম্মাহ'র ভবিষ্যত কল্যাণকে সামনে রেখে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সযত্ন সতর্কতার অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দলীল গ্রহণের যে পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে ওহির আলোকে হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ،

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটি তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[১৪৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ،

"আমি আপনার নিকট কুরআন নাযিল করেছি। যাতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে । যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে"।[১৪৭]

---

[১৪৪] আল কুরআন, ১৬;৯০।

[১৪৫] আবু মুহাম্মদ ইজ্জুদ্দীন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুস সালাম. *কাওয়ায়িদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম*, সম্পাদনা: তাহা আবদুর রউফ সাদ, (কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯১ খ্রি.),পৃ, ৬৪২।

[১৪৬] আল কুরআন, ৫৩;৩-৪।

[১৪৭] আল কুরআন, ১৬;৪৪।

উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল ফায়সালা দিয়েছেন, তা গ্রহণ না করে কেউ কখনো মুমিন হতে পারে না। এতে কোনো রকম সঙ্কোচ পোষণ করা এবং পরিপূর্ণরূপে তাতে আত্মসমর্পণ না করেও কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا،

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা কখনো মুমিন হতে পারে না। যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পন না করে। অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ না থাকে এবং সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পন করবে"।[১৪৮]

আল কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত সকল বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের উৎস। হাদীস ও সিরাতের কিতাবে এ সংক্রান্ত অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে ইজতিহাদ করেছেন, তার আরো কতিপয় পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক. অনুমতিসাপেক্ষ ইজতিহাদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবীদের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ইজতিহাদ করার অনুমতি প্রদানের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিখাদ নির্ভরযোগ্যতা ও বিশেষ বিচারিক যোগ্যতার কারণে অনেকে এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যোগ্যতাসম্পন্ন এমন সাহাবীদের উপর অনেক সূক্ষ্ম ঘটনা নিস্পত্তির দায়িত্বও অর্পিত হয়। এখানে যে বিষয়টি সূক্ষ্ম ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হলো, ইজতিহাদ এর সুনিপুণ পদ্ধতি শিক্ষাদানের উদ্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপস্থিতিতেই বিশেষ বিশেষ সাহাবীর উপর এ গুরুদায়িত্ব অর্পন করেন । এ ধরনের অনুমতি দুই প্রকার।

ক. বিশেষ অনুমতিসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সাহাবীর ইজতিহাদ। খ. সাধারণ অনুমতি সাপেক্ষ ইজতিহাদ।

ক. বিশেষ অনুমতিসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সাহাবীর ইজতিহাদ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, দুইজন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি বিচার নিয়ে আসলেন। তিনি আমরকে (রা) উদ্দেশ করে বলেন,

اقض بينهما 'এ দুইজন ব্যক্তির বিচার মীমাংসা করে দাও'। আমর (রা) বললেন,

أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَى أَنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ أُجُورٍ وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ،

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপস্থিতিতে আমি কীভাবে বিচার করতে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তুমি সঠিক বিচার করলে দশটি নেকি লাভ করবে। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করো, তবে একটি নেকি পাবে"।

আমর ইবনুল আস (রা) এর এ ইজতিহাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ নির্দেশের কারণে বিশেষ ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে"।[১৪৯]

---

[১৪৮] আল কুরআন, ৪;৬৫।

[১৪৯] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, সম্পাদনা: মুস্তফা আবদুল কাদির আতা, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), খ. ৮, পৃ. ২২৩, হাদীস নং- ৭০০৪।

আমর ইবনুল আস (রা) উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিচারের উদ্দেশে দুটি প্রতিপক্ষ দল আগমন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,قم ياعقبة اقض بينهما

"এসো। হে উকবা! দুজনের মধ্যে বিচার করে দাও।

আমি বললাম, أنت أولي بذالك مني

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মহৎ কাজের জন্য আপনিই বেশি উপযুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أنك ان أصبت فلك عشر أجور وان اجتهدت فأخطأت فلك أجر،

"তুমি যদি বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করো এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবে তেমার জন্য রয়েছে দশটি সওয়াব। আর ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করলে একটি পূণ্যের অধিকারী হবে"।[১৫০]

এ ঘটনায়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা ইব্ন আমিরকে (রা) ইজতিহাদ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল ফিকরুস সামি গ্রন্থকার বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুজন সাহাবীকে বিশেষ বিশেষ ঘটনায় বিচারক নিযুক্ত করার অনেক উদাহরণ রয়েছে"। [১৫১]

খ. সাধারণ অনুমতিসাপেক্ষ ইজতিহাদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নির্দিষ্ট সাহবিদের ইজতিহাদের বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন, তেমনিভাবে সাধারণ মুসলমানের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ইজতিহাদের প্রকৃতিও শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যাপারে (طريق النداءالي الصلاة) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ সাহাবীদের ইজতিহাদ করার উন্মুক্ত অনুমোদন দিয়েছেন। এ সুযোগ লাভ করার কারণে অনেক সাহাবী এ বিয়য়ে ইজতিহাদী কার্যক্রম শুরু করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যাইদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী (রা) এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি নিদ্রা ও জাগরণের মাঝে আযানের বাক্যসমূহ শুনতে পেলেন। আবদুল্লাহ (রা) এর এ ইজতিহাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথ, সময়োচিত ও সুন্দর মনে করে বেলালকে (রা) তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন"।[১৫২]

তেমনিভাবে বনু কুরাইযা অবরোধের ক্ষেত্রে আসরের নামায আদায় করার নির্দেশসম্বলিত হাদীসও ছিল সকল সাহাবীর উদ্দেশে ইজতিহাদের একটি উন্মুক্ত আহ্বান। যার কারণে একদল সাহাবী ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য হলো দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া। পথিমধ্যে নামায আদায় করা নির্দেশ পালনে প্রতিবন্ধক নয়। আর একদল সাহাবী মনে করলেন, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নামায আদায় করাই ছিল নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য। মাঝপথে নামায আদায় করার কোনো সুযোগ নেই।

সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করার ঘটনাটিও উন্মুক্ত ইজতিহাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যার কারণে একদল সাহাবী মুসলমানদের শক্তিবর্ধনের লক্ষ্যে মুক্তিপণ আদায় করার মত প্রকাশ করেন। আরেক দল সাহাবী শত্রুদের চিরতরে মূলোৎপাটনের লক্ষে তাদের হত্যা করার পক্ষে জোরালো অভিমত প্রকাশ করেন। এখানে তৃতীয় আরেকটি মত ছিল,

---

[১৫০] দারা কুতনী, আবুল হাসান আলী ইব্ন উমার আল বাগদাদী, *সুনানু দারা কুতনী*, (বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৬২।

[১৫১] হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৯।

[১৫২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং- ৪৯৮।

يقضي بأن يحرقوا بالنار بعد ادخالهم في واد كثير الخطب،
"অধিক লাকড়িবিশিষ্ট উপত্যকায় শত্রু নেতাদের একত্রিত করে পুড়িয়ে মারা"।[১৫৩]

১.২.৬. ইজতিহাদে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ তারা সবসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে ইজতিহাদের বিশুদ্ধতা যাচাই করে নিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ যখন ইসলামী আইনের মর্যাদা লাভ করে, তখন থেকে মুসলিম সমাজে তার গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়।

মানুষ হিসেবে অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা ভুল ইজতিহাদও সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ওহি নাযিল এর মাধ্যমে ইজতিহাদগত ভুলের সংশোধন হয়ে যেতো। সর্বোপরি তারা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর পর্যবেক্ষণে থাকতেন। যার কারণে কখনো এ ভুল স্থায়ী হতো না। সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদী বিষয়ে অনেক সময় ভিন্নমত পোষণ করতেন। পারস্পরিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের ইজতিহাদ ছিল মৌলিক নীতিমালার আলোকে। তারা পরস্পরের ইজতিহাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তারা সরাসরি নবীর দরবারে তার সত্যাসত্য যাচাই করার সুযোগ লাভ করতেন। তারা যথাসম্ভব বিরোধ এড়িয়ে চলতেন এবং বিরোধীয় বিষয়ের সমাধানে অক্লান্ত সাধনা করতেন এবং মর্যাদাবান ও অভিজ্ঞ সাহাবীদের ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধের কারণ উল্লেখ করা হলো।

ক.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তারতম্য ও ইলমী মজলিসে অনুপস্থিতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং শিক্ষা মজলিসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সব সাহাবী সমপর্যায়ের ছিলেন না। জীবিকার্জন ও বিভিন্ন অভিযানে গমনসহ বিবিধ কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতেন। এ ক্ষেত্রে সকল সাহাবীর ছিল অসীম আগ্রহ। যা উমার (রা) এর কথা থেকে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন,

"আমার একজন আনসারী ভাই ছিল। আমরা সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অবস্থান করার অপেক্ষায় থাকতাম। সুতরাং আমি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেতাম আর একদিন তিনি যেতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারের যে কোনো হাদীস অথবা সংবাদ আমি তার নিকট বর্ণনা করতাম। তিনিও অনুরূপ আমার নিকট থেকে বর্ণনা করতেন"।[১৫৪]

---

[১৫৩] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: ফাহিম মুহাম্মদ শালতূত, (জিদ্দা: তারীখুল মদীনা, ১৩৯৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৮৬১।

[১৫৪] কুরতুবী, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব: দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৬।

খ. যোগাযোগ ও হাদীস শোনার ক্ষেত্রে সমতা সত্ত্বেও স্মরণশক্তির দুর্বলতা

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকের স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। অনেকে ছিলেন তাদের তুলনায় দুর্বল। অনেকে ভুলে যাবার ভয়ে হাদীস লিখে রাখতেন। হাদীস সংরক্ষণের ইত্যাদি পদ্ধতির কারণে তাদের ইজতিহাদে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়।

আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। যা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি একদিন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন ব্যক্তি এসে বললো, আমরা অনেক স্থানে একমাস কিংবা দুইমাস অবস্থান করি। উমার (রা) বলেন, আমি তো তখন পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতাম না। একথা শুনে আম্মার (রা) বললেন. হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কি সে কথা স্মরণ নেই? যখন আমি ও আপনি এক স্থানে অবস্থান করছিলাম। আমাদের উপর গোসল ফরজ হয়েছিল। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি আমাকে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। উমার (রা) বললেন, হে আম্মার! তুমি যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আম্মার (রা) বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি চাইলে আমি কখনো তা স্মরণ করিয়ে দেবো না। এতে উমার (রা) বললেন, কখনো না, আপনি যেভাবে আমাকে দায়িত্ববান মনে করেন আমিও আপনাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল মনে করি"।[১৫৫]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসম্বলিত এমন একটি ঘটনা উমার ইবনুল খাত্তাব এর স্মরণ থেকে উধাও হয়ে যায়। যা আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) এর নিকট খুব ভালোভাবেই স্মরণ ছিল। যার কারণে উমার ইবনুল খাত্তাব স্বীয় ইজতিহাদ প্রত্যাহার করেন।

গ. হুকুমসম্বলিত নস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার অভাব

সাহাবায়ে কেরামের নিকট শরীয়তের হুকুমসম্বলিত নস বর্ণিত হবার পর বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা, স্মরণশক্তির অভাব ও নাসিখ মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা অথবা মজবুত দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে রাবীর নিকট থেকে সাক্ষ্য তালাশ করা হতো। রাবী নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ দিতে অপারগ হলে অনেক সময় তাদের বর্ণিত হাদীস বর্জন করা হতো। যেমন ফাতিমা বিনতে কাইস[১৫৬] তালাকপ্রাপ্ত হবার পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট তার খোর-পোষ ও বাসস্থানের দাবি করলে উমার (রা) তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমরা একজন সাধারণ মহিলার কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আমরা জানি না মহিলাটি ঐ সুন্নাহ যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, নাকি ভুলে গেছে'।

ঘ. নস এর বিধান থেকে ইজতিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন

সাহাবায়ে কেরামের নিকট এমন অনেক সমস্যা উদ্ভব হয়েছে, যা নস এর বিধান দ্বারা সমাধানের পরিবর্তে ইজতিহাদ ও রায় প্রয়োগ দ্বারা সমাধান করেছেন। তবে ইজতিহাদ ও রায়ের ক্ষেত্রেও সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা যায়। যেমন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কোনো

---

[১৫৫] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস নং- ৩৩৮।

[১৫৬] ফাতিমা বিনতু কাইস (মৃত ৫০ হি.) ইব্ন খালিদ আল কুরাশিয়্যাহ আল ফিহরিয়্যাহ একজন মহিলা সাহাবী। ১ম সারির মুহাজির নারীদের একজন। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারী, সুদর্শন ও বুদ্ধিমতি রমনী ছিলেন। তিনি যাহহাক ইব্ন কাইস আল আমীর এর বোন। উমার (রা) এর শাহাদতের পর শুরা সদস্যগণ তার ঘরে মিলিত হন। (যিরিক্লি ,আল আলাম, খ. ৫, পৃ. ১৩১)

ঘটনায় যায়দ ও আলী (রা) এর সুন্নাহসম্বলিত ফায়সালার ব্যাপারে বলেন, আমি হলে ফায়সালা অন্যরকম হতো। বিচার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত একজন লোক উমারকে বললো, সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও সঠিক ফায়সালা দিতে বাধা কোথায়? তিনি বললেন, আমি আল কুরআন ও সুন্নাহ মতে ফায়সালা দিলে এমন করতাম। কিন্তু বিষয়টি আমি ইজতিহাদ ও রায় অনুসারে করার পক্ষপাতি। আর সব মানুষের রায় একরকম হয় না"।[১৫৭]

ঙ. নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কীয় জ্ঞানের অভাব

নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কীয় জ্ঞান না থাকার কারণে অথবা সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জানা-শোনার অভাবে অনেক সাহাবী বর্ণনাকারীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেক সময় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে অনির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এমন একটি ঘটনা ঘটেছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) এর মধ্যে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ،

"যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় সে যেন গোসল করে নেয়। আর যে ব্যক্তি লাশ বহন করে সে যেন অযু করে"।[১৫৮]

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে বলেন, দুটি শুকনো কাঠ বহন করার কারণে কখনো অযু ওয়াজিব হতে পারে না। তিনি নিজ ইজতিহাদ দ্বারা এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫৯]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এমন এক নারীর জন্য 'মাহরে মিসিল' এর ফায়সালা দেন। একথা শুনে মাকাল ইব্‌ন সিনান আল আশজায়ী[১৬০] (রা) বলেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুরূপ ফায়সালা দিয়েছেন। তার কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যে, ইতোপূর্বে কখনো এত খুশি হননি। কারণ তার সিদ্ধান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে গেছে। কিন্তু আলী (রা) মাকাল বর্ণিত এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে বলেন, কিতাবুল্লাহর বিপরীতে একজন বেদুঈনের হাদীস গ্রহণ করা যায় না। যে বেদুঈন নিজের গোড়ালীর উপর প্রস্রাব করে।[১৬১]

আলী (রা) স্বামীবিগত মহিলাকে তালাকপ্রাপ্তা নারীর উপর কিয়াস করেছেন এবং কিয়াসকে খবরে ওয়াহেদ[১৬২] এর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

---

[১৫৭] কুরতুবী, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব: দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫৩ ।

[১৫৮] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: কামাল ইয়ূসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭, হাদীস নং- ১১৯৯৯।

[১৫৯] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮১।

[১৬০] মাকাল ইব্‌ন সিনান আল আশজায়ী সাহসী ও বীর সাহাবীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। মক্কা বিজয়ের দিন নিজ গোত্রের পক্ষে তিনিই পতাকা বহন করেন। ৬৩ হিজরীতে বাসারায় ইন্তেকাল করেন। (ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল ইসাবা, খ. ৩, পৃ. ৪৪৬)

[১৬১] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামিস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৮১।

[১৬২] যে হাদীসের রাবী একজন তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে।

পরিচ্ছেদ- ৩
তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদ এর প্রকৃতি ও পরিধি

নবীযুগে যে পদ্ধতিতে ইজতিহাদ পরিচালিত হয় এবং সাহাবায়ে কেরাম যে প্রকৃতিতে ইজতিহাদের অনুশীলন করেন, তাবিঈযুগে তাতে কিছুটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে কারো জন্য ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল না বিধায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একক ইজতিহাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের শাস্তির পন্থা নির্ধারণে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি উন্মুক্ত আহ্বান জানানো এবং আযান দেয়ার প্রথা উদ্ভাবনের বিষয়ে সর্বস্তরের সাহাবায়ে কেরামের নিকট পরামর্শ চাওয়া ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামের যুগে অধিকাংশ সময়ে শীর্ষস্থানীয়, প্রজ্ঞাবান ও জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করতেন। অন্যান্য সাহাবী তাদের অনুসরণ করতেন। মাঝে-মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ও মর্যাদাবান সাহাবীগণও অন্যান্য সাহাবীর নিকট থেকে পরামর্শ চাইতেন। উদ্ভূত সমস্যায় ইজতিহাদী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেন। আবু বকর, উমারসহ (রা) খুলাফায়ে রাশেদূন এর পদ্ধতি ছিল এটিই। তাবিঈযুগে উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতি ব্যাপকতা লাভ করে এবং সম্মিলিত ও একক উভয় পদ্ধতিতে ইজতিহাদ পরিচালিত হয়।

১.৩.১. ব্যক্তিগত ইজতিহাদ

ইজতিহাদের বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। তবে পদ্ধতিগতভাবে ইজতিাদ দুই প্রকার। ক. সম্মিলিত বা যৌথ ইজতিহাদ (الاجتهاد الجماعي) খ. একক বা ব্যক্তিগত ইজতিহাদ (الاجتهادالفردي) । মূলত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইজতিহাদ বলতে একক ইজতিহাদকেই বোঝানো হতো। সম্মিলিত ইজতিহাদ বর্তমানে যে রূপ গ্রহণ করেছে পূর্বে তার প্রচলনের ব্যাপকতা ছিল না। উসূলে ফিক্হ এর প্রাচীন কিতাবসমূহে ইজতিহাদ এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তাতে একক ইজতিহাদের চিত্রই ফুটে ওঠে। মুজতাহিদগণের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলিসমন্বিত ব্যক্তির ইজতিহাদ। ইজতিহাদে কারো অংশিদারিত্বের বিষয় তারা আলোচনা করেননি। যার ফলে ইসলামে একক ইজতিহাদের প্রাধান্যই সর্বাধিক। উসূলে ফিক্হ এর প্রাথমিককালের কিতাবসমূহে যে সকল আলোচনা করা হয়েছে, তাতে মূলত একক ইজিতিহাদের বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

১.৩.২. সম্মিলিত ও যৌথ ইজতিহাদ

ইজতিহাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুজতাহিদ ও ফকীহগণ যেভাবে একক ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ করে ইসলামী শরীয়তের অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ এককভাবেই ইজতিহাদ করেছেন। মুজতাহিদগণ যে যেখানে ছিলেন প্রয়োজনের মুহূর্তে ইজতিহাদ করতে কুণ্ঠিত হননি। পূর্বের পরিচ্ছেদে ইজতিহাদের যে সকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে একক ইজতিহাদের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠেছে। মুসলিম সমাজে যখন সম্মিলিত ইজতিহাদের ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে এবং ফকীহগণ এ

ইজতিহাদকে নির্ধারিত ছকে আবদ্ধ করেন, তখন থেকে ইজতিহাদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নসর মাহমুদ আল কিরনিয সম্মিলিত ইজতিহাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

استفراغ اغلب الفقهاءالجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط واتفاقهم جميعا،

"মাসআলা উদ্ভাবনের পদ্ধতিতে শরীয়তের কোনো বিধান অবগত হবার লক্ষ্যে একাধিক ফকীহ্ এর চেষ্টা-সাধনা করাকে সম্মিলিত ইজতিহাদ বলে"।[১৬৩]

মুজতাহিদ ফকীহগণ যেভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে একক ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ এর মাধ্যমেও অনেক মাসআলা উদ্ভাবন করার ইতিহাস পাওয়া যায়। নিম্নে এমন কয়েকটি ইজতিহাদী কার্যক্রম তুলে ধরা হলো, যাতে মদীনার মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ

মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন মুজতাহিদ দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সম্মিলিত ইজতিহাদ করেছেন।
দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ،

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার মদীনায় দ্রব্যমূল্যে চড়াভাব দেখা যায়। লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্রব্যমূল্য লাগামছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের সুবিধার্থে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একমাত্র আল্লাহই পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা ও রিযিকে প্রশস্ততা দানকারী। আমি আশা করি, আল্লাহর সঙ্গে আমি এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবো যে, কোনো ব্যক্তি আমার নিকট রক্তপণ ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জুলুমের অভিযোগ নিয়ে আসবে না"।[১৬৪]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণে বিধি-নিষেধ আরোপ করা জায়েয নয়। মুজতাহিদগণ হাদীসের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনের মুহূর্তে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। তারা জনস্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ করেন। যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের স্বার্থ রক্ষিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ব্যবসায়ীগণ বাজারে যথেচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি করবে। তাদেরকে একচেটিয়া মূল্য বৃদ্ধির অধিকার দেওয়া হবে। ব্যবসায়ীগণ মুনাফা লাভের উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে, তা কখনো জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যদি বাজারে পণ্যের অভাব হয়, যার কারণে তারা মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়, এমতাবস্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করলে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং মুজতাহিদগণ এমন মাসআলা ইসতেম্বাত করেন, যাতে সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষা পায়।

শ্রমিক ও কারিগরের হাতে কোনো বস্তু নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হবে

তাবিঈযুগে ইজতিহাদপ্রসূত একটি মাসআলা হলো, কর্মচারী বা কারিগরের হাতে কারো পণ্যদ্রব্য নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কারিগরকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। মূল মাসআলাটি হলো, কোনো

---

[১৬৩] আল কিরনিয, নসর মাহমুদ, *আল ইজতিহাদুল জিমায়ী*, (গাযা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৯ হি./২০০৮খ্রি.), পৃ. ৩৬।

[১৬৪] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ২১, পৃ. ৪৪৫ ।

কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হলে অথবা মেরামতের লক্ষ্যে কোনো দ্রব্য কারিগরের নিকট অর্পন করা হলে তাদের মূল দায়িত্ব হলো, যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের সাথে কাজটি সম্পন্ন করে বস্তুটি নিয়োগকর্তার নিকট ফেরত দেয়া। এ ক্ষেত্রে কর্মচারী বা কারিগর একজন আমানতদার। ইসলামী শরীয়তের মূল দর্শন হলো, আমানতদার গচ্ছিত বস্তুর দায়ভার গ্রহণ করে না। আমানতদারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ত্রুটি বা অবহেলা ব্যতীত ঐ বস্তু নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ،

"আমানতদারের উপর জরিমানা ধার্য হবে না"।[১৬৫]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা আমানতদার হিসেবে শ্রমিক বা কারিগরের উপর জরিমানার বোঝা ছাপিয়ে দেয়া জায়েয না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মুজতাহিদ ও ফকীহগণ কাজে অবহেলাপ্রতিরোধ ও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা আদায় করার বিধান রেখেছেন। যাতে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং জন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদের ক্ষতি হলে শ্রমিককে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে

তাবিঈ যুগে ইজতিহাদপ্রসূত আর একটি উল্লেখযোগ্য মাসআলা হলো, শ্রমিক-কর্মচারীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত কোনো ব্যবসায় যদি শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে কোনো পণ্যের ক্ষতি সাধন হয়, এতে শ্রমিককে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। মূলত শ্রমিকের কোনো ধরনের ত্রুটি ও অবহেলার কারণে যদি সম্পদের ক্ষতি হয়, তবেই তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। অন্যথায় শ্রমিক যৌথ মালিকানাধীন সম্পদে একজন আমানতদার মাত্র। কিন্তু অবহেলার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করা এবং জন-সম্পদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ফকীহগণ শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে সম্পদের হানি হলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান কার্যকর করেন।[১৬৬]

বনু হাশেমকে যাকাত দেয়া জায়েয

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর বনু হাশেমকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। নবীজীর বংশধরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এটি একটি বিধিবদ্ধ হুকুম। এর বিনিময়ে তাদের জন্য বাইতুল মালে রয়েছে নির্ধারিত অংশ। 'গনিমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) এর সম্পদে তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فجعلها في فيه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ. لِيَطْرَحَهَا وَقَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ،

"সদকার অর্থ গ্রহণ করা নবী বংশধরের জন্য শোভনীয় নয়। এগুলি মানুষের সম্পদের বর্জ্য। (মুসলিম) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, হাসান (রা) সদকার একটি খেজুর হাতে নেয়ার পর মুখে পুরে দিলেন।

---

[১৬৫] বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, *আস সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৪৭২।

[১৬৬] ড. যুহাইলী, ওয়াহবাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্ক: দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি./.২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৭।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা রেখে দিতে বললেন। তিনি বললেন, থু. থু. ছি. ছি.। তুমি কি জানো না আমরা সদকা খাই না"।[১৬৭]

কিন্তু যদি কোনো শাসক বনু হাশেমকে তাদের এ ন্যায্য হিসসা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের পাওনা আদায় না করে, তখন তাদের অধিকার নিয়ে তাবিঈ যুগের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদপূর্বক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিস্থিতির বাস্তবতার নিরিখে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা যেভাবে জায়েয হবে, তেমনিভাবে যাকাতদাতার যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া (র) বলেন, বনু হাশিমকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে, প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা অন্যান্য ফরজ সদকা গ্রহণ করতে পারবে। ইব্‌ন কুদামা (র) বলেন, তারা নফল সাদকাও গ্রহণ করতে পারবে।[১৬৮]

মসজিদে মহিলাদের আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের যুগে মুসলিম নারীগণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আগমন করতেন। তখন তাদের মধ্যে তাকওয়া পরহেযগারী ছিল নজিরবিহীন। তাদের অন্তর ছিল আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ। মুসলিম নারীদের মসজিদে আগমনে বাধা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ،

"তোমরা আল্লাহর দাসীদের মসজিদে আগমনে বাধা প্রদান করো না"।[১৬৯]

এই হাদীস দ্বারা মুসলিম নারীদের মসজিদে আগমনের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাবিঈ মুজতাহিদগণ দেখতে পেলেন, দিন দিন মুসলিম নারী-পুরুষের মধ্যে তাকওয়া পরহেযগারী লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যাত্রাপথে বখাটে যুবকদের দৌরাত্মে নারীসমাজ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। নারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে। দৃষ্টির হেফাজতের পরিবর্তে বে-পর্দার সয়লাব চলছে। ইত্যাদি কারণে মহিলাদের মসজিদে আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইমাম বুরহানুদ্দীন আল মারগীনানী (র) বলেন,

ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله،

"ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ফিতনায় আক্রান্ত হবার আশঙ্কার কারণে যুবতী নারীদের জন্য জামাতে শামিল হওয়া মাকরূহ। বয়স্ক নারীদের জন্য ফজর, মাগরিব ও এশার জামাতে শরিক হতে কোনো দোষ নেই"।[১৭০]

আদ দুর্‌রুল মুখতার প্রণেতা বলেন,

ولما تغيرت هذه الأعراف في أزمان متأخري الحنفية اضطروا إلى تغيير هذه التفصيلات في المسألة حيث صار خروج المرأة للمسجد في زمنهم ذريعة للفساد والفتنة بها وكثر انتشار الفساق على مدار

---

[১৬৭] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ. ১২৭, হাদীস নং- ১৪৯১।

[১৬৮] ইব্‌ন আবদিল হাদী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *ইখতিয়ারাতু শাইখিল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া*, সম্পাদনাঃ সামী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাদুল্লাহ, (জিদ্দাঃ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১০৪।

[১৬৯] ইব্‌ন খুযায়মা, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, *সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুস্তফা আজমী, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮১১ ।

[১৭০] মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ, আবু আবদিল্লাহ আকমালুদ্দীন, *আল ইনায়া শরহুল হিদায়া*, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৫।

اليوم فأفتى المتأخرون باعتماد منع الكل في الكل أي منع كل النساء من حضور كل الصلوات في كل الأوقات،

"যুগের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে হানাফী ফকীহগণ মাসআলায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। বর্তমানে এমন একটি সময় অতিবাহিত হচ্ছে, যখন মসজিদের জন্য বের হওয়াই ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম বেড়ে গেছে। যার ফলে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ সকল প্রকার নারীদের জন্য সর্বাবস্থায় সব ওয়াক্তের জামাতে শরিক হতে নিষেধ করেছেন।[১৭১]

ফতোয়ায়ে উসমানী ও আলমগীরী এর বরাতে মুসলিম বংলা এ্যাপস-এ এক জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান ফিতনার যুগে মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে সব ধরনের নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে যদি মার্কেটে বা বাইরে কোথাও যাওয়ার পথে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকায় মসজিদে নামায পড়া হয়, তাহলে সমস্যা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা আছে কিনা দেখতে হবে। মোট কথা ঘটা করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া যাবে না। এমনিভাবে কারণবশত বাইরে গেলে জুমার নামাজে মহিলারাও উপস্থিত হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে যদি খুতবা শুনতে পারে তাহলে পুরুষদের সাথে দুই রাকাত পড়লে হবে। আর খুতবা মিস হয়ে গেলে ফরজ চার রাকাতই আদায় করতে হবে।

আবিলতামুক্ত নির্দোষ গান-বাজনা বৈধ

কোনো বিষয় হারাম হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট নস না থাকলে তা নিষিদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে ঐ বস্তুটির হালাল ও বৈধতাই আসল কথা। যে সকল বাদ্য-বাজনায় অন্তর নরম হয় এবং তাতে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হবার উপাদান থাকে তা অনেক সময় অন্তঃরোগের উপশম হয়। মনে প্রশান্তি লাভ হয়। নানা ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির কারণ হয়। সাহাবী ও তাবিঈগণ এ ধরনের গান-বাজনা বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।[১৭২]

ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী (১৯৩২-২০১৫খ্রি.) বলেন, যে সকল শর্তসাপেক্ষে সাহাবী ও তাবিঈগণ গান-বাজনা বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন, বর্তমান যুগে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আধুনিক কালের মিডিয়ায় যে সকল গান-বাদ্য প্রচার করা হয়, তা বৈধ না হওয়ার সম্ভাবনাই যুক্তিযুক্ত। অন্ততপক্ষে গুনাহে লিপ্ত হবার আশঙ্কার কারণেও তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।[১৭৩]

যে সমস্ত গান-বাজনা ও খেলা-ধূলার উদ্দেশ্য নিছক বিনোদন এবং তাতে রয়েছে আল্লাহর নাফরমানীর উপকরণ, তা নির্ঘাত হারাম। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীস এর সহীহ নস রয়েছে। সাহাবী ও তাবিঈগণ ঐ সকল গান-বাজনা বৈধ বলে ইজতিহাদ করেছেন, যাতে হারামে লিপ্ত হবার কোনো আশঙ্কা না থাকে। মানসিক জড়তা ও অবসাদ দুরিকরণ এবং কাজে-কর্মে ফুর্তি আনার লক্ষ্যে এ ফতোয়া প্রদান করেছেন। বর্তমান সময়ে তাকওয়ার উত্তরোত্তর অধঃপতনের কারণে তার সুযোগ না থাকাই শ্রেয়।

১.৩.৩. মতভেদমুক্ত ইজতিহাদ

ইসলামই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন। যা সকল প্রকার বিরোধ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এখানে মৌলিক বিষয়ে কোনো মতভেদ, বিরোধ, খুঁত ও সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ নেই। দীনের ক্ষতিসাধনের

[১৭১] ইব্‌ন আবেদিন, মুহাম্মদ আমিন ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয, *দুররুল মুখতার*, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৬৬।

[১৭২] ড. যুহাইলী, ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্কঃ দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩১।

[১৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

উদ্দেশ্যে মতবিরোধ করার কোনো সুযোগ নেই। আল কুরআনের সর্বত্র মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"[১৭৪]।

হাদীস এর বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জামাতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রতি অতিশয় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَحَتَّى يَشْهَدَ وَلَا يُسْتَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا شَيْطَانٌ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتَهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ،

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রা) একদিন জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দানকালে বলেন, আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছি, যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবী এবং তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের সদুপদেশ দিচ্ছি। এরপর মিথ্যার ব্যাপক প্রচলন হবে। মানুষ অযথাই আল্লাহর নামে শপথ করবে। সাক্ষী তলব না করা সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। তোমরা অবশ্যই জামাতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করবে, কখনো বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করো না। নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে শয়তান থাকে। যেখানে দুইজন ব্যক্তি থাকে সেখান থেকে শয়তান নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। কোনো নারী-পুরুষ নিভৃতে একত্রিত হলে সেখানে শয়তান তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি জান্নাতের উত্তম স্থানে অবস্থান করতে ইচ্ছুক, সে যেন একতাবদ্ধ জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি ভালো কাজে আনন্দ লাভ করে এবং মন্দ কাজে অনুতপ্ত হয়, সেই প্রকৃত মুমিন"।[১৭৫]

আল কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের ইসলামে বিচ্ছিন্নতার জীবন পরিহার করে সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই শরীয়তের কোনো মৌলিক বিষয়ে কোনো ধরনের ইখতিলাফ সংঘটিত হয়নি। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান, যা সকল প্রকার বিরোধ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। ইজতিহাদের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার বৈপরীত্ব পাওয়া যায়নি। ইসলামের প্রথম শতকে মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক কোনো বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়নি। সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগে যে সকল ইখতিলাফ পরিদৃষ্ট হয়, তা ছিল আনুষঙ্গিক। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো চমৎকার। এখানে ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামদের পারস্পরিক ইখতিলাফ ও মতানৈক্য ছিল সত্য উদঘাটনের মৌলিক উপাদান। ইজতিহাদগত ভুল এখানে দোষণীয় নয়; বরং প্রসংশনীয় ও পূণ্যের কাজ। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার লক্ষ্যে মুজতাহিদগণের মধ্যে পারস্পরিক যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। আবার ইজতিহাদগত মতানৈক্যের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান সহজভাবে পালন করার একটি উন্মুক্ত পথ তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং এ মতভেদ অভিশাপ নয় ; রহমত।

---

[১৭৪] আল কুরআন, ৩;১০৩।

[১৭৫] নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব ইব্‌ন আলী আল খোরাসানী, *আস সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৮৬ ।

১.৩.৪. বিরোধপূর্ণ ইজতিহাদ

ইজতিহাদ ও ইখতিলাফ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইখতিলাফ ছাড়া ইজতিহাদ যেন অকল্পনীয়। যেখানে শরীয়তের নির্দিষ্ট নস বিদ্যমান আছে, সেখানে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফ করার কোনো সুযোগ নেই। আর যেখানে নস নেই, সেখানে মুজতাহিদ ইমামদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন। এ ধারা সাহাবাযুগ থেকেই চলে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় কোনো ধরনের ছন্দপতন ঘটেনি। ইজতিহাদের বিকাশধারা ইখতিলাফ এর এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ এর গ্রন্থসমূহে ইজতিহাদের যে সকল আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বিরোধপূর্ণ ইজতিহাদেরই এক দীর্ঘ ফিরিস্তি। ইসলামের প্রথম শতকেই বিরোধপূর্ণ এ ইজতিহাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ইজতিহাদকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে তাবিঈগণ এটিকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও ডাল-পালায় সমৃদ্ধ করেন। সাহাবা যুগের পর তাবিঈদের মধ্যেও অভ্যুদয় ঘটে অনেক মুজতাহিদ ইমাম এর। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তারাও পারস্পরিক ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এতে নতুন ধারা সংযোজন করেন। তাদের ইজতিহাদী মতামত এ যুগে 'মাযহাব' নামে খ্যাতি লাভ করে। হিজরী প্রথম শতকে খ্যতিমান অনেক ফকীহ ও মুজতাহিদ এর পরিচয় হয় মাযহাবের ইমাম হিসেবে। এই শতকের শেষ পর্যায়ে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন 'ইমাম আযম' উপাধিপ্রাপ্ত আবু হানীফা নুমান ইব্ন সাবিত। তিনি ফিক্হ শাস্ত্র উদ্ভাবন করে ইজতিহাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন এবং মুসলিম উম্মাহর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তার শিষ্যগণ এ মাযহাবকে সাধারণ মুসলমানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অপরিসীম পরিশ্রম ও ঈর্ষণীয় সাধনা করেন। ইমাম আবু ইউসূফ (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) (১৩২-১৮৯) তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। পরবর্তীকালে তাদের শিষ্যদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ ইমাম শাফিঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদ ইমাম এর আসন অলংকৃত করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এর সমসাময়িক আর একজন মুজতাহিদ ইমাম এর আভির্ভাব ঘটে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনায়। যার নাম হলো মালিক ইব্ন আনাস (র) (৯৩-১৭৯ হি.)। তিনি 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دار الهجرة) হিসেবে জগত-ব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম আশ শাফিঈ (র) এর প্রধান শিষ্য আহমাদ ইব্ন হাম্বলও (র) (১৬৪-২৪১) মুসলিম উম্মাহর অন্যতম মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহ এর আসনে অধিষ্টিত হন।

মুজতাহিদ ইমামদের মতামতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকের মতামত ও সিদ্ধান্ত অন্য ফকীহ ও মুজতাহিদ এর মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিরোধপূর্ণ ফিকহী সিদ্ধান্তই ফিকহ শাস্ত্র ও ইজতিহাদের প্রধান উপকরণ।

অতএব বিরোধপূর্ণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইজতিহাদের ইতিহাস হলো বিরোধ ও ইখতিলাফের ইতিহাস। মুজতাহিদ ইমামদের বিরোধপূর্ণ ফিকহী মাসআলাসমূহ পরবর্তীতে ইজতিহাদের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকে যার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন চলতে থাকে। তৃতীয় শতকে চার মাযহাবকে কেন্দ্র করেই ইজতিহাদী কর্মধারা আবর্তিত হয়। এ শতক হলো ইজতিহাদের পরিপুর্ণতা ও তার স্বর্ণ-যুগ। এ যুগে অনেক মুজতাহিদ ইমাম এর অবির্ভাব ঘটে। 'সিহাহ সিত্তাহ' এর ছয়জন সংকলকসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের সংকলকগণও ছিলেন স্ব স্ব স্থানে এক এক জন মুজতাহিদ। এতদসত্ত্বেও তারা ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল এর ইজতিহাদের আলোকে নিজেদের ফিক্হ চর্চার বিকাশধারা অব্যাহত রাখেন এবং তাদের সংকলিত কিতাবসমূহ বিন্যস্ত করেন। তাদের অনেকেই এই চার মাযহাবকে নিজেদের মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করেন। নিজেদের নামে স্বতন্ত্র মাযহাব তৈরি না করে প্রচলিত চার মাযহাবকেই স্বীকৃতি দান করেন।

১.৩.৫. সাহাবী ও তাবিঈদের মাঝে ইজতিহাদগত মতভেদ

তাবিঈগণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় সাহাবীদের বিরোধীতাও করেছেন। সাহাবা পরবর্তী যুগে সময়ের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্ধনের কারণে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা অধিকহারে অনুভূত হয়। এ যুগের মুজতাহিদগণ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলায় নতুনভাবে চিন্তা-গবেষণা শুরু করেন। সার্বিক দিক বিবেচনায় তারা সাহাবী ও অগ্রবর্তী তাবিঈদের ইজতিহাদের বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেন। তারা অনেক ক্ষেত্রে 'নস' (نص) এর শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে শরীয়তের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে ইজতিহাদ করেন। জন-স্বার্থ রক্ষা, সুবিধাবঞ্চিতদের সমস্যা দূরীকরণ, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জান-মালের সুরক্ষা ও যুগ-চাহিদার পরিবর্তনহেতু শরীয়তের বিধি-বিধান প্রয়োগে নবতর পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা-ধারার আলোকে অনেক মর্যাদাবান ও জলীলুল কদর (جليل القدر) তাবিঈ ইজতিহাদে নবতর গতি সঞ্চার করেন। মদীনার বিশিষ্ট তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (মৃ. ৯৪/৭১৩) এর অনেক ফতোয়া ছিল সাহাবায়ে কেরামের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিম্নে তার ইজতিহাদকৃত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো-

১. তিনি 'সালাম' অথবা 'সালাফ'[১৭৬] পদ্ধতির বেচা-কেনা অবৈধ মনে করতেন।

২.তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করেও শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন।

৩. তিনি ওযু থাকা অবস্থায় নতুন ওযু করা মোস্তাহাব মনে করতেন না। গোসল ওয়াজিব হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয মনে করতেন এমন ব্যক্তির জন্য মসজিদের উপর দিয়ে যাতায়ত করাও তিনি বৈধ মনে করতেন।। তিনি আরো বলতেন, কুরআন কী তার পেটের অভ্যন্তরে?

৪. তিনি মীরাস সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাপকতার কারণে নিহত ব্যক্তির সম্পদে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর (قتل عمد) অধিকার সংরক্ষণ করতেন।

৫. কোনো কারণ ছাড়া পঙ্গপালের মৃত্যু হলে তা খাওয়া তিনি অবৈধ মনে করতেন।

৬. কাফির মুসলিম থেকে এবং মুসলিম কাফির থেকে উল্টরাধিকারী সম্পদের মালিক হবে মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন।

৭. তার ইজতিহাদকৃত আর এশটি মাসআলা হলো, মুসলমান গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে দুইবার গোসল দিতে হবে। এশবার ফরয গোসল আর এশবার মৃত্যুজনিত গোসল।

৮. তিনি আরো মনে করতেন, দুধপানজনিত (رضاعت) বিয়ে-শাদী হারাম হবার বিধানটি নারীর সুবাদে, পুরুষের কারণে নয়। সুতরাং এক স্বামীর দুই স্ত্রীর ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে-শাদি জায়েয।[১৭৭]

১.৩.৬. সাহাবীদের সঙ্গে তাবিঈদের মতভেদপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সবার অগ্রগণ্য ও পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ-ফকীহদের অনুকরণীয় আদর্শ। তাবিঈগণ ছিলেন তাদের অনুবর্তী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসৃত নীতি

---

[১৭৬] বাকি মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রি করা অথবা নগদ মূল্যে এমন পণ্য বিক্রি করা, যা এখনো বিক্রেতার আয়ত্তাধীন নয়, শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে সালাফ অথবা সালাম বলা হয়।

[১৭৭] ড. যুহাইলী, ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্ক: দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি.২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

অনুসারে তাবিঈগণ ইজতিহাদ করেছেন। আবার অনেক সময় তাবিঈগণ সাহাবীদের সাথে ইখতিলাফ করেছেন এবং ভিন্নমত পোষণ করেছেন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ইজতিহাদের আলোচনা করা হলো।

নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ-বর্জন প্রসঙ্গ

আলী (রা) এর একটি বর্ম হারিয়ে যায়। এক ইহুদীর নিকট বর্মটি পাওয়া গেলে তিনি কাজী শুরাইহ (র) এর নিকট বিচারপ্রার্থী হন। আলী (রা) তার পক্ষে স্বীয় পুত্র হাসানকে (রা) সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করেন। কিন্তু বিচারক শুরাইহ নিকটাত্মীয় ও পুত্র হবার কারণে হাসান এর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। আলী (রা) এর মত হলো, পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তিনি এটিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো প্রকার অসুবিধা বা বাধা মনে করেন না। উমার (রা) এর মতও তাই। তারা নিকটাত্মীয়দের সাক্ষ্য মুমিনের পক্ষে জায়েয মনে করতেন। তাদের যুক্তি হলো, ন্যায়-পরায়ণতাই মুমিনের প্রধান ভূষণ। নিকট বা দূরাত্মীয় যাই হোক, মুমিন কোনো অবস্থাতেই ন্যায়-পরায়ণতা পরিত্যাগ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء،

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমাদের সন্তোষ আছে, তাদের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষ সাক্ষ্য রাখবে। যদি দুইজন পুরুষ না তাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক।[১৭৮]

আয়াতে সাধারণ নারী-পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয়ের কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ،

"হে মুমনিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। যদিও এটি তোমাদের নিজেদের অথবা মাতাপিতার অথবা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়"।[১৭৯]

তদুপরি আলী (রা) ফাতিমা (রা) এর পক্ষে আবু বকর (রা) এর নিকট সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইব্ন হাযম বর্ণনা করেন,

شهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها عند أبي بكر رضي الله عنه ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك،

"আলী (রা) ফাতিমা (রা) এর পক্ষে আবু বকর (রা) এর নিকট সাক্ষ্য দিয়েছেন। উম্মু আয়মানও তার সঙ্গে ছিলেন। আবু বকর (রা) আলীকে (রা) বললেন, যদি আপনার সঙ্গে অন্য একজন পুরুষ অথবা নারী সাক্ষ দিত, আমি ফাতিমা (রা) এর দাবি অনুযায়ী ফায়সালা দিতাম"।[১৮০]

পক্ষান্তরে তাবিঈ মুজতাহিদ ও বিচারক শুরাইহ এর মত হলো, কারো পক্ষে তার নিকটাত্মীয় সাক্ষ্য প্রদান করলে তা গৃহীত হবে না। যার কারণে শুরাইহ জলীলুল কদর সাহাবী ও খলীফা আলী (রা) এর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। কাজী শুরাইহ তার ইজতিহাদের পক্ষে নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَلَا الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ،

---

[১৭৮] আল কুরআন: ২;২৮২

[১৭৯] আল কুরআন, ৪;১৩৫।

[১৮০] ইব্ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্ন আহমদ, *আল মুহাল্লা বিল আসার*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা/বি.), খ. ৮, পৃ. ৫০৬।

"পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য এবং পুত্রের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনিভাবে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর, মনিবের পক্ষে গোলামের, গোলামের পক্ষে মনিবের ও নিয়োগকর্তার পক্ষে শ্রমিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না"।

ইমাম যাইলায়ী 'নাসবুর রায়হ' কিতাবে হাদীসটিকে যয়ীফ ও 'গরীব' আখ্যায়িত করে এটিকে দলীল উপস্থাপনের যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেন।[১৮১]

যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ দেয় না তার সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর করণীয় সংক্রান্ত বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ،

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল তার সাধ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। এটি নেককার লোকদের দায়িত্ব"।[১৮২]

আল কুরআনের এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের প্রতি সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ প্রদান করা সৎকর্মশীলতার পরিচায়ক। কিন্তু এটি শরীয়তের এমন অত্যাবশ্যকীয় ও বিধিবদ্ধ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তা পালন না করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তাবিঈ যুগের অনেক মুজতাহিদ বিচারক এটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তাকে আদালতে অযোগ্য ঘোষণা করেন এবং তার সাক্ষ্য বাতিল করে দেন। কাযী আবু মিহজান তাওবা ইব্ন তামার আল হাদরামী এর আদালতে এমন একটি বিচার দায়ের করা হলে তিনি এরূপ ফায়সালা প্রদান করেন। মামলাটির বিবরণ নিম্নরূপ-

এক দম্পতি কাজী আবু মিহজান তাওবা ইব্ন তামার আল হাদরামী এর আদালতে বিচারপ্রার্থী হয়। পরবতর্তীতে ঐ স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। বিচারক স্বামীকে তার স্ত্রীর খরচ আদায় করার নির্দেশ দেন। স্বামী বলল, আমি তা আদায় করবো না। এবার বিচারক নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কারণ স্বামী এটাকে অবশ্য আদায়যোগ্য খরচ হিসেবে মনে করেনি। পরবর্তীতে লোকটি কোনো মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদালতে আসলে বিচারক তাকে বললেন, আপনি সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য ব্যক্তি নন। লোকটি বলল, কেন? বিচারক বললেন, আপনি সৎকর্মশীল হতে চাননি এবং মুত্তাকি হতে অস্বীকার করেছেন। এ কারণ দেখিয়ে তাকে সাক্ষ্য দেয়ার অযোগ্য ঘোষণা করেন।

বিচারকের ইজতিহাদের পক্ষে উপরে বর্ণিত আয়াতটি সমর্থন প্রদান করে। আয়াতটিতে স্ত্রীর খরচ অনাদায়কারী ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত না হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও তিনি শরীয়তের বিধি পালনে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তার উপর এ শাস্তি প্রয়োগ করেন।

সন্তান কুরবানী করার মানত করলে একটি ছাগল কাফফরা দিতে হবে

কোনো ব্যক্তি যদি এই মর্মে মানত করে যে, সে তার সন্তান কুরবানী করবে। এ ক্ষেত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) এর ইজতিহাদ হলো, তাকে একশ উট কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু তাবিঈ মাসরুক ইবনুল আজদা (র) এর অভিমত হলো, তাকে একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে। মাসরুক বলেন, কোনো ব্যক্তির সন্তান ইসমাঈল (আ) থেকে উত্তম হতে পারে না। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে (আ) কুরবানী করার

---

[১৮১] যায়লায়ী, জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়ূসুফ ইব্ন মুহাম্মদ, *নাসবুর রায়াহ*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রাইয়ান, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৮২।

[১৮২] আল কুরআন, ২;২৩৬ ।

মানত করলে আল্লাহ তায়ালা তার পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি ছাগল পাঠিয়ে দেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি স্বীয় সন্তান কুরবানী করার মানত করলে তাকে একটি বকরী কুরবানী করতে হবে।[১৮৩]

১.৩.৭. তাবিঈযুগে মতভেদপূর্ণ ইজতিহাদের উদাহরণ

তাবিঈ যুগে মুজতাহিদগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতৈক্য দেখা গেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবিরোধও পরিলক্ষিত হয়। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তাধারা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ মতবিরোধের সূত্রপাত। সাহাবায়ে কেরামের পরে তবিঈদের মাধ্যমে হাদীস ও ফিকহ চর্চার লক্ষ্যে মদীনা ও ইরাকে দুটি আলাদা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই কেন্দ্রের ফকীহ ও মুজতাহিদদের মধ্যে অনেক মাসআলা বিরোধপূর্ণ হলেও অদ্যাবধি মুসলিম সমাজে তা সমাদৃত হয়ে আসছে। নিম্নে কয়েকটি মতবিরোধপূর্ণ ইজতিহাদী মাসআলা আলোচনা করা হলো।

ইমাম এর পেছনে কিরায়াত পাঠ

ইমামের পেছনে কিরায়াত পাঠ বিষয়ে হিজায এর মুজতাহিদগণের মতামত হলো, যে সকল নামাযে নিম্নস্বরে কিরায়াত পড়া বিধেয়, সেখানে মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে কিরায়াত পাঠ করবে। আর যে সকল নামাযে উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়া বিধেয়, সেখানে মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে কিরায়াত পাঠ করবে না। তারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত হাদীস ও আসারসমূহ দলীল হিসেবে পেশ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত,

لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب،

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার নামায শুদ্ধ হবে না"।[১৮৪]

কূফা'র মুজতাহিদদের অভিমত হলো, ইমামের পেছনে কোনো নামাযেই মুক্তাদী কেরাত পড়বে না। তারা আল কুরআনের এই আয়াতটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ،

"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবন করবে এবং নিশ্চুপ থাকবে, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"[১৮৫]

তদুপরি তারা ঐ সকল হাদীসসমূহ প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন, যেখানে ইমামের কিরায়াত পাঠকে মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে একটি বিষয়ে কূফা'র মুজতাহিদদের দলীল মজবুত বলে বিবেচিত হয়। তা হলো, কোনো মুসল্লি ইমাম এর রুকুরত অবস্থায় নামাযে শরিক হলে ঐ মুক্তাদি কিরায়াত পাঠ না করেও তার নামায শুদ্ধ

---

[১৮৩] ড. যুহাইলী, ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্কঃ দারুল মাকতাবী , ১৪২০ হি.২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৪।

[১৮৪] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ. ১০২ ।

[১৮৫] আল কুরআন, ৭;২০৪।

হওয়া এবং ঐ রাকাত নামাযে গণ্য হবার ব্যাপারে সকল মুজতাহিদ একমত। কেননা হিজায এর মুজতাহিদদের মতে ইমামের পেছনে নামাযে কিরায়াত পাঠ ফরয নয়[১৮৬]। সুতরাং কিরায়াত পাঠ না করা নামাযের বিশুদ্ধতায় কোনো প্রভাব ফেলবে না।

নামাযে বসার পদ্ধতি প্রসঙ্গ

তাবিঈদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের মধ্যে একটি হলো নামাযে বসার পদ্ধতি প্রসঙ্গ। হিজায এর মুজতাহিদদের মতে নামাযে বসার পদ্ধতি হলো দুই তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযে تورك পদ্ধতিতে বসা। অন্য নামাযে ডান পা বিছিয়ে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা। তাদের দলীল হলো,

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) নামাযে বসার পদ্ধতি এভাবে দেখিয়েছেন যে, তিনি ডান পা বিছিয়ে দেন এবং বাম নিতম্বের উপর উপবেশন করেন। তিনি দুই পায়ের উপর বসেননি। অতঃপর তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এভাবে উপবেশন করে দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তার পিতা এভাবে বসতেন। সহীহ বুখারী শরীফে আবু হুমাইদ আস সায়িদী থেকে বর্ণিত,[১৮৭]

فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ،

কূফা'র মুজতাহিদদের অভিমত হলো, নামাযের প্রতিটি বৈঠকে বসার পদ্ধতি হলো, বাম পা মাটিতে বিছিয়ে দেবে এবং তার উপর বসবে। তাদের দলীল হলো, ইবরাহীম নাখায়ী এভাবে বসা পছন্দ করেন। তিনি বলেন, কেনো লোক নামাযে এভাবে বসবে যে, সে তার বাম পা মাটিতে বিছিয়ে দেবে অতঃপর তার উপর বসবে। ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে আয়িশা (রা) থেকে এ ধরনের বসার পদ্ধতি সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।[১৮৮]

وَكَانَ يَفرشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ ينْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ؛

মুজতাহিদদের মধ্যে নামাযে বসার আরেকটি পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। তা হলো, নামাযের প্রথম বৈঠকে কূফা'র মুজতাহিদদের মতানুযায়ী বসবে। দ্বিতীয় বৈঠকে হিজায এর মুজতাহিদদের মতানুযায়ী বসবে।[১৮৯]

الموسوعة الفقهية গ্রন্থে ফকীহদের ইখতিলাফ এভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৯০]

وَأَمَّا هَيْئَةُ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ فَالِافْتِرَاشُ لِلرَّجُلِ وَالتَّوَرُّكُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَمْ الْأَخِيرَةِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هَيْئَةُ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ التَّوَرُّكُ وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْقُعُودِ هَيْئَةٌ لِلْإِجْزَاءِ فَكَيْفَمَا قَعَدَ فِي جَلَسَاتِهِ أَجْزَأَهُ لَكِنَّ السُّنَّةَ فِي جُلُوسِ آخِرِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ وَفِي أَثْنَائِهَا الِافْتِرَاشُ وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ هَيْئَةَ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ هِيَ الِافْتِرَاشُ

---

[১৮৬] মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী*, (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৯৬।

[১৮৭] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ৫৩৬।

[১৮৮] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস নং- ৪৯৮।

[১৮৯] মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী*, (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৯৬।

[১৯০] *আল মাওসুআতুল ফিকহীয়্যা আল কুওয়াইতিয়্যাহ*, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, (কুয়েতঃ দারুস সালাসিল, ২য় সংস্করণ), খ. ১৫, পৃ. ২৬৮।

وَفِي الثَّانِي التَّوَرُّكُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي أَنْ تَجْلِسَ مُتَرَبِّعَةً لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَنْ تَسْدُلَ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلَهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ السَّدْلَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ غَالِبُ فِعْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَلِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِجِلْسَةِ الرَّجُلِ؛

একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও শপথের মাধ্যমে বিচার মীমাংসা

সাধারণত কোনো বিচার মীমাংসার জন্য দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হিজায এর মুজতাহিদদের মতে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর শপথ সহকারে বিচার মীমাংসা করা যাবে। তাদের দলীল হলো ইমাম মালিক (র) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আবু সালামা ইব্‌ন আবদির রহমান ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, একজন সাক্ষীর শপথের মাধ্যমে কি কোনো বিচার ফায়সালা করা যায়? তারা উত্তর দিলেন হ্যাঁ। ইব্‌ন হাযম বর্ণনা করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ও আলী (রা) একজন সাক্ষীর শপথের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করেন। ইমাম বায়হাকী ও ইবনুল জারুদ বর্ণিত হাদীসটি হলো,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ،

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর শপথের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করেন"।[১৯১]

ইরাকের মুজতাহিদগণের মতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোনো বিচার মীমাংসা হতে পারে না। একজন সাক্ষীর শপথসহকারে কোনো বিচার ফায়সালা হতে পারে না।[১৯২] তাদের দলীল হলো আল কুরআন এর এই আয়াত,

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ،

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট হও, তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। "।[১৯৩]

১.৩.৮. তাবিঈযুগে সর্বসম্মত ইজতিহাদ

তাবিঈ যুগে এমন কিছু ইজতিহাদের নযির পাওয়া যায়, যাতে রয়েছে সকলের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত। তাবিঈদের সর্বসম্মত ইজতিহাদের ভিত্তিতে গৃহীত কয়েকটি বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

হাদীস সংকলন

তাবিঈ যুগে হাদীস সংকলন একটি সর্ববাদী ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যদিও এ বিষয়ে প্রথম দিকে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন ।

বায়হাকি উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রন্থবদ্ধ করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনার পর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সাহাবায়ে কেরামও এতে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘ একমাস এ বিষয়ে আল্লাহর

---

[১৯১] ইবনুল জারুদ, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী, *আল মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ*, সম্পাদনা: আবদুল্লাহ উমার আল বারুদী, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুল কিতাবিস সাকাফিয়্যাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৫২, হাদীস নং-১০০৬।

[১৯২] মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী*, (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৯৬।

[১৯৩] আল কুরআন, ২;২৮২

নিকট ইসতেষারা করতে থাকেন। একদিন তিনি নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا ،

"ফমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সংকলন করার বিষয়ে চিন্তা করলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। রাসূলের সাহাবীগণ তাকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক পরামর্শ দেন। উমার (রা) দীর্ঘ এক মাস যাবত আল্লাহর নিকট ইসতেষারা করেন। একদিন সকালে তিনি সিদ্ধান্ত ঘোষণাপূর্বক বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সংকলন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু আমার নিকট পূর্ববর্তী এমন অনেক জাতির কথা স্মরণ হলো, যারা অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করেছে। পরবর্তীতে তারা ঐ কিতাবসমূহ নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি "ধাল্লাহর কিতাবকে আমি কোনো কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে দেবো না"। [১৯৪] (অর্থাৎ হাদীসকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে সংকলন করতে পারবো না)

সাহাবাযুগের পরিসমাপ্তির পর তাবিঈগণ দেখতে পেলেন, মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিথ্যার প্রসার ঘটেছে এবং জাল হাদীস রচনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে হাদীস সংকলনের ব্যাপারে তাবিঈদের ইজমা সংগঠিত হয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন উমাইয়া খলীফা উমার ইব্ন আবদিল আযীয (রহ) (৯৯-১০১)।[১৯৫] তার নির্দেশে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়।

ইজতিহাদে রায় প্রয়োগ

যে সকল নব-উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানে শরীয়তের কোনো নস পাওয়া যায় না। সেখানে রায় প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা তাবিঈ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ পদ্ধতির প্রধান উদ্ভাবক ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, উমার এর ইন্তেকালে জ্ঞানের এক দশমাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি এই বলে উমার (রা) এর রায় প্রয়োগ, মাসআলা ইসতেম্বাত ও চিন্তাশক্তির বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন,

كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا،

"ফমার (রা) আমাদের জন্য কোনো পথ আবিষ্কার করলে, সে পথে পরিচালিত হওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়"।[১৯৬]

তিনি কাযী শুরাইহ (র) এর নিকট বিচারকার্যে রায় প্রয়োগের বিষয়ে পত্র লিখেন। যাতে তিনি বলেন,

اعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق،

---

[১৯৪] বায়হাকী, আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন মূসা, *আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী, (কুয়েত: দারুল খুলাফা লিল কিতাবিল ইসলামী, তা/বি.), পৃ. ৪০৭।

[১৯৫] মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী*, (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৮৬।

[১৯৬] দারিমী, আবু আবদিল্লাহ আবদুস সামাদ, *সুনানু দারিমী*, (বৈরুত: দারুল বাশায়ির, ১৪১২ হি./ ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৩।

"একটি সদৃশ বিষয়কে অন্য সদৃশ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করো। এতে কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হলে যেটি অধিকতর সত্য বলে মনে হয় সে মতে আমল করো"।[১৯৭]

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) কোনো বিষয়ে উমার (রা) এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করলেও নস পাওয়া না গেলে স্বাধীন চিন্তাশক্তির আলোকে অনেক নতুন মাসআলা উদ্ভাবন করেন। যা অনেক সময় উমার (রা) এর মতের বিপরীত মনে হয়। ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর মধ্যে কোনো মাসআলায় দ্বিমত হলে আমার নিকট ইব্ন মাসউদ (রা) এর মতটি বেশি পছন্দ হয়। ইবরাহীম নাখায়ী রায় প্রয়োগপূর্বক ইজতিহাদ করার বিষয়ে উমার (রা) এর নিকট সংরক্ষিত বীজটি ইরাকের উর্বর ভূমিতে বপন করেন। আর মদীনার পূণ্যভূমিতে এই চারাগাছ রোপন করেন রবিয়াতুর রায় (মৃ.১৩৬/৭৫৩)।[১৯৮]

ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র (المدارس الفقهية)

সাহাবাযুগে ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস ছিল আল কুরআন ও সুন্নাহ। তারা এ দুটি উৎসের প্রচার-প্রসারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন এবং বিজিত অঞ্চলে কুরআন-সুন্নাহর বিস্তারে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। সাহাবায়ে কেরামের পর তাবিঈ যুগে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষার অনেক নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীযুগে সরাসরি ফিক্হ শাস্ত্রের চর্চা না থাকলেও সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদপূর্বক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফিক্হ চর্চার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর পাঠ গস্খহণ ও তার উপর আমল হবে সহজতর। এ সময়ে মদীনা ও কূফায় দুটি প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনায় এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ছিলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব। তাছাড়াও উরওয়া ইব্ন যুবাইর, আবু বকর ইব্ন আবদির রহমান, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ, খারিজা ইব্ন যাইদসহ (র) অনেক তাবিঈ ছিলেন এ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাণশক্তি। এক পর্যায়ে এ শিক্ষাকেন্দ্রর নেতৃত্ব গস্খহণ করেন ইমাম মালিক ইব্ন আনাস। যার নামে প্রধান চার মাযহাবের অন্যতম 'মালিকী মাযহাব' মুসলিম উম্মাহ'র জোরালো সমর্থন লাভ করে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে কূফা ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অনেক মর্যাদাবান ও জলীলুল কদর সাহাবী তথায় বসতি স্থাপন করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবু মূসা আশআরী, সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসসহ (রা) প্রায় তিনশো সাহাবীর আবাসস্থলে পরিণত হয় এ শহর। আলী (রা) ইসলামী খেলাফতের রাজধানী কূফায় স্থানান্তর করার পর তার মর্যাদা বেড়ে যায় বহুগুণে। তখন থেকে শহরটি পরিণত হয় প্রধানতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে। ফিক্হ চর্চার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান পরিচালক ছিলেন আলকামা ইব্ন কাইস (মৃ. ৬২ হি.)। আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ, আমর ইব্ন শারাহিল ও হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান ও মাসরুক ইব্নল আজদাসহ (র) অনেক তাবিঈ এখানে ফিকহ চর্চায় বহুমুখী অবদান রাখেন। পরবর্তীতে নুমান ইব্ন সাবিত (র) (৮০-১৫০ হি.) ফিক্হ চর্চাকে এশটি শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেন এবং তার উপ-নামে 'হানাফী মাযহাব' মুসলিম উম্মাহ'র প্রধান মাযহাব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১৯৯]

---

[১৯৭] শানকীতী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আলাবী, *নাসরুল বুনূদ আলা মারাকিস সুউদ*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মাতবাআ ফুজালা, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৪।

[১৯৮] মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরিঈল ইসলামী*, (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৯০।

[১৯৯] আল আশকার ড. উমার সুলায়মান, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (কুয়েতঃ মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২হি./১৪০৬ খ্রি,), পৃ. ৮৬০।

১.৩.৯. তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদ এর পরিধি

সাহাবায়ে কেরামের মুবারক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সময়কাল হলো তাবিঈ যুগ। খুলাফায়ে রাশেদুন এর পরবর্তী এবং প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের পূর্ববর্তী সময় এ যুগের অন্তর্ভুক্ত। উমাইয়া শাসনামলই মূলত তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগ। সাহাবায়ে কেরাম যে পরিধিতে ইজতিহাদ করতেন, এ যুগেও অনেকটা একই পরিধিতে ইজতিহাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাবিঈ শব্দের অর্থের মধ্যেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাবিঈ অর্থ অনুসারী। শরীয়া পালনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন বলে তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়। আল কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه،

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট"।[২০০]

শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের মতো ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও তারা সাহাবায়ে কেরামের পরিপূর্ণ অনুগামী ছিলেন। তারাই ছিলেন তাবিঈদের একমাত্র শিক্ষক। তাদের নিকট থেকেই দীনের মৌলিক জ্ঞান ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা অর্জন করেছেন। তারা সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। কিয়াস এর পাশাপাশি ইজমাও শরীয়তের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয় সাহাবা যুগ থেকে। মূলত এ চারটিই ইজতিহাদ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। এ দিকে ইঙ্গিত করেই উসূল শাস্ত্রবিদ খাদিমী বলেন,

أن التابعين قد ورثوا من الصحابة مسالك استنباطهم ومروياتهم وفتاواهم وأقضيتهم والتي كان جزء منها مستند إلى العمل بالمقاصد واعتبار المصالح إذ ذلك القول يفيد بجلاء تام قبول التابعين وتعويل التابعين على الصحابة،

"তাবিঈগণ সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে মাসাআলা উদ্ভাবনের নীতি ও বর্ণনা পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাদের ফতোয়া ও বিচারিক রীতি-নীতিও আয়ত্ত করেছেন। শরীয়ত প্রণেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মানবকল্যাণের প্রতি খেয়াল রেখে শরয়ী সমস্যার সমাধান করা দলীল চতুষ্ঠয়েরই অংশবিশেষ। সাহাবায়ে কেরামের নীতি-আদর্শের অনুসরণের প্রকৃত অর্থ হলো, সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া"।[২০১]

তাবিঈগণ সার্বিক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের অনুবর্তী হলেও এ যুগে ইজতিহাদের পরিমণ্ডলে কিছুটা বর্ধিত মাত্রা যোগ হয়। এ যুগে এমন কিছু নতুন সমস্যাবলির উদ্ভব হয়, যা ছিল সাহাবী যুগে অবর্তমান। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াত আরব উপদ্বীপ পেরিয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়। পক্ষান্তরে সাহাবাযুগে বিশেষত আবু বকর ও উমার (রা) এর যুগে ইসলামের পরিধি আরব উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজিত অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের নিকট এমন কিছু হাদীস ছিল, যা অন্যন্য এলাকার সাহাবীদের নিকট পৌঁছেনি। প্রতিটি অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী দীন প্রচারক সাহাবীদের ফতোয়া ও মাসআলা উদ্ভাবন ও ইজতিহাদের নিয়ম-নীতির আলোকে দীনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। অথচ অন্য এলাকায় দীনের দায়ী সাহাবীগণের হাদীস ও ইজতিহাদের রীতি-পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদী চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে বিজিত অঞ্চলসমূহে ফিকহী ইখতিলাফ অধিকহারে পরিদৃষ্ট হয়। সার্বিক দিক বিবেচনায় তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদের কর্মপরিধি খানিকটা ব্যাপকতা লাভ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় তাবিঈগণ ইজতিহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

---

[২০০] আল কুরআন, ৯;১০০।

[২০১] খাদিমী, নুরুদ্দীন ইব্ন মুখতার, *আল ইজতিহাদুল মাকাসিদী*, (কাতার: রিয়াসাতুল মাহাকিমিশ শরঈয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

নবী ও খুলাফায়ে রাশেদূন এর যুগে সামষ্টিক ও যৌথ ইজতিহাদের (الاجتهاد الجماعي) যে নিয়ম চালু ছিল, তাবিঈ যুগে তাতে কিছুটা ছন্দপতন ঘটে। উমাইয়া শাসকবর্গের নৈতিক স্খলনের কারণে পরামর্শের (شوري) ভিত্তিতে খেলাফত পরিচালনায় ব্যত্যয় ঘটে। যার ফলে ফকীহ-মুজতাহিদগণ একক ও ব্যক্তিগত ইজতিহাদ (الاجتهاد الفردي) পদ্ধতির দিকেই ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে উসূলবিদ কাতানী এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

وما انتهت أيام الخلافة الراشدة حتى اختفى الاجتهاد الجماعيلأن بني أمية الغوا الشورى فعكف الفقهاء في المساجد على الاجتهاد الفردي النظري ،

"খুলাফায়ে রাশেদূন যুগের পরিসমাপ্তির পর সামষ্টিক ইজতিহাদের পদ্ধতি নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। এ সময়কালে উমাইয়া শাসকবর্গ শুরা পদ্ধতি অকার্যকর করে দেয়। যার ফলে ফকীহ-মুজতাহিদগণ মসজিদে বসে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ (الاجتهاد الفردي) এর পদ্ধতি চালু করেন।[২০২]

[২০২] আল কাতানী, মুহাম্মদ ইবরাহীম ইব্ন আহমদ, *আল ইজতিহাদু ওয়াল মুজতাহিদূন বিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ হামযা আল কাতানী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলমিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুজতাহিদঃ যোগ্যতা ও শর্তাবলি

পরিচ্ছেদ- ১
মুজতাহিদের পরিচয়, শ্রেণিবিভাগ ও বিধি-বিধান

মুজতাহিদ ইসলামের এমন একটি অনন্য মর্যাদাবান পদ, যেখানে ভুল করেও পূণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। মুসলিম উম্মাহর দীন-দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে তারাই শেষ আশ্রয়স্থল। কুরআন-সুন্নাহ'য় মুজতাহিদের অনেক ফজিলত ও তাৎপর্য বর্ণিত আছে। এ পদাধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিয়োজিত। যে মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তারাই শীর্ষস্থানীয়।

২.১.১. মুজতাহিদের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী শরীয়তের এমন জ্ঞানী ও মহা-পণ্ডিতকে মুজতাহিদ বলা হয়, যিনি শরীয়তের দলীল চতুষ্টয় থেকে আমলযোগ্য বিধি-বিধান উদ্ভাবনে করতে সক্ষম এবং তার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। ইবনুস সালাহ (র) (৫৭৭-৬৪৩ হি.) মুজতাহিদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,

المجتهد المطلق او المستقل هو من يستقل بادراك الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد،

"মুজতাহিদ মুতলাক বা মুসতাকিল ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে কারো তাকলীদ ও অনুসরণ ব্যতীত শরীয়তের বিধানসমূহ মূল উৎস থেকে অনুধাবন করতে স্বাধীন সত্তার অধিকারী হয়"।[২০৩]

অনেকের মতে মুজতাহিদ হলেন,

"যিনি পবিত্র কুরআনের ইলম ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সকল নীতিমালা এবং ইলমে হাদীসের সনদ, মতন ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী, বিশুদ্ধ কিয়াস প্রয়োগে যোগ্যতাসম্পন্ন ও মানব সভ্যতা ও সমাজ বিজ্ঞানের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল। যিনি এ সব যোগ্যতার মাধ্যমে কুরআন হাদীস থেকে শরীয়তের হুকুম আহকাম উদ্ভাবন করার ব্যাপারে বিশুদ্ধতার সাথে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে থাকেন"।[২০৪]

মুজতাহিদের শ্রেণিবিন্যাস

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখা ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গুটিকয়েক ব্যক্তির সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেনি। যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষীর শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে একটি শাস্ত্র সফলতার উচ্চতায় আরোহণ করে। আহকামে শরীয়তের বিষয়টিও অনুরূপ। নস থেকে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কারো অবদান মূলনীতির ক্ষেত্রে। কেউ কেউ উপমূলনীতির উপর গবেষণা করেছেন। আবার কেউ সাধারণ মূলনীতির উপর গবেষণা করে ইজতিহাদের অগ্রগতি সাধন করেছেন। এ দৃষ্টিকোণে মুজতাহিদদের কয়েকটি শ্রেণিতে

---

[২০৩] আল খাইয়াত, ড. আবদুল আযীয, *শুরূতুল মুজতাহিদ*, (কায়রোঃ দারুস সালাম, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২১।

[২০৪] লেখকমণ্ডলী, *ফতোয়া ও মাসাইল*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৫।

সুবিন্যস্থ করা যায়। আল্লামা শামসুদ্দীন ইব্ন কামাল (র) মুজতাহিদের শ্রেণিসংখ্যা ছয়টি বলে উল্লেখ করেছেন।

১.মুজতাহিদ ফিদ দীন (مجتهد في الدين)
২.মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد في المذهب)
৩.মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مجتهد في المسائل)
৪.আসহাবুত তাখরীজ (اصحاب التحريج)
৫.আসহাবুত তারজীহ (اصحاب الترجيح)
৬.আসহাবুত তাময়ীয (اصحاب التميز)

ইব্ন হাজার মক্কী (র) 'আল মুহাযযাব' কিতাবে মুজতাহিদদের দুইভাগে বিভক্ত করেছেন।

এক. মুজতাহিদ মুসতাকিল (مجتهد مطلق)
দুই.মুজতাহিদ মুনতাসিব (مجتهد منتسب)

মুজতাহিদ মুসতাকিল এর সংজ্ঞা

"যে সকল মুজতাহিদের মধ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা আছে তাদের মুজতাহিদ মুসতাকিল বলে। ১. ফিকহুন নাফস ২.বিশুদ্ধ মেধা ৩.বিদগ্ধ গবেষণা ৪.বিশুদ্ধ উদ্ভাবন পদ্ধতি ৫.সজাগ ও সচেতনতা ৬. শরীয়তের দলীল এর শর্তাবলি সম্পর্কে ব্যাপক অবগতি ৭. দলীল উপস্থাপন ও তা যথাস্থানে প্রয়োগের ব্যাপারে বিচক্ষণতা ৮.ফিকহ এর মৌলিক মাসাইল এর উপর পূর্ণ দক্ষতা"।

মুজতাহিদ মুনতাসিব এর সংজ্ঞা:-

"যে মুজতাহিদ এর মধ্যে মুজতাহিদ মুতলাকের উপর্যুক্ত শর্তাবলি বিদ্যমান। তবে তিনি মূল নস এর মধ্যে ইজতিহাদ করে না, বরং কোনো মুজতাহিদের প্রণীত মূলনীতির আলোকে শাখা মাসআলায় ইজতিহাদ করেন।[২০৫]

ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) মুজতাহিদ মুনতাসিব এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,[২০৬]

وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد كالصنف السابق، لكن لم يضع لنفسه قواعد ينفرد بها بل التزم طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد فهو مجتهد مطلق منتسب،

"পূর্বোল্লিখিত প্রথম প্রকারের (মুজতাহিদ মুসতাকিল) জন্য আরোপিত সকল প্রকার শর্ত যার মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যিনি নিজের জন্য মাসআলা উদ্ভাবনের স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়ন কনেননি। বরং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাযহাবসমূহের ইমামদের মধ্যে কারো অনুসরণকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন"।

২.১.২. মুজতাহিদের আবশ্যকতা

শরীয়তের বিধি-বিধান উদ্ভাবনে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মুজতাহিদ এর সর্বকালে ও সর্বযুগে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক? নাকি এমন কোনো সময় অতিবাহিত হওয়া সম্ভব, যখন কোনো মুজতাহিদ এর অনুপস্থিতি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। বিষয়টি উসূলে ফিক্হ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উসূলে

---

[২০৫] আরিফ ইযযুদ্দীন হাসুনাহ, *মাদা ওয়াজূদিল মুজতাহিদিল মুতলাক ওয়াল মুনতাসাব*, (বৈরুত: ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৩০।

[২০৬] ড. যুহাইলী, ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তাফা, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল ফিকরিল মুআসির, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫২।

ফিক্হ এর একদল মনীষীর অভিমত হলো, শরীয়তের বিধি-বিধান উদ্ভাবনে যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ থেকে কোনো কাল ও কোনো যুগ শুন্য হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল এ মতের প্রবক্তা। তিনি এ মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন,

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَخْلَى زَمَانًا من قائم بحجة، زال التَّكْلِيفُ إِذِ التَّكْلِيفُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْحُجَّةِ الظَّاهِرَةِ وَإِذَا زَالَ التَّكْلِيفُ بَطَلَتِ الشَّرِيعَةُ،

"আল্লাহ তায়ালার বিধান কায়েমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে কোনো যুগ শুন্য হওয়ার অর্থ হলো শরীয়ত অকার্যকর হওয়া। মূলত সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমেই শরীয়ত কার্যকর থাকে। কোনো সময়ে শরীয়তের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনকারী ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি শরীয়ত অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।[২০৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ،

"আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সদা-সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকবে"।[২০৮]

খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) বলেন,

لَن تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ لِكَيْ لَا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ أُولَئِكَ الْأَقَلُّونَ عَدَدًا الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا بِهِمْ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ حُجَجِهِ حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى نُظَرَائِهِمْ،

"পৃথিবীতে কোনো সময় মুজতাহিদশুন্য হওয়া অসম্ভব। এতে আল্লাহর কুদরতী প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ অকার্যকর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পৃথিবীতে তারা সংখ্যালঘু হলেও আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। মুজতাহিদগণ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রমাণসমূহ সদৃশ বিষয়সমূহের উপর প্রয়োগ করে তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ করেন।[২০৯]

পক্ষান্তরে এক দল উসূলবিদ এর মতে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কোনো সময় অতিবাহিত হওয়া সম্ভব, যে সময়ে কোনো মুজতাহিদ পাওয়া যাবে না। এ মতাবলম্বিদের দলীল হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ হলো ফরজে কেফায়া। এ অনুপাতে শরীয়তের আমল ও প্রচার-প্রসার অব্যাহত থাকলে মুজতাহিদের অনুপস্থিতি দীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো সমস্যা হতে পারে না। শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব এর লেখক বিষয়টি এভাবে ব্যাখা করেন,[২১০]

أَنَّ الِاجْتِهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيَسْتَلْزِمُ انْتِفَاؤُهُ فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ اتِّفَاقَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَاطِلِ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الِاجْتِهَادُ فِي عَصْرٍ تَكُونُ الْأُمَّةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَهُوَ بَاطِلٌ،

ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, উসূলে ফিক্হ এর ইমামদের উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজতাহিদ মুতলাক না হলে ফরজে কেফায়া আদায় হয় না।

ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.) বলেন, দীনের আলিমদের জন্য ইজতিহাদ এর হুকুম তিন প্রকার। ১.ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া ৩. মুস্তাহাব।

---

[২০৭] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ, *ইরশাদুল ফুহূল*, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৭।

[২০৮] তাবরানী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ুব, *আল মুজামুল কাবীর*, (কায়রোঃ মাকতাবাহ ইব্ন তায়মিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২০, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং- ৯৬১।

আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩৩, পৃ. ১২৬।

[২০৯] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী, *আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, সম্পাদনাঃ আবু আবদির রহমান আদিল, (সৌদি আরবঃ দারু ইব্নিল জাওযী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ১৮৩।

[২১০] আবুস সানা শামসুদ্দীন, মাহমুদ ইব্ন আবদুর রহমান, *বায়ানুল মুখতাসার শারহু মুখতাসারি ইব্নিল হাজিব*, (সৌদি আরবঃ দারুল মাদানী, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬৪।

ফরজে আইন দুই প্রকার।
ক. সমস্যা উদ্ভব হবার পর নিজের জন্য ইজতিহাদ করা।
খ. সমস্যা উদ্ভব হবার পর সর্বসাধারণের জন্য বিধান উদ্ভাবন করা।
ফরজে কেফায়া দুই প্রকার।
ক. কারো সামনে শরীয়া বিষয়ক কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার পর যদি কোনো আলিমের নিকট তার সমাধান তলব করে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টির সমাধান দেয়া সকল আলিমের উপর ফরজ হয়ে যায়। যার নিকট সমাধান চাওয়া হয় তার উপর বিশেষভাবে দায়িত্ব অর্পিত হয়। যে কোনো আলিম তার সমাধানে উদ্যোগী হলে সকলেই দায়মুক্ত থাকবে। অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে।
খ. কোনো বিষয়ের সমাধানে দুই জন কাযীর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হলে উভয়ের উপর ইজতিহাদ করার ফরজ। উভয়ের মধ্যে যে কেউ সমাধান উদ্ভাবন করলে দুইজনের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।
মুস্তাহাব ইজতিহাদ দুই প্রকার।
ক. সমস্যা উদ্ভব হবার পূর্বে তার সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।
খ. সমস্যা উদ্ভব হবার পূর্বে তার সমাধান তালাশ করা।[২১১]

২.১.৩. মুজতাহিদের বিশুদ্ধতা ও ভ্রান্তি

সহীহ বুখারী শরিফে বর্ণিত আছে, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر "মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুটি সওয়াব লাভ করবে। আর ভুল ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব লাভ করবে"। উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো ইজতিহাদকৃত বিষয়ে মুজতাহিদের সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও ভ্রান্তির শিকার হওয়া প্রসঙ্গ। উসূলে ফিক্‌হ এর ইমামগণ এ মর্মে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইজতিহাদকৃত প্রত্যেক মাসআলার বিনিময়ে মুজতাহিদ কি সওয়াবের অধিকারী হয়, নাকি বিশুদ্ধতা এক পাক্ষিক হবার কারণে মুজতাহিদ ভ্রান্তির শিকার হয় এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়?
ইমাম নববী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, মুজতাহিদের জন্য হাদীসে বর্ণিত দুটি পূণ্য লাভ করার ফজিলত মূল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নয়। বরং শাখাগত মাসআলায়। মূলত একাধিক বিষয়ে সত্য একটি হবার কারণে সঠিক ইজতিহাদ করার কারণেই মুজতাহিদ সওয়াব লাভ করবে। যে মুজতাহিদ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সে এই ফজিলতের অধিকারী হবে না। ইমাম নববী বলেন,[২১২]

قال النووي فأما أصول التوحيد فالمصيبُ فيها واحدٌ بإجماع من يُعتدّ به،

ইমাম শাওকানী ইজতিহাদকৃত মাসআলাকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।
ক. বুদ্ধিসঞ্জাত মাসআলা (المسائل الْعَقْلِيةَ)
খ. শরয়ী মাসআলা (المسائل الشرعية)

---

[২১১] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *ইরশাদুল ফুহুল*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৭।
[২১২] নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইব্‌ন শরফ, *আল মিনহাজ শারহু সহীহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), খ. ১২, পৃ.১৪।

ইমাম শাওকানী যুক্তি ও বিবেকসম্মত বিষয়ের (الْعَقْلِيَّاتُ) ইজতিহাদকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করেছেন।

১. যুক্তি ও বিবেক দ্বারা যে সকল মাসআলা ইজতিহাদ করা হয়, তাতে ভুল-ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ ও তার রাসূলের পরিচয় লাভে অন্তরায় না হলে সত্য এক পাক্ষিক হবার কারণে মুজতাহিদ সওয়াবের অধিকারী হবে। এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তির কারণে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে কাফের বলে গণ্য হবে। যেমন সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ, আল্লাহর একত্ববাদ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণ করার জন্য ইজতিহাদ করা।

২. যুক্তি ও বিবেক দ্বারা যে সকল মাসআলা ইজতিহাদ করা হয়, তাতে সঠিক ইজতিহাদের কারণে মুজতাহিদ সওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে কাফের বলে গণ্য হবে। ইমাম শাফিঈ (র) এ মতের প্রবক্তা। যেমন পরকালে আল্লাহর দিদার লাভ করা, আল কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি ও গুণ প্রসঙ্গ, তাওহিদে বিশ্বাসী সকল মুসলমানের জাহান্নাম থেকে মুক্তি। ইমাম শাফিঈ (র) এর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে কাফের অর্থকে রূপকভাবে নেয়ামত অস্বীকারকারীর অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

৩. যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে দীনের অর্ন্তভুক্ত নয়। যেমন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বাক্য গঠন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শরীর গঠন বিষয়ে গবেষণা করা। এ সকল ক্ষেত্রে সঠিক ইজতিহাদের কারণে মুজতাহিদ যেভাবে সওয়াবের অধিকারী হবে না। তেমনিভাবে ভ্রান্তির কারণে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে অপরাধীও সাব্যস্ত হবে না। তবে এসকল বিষয় দীনের মৌলিক শিক্ষার ভূমিকা হিসেব অথবা জনস্বার্থে উপকারী শাস্ত্র হিসেবে চর্চ করা হলে অবশ্যই সওয়াবের অধিকারী হবে। মূলত সুচিন্তা ও সৎ নিয়তের কারণেই গবেষক তার বিনিময় লাভ করবে।

ইমাম শাওকানী বিভিন্ন মনীষীর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي "الْمُخْتَصَرِ" أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ، ثُمَّ حَكَى عَنِ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ، وحُكِي أَيْضًا عَنِ الْجَاحِظِ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، بِخِلَافِ الْمُعَانِدِ،

"ইবনুল হাজিব 'আল মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন, যুক্তি ও বিবেক দ্বারা যে সকল মাসআলা ইজতিহাদ করা হয়, তাতে সত্য হয় একপাক্ষিক। ইমাম আম্বরী (র) থেকেও তিনি একই অভিমত বর্ণনা করেন। ইমাম জাহিজ (১৫৯-২৫৫ হি.) এর অভিমত বর্ণনাপূর্বক তিনি বলেন, মুজতাহিদ কাফের না হলে তার কোনো পাপ নেই"।[২১৩]

শরীয়তের মাসআলাসমূহে (المسائل الشرعية) ইজতিহাদ দুই প্রকার।

ক. যে সকল মাসআলা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করা যায়, তাতে পরস্পরবিরোধী উক্তির কারণে সকল মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে সত্য এক পাক্ষিক হবার কারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেই মুজতাহিদ সওয়াবের অধিকারী হয়। এখানে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মুজতাহিদ ক্ষমাযোগ্য হয় না।

খ. যে সকল মাসআলা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাতে পরস্পরবিরোধী উক্তির কারণে সকল মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় । সুতরাং ভুল-শুদ্ধ যাই হোক, প্রত্যেক মুজতাহিদই হাদীসে বর্ণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।

এ মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলীল পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،

[২১৩] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *ইরশাদুল ফুহুল*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.),খ. ২, পৃ. ২২৭।

"এবং সুলায়মান ও দাউদ (আ) এর কথা স্মরণ কর। যখন তারা উভয়ে একটি শস্য ক্ষেত্রের বিচার মীমাংসা করতেছিলেন। তাতে রাতের বেলায় কোনো সম্প্রদায়ের মেষ ঢুকে পড়েছিল। আমি তাদের মীমাংসাটি প্রত্যক্ষ করতেছিলাস। আমি সুলায়মানকে (আ) ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছি এবং উভয়কে দান করেছি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।[২১৪]

আয়াত দুটিতে আল্লাহ তায়ালা সুলায়মান (আ.) এর ইজতিহাদকৃত বিচারের বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করে তার প্রশংসা করেছেন। পক্ষান্তরে ইজতিহাদে ভুল করার কারণে দাউদ (আ.) এর নিন্দা করেননি।

তদুপরি ইজতিহাদের ফজিলত সংক্রান্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজতাহিদকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং ভুল ইজতিহাদ করার কারণেও একটি সওয়াবের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত,

خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد : أصبت السنة فأجزأتك صلاتك وقال للآخر : لك الأجر مرتين،

"দুইজন লোক সফরে বের হলো। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলো। কিন্তু তাদের কারো নিকট অযুর পানি ছিল না। তারা উভয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিল। পরবর্তীতে উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যেই পানি পাওয়া গেলে একজন অযু-নামায দুটিই পুনরায় আদায় করলো। অন্যজন একটিও পুন আদায় করলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করার পর তারা উভয়ে বিষয়টি তার নিকট উত্থাপন করলো। যে অযু-নামায কোনোটিই পুন আদায় করেনি তার উদ্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সঠিক সুন্নাহ পালন করেছো। সুতরাং তোমার নামায আদায় হয়ে গেছে। আর যে অযু-নামায পুন আদায় করেছে তাকে উদ্দেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি দুটি সওয়াব লাভ করেছো"।[২১৫]

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন দুটি আমলের কারণে প্রথম জনকে বিশুদ্ধ সুন্নাতের আমলকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর দ্বিতীয় জনের জন্য দুটি সওয়াব লাভের সুসংবাদ দান করেন। যাতে প্রমাণিত হয়, সুন্নাতের উপর আমল না করেও মুজতাহিদ সওয়াবের অধিকারী হয়।

এ মতের অনুসারীগণ নিম্নের আয়াত দুটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُون،

"সুতরাং সত্য ত্যাগ করার পর গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকতে পারে। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরছ?"[২১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا،

"তবে কি তারা আল কুরআনে গবেষণা করে না। যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তাতে অনেক অসংগতি পরিলক্ষিত হতো"।[২১৭]

আয়াত দুটি দ্বারা প্রতিয়মান হয়, বিভিন্ন উক্তির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সত্য একটিই। সত্যের মধ্যে ভিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। মুজতাহিদগণের ভুল-ক্রটি সংঘটিত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে

---

[২১৪] আল কুরআন, ২১:৭৮,৭৯।

[২১৫] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), খ, পৃ, ৯৩, হাদীস নং- ৩৩৮।

[২১৬] আল কুরআন, ১০: ৩২।

[২১৭] আল কুরআন, ৪: ৮২।

কখনো তা হতে পারে না। নিম্নের হাদীস দ্বারাও এ মতের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

القضاةُ ثلاثة واحدٌ في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النار،

"বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার জান্নাতে যাবে। অবশিষ্ট দুই প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে ব্যক্তি সত্যকে জেনে-শুনে সে মতে বিচার ফায়সালা করবে, সে জান্নাতে যাবে। যে ব্যক্তি সত্য অবগত হওয়া সত্ত্বেও অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় না বুঝে বিচার মীমাংসা করবে সেও জাহান্নামে যাবে।[২১৮]

ইমাম শাওকানী এই হাদীসের আলোকে বলেন, সত্য একটি না হলে বিচারকদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা অর্থহীন হতো। অন্য একটি হাদীস দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধের সেনাপতির উদ্দেশে বলেন, কোনো দুর্গের অধিপতি তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান মতে অবতরণের নির্দেশ দিলে তোমরা আল্লাহর বিধান মতে অবতরণ করবে না। কেননা আল্লাহর সঠিক বিধান তোমাদের হয়তো জানা থাকবে না" ।

'ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুটি সওয়াব লাভ করবে। আর ভুল ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব লাভ করবে'। হাদীসটিতেও মুজতাহিদের ভুল-শুদ্ধ দুটি প্রকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে একমত হবার পর উসূলবিদগণ এই মর্মে ইখতিলাফ করেছেন যে, মুজতাহিদ মাত্রই কি সওয়াবের অধিকারী হবে নাকি কেবলমাত্র সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তিই সওয়াব লাভ করবে। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক বলেন, দুই জনের মধ্যে অনির্দিষ্ট একজনই সওয়াবের অধিকারী হবেন।

ইমাম আবু ইয়ূসুফসহ (র) আর একদল উসূলবিদ বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদই সওয়াব লাভ করবে। যদিও সত্য এক পাক্ষিক হয়। এ মত অবলম্বনকারীদের প্রমাণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের মতামতকে বিশুদ্ধ মনে করতেন। যদিও তারা ভিন্নধর্মী মত প্রকাশ করতেন। তদুপরি ভুলের উপর তাদের একমত হওয়া জায়েয হতে পারে না।

খতীব বাগদাদী বলেন, বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সত্য একটি হলেও মুজতাহিদ ভুল করলে একটি সওয়াব লাভ করবে। যদিও সঠিক ইজতিহাদের কারণে মুজতাহিদ দুটি সওয়াব লাভ করবে। খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে (র) সাহাবায়ে কেরাম এর ইখতিলাফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তারা কি প্রত্যেকে সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন, উত্তরে তিনি বলেন, সত্য একটিই। তবে তাদের ভুল-ত্রুটি আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন। খতীব বাগদাদী এই বিষয়ে লাইস ইব্‌ন সাদ (র) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,[২১৯]

الحق في أمرين مختلفين لا يكون إلا واحد،

"প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না"।

এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী এর যুক্তি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত ফকীহ-মুজতাহিদগণের পারস্পরিক মতবিরোধ চলে আসছে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। যদি তারা প্রত্যেকে সঠিক

---

[২১৮] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (কায়রো: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং- ৩৫৩৭।

[২১৯] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৮৩।

মতের উপর থাকতেন এ মতবিরোধ অর্থহীন হতো। তাদের মধ্যে কেউ প্রতিপক্ষকে এ যাবত স্বীকার করেননি।

২.১.৪. মুজতাহিদ ও ইজতিহাদ সংক্রান্ত পরিভাষা

ফিক্‌হ ও উসুলে ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইজতিহাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন ফকীহ, মুজতাহিদ, মুফতী ইত্যাদি। এ সকল শব্দের সূক্ষ্ম পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যববহৃত দুটি প্রধান পরিভাষা হলো মুজতাহিদ ও ফকীহ। এ দুটি পরিভাষা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও অনেক উসূলবিদ একই অর্থে অঙ্গীভূত করেছেন। উসূলবিদ ইব্‌ন আমিরুল হাজ (৮২৫-৮৭৯ হি.) এর মতে, ফকীহকে মুজতাহিদ থেকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। উসূলবিদগণ মুজতাহিদের জন্য যে সকল শর্ত নির্ধারণ করেছেন, তার সমাহার না থাকা সত্ত্বেও যিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক মাসআলার চর্চা করে এমন আলিমকে ফকীহ বলা হয়। যদিও তার জন্য ফতোয়া প্রদান সমীচীন নয়। তিনি বলেন, মূলত পরিপূর্ণ মুফতীকে মুজতাহিদ বলে। কেননা মুফতী হওয়ার জন্য এমন ফকীহ হওয়া বিধেয়, যিনি পূর্ণাঙ্গ ফকীহ হবার পাশাপাশি মুজতাহিদের মর্যাদায়ও উপনীত হন। তবে যুগের চাহিদার কারণে মুফতীগণই ফতোয়া দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যিনি পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামদের বর্ণিত মতামতসমূহ বর্ণনা করে ফতোয়া প্রদান করবেন। ইব্‌ন আমিরুল হাজ বলেন,[২২০]

وَالظَّاهِرُ كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ: أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَقِيهٌ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ وَلَا مُجْتَهِدٌ غَيْرُ فَقِيهٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ: بَالِغٌ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَأْخَذِهَا،

ওমান সরকারের ফিক্‌হবিষয়ক সরকারী সংস্থা 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' মুফতী পরিভাষাকে নিম্নোক্ত ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছে।

هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة،

"শরীয়তের বিধি-বিধান, ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও উদ্ভূত ঘটনাবলি সম্পর্কে যিনি সম্যক অবগত হবার পাশাপাশি শরীয়তের মূল উৎস থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করে তা সমসাময়িক ও অত্যাধুনিক সমস্যাবলির সমাধানে বাস্তব প্রয়োগে সক্ষম আলিমকে মুফতী বলে"।[২২১]

ড. আলী জুমুআহ (জন্ম ১৯৫২ খ্রি.) ফকীহ, মুফতী ও মুজতাহিদ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন, "ফকীহ শরীয়তের বিস্তৃত প্রমাণাদি থেকে বিধি-বিধান বের করেন এবং এগুলো শরীয়তের সামগ্রিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োগ করেন। পক্ষান্তরে মুফতী সমাজের বাস্তবতা অধ্যয়নপূর্বক ফিক্‌হ থেকে আল্লাহর হুকুম উদঘাটন করেন। যাতে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে শরীয়তের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।[২২২]

---

[২২০] ইব্‌ন আমীরুল হাজ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আত তাকরীর ওয়াত তাহরীর*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৯১।

[২২১] *মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী*, ওমান, ১৫৩ নং সিদ্ধান্ত, ২৮ জুমাদাল উলা, ২০০৬ খ্রি.।

[২২২] ড. আলী জুমুআ, *আল ফাতওয়া ফী আলামিন মাফতুহিন*, তাগাইয়ুরুল ফতোয়া বি-তাগাইয়ুরি মুজিবাতিহাল আরবা প্রসঙ্গ, খ. ১, পৃ. ৫৫৮।

আর মুজতাহিদ হলেন, যিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের অধিকাংশ মাসায়িল তার মূলনীতি ও দলীল-প্রমাণসহ আয়ত্ত করেছেন। তদুপরি তার মধ্যে ইজতিহাদের পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতার সমাহার রয়েছে। যাতে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে দলীল-প্রমাণসহ শরীয়তের বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে পারেন। উপর্যুক্ত যোগ্যতাসমূহ অবশিষ্ট শর্তাবলিসহ অধিকহারে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তিনি যোগ্য মুজতাহিদ বলে বিবেচিত হবেন। তিনি ফতোয়া ও বিচার মীমাংসার অধিকার লাভ করবেন। এ সকল যোগ্যতার অবর্তমানে কোনো ব্যক্তি মুজতাহিদ হতে পারে না।[২২৩]

ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমামগণ উপর্যুক্ত পরিভাষাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ফকীহ

يستنبط احكام الله من الادلة التفصيلية وتلك الاحكام تحقق مقاصد الشريعة الكلية،

“ইসলামী শরীয়তের বিস্তৃত দলীল -প্রমাণ থেকে যিনি এমন বিধি-বিধান ইসতেম্বাত করেন, যা শরীয়তের সামগ্রিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক, তাকে ফকীহ বলে।

ফতোয়া

ইজতিহাদে ব্যবহৃত আর একটি পরিভাষা হলো ফতোয়া। অভিধানিক অর্থে যে কোনো সংবাদের বিশ্লেষণকে الفتوى ফতোয়া বলে। والفتوى والفتيا শব্দ দুটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে فتاوَى।[২২৪]

“শরীয়তের দৃষ্টিকোণে প্রশ্নকৃত কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধানের আলোকে সুস্পষ্টভাবে সমাধান দেয়াকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ফতোয়া বলে। যেখানে প্রশ্নকর্তার উত্তরদানে মুফতীর বাধ্যবাধকতা থাকে না”।[২২৫]

দারুল ইফতা আল মিসরীয়্যাহ নিম্নোক্ত ভাষায় ফতোয়াকে সংজ্ঞায়িত করেছে।

আভিধানিক অর্থ,

الإفتاء في اللغة العربية: أفتاه في الأمر: أبان له، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في عدد من الآيات.(سورة النساء: 127، 176. وسورة يوسف: 43، وسورة الصافات: 11)

পারিভাষিক অর্থ,

أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول،

“ইসলামী শরীয়তের দলীল সমগ্রের আলোকে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করাকে ফতোয়া বলে”।[২২৬]

মুফতী

يدرس الواقع وما يكتنفه من احداث ثم يلتفت الي الفقه ليأخذ منه حكم الله في مثل هذه الواقعة بما يتحقق مقا صد الشريعة،

---

[২২৩] ড. আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, *আল ফাতওয়া ফিল মুয়াসসাসাতিল মুখতাস্‌সাহ*, আল ইফতা ফী আলামিন মাফতুহিন প্রসঙ্গ, খ. ১১ পৃ. ২।

[২২৪] আর রাযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন আবদুল কাদির, *মুখতারুস সিহাস*, সম্পাদনাঃ মাহমুদ খাতির, (বৈরুতঃ মাকতাবাহ লোবনান, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৬।

[২২৫] সাঈদ আবু হাবীবী, *আল কামূসুল ফিকহী*, (দারুল ফিক্‌র, দামেস্ক, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৮১।

[২২৬] শায়খ জাদুল্লাহ আলী জাদুল হক, *বুহূস ওয়া ফাতওয়া ইসলামিয়্যাহ ফী কাদায়া মুআসারাহ*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৬ হি,/২০০৬ খ্রি.), ফতোয়া নং- ৩১৬/১৯৮১।

"শরীয়তের সামগ্রিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঘটনা বিশ্লেষণপূর্বক শরীয়তের বিধান অন্বেষণে যিনি সার্বিক প্রচেষ্টা চালান তাকে মুফতী বলে"।

কাযী

هو الذي يقيم الحد وهو الذي ينفذ أمر المفتي،

"দুই প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণ বিবেচনা করে যিনি আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নপূর্বক মুফতীর সিদ্ধান্তের আলোকে দণ্ড কায়েম করেন তাকে কাযী বলে"।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপর্যুক্ত তিনটি পরিভাষা বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি মাদক সেবন করল। এ ক্ষেত্রে ফকীহ এর ভূমিকা হবে, তিনি শরীয়তের দলীল-প্রমাণের আলোকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলবেন যে, মদপান একটি হারাম ও গর্হিত কাজ। তার উপর নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। মুফতীর ভূমিকা হলো, তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করবেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে ফকীহ এর সিদ্ধান্তের বিপরীত মতামত প্রকাশ করবেন। অনেক সময় মুফতীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদক সেবনকারীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং ফকীহ কর্তৃক আরোপিত দণ্ড মওকূফ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাযী মুফতীর মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন এবং দণ্ড কায়েম করবেন।

পরিচ্ছেদ- ২
মুজতাহিদের যোগ্যতা ও শর্তাবলি

ফকীহ-মুজতাহিদগণ ইসলামের এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ইলমে নববীর বাহক ও ওয়ারিস হবার সুবাদে এবং উম্মতের নিকট তার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালনের কারণে তারা নবী-রাসূলদের প্রতিনিধির স্থলে অভিষিক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم ،

"আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে কাউকে দিনার-দিরহামের উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তারা একমাত্র ইলম এর উত্তরাধিকারীই রেখে গেছেন"।[২২৭]

মূলত ইজতিহাদ হলো দীন-দুনিয়ার এমন একটি মর্যাবান আমল, যাতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি আল্লাহর ঐশী বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিয়োজিত। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণ শরীয়তের মূলকেন্দ্র থেকে জ্ঞান আহরণ ও মূল উৎসের ভাষাজ্ঞান ও মাকাসিদ আশ শরীয়া তথা শরীয়তের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকার কারণে ইজতিহাদের বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন এর উর্ধ্বে ছিলেন। পরবর্তী যুগে এ সকল কারণ হ্রাস পাবার কারণে এমন কতিপয় শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ প্রণীত হয়, যাতে ইজতিহাদের কাঠামো একটি সুশৃংখল নীতি ও মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। একজন মুজতাহিদের উপর দীনের অনেক বিষয় নির্ভরশীল। সঠিক ইজতিহাদে সফলতা অর্জনের জন্য মুজতাহিদের মধ্যে বহুমুখী গুণের সমাহার প্রয়োজন। গুণান্বিত হতে হয় বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে। এ গুণ বিভিন্ন প্রকার। ব্যক্তিগত ও জ্ঞানগত।

[২২৭] কুরতুবী, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল আয যুহাইরী, (সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০।

ইমাম ইবনুস সালাহ (র) মুজতাহিদের সামগ্রিক যোগ্যতা প্রসঙ্গে বলেন,

...أن يكون مُكلفاً مسلماً ثقةً مأمونا منزهاً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا وهذه شروط المجتهد بوجه عام وإذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها،

“মুজতাহিদকে প্রাপ্তবয়স্ক-মুসলিম হবার পাশাপাশি পাপাচারমুক্ত, মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, একজন স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। মুজতাহিদ উপর্যুক্ত গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ না হলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। মুজতাহিদের জন্য ফিকহী প্রতিভাসম্পন্ন, সুষ্ঠু মেধা ও বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সঠিক দলীল-প্রমাণের ব্যবহার ও বিশুদ্ধ মাসআলা উদ্ভাবনের যোগ্যতা তার জন্য অন্যতম শর্ত। এ সকল শর্ত হলো একজন সাধারণ মুজতাহিদের জন্য। মৌলিক মুজতাহিদের জন্য উপর্যুক্ত শর্তাবলির সঙ্গে আরো কিছু শর্ত যোগ করতে হবে। যেমন- কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং ফিক্‌হসহ অন্যান্য শাস্ত্রে এতদসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনায় পারঙ্গম হওয়া।[২২৮]

যার মধ্যে উপর্যুক্ত মৌলিক ও মানবিক যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান তার জন্যই কেবলমাত্র ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে অযোগ্য ব্যক্তির ইজতিহাদ করা খেয়ানতের শামিল। একজন মুজতাহিদকে এমন কিছু শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া দরকার, যার অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে বাধার সৃষ্টি করে। উসূলে ফিক্‌হ এর ইমামগণ মুজতাহিদের মধ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বলে মত প্রদান করেছেন।

মুজতাহিদের মৌলিক গুণাবলির মধ্যে প্রধান শর্ত মুসলমান হওয়া। একজন অমুসলিম ইসলামের বৈষয়িক শাস্ত্রজ্ঞানে যতই পণ্ডিত হোক তার ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে ইমাম আমীদী এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মুজতাহিদের মৌলিক শর্তাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

أن يعلم وجود الرب تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقه من الكمالات وأنه واجب الوجود لذاته حي عالم قادر مريد متكلم حتى يتصور منه التكليف وأن يكون مصدقا بالرسول وما جاء به من الشرع الْمَنْقُولِ بِمَا ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ لِيَكُونَ فِيمَا يُسْنِدُهُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَحْكَامِ مُحَقِّقًا ،

“মুজতাহিদকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে হবে। আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী গুণাবলি ও উপযোগী বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারেও ঈমান থাকতে হবে। তার জন্য এ বিষয়ে ঈমান থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার অস্তিত্ব অনিবার্য। তিনি চিরঞ্জীব, মহাজ্ঞানী ও শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তা করা ও বলার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। যে শক্তিবলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলদের ব্যাপারেও মুজতাহিদকে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত শরীয়ত এর প্রতি ঈমান রাখতে হবে। পাশাপাশি

[২২৮] ইবনুস সালাহ, তাকিউদ্দীন উসমান ইব্‌ন আবদির রহমান, *আদাবুল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি*, সম্পাদনা: মুয়াফ্‌ফাক আবদুল্লাহ আবদুর কাদের, (মদীনা মুনাওয়ারাা: মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৬।

নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যে সকল মুজিযা ও আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার উপরও ঈমান আনতে হবে।।[২২৯]

প্রত্যেক মুজতাহিদকে ব্যক্তিগত জীবনে আমানতদার, পরহেযগার ও সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া দরকার। খেয়ানতকারী, বদআমল ও বিদআতপন্থিদের ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। এমন ব্যক্তিদের তাকলীদ করা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধও নয়। ইমাম বগবী (র) (১০৪০-১১২২ হি.) এর মতে, যে খাহিশাতের অনুসরণ করে অথবা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না কিংবা বে-পরোয়াভাবে সগিরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তার পক্ষে মুজতাহিদ দাবি করার কোনো অধিকার নেই। [২৩০]

ইমাম শাতিবী (র) (৫৩৮-৫৯০ হি.) অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শর্তসাপেক্ষ বিশুদ্ধ ইজতিহাদের অনুমোদন দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ উসুলবিদ এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ইসলামে একমাত্র মুসলিম ফকীহ-মুজতাহিদগণের কৃত ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য। মূলত শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাসী ও ইসলামী মূল্যবোধ পালনে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইসলামে ইজতিহাদের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহির প্রতি ঈমান আনা এবং যার উপর এই ওহি নাযিল হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া। ওহির উপর যে ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস নেই এবং যার উপর ওহি নাযিল হয়েছে তার উপরও আস্থাহীন, এমন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের আরোপকৃত শর্তের আলোকে কোনো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ইজতিহাদ করা সম্ভব হতে পারে না।

প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেচনাবোধ ও বিবেকসম্পন্ন হওয়া মুজতাহিদের দ্বিতীয় শর্ত। পরিণত বয়স ও পরিপক্ক বোধজ্ঞনসম্পন্ন ব্যক্তিই শরীয়তের নস ও মাকাসিদ তথা শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে। পরিণত বয়সে না পৌঁছার কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ইজতিহাদ শরীয়তে ধর্তব্য নয়। বিবেচনাবোধের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামের বিধি-বিধান পালনেও সে বাধ্য নয়। সুতরাং অবিবেচক ও উম্মাদের ইজতিহাদ ইসলামে ধর্তব্য নয়। বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্কতা হলো ইজতিহাদের মূল ভিত্তি।

মুজতাহিদের জন্য আদালত (العدالة) বা ন্যায়পরায়ণতা হলো তৃতীয় মৌলিক শর্ত। কোনো মুজতাহিদের মধ্যে এ গুণের অভাব হলে তার ফতোয়া গৃহীত হবে না এবং তার প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী আমল করাও জায়েয হবে না। ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত রাখার পাশাপশি তুচ্ছ সগিরা গুনাহ এবং বৈধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দৃষ্টি ও শ্রুতকটু বিষয় থেকেও বিরত রাখে। মুজতাহিদের জন্য ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি জরুরি বৈশিষ্ট্য, যা সগিরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হওয়া দূরের কথা, একবার লিপ্ত হলেও মুজতাহিদের আদালত খর্ব হয়। পৌনঃপুনিক সগিরা গুনাহ এর অবতারণা কাবীরা গুনাহে পরিণত হয়। ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য হবার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ন্যায়পরায়ণতা গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিকে শরীয়তের নস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনে উপযোগী মনে করা হয়। এমন ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য থাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ গুণ ব্যতীত মুজতাহিদ যতই যোগ্যতাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হোক, তার ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। মুজতাহিদের জন্য ন্যায়পরায়নতা গুণের অপরিহার্যতা বিষয়ে ইমাম গাযালী বলেন

ان يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه
أما هو في نفسه فلا فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد

---

[২২৯] আমীদী, আবুল হাসান সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবী আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্‌যাক আফীফী, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.), খ .১, পৃ. ১৬২।

[২৩০] আন নামলা, ড. আবদুল কারীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুহায্‌যাব ফী ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২২২।

"মুজতাহিদকে এমন ন্যায়পরায়ণতা গুণের অধিকারী হতে হবে, যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে। তার ফতোয়ার উপর আস্থাশীল হবার ক্ষেত্রে এটি প্রধান শর্ত। যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অভাব থাকবে, তার ফতোয়া গৃহীত হবার কোনো সুযোগ নেই। ফতোয়া গৃহীত হবার জন্য যদি এ শর্ত আরোপ করা হয়, কোনো ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্যে এ যোগ্যতার অভাব থাকলে ইজতিহাদের সুমহান পরিমণ্ডলে তার গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোটায়। মূলত এটি ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবার জন্যই শর্ত; ইজতিহাদ শুদ্ধ হবার শর্ত নয়"।[২৩১]

কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা ইসতেম্বাতের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় শর্তের ব্যাপারে উসুলবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। আর কতিপয় শর্তে মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে শর্তসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো।

২.২.১. আরবী ভাষাজ্ঞানে দক্ষতা

শরীয়া আইনের প্রধান দুই উৎস তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর মূল ভাষা হলো আরবী। আরবী ভাষাভাষীদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হবার কারণে কুরআন-সুন্নাহর অধিকাংশ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সে ভাষায় রচিত। এ ভাষা স্বকীয় স্বভাব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ঐশী ভাষার মাধ্যম হবার সুবাদে কুরআন-সুন্নাহর সাহিত্যমান খুবই উচ্চাঙ্গের। এ ভাষায় পর্যাপ্ত ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়া ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। যিনি ইজতিহাদ করবেন তার জন্য আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা জরুরি। যিনি শিক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরবী শব্দমালার যথার্থ অর্থ ও মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে সক্ষম, তার জন্য ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে।

ড. শাইখ মুহাম্মদ তাহির ইব্‌ন আশুরা (১২৯৬-১৩৯৩ হি.) আরবী ভাষাশৈলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ইমাম শাফিঈ (র) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه ومستودعا لمراده وأن يكون العرب هم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمها منها كون لسانهم افصح الالسن واسهلها انتشارا واكثرها تحملا للمعاني مع ايجاز لفظه،

"আল্লাহ তায়ালা কুদরতি ভাবপ্রকাশ ও ওহি নাযিলের মাধ্যম হিসেবে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেন। তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত ও প্রজ্ঞাময় ভাবধারার প্রথম ধারক ছিল আরবী ভাষাভাষী মহা-মনীষীগণ। এটির প্রধান কারণ হলো, আরবী হলো অতিশয় প্রাঞ্জল ও ভাববিস্তারে সরল ও সহায়ক একটি সমৃদ্ধ ভাষা। তদুপরি এটি সংক্ষিপ্ত শব্দাবলির খোলসে অধিক অর্থব্যঞ্জক"।[২৩২]

কুরআন-সুন্নাহর নসসমূহের মর্মার্থ নির্ধারণে আরবী শব্দের অর্থ-নির্দেশ, শব্দপ্রকরণ ও তার বিধি-বিধানসমূহের ব্যাপারে সামগ্রিক ধারণার অভাব ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। কুরআন-সুন্নাহ'য় ব্যবহৃত ظاهرخفي،مجمل مبين، حقيقة مجاز، امر نهي،عام خاص،مطلق مقيد، ইত্যাদি পারিভাষিক

---

[২৩১] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪২।

[২৩২] ইব্‌ন আশূরা, ড. শাইখ মুহাম্মদ তাহের, *আত তাহরীর ওয়াত তানবীর*, (তিউনিস: আদ দারুত তিউনিসিয়্যা, ১৯৮৪ খ্রি.). খ. ১, পৃ. ৩৩।

শব্দাবলির শাস্ত্রগত জ্ঞান না থাকলে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে ভ্রান্তির সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রগত ব্যুৎপত্তি না থাকলেও ন্যূনতম আরবী ভাষারীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সদৃশ অন্যান্য বিধি-বিধান ইসতেম্বাতের জন্য আরবী ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্রসমূহের আত্মীকরণের বিকল্প নেই। আরবী ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত নাহু, সরফ, বালাগত, মাআনি ও বায়ান শাস্ত্রের পাশাপাশি আরবী ভাষাশৈলি সম্পর্কেও পূর্ণ অবগতি থাকা দরকার। এ বিষয়ে তাকিউদ্দীন আস সুবকী (র) (৬৮৩-৭৫৬ হি.) বলেন,

يكفي في المجتهد بالتوسط في علوم العربية من لغة واعراب وتصريف واعراب ومعان وبيان،

"মুজতাহিদের জন্য আরবী ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ যথা لغة واعراب وتصريف ومعاني وبيان এর মধ্যস্থতা গ্রহণের অনুমতি রয়েছে"।[২৩৩]

আরবী ভাষাতত্ত্বের পাশাপাশি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যকীয়। ইমাম যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) ইজতিহাদরে জন্য আরবী ব্যাকরণ শস্ত্রের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে বলেন,

أنَّ الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبني على علم الإعراب فمن يريد استنباط الأحكام وفهم القرآن أن يكون عارفاً بالنحو بصيراً بأساليب اللغة،

"উসূলে ফিক্হ এর অধিকাংশ অধ্যায় এবং তার বিধিবিধানসমূহ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর। সুতরাং যে মাসআলা উদ্ভাবন ও কুরআন বুঝতে চায়, সে যেন নাহু ও আরবী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে"।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সিয়ুতী (র) এর (৮৪৯-৯১১ হি.) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

اعلم أنَّ معرفة اللُّغة والنحو والتصريف فرض كفاية لأنَّ معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ومعرفة الأحكام بدون أدلتها يستحيل والأدلة راجعة إلى الكتاب والسُّنَّة وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم فإذاً توقفت الأحكام الشرعية على الأدلة ومعرفة الأدلة ومما يستوقف عليه تتوقف على معرفة اللُّغة والنحو الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف واجب إذاً معرفة اللُّغة والنحو والتصريف واجب،

"আরবী ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও শব্দ রূপান্তর সম্পর্কীয় শাস্ত্রজ্ঞান মুসলমানদের জন্য ফরজে কেফায়া। শরীয়া বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হবার বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। দলীল-প্রমাণহীন শরীয়াজ্ঞান অগ্রহণযোগ্য। শরীয়তের প্রধান দুই উৎসমূল কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষায় হবার কারণে নাহু-সরফ ইত্যাদি শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনও মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। দীনের যে সকল বিষয় অন্য শাস্ত্র জানার উপ নির্ভরশীল, প্রয়োজন অনুপাতে তা শিক্ষা করাও মুসলমানের জন্য ওয়াজিব"।[২৩৪]

"ইজতিহাদ ও ফিক্হ শাস্ত্রে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ইয়াকুত হামাবী (৫৭৪-৬২৬ হি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আরবী ব্যাকরণবিদ ইমাম কাসায়ী ও আব্বাসী খেলাফতের প্রধান বিচারপতি, ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমাম আবু ইয়ূসুফ একদা খলীফা হারুনুর রশিদ এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। জ্ঞাতব্য যে, খলীফা ছিলেন আরবী ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। ইমাম কাসায়ী এর লক্ষ্য ছিল

---

[২৩৩] সিয়ূতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন আবি বকর, *তাকরীরুল ইসতিনাদ ফী তাফসীরিল ইজতিহাদ*, সম্পাদনা: ফুয়াদ আবদুল মুনয়িম, (ইসকান্দরিয়্যাহ: দারুদ দাওয়া, ১৪০৩ হি,), খ. ১, পৃ.৩৮।

[২৩৪] কামালুদ্দীন, *ইলমুন নাহবি ওয়া আহাম্মিয়াতুহূ ফী ইসতিম্বাতিল আহকামিল ফিকহীয়্যাহ*, (স্থান ও তারিখবিহীন), পৃ. ৪১।

কাযী আবু ইয়ূসুফ (র) এর নিকট নাহু শাস্ত্রের মাহাত্ম উপস্থাপন করা। তিনি কাযী আবু ইয়ূসুফ এর নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন,
এক ব্যক্তি বলল, (সম্বন্ধবাচক বাক্য দ্বারা)
أنا قاتِلُ غلامِك (আমি তোমার কৃতদাসের হত্যাকারী)
দ্বিতীয়জন বলল, (غلام শব্দটিকে কর্মবাচ্য ব্যবহার করে)
أنا قاتلٌ غلامك (আমি তোমার কৃতদাসকে হত্যা করব)
অন্যায়ভাবে মানব হত্যার অপরাধে আপনি কাকে গ্রেফতার করবেন?
ইমাম আবু ইয়ূসুফ উত্তর দিলেন, আমি উভয়কেই গ্রেফতার করব।
খলীফা হারুনুর রশিদ ইমাম আবু ইয়ূসুফ (র) এর উদ্দেশে বললেন, আপনার কথাটি ভুল। এতে তিনি লজ্জিত হলেন। খলীফা তার কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি (সম্বন্ধবাচক বাক্য দ্বারা) أنا غلامِك قاتلُ (আমি তোমার কৃতদাসের হত্যাকারী) বলেছে তাকেই গ্রেফতার করতে হবে। কেননা এই বাক্যে অতীত কালে হত্যা সংঘটিত হবার অর্থ বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি أنا قاتلٌ غلامك (আমি তোমার কৃতদাসকে হত্যা করব) বলেছে, তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। কেননা বাক্যটির অর্থ হলো, আমি কৃতদাসটিকে ভবিষ্যতে হত্যা করব। যা এখনো সংঘটিত হয়নি।[২৩৫]

২.২.২. কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন

ইসলামী শরীয়তের প্রধান ও প্রথম উৎস হলো আল কুরআন । এটি القرء ধাতুমূল থেকে যুক্ত করা ও একত্রিকরণ (الجمع والضم) অর্থে ব্যবহৃত। আরবের লোকেরা قرأت الماء في الحوض বলে কূপে পানি জমা করার অর্থ গ্রহণ করে। ما قرأت الناقة جنينًا এর অর্থ হলো, উট গর্ভবতী হয়নি। এ নামে আল কুরআনকে নামকরণের কারণ হলো, আল কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত ও মিলিত আকারে সুবিন্যস্ত রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, القرآن শব্দটি القرء ধাতুমূল থেকে নির্গত কোনো শব্দ নয়। এটি ইনজিল ও যাবুর এর মতো একটি আসমানি কিতাবের নাম।[২৩৬]
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল কুরআনের সংজ্ঞা হলো,
هو كلام الله المنزّل على نبيه محمد المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس،
"কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। যা স্বীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ। যার শব্দ প্রাঞ্জল ও তেলওয়াত করা ইবাদত। এটি তাওয়াতুর পদ্ধতিতে বর্ণিত। সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু ও সূরা নাস দ্বারা সমাপ্ত মাসহাফের মাঝখানে লিখিত"।[২৩৭]
নবী প্রেরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক নবী-রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা এক বা একাধিক মুজিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যা ছিল প্রতিটি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম। আল কুরআন হলো সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। আল্লাহ তায়ালা

---

[২৩৫] ইয়াকূত হামাবী, *মুজামুল বুলদান*, (তেহরান: সাযমানে মিরাসে ফিরিঙ্গী কিশওয়ার, ১৩৮৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১৭৭।
[২৩৬] سبب تسمية القرآن الكريم ، fatwa.islamonline.net
[২৩৭] আকরাম দায়লামী, *জামউল কুরআন দিরাসাতান তাহলীলিয়্যাতান লি মারবিয়্যাতিহী*, (বৈরুত: দারুল কুতুলি ইলমিয়্যাহ), পৃ. ১৯।

আল কুরআনের অনুরূপ কোনো আয়াত কিংবা সূরা রচনা করার ব্যাপারে তৎকালীন জাহেলী যুগের কবি-সাহিত্যকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ،

"আমি আমার নবীর উপর যা অবতীর্ন করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে, তোমরা এটির অনুরূপ কোনো সূরা রচনা করে দেখাও। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো। যদি তোমারা সত্যবাদী হও"।[২৩৮]

আল কুরআনের মুজিযা কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থগত বর্ণনাশৈলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এতে এমন কিছু শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্র ও পথনির্দেশ রয়েছে, যা তৎকালীন সময়ে বিশিষ্টজনের মধ্যেও ছিল অজানা এবং সমকালীন শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট অনুদ্ভাবিত। আধুনিক বিজ্ঞান তার কিয়দংশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অবশিষ্ট অনেক বিষয় উদ্ভাবনে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিজ্ঞানকে আরো দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে। আল কুরআনের প্রধান মুজিযা এই যে, অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মুজিযা তাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আল কুরআনের মুজিযা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং প্রদত্ত চ্যালেঞ্জও বাকি থাকবে। মূলত আল কুরআন হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি জীবন্ত মুজিযা।

আল কুরআনের ভাষাশৈলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল। যার ব্যঞ্জনা ও বর্ণনাশৈলি মানবীয় শক্তি-সামর্থের উর্ধ্বে। ভাষাচর্চা সম্পর্কীয় মানবরচিত বিজ্ঞান দ্বারা আল কুরআনের উচ্চমানসম্পন্ন সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। আল কুরআনের সাহিত্যমান সম্পর্কীয় বর্ণনায় আরবের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক ওয়ালিদ ইব্ন মুগিরা[২৩৯]আরবের সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বলেন,

فو الله ما فيكم من رجلٍ أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته،

"আল্লাহর কসম! ছন্দ শাস্ত্রে তোমাদের মধ্যে আমার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই। গদ্য ও পদ্য বিষয়েও আমি সব চেয়ে অধিক জ্ঞাত। জিন জাতির কবিতা সম্পর্কে তোমরা আমার চেয়ে বেশি জানো না। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন উপর্যুক্ত কোনো প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহর কসম! আল কুরআনের প্রাঞ্জল বাক্যসমূহ খুবই চিত্তাকর্ষক ও মানবমনে অতিশয় প্রভাব বিস্তারকারী। আল কুরআনের শব্দব্যাঞ্জনা সুউচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ফলবান। তার অর্ন্তনিহিত ভাব ও মর্ম মাটির গভীরে প্রোথিত বট বৃক্ষের মতো শক্তিমান। এ কুরআন একদিন বিজয়ী হবেই। এটিকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আল কুরআন সকল মতবাদকে চুর্ণবিচুর্ণ করে পদানত করে ছাড়বে"।

আল কুরআনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও আয়াতাংশ 'তাওয়াতুর'[২৪০]

---

[২৩৮] আল কুরআন, ২; ২৩।

[২৩৯] ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম (৫২৭-৬২২ খ্রি.) জাহিলী যুগের অন্যতম কুরআইশ সর্দার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতি যুগ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সেই ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেসালত ও কুরআন অস্বীকার করে বলেছিল, আমি কুরাইশের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ এর উপর কীভাবে কুরআন নাযিল হয়। তার ব্যাপারে সূরা যুখরুফ এর ৩১ নং আয়াতটি নাযিল হয়।

[২৪০] কোনা বিষয়ে এমন অধিক সংখ্যক লোকের বর্ণনা, যাদের সকলের একযোগে মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া অসম্ভব। "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"، www.al-eman.com।

পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। তার প্রতিটি হুকুম দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য। এমনকি প্রতিটি সূরা ও আয়াতের বিন্যাস পদ্ধতিও অকাট্য। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,[২৪১] إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ।

এ আয়াতের ব্যাখায় ইমাম কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি.) বলেন, [২৪২] মানব কিংবা শয়তানের পক্ষ থেকে এখানে কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর যুগে প্রথমবার এবং তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) এর সময়কালে দ্বিতীয়বার গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা অর্থ না বুঝে পাঠ করলেও সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। আল কুরআনের কোনা অংশের তেলাওয়াত ব্যতিরেকে নামায শুদ্ধ হয় না। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। বারবার তেলাওয়াতের পরও যার স্বাদ ও আগ্রহ অটুট থাকে। মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো আল কুরআন। ইহকালীন জীবনের প্রতিটি স্তরের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলমন্ত্র হলো আল কুরআন। যেমনিভাবে পরকালীন জগতের মুক্তি ও শান্তি আল কুরআনের মধ্যেই নিহিত। এটিই মুসলিম উম্মাহর একান্ত ও সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ড. ওয়াসফি আশুর আবু যাইদ মুসলিম জীবনে আল কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন,

فالقرآن الكريم هو الكتاب الخالد لهذه الأمة ودستورها الشامل وحاديها الهادي وقائدها الأمين كما أنه الكتاب الخالد للدعوة الإسلامية ودليلها في الحركة في كل حين وله أهمية كبيرة في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة فهو يعالج بناء هذا الإنسان نفسه بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره ويشرع من التشريعات ما يحفظ كيان الأسرة تظللها السكينة وتحفها المودة والرحمة كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام الطاقات الكامنة في المجتمع وينشد الأمة القوية المتماسكة الشاهدة على العالمين،

"আল কুরআন হলো এই উম্মতের শাশ্বত কিতাব এবং পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। সত্যের পথে আহ্বানকারীদের অভিভাবক ও বিশ্বস্ত পরিচালক। এটি ইসলামের পক্ষে দাওয়াতের চিরস্থায়ী গ্রন্থ। মানবজীবনের প্রতিক্ষণের পথ প্রদর্শক। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি এটি ব্যক্তিত্ব, মানস, বিবেক ও চিন্তার পরিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষে পারিবারিক কাঠামোর বিনির্মাণে আল কুরআনের সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি রয়েছে। সমাজের সুসংবদ্ধ ও সুপ্ত শক্তির পুনর্গঠনে শক্তিশালী অবদান রয়েছে আল কুরআনের। এটি বিশ্বশক্তির উপর মুসলিম উম্মাহকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে"।[২৪৩]

মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহ তথা আল কুরআন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ইল্‌ম থাকা আবশ্যক। কিতাবুল্লাহ হলো শরীয়তের মূল দলীল, প্রধান উপাত্ত ও বুনিয়াদি আকর। মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত সম্পর্কে ধারণা বিশেষত আহকাম সম্পর্কিত আয়াতগুলোর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহকাম সম্পর্কিত আয়াত সংখ্যা হলো পাঁচ'শ। আল কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা থেকেও অনেক বিধান উদ্ভাবনের সুয়োগ রয়েছে। তবে এখান থেকে বিধান উদ্ভাবনের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হবার কারণে পাঁচশ আয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী এর উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

---

[২৪১] আল কুরআন, ১৫; ৯।

[২৪২] কুরতুবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবি বকর, *আল জামে লি আহকামিল কুরআন*, সম্পাদনা: আহমাদ আল বারদুনী ও ইবরাহীম উতাইফাশ, (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৫।

[২৪৩] ড. ওয়াসফী আশূর আবু যাইদ, *আহাম্মিয়াতুল কুরআনিল কারীম*, (কুয়েত: প্রকাশনার নামবিহীন, ১৪২৯ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩।

ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهرللقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك،

"পাঁচশত আয়াতের মধ্যে আহকামের আয়াতসমূহ সীমাবদ্ধ করার দাবি এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এ সকল আয়াত থেকেই বেশিরভাগ আহকাম ইসতেম্বাত করা হয়" ।[২৪৪]

আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও মুজতাহিদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এটি কিতাবুল্লাহ সংশ্লিষ্ট শর্তের অন্তর্গত।

২.২.৩. সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান

সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রধান উৎসের মর্যাদায় অভিষিক্ত।[২৪৫]
আল কুরআনে সুন্নাহকে হিকমাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নের আয়াত দুটি প্রণিধানযোগ্য।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ،

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ،

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয়, তা স্মরণ রাখবে"
"তিনি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন"[২৪৬]

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আয়াত দুটিতে হিকমাহ বলে সুন্নাহ উদ্দেশ্য। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে যা তেলাওয়াত করা হয়, তা হয়তো কুরআন অথবা সুন্নাহ। সুন্নাহকে ইসলামী শরীয়তের উৎস সাব্যস্ত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ،

"খবরদার! ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তিরও উদ্ভব হতে পারে, যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তার নিকট আমার হাদীস পৌঁছলে বলবে, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে ফায়সালার জন্য আল কুরআনই যথেষ্ট। এখানে যা হালাল হিসেবে পাবো, তা হালাল বলে গণ্য করবো। যা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা হারাম সাব্যস্ত করবো। বাস্তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা আল্লাহ হারাম ঘোষণার মতো" ।[২৪৭]

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه،

"মনে রেখো! আমার উপর যেভাবে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুরূপ আরো কিছু অকাট্য বিষয়ও নাযিল হয়েছে"।

আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতার ব্যাপারে ইহকালে ফিতনা ও পরকালে কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উল্লেখ করে বলেছেন।

---

[২৪৪] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *ইরশাদুল ফুহূল*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.),খ. ২, পৃ. ২০৬।

[২৪৫] সুলায়মান আবদুল্লাহ, *মিদাদ, আস সুন্নাতু মাসদারুত তাশরীঈল ইসলামী, সংখ্যা. ১৮, প্রকাশনাকাল, ৮.১১.২০০৭ খ্রি.।*

[২৪৬] আল কুরআন, ৩৩; ৩৪। আল কুরআন, ২; ১৫১।

[২৪৭] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৩৫, হাদীস নং- ২৬৬৪।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ،

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি" ।[২৪৮]

কুরআন ও হাদীসের উপর্যুক্ত নসসমূহ দ্বারা সুন্নাহ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তদুপরি আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় সুন্নাহ শব্দটি বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৪৯]

১.ধারানো, শান দেয়া ও তীক্ষ্ণ করা। কোনো ব্যক্তি ছুরি ধার দিলে আরবের লোকেরা বলে- سنّ فلان السكين ।

২. শুরু ও আরম্ভ করা। ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك أنه أول من سنّ القتل হাদীস শরিফে سنّ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ও কোনো কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কোনো ব্যক্তি উটের যথাযথ যত্ন নিলে আরবীতে বলা হয়- سنّ الإبل إذا أحسن رعايتها والعناية بها । এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন এবং নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করেছেন তাকে সুন্নাহ বলা হয়।

৪.ভালো-মন্দ যে কোনো অনুকরণীয় নীতি ও আদর্শ। কেনো স্থানে নিয়মিত পানি ঢালাকে আরবীতে বলা হয়- سننت الماء إذا واليت صبه ।[২৫০]

ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্রে সুন্নাহ শব্দটি বিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে। হাদীস, ফিক্‌হ ও উসূল শাস্ত্রবিদদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিন্নতার কারণে তার সংজ্ঞায় ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হলেও মূলভাব এক ও অভিন্ন। উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ সুন্নাহ শব্দটি নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন।[২৫১]

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي يُسْتدَلُّ بها على الأحكام الشرعية،

ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের মতে সুন্নাহর সংজ্ঞা হলো, [২৫২]

ما ثبَت طلبه بدليلٍ شرعي من غير افتراض ولا وجوب،

হাদীস শাস্ত্রবিদদের মতে সুন্নাহর সংজ্ঞা-[২৫৩]

كُلّ ما اثرعن النبيّ صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو سيرةٍ أو صفة خَلقية أو خُلقية سواء كان أخباره قبل البعثة ا وبعدها،

মুজতাহিদ এর জন্য সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সুন্নাহ মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধান সুন্নাহ'তে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তার স্বরূপ ও

---

[২৪৮] আল কুরআন, ২৪; ৬৩।

[২৪৯] ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *আল মুজামুল ওয়াসিত*, (কায়রোঃ দারুদ দাওয়া, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৫।

[২৫০] আর রাযী, ফখরুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার, *আত তাফসীরুল কাবির*, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫৪।

[২৫১] আমীদী, আবুল হাসান সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবি আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্‌যাক আফীফী, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.), খ .১, পৃ. ১২৭।

[২৫২] শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *ইরশাদুল ফুহুল*, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.),খ. ১, পৃ. ৩৩।

[২৫৩] মুস্তফা আস সিবায়ী, *আল সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী*, (দারুল ওয়ার্‌রাক, ২য় সংস্করণ, তা/বি.), পৃ, ৬৫।

প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনা রয়েছে বিস্তারিতভাবে। তাই সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ নেই। মুজতাহিদের জন্য মোট কত সংখ্যক হাদীস জানা থাকা আবশ্যক, সে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ মনীষীদের নিকট থেকে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ইমাম আবু বকর আর রাযী (র) (২৫০-৩১১ হি.) বলেন, ইজতিহাদের সময় মুজতাহিদের জন্য আহকাম সংশ্লিষ্ট সমুদয় হাদীস মুখস্থ থাকা আবশ্যক নয়। তবে এতটুকু প্রয়োজন যে, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে সবগুলো সম্মুখে উপস্থিত করতে পারেন কিংবা জানতে পারেন। আহকাম সম্পর্কিত হাদীস নির্ণয়ে আলিমগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। আবু বকর ইবনুল আরবী (র) (৪৬৪-৫৪৩ হি.) এর মতে এ সংখ্যা তিনশত। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) এর মতে এক হাজার দুইশত। অন্য বর্ণনা মতে পাঁচ হাজার। সাহাবী ও তাবিঈদের উক্তিসহ (آثار الصحابة والتابعين) এ সংখ্যা তিন হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। যুহাইলী এর বর্ণনায় এটি প্রতিভাত হয়।[২৫৪]

وحدد ابن العربي أحاديث الأحكام بثلاثة آلاف ونقل عن أحمد أنها ألف ومئتان وشدد في رواية أنها خمس مئة ألف وفي رواية ثلاث مئة ألف ولعله أراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين،

ইমাম শাওকানী বলেন, সুন্নাহ সম্পর্কীয় সকল হাদীস মুজতাহিদের তথ্যভাণ্ডারে আয়ত্ত থাকা একান্ত অপরিহার্য। পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রে সংকলিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের ব্যাপারেও ধারাণা থাকা প্রয়োজন। যেমন মৌলিক ষষ্ঠ গ্রন্থ (الأمهات الست)

তদুপরি 'মাসানিদ ও মুসতাখরাজাত'والبيهقي لموطأ وسنن الدارمي والدارقطني) গ্রন্থাবলি। যেমন- (مسانيد ومستخرجات) নামে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে মুজতাহিদের ধারণা থাকতে হবে। যেমন- مسند أحمد، ومستدرك الحاكم ইত্যাদি । যে সকল হাদীস সংকলক নিজেদের উপর সহীহ হাদীস সংকলন অত্যাবশ্যক করে নিয়েছেন, তাদের সংকলনসমূহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন- صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، ومصنف عبد الرزاق ইত্যাদি । মূলত হাদীস সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানলাভ না হলে প্রয়োজনের সময় নস থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব অভিমত প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। মুজতাহিদের জন্য সনদ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। হাদীসের সনদ শুদ্ধ না হলে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। মুজতাহিদের জন্য এ বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান লাভ করতে হবে যে, তিনি যে হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার প্রেক্ষাপট কি? তাছাড়া হাদীসের মূল পাঠ এর যথার্থ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। পাশাপাশি মুজতাহিদকে হাদীস শাস্ত্রের আর একটি শাখা جرح والتعديل বিষয়ক সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২.২.৪. ইজমা সম্পর্কীয় জ্ঞান

উম্মতে মুহাম্মদিয়া যে সকল অনন্য স্বকীয়তা দ্বারা তাৎপর্যমণ্ডিত তম্মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, দীনের ব্যাপারে এই উম্মতের আলিমদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রান্তিমুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন এবং মুজতাহিদগণের ইজমাকে ইসলামী শরীয়তের দলীলের মর্যাদা

[২৫৪] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *কিতাবুল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ,* (দামেস্ক: দারুল খাইর লিত তাবাআ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৮৯।

দিয়েছেন। মুজতাহিদ আলিমদের ইজমার বিশুদ্ধতার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (র) (৭৪৫-৭৯৪ হি.) বলেন,

والسرّ في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الكافة والأنبياء قبله إنما بُعث النبي لقومه وهم بعض من كل ويد الله مع الجماعة فلهذا خصّها بالصواب والله أعلم،

"এই উম্মতের ইজমা বিশুদ্ধ হবার নেপথ্য কারণ হলো, প্রকৃতপক্ষে উম্মতে মুহাম্মদিয়াই একমাত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জামাত ও সর্বজনীন জাতি। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন নির্দিষ্ট অঞ্চল ও জাতির নবী হিসেবে। অন্যান্য জাতির মধ্যে সামগ্রিকতার এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, ঐক্যবদ্ধতা ও সামষ্টিকতার মধ্যেই আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়। সুতরাং এ জাতির মুজতাহিদ ইমামদের ইজমাকে বিশুদ্ধতার সাহায্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত"।[২৫৫]

মুজতাহিদগণের প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ ঐকমত্যে পৌঁছলে ইজমা হিসেবে গণ্য হয় এবং অকাট্য দলীলের মর্যাদায় আসীন হয়। ইজমা ইসলামী আইনের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবার পর কারো জন্য এর বিরোধিতা করা কিংবা অমান্য করা জায়েয নেই। পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণ যে সকল মাসআলার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, মুজতাহিদের জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইজমা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকার সুবিধাগত দিক হলো, এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ বিপরীত রায় প্রদান থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে এবং নতুন সমস্যাবলির সমাধান উদ্ভাবনে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। ইজতিহাদকৃত সকল মাসআলা সম্পর্কে মুজতাহিদ অবগত না হলেও ন্যূনতম এই ধারণা থাকা আবশ্যক যে, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলিমদের কোনো ইজমা সংগঠিত হয়নি। মুজতাহিদের জন্য এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকা অপরিহার্য যে, তার প্রদত্ত ফতোয়া ইজমার বিপরীত নয়, অথবা বিষয়টি নব-উদ্ভূত। এতে পূর্বে কোনে গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এমন ধারণা বদ্ধমূল হবার জন্য পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা বাঞ্চনীয়।

ইজমা-জ্ঞান বিষয়ে মুজতাহিদের অবগতির আবশ্যকতা সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) এর নিম্নোক্ত উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[২৫৬]

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتًا فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف أين قال ما يقول وترك ما يترك ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله،

"পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের ইখতিলাফের কারণসমূহ এবং তাদের উপস্থাপিত প্রমাণাদি ও ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়নের মাধ্যমে মুজতাহিদের ইজতিহাদী প্রতিভা বিকশিত হয়। এতে প্রমাণাদির শক্তিমত্তা-দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা ও দলীল উপস্থাপনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। যা বিশুদ্ধ ইজতিহাদ, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নস এর ভাবার্থ পর্যালোচনায় মুজতাহিদের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে"।[২৫৭]

---

[২৫৫] যারকাশী, আবু আবদিল্লাহ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, (দারুল কুতবা, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৯৬।

[২৫৬] আশ শাফিঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস, *আর রিসালা*, সম্পাদনা: আহমাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন শাকির, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ.৫১০।

[২৫৭] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তাফা, *কিতাবুল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, (কাতার: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭৯।

ইজমা এর শাব্দিক অর্থ

ইজমা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. কোনো বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[২৫৮] فأجم فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ এবং وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ [২৫৯] আয়াত দুটিতে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له বর্ণিত হাদীসে يُجمع শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২.ঐকমত্য, একমত পোষণ করা। আরবের লোকেরা أجمع الناس على كذا বলে (اتفقوا عليه) কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা বোঝায়।[২৬০]

ইজমা এর পারিভাষিক অর্থ

ا تفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان هو ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মুজতাহিদগণের যে কোনো বিষয়ে এবং যে কোনো যুগের ঐকমত্যকে ইজতিহাদ বলে"।[২৬১]

ইজমা ইসলামী শরীয়তের দলীল হবার ব্যাপারে নিম্নের আয়াত দুটি প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,[২৬২]

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ،

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ،

ইজমা ইসলামী শরীয়তের দলীল হবার ক্ষেত্রে হাদীসের প্রমাণ হলো,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً،

"আমিরকে কোনো অপছন্দনীয় কাজ করতে দেখলে ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ হলেও বিচ্যুত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে যেন জাহিলিয়্যাতের মতো মৃত্যুবরণ করলো"।[২৬৩]

ইজমা এর প্রামাণিকতা বিষয়ে আবু যর গিফারী (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ،

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ হলেও বিচ্ছিন্ন হয়, সে যেন তার ঘাড় থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল"।[২৬৪]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

---

[২৫৮] আল কুরআন, ১০:৭১

[২৫৯] আল কুরআন, ১২:১০২

[২৬০] ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়া আল কাযবীনী, *মাকায়ীসুল লুগাহ,* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৭ খ্রি.), খ .১, পৃ. ৪৭৯।

[২৬১] আবু যুরআ, ওয়ালিউদ্দীন আহমাদ ইব্ন আবদুর রহিম, *আল গাইসুল হামী শারহু জামঈল জাওয়ামী* সম্পাদনা: মুহাম্মদ তামির হিজাযী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪৮৫।

[২৬২] আল কুরআন, ২;১৪৩। আল কুরআন, ৩; ১০৩।

[২৬৩] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৯, পৃ. ৬৩, হাদীস নং- ৭১৪৩।

[২৬৪] বায়হাকী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী, *আস সুনানুল কুবরা*, সম্পাদনা: আবদুল কাদির আতা, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৭১, হাদীস নং- ১৬৬১৪।

وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازمٌ،
"মুসলমানদের জামাত আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ উম্মতের ইজমা ওয়াজিব হবার প্রমাণ বহন করে"।[২৬৫]

মুজতাহিদ আলিমদের ইজমাই একমাত্র ইসলামী শরীয়তের দলীল হবার যোগ্য। অন্য কারো ইজমা ইসলামী শরীয়তে ধর্তব্য হবে না। এ বিষয়ে ইব্ন কুদামা (র) (৫৪১-৬২০ হি.) বলেন,

ومعنى ذلك: أن العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نص معين على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وروحها السمحة وعلى أساس دلالات الألفاظ اللغوية باعتبار أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين وكذلك السنة النبوية فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،

"এ ইজতিহাদের ভিত্তি হবে শরীয়তের বিধিবদ্ধ মূলনীতি, উদারনৈতিক প্রাণশক্তি ও মুসলিম উম্মাহ'র সমাগ্রিক কল্যাণ। কুরআন সুন্নাহর ভাষালঙ্কার ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য। কেননা আল কুরআন এমন একটি কিতাব, যা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর ভাষাও হলো আরবের সর্বাধিক প্রাঞ্জল।[২৬৬]

ইজমা কি অকাট্য প্রমাণ নাকি প্রবল ধারণাগত দলীল ? (دلالة الإجماع هل هي قطعية أو ظنية)

ইজমা এর মাধ্যমে সাব্যস্ত বিধান দ্বারা কি অকাট্য হুকুম (قطعية) প্রমাণিত হয় নাকি প্রবল ধারণাগত (ظنية) বিধান জারি হয় এ বিষয়ে উসূল শাস্ত্রবিদদের মধ্যে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

১.অধিকাংশ ফিক্হ ও উসূল শাস্ত্রবিদের মতে ইজমার মাধ্যমে অকাট্য হুকুম (قطعية) সাব্যস্ত হয়। নিশ্চিতভাবে ইজমা প্রমাণিত হবার পর কারো জন্য এর বিরোধিতা করা কিংবা অমান্য করা জায়েয নেই। ইজমার বিরোধিতাকারী পথভ্রষ্ট, বিদআতপন্থি ও কাফের বলে গণ্য হবে। ইমাম আমীদী ও ইব্ন হাজিব এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে ইজমা প্রসিদ্ধি লাভ করার পর তার বিরোধিতাকরীকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে।[২৬৭]

২.একদল উসূল শাস্ত্রবিদের মতে ইজমা এর মাধ্যমে প্রবল ধারণাগত (ظنية) বিধান প্রমাণিত হয়। ইমাম রাযী (র) এ মতের প্রবক্তা।

৩. নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ আলিমদের ঐক্যবদ্ধ ইজমা দ্বারা অকাট্য হুকুম (قطعية) সাব্যস্ত হয়। মুজতাহিদগণের ঐক্য পাওয়া না গেলে প্রবল ধারণাগত (ظنية) বিধান প্রমাণিত হয়।

ইজমা এর প্রকারভেদ

ইজমা প্রধানত দুই প্রকার। ১. সুস্পষ্ট ইজমা (اجماع صريح) ২. অস্পষ্ট বা নীরব ইজমা (اجماع سكوتي) ।

---

[২৬৫] আশ শাফিঈ, মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস, *আল রিসালা*, সম্পাদনা: আহমাদ মুহাম্মদ ইব্ন শাকির, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ.৪০৩।

[২৬৬] মাকদিসী, ইব্ন কুদামা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ মুয়াফ্ফাকুদ্দীন, *রাওদাতুন নাজির ওয়া জান্নাতুল মানাজির*, (বৈরুত: মাকতাবাতুর রাইয়ান, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯।

[২৬৭] আমীদী, আবুল হাসান সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্ন আবি আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্যাক আফীফী, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.), খ .১, পৃ. ১৪৪।

১. সুস্পষ্ট ইজমা (اجماع صريح)। নির্দিষ্ট মাসআলায় ফকীহ-মুজতাহিদগণের কথা ও কাজের ঐকমত্যকে সুস্পষ্ট ইজমা বলে। যেমন- কোনো যুগের ফকীহ-মুজতাহিদগণ নির্দিষ্ট মাসআলায় একমত হবার পর তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। এ ধরনের ইজমা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ফকীহগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।

২. অস্পষ্ট ইজমা বা নিরব ইজমা (اجماع سكوتي) ।

যেমন- কোনো যুগের ফকীহ-মুজতাহিদগণ একটি নির্দিষ্ট মাসআলায় স্পষ্ট ঐকমত্য প্রকাশ করার পর অবশিষ্ট আলিমগণ তাতে নিরবতা অবলম্বন করলো। এ প্রকারের ইজমা দলীল হবার ব্যাপারে অনেকেই দ্বিমত প্রকাশ করলেও এটি দ্বারা শরীয়তের হুকুম সাব্যস্ত হবার দিকটি প্রবল।

ইজমার শর্তাবলি

১.ইজমা ইসলামী শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার জন্য নিম্নোক্ত শতাবর্লি প্রযোজ্য। ইজমা কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

২.নির্দিষ্ট যুগের সকল ফকীহ-মুজতাহিদ ইজমা হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট উক্তি করা অথবা নিরব থাকা কিংবা সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৩.ন্যায়পরায়নণ ও বিদআতী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত মুজতাহিদ আলিমদের ইজমা হওয়া।

৪.মুজতাহিদগণের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা।

২.২.৫. নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ

নাস্‌খ (রহিতকরণ) কুরআন-সুন্নাহর নস দ্বারা প্রমাণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণে যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা হুকুম করার অধিকার রাখেন। যে হুকুম অন্য হুকুমকে রহিত করে তাকে নাসিখ বলে। রহিত বিধানকে বলে মানসূখ। নাসিখ-মানসূখ উসূলে ফিকহ এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। নাস্‌খ বিষয়ক বিধি-বিধান আলিমদের নিকট একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা হিসেবে খ্যাত। মুজতাহিদের জন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা ইজতিহাদের পূর্বশর্ত। নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা মুজতাহিদের জন্য দোষণীয়। কোনো মুজতাহিদ রহিত বা মানসূখ দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করলে তার ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

নাস্‌খ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

আভিধানিকভাবে নাস্‌খ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় ১. স্থানান্তর ও পরিবর্তন করা (التحويل والنقل) ২. রহিত ও দূরীভূত করা (الرفع والإزالة) ।[২৬৮]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নাস্‌খ এর সংজ্ঞা হলো,

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر،

“শরীয়তের পরবর্তী বিধান দ্বারা পূর্বের বিধান রহিত করাকে নাসখ বলা হয়”।[২৬৯]

---

[২৬৮] ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন ফারিস ইব্‌ন যাকারিয়া আল কাযবীনী, *মাকায়ীসুল লুগাহ*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৭ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪২৪।

নাসখ এর কারণ এবং তার অন্তর্নিহিত উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ،

"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমতুল্য কোন আয়াত প্রদান করি। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"।[২৭০]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হুকুম রহিত হবার পাশাপাশি সুন্নাহর মধ্যেও নাস্খ পাওয়া যায়। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন ইসলামের প্রথমিক যুগে কবর যিয়ারতের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বৈধতা প্রদানপূর্বক অনুমোদন দান করেন। তেমনিভাবে 'মুতা' বিয়ে (نكاح المتعة) মুসলমানদের জন্য প্রথমিক পর্যায়ে বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা হারাম ঘোষিত হয়।

কুরআন-সুন্নাহর নসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শরীয়তের বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়েই কেবলমাত্র নাসখ সংঘটিত হয়। আকিদা ও আখলাক বিষয়ে নাস্খ সংঘটিত হবার কোনো নজির নেই।

নাসখ এর প্রকারভেদ

১.কুরআন দ্বারা কুরআনের নাস্খ

যেমন সুরা বাকারা'র ২১৯ নং নিম্নের আয়াতটি

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا،

"লোকজন আপনার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক"।

সুরা মায়িদা'র নিম্নের ৯০ নং আয়ত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،

"হে মুমনিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো।

২.কুরআন দ্বারা সুন্নাহর নাস্খ

বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে নামায আদায় করার বিধানটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নের আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। যাতে মসজিদে হারাম অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। নিম্নের আয়াতে এ সংক্রান্ত হুকুম জারি করা হয়।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ،

"অতএব আপনি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরান"।[২৭১]

৩. সুন্নাহ দ্বারা সুন্নাহর নাস্খ

একটি সুন্নাহ দ্বারা আরেকটি সুন্নাহ নাস্খ হবার অনেক নজির পাওয়া যায়। যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মুতা' (المتعة) বিয়ে ছিল সুন্নাহ দ্বারা একটি প্রমাণিত বিধান। পরবর্তীতে অন্য একটি সুন্নাহ দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। ইয়াস ইব্‌ন সালামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه،

---

[২৬৯] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, মুহাদ্দিস দেহলাবী, *আল ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিদ্দীন*, আবরী অনুবাদ, সালমান আল হুসাইনী আন নাদাবী, (কায়রোঃ দারুস সাহওয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ, ৮৩।

[২৭০] আল কুরআন, ২; ১০৬।

[২৭১] ২:১৪৪

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস এর বছর (عام أوطاس) মুতা বিয়ের অবকাশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়"।[২৭২]

নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করার পদ্ধতি

কোন্ হুকুম নাসিখ এবং কোনটি মানসূখ আলিমগণ এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন ।

১. রাসূল এর উক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট বর্ণনা

পৌত্তলিক সমাজে মুশরিকগণ মৃত্যুবরণকারী সৎলোকদের পূজা করতো। এ প্রবণতা দূর করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের শিক্ষা বদ্ধমূল হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের বৈধতা ঘোষণাপূর্বক বলেন,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها،

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বারণ করতাম। এখন তার অনুমতি প্রদান করা হলো"।[২৭৩]

২. সাহাবায়ে কেরাম এর বর্ণনা

সাহাবায়ে কেরাম এর বর্ণনা দ্বারা নাস্খ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মাউনা অঞ্চলের জলাশয় প্রান্তরে (بئر معونة) শাহাদতপ্রাপ্ত সাহাবীদের ব্যাপারে একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে যায়। বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী ঘটনাটি নিম্নরূপ-

فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ،

"জিবরীল (আ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে সংবাদ প্রদান করেন যে, তারা স্বীয় রবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা তখন নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا পরবর্তীতে এটি রহিত হয়ে যায়"।[২৭৪]

৩. উম্মতের ইজমা

উম্মতের ইজমা দ্বারাও নাসিখ-মানসূখ নির্ণয় করা যায়। এর মাধ্যমে কোন হুকুম পূর্বের এবং কোন হুকুম পরের তার পরিচয় করার পথ সুগম হয়।

---

[২৭২] মুসলিম, আবুল হাসান ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১০২৩, হাদীস নং- ১৪০৫।

[২৭৩] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসরঃ শিরকাতু মুস্তাফা আল বাবী আল হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং- ১০৫৪।

[২৭৪] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ২৮০১।

২.২.৬. ফিক্হ সম্পর্কীয় জ্ঞান

ফিক্হ শাস্ত্র হলো ঐশী বিধানের সুবিন্যস্ত রূপ। যার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের আলোকে জীবন পদ্ধতি নির্ণয় করা যায়। শরীয়া পদ্ধতির জীবনাচার মুসলিম উম্মাহ'র চলমান সভ্যতা। মুসলমানের ইবাদত-বন্দেগীসহ সামগ্রিক জীবন কাঠামো শান্তিময় জীবন যাপনের চাবিকাটি। মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গঠনের মানদণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্বপ্নময় প্রত্যাশা। ফিক্হ (فِقْهٌ) শব্দটি মধ্যবর্তী অক্ষরে যবর, যের ও পেশ তিন হারকাতেই (স্বরচিহ্ন) উচ্চারিত হয়। যার অভিধানিক অর্থ হলো বোধজ্ঞান, মেধা, দক্ষতা, উপলব্ধি ও কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা।[২৭৫]

সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে ফিক্হ শব্দটির ব্যবহার সমধিক। ইবনুল মানজুর (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন, অন্যান্য শাস্ত্রের উপর দীনি শাস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ফিক্হ শাস্ত্রে শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করেছে। যেভাবে সুরাইয়া নক্ষত্রের উপর 'নাজম' শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

আল কুরআনের এই আয়াতে فقه শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৭৬]

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،

হাদীস শরীফে বোধজ্ঞান অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। [২৭৭]

مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقّهه في الدِّين ،

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ফিক্হ বলা হয়-

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية،

"শরীয়তের সুবিস্তৃত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত আমলযোগ্য বিধানসমূহের জ্ঞান অর্জন করা"।[২৭৮]

ড. ফওযী ফয়জুল্লাহ ফিক্হ শাস্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন,[২৭৯]

هو التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العلم، تصديقًا حاصلًا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا،

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরকাল বিষয়ক জ্ঞান, মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মন্দ কাজসমূহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া, অবিনশ্বর দুনিয়া থেকে পরকালের শাশ্বত নেয়ামতরাজির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও মনে আল্লাহর ভয়ের অনুশীলন করাকে ফিক্হ বলা হতো।

ফিক্হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

ফিক্হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো শরীয়া পালনে বাধ্যগত ব্যক্তির (مكلف) ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মসমূহ। ইমাম আবু হানীফা (র) ফিক্হ শাস্ত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ফিকহে আকবর (فقه اكبر) ও ফিকহে আসগর (فقه اصغر)। তিনি আকিদাকে ফিকহে আকবর এর বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেন। আর "শরীয়া পালনে বাধ্যগত ব্যক্তির আমলযোগ্য হুকুমসমূহকে ফিকহে আসগর এর বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেন"।

---

[২৭৫] হামাবী, আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল ফায়ূমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ২, পৃ, ৪৭৯।

[২৭৬] আল কুরআন, ২০; ২৭, ২৮।

[২৭৭] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪১।

[২৭৮] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪।

[২৭৯] ড. ফওযী ফয়জুল্লাহ, *মাবাহিসুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ফী ইলমি উসূলিল ফিক্হ, তৃতীয় বর্ষ, পৃ. ৪।*

الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلّفين ،

ড. ওয়াহবা যুহাইলী বলেন,

هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها إما فعلاً كالصلاة أو تركاً كالغصب أو تخييراً كالأكل،

ইমাম গাযালী, শাতিবী ও ইসফারাইনীসহ অনেক আলিম মুজতাহিদ হবার জন্য ফিক্‌হ ও ফকীহগণের মতবিরোধ সম্পর্কীয় জ্ঞানকে শর্তযুক্ত করেছেন। পূর্বেকার ফকীহগণ প্রতিটি মাসআলায় কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবদুল্লাহ আর রাযী বলেন,

من لم يعرف الاختلاف عند الفقهاء فليس بفقيه،

"যে মুজতাহিদ ফকীহগণের ইখতিলাফ সম্পর্কে অবহিত নয়, তার মুজতাহিদ হবার যোগ্যতা নেই"।[২৮০]

আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র) বলেন,

لا ينبغي لاحد ان يفتي الناس حتي يكون عالما باختلاف الناس فانه وان لم يكن كذالك رد من العلم ما هو اوثق من الذي بين يديه،

"আলিমদের ইখতিলাফ সম্পর্কে না জেনে কারো জন্য ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো ফকীহ এর নিকট নিজের মতামত সমর্পন করবেন"।[২৮১]

সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন,

اجرا الناس علي الفتوي واقلهم علما باحتلاف العلماء والمقصود معرفة اقوال السلف من الفقهاء وهذا يدعوه الي ان يامن العثار في الفتوي،

"পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ফকীহগণের ইখতিলাফ সম্পর্কে না জেনে ফতোয়া দেয়া এ শাস্ত্রের সঙ্গে স্পর্ধা দেখানোর শামিল। এমন ব্যক্তিদের ফতোয়ায় পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে"।

অধিকাংশ আলিম মুজতাহিদ হবার জন্য ফিক্‌হ ও ফকীহগণের মতবিরোধ সম্পর্কীয় জ্ঞানকে শর্তযুক্ত করেননি। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (৬৮৩-৬৯৩ হি.) বলেন,

ان الفقه من ثمرات الاجتهاد فلا يكون شرطا فيه،

"ফিক্‌হ হলো ইজতিহাদেরই এশটি উৎপন্ন শাখা। সুতরাং এটি মুজতাহিদের জন্য শর্ত হতে পারে না"।[২৮২]

২.২.৭. উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কে জ্ঞান

ইসলামের পরিধি আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর কতিপয় নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। শরীয়তের মূল উৎস থেকে বিধি-বিধান ইসতেম্বাতের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শাস্ত্র হলো 'উসূলে ফিক্‌হ'। তাবিঈ যুগে এ শাস্ত্রের এমন কতিপয় মূলনীতি প্রণীত হয়, যাতে কুরআন-সুন্নাহর মর্ম অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ শাস্ত্রে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রিস আশ শাফিঈ (র)। পরবর্তীকালের মুসলিম মনীষীগণ অনবদ্য গ্রন্থাবলি রচনার মাধ্যমে শাস্ত্রটিকে সমৃদ্ধ করেন।

---

[২৮০] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সম্পাদনা: আবুল আশবাল যুহাইরী, (সউদি আরব: দারু ইব্‌নিল জাওযী, ১৪১৪হি./১৯৯৪ খ্রি,), খ. ২, পৃ. ৪৬।

[২৮১] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬।

[২৮২] আল খাইয়াত, ড. আবদুল আযীয, *শুরূতুল ইজতিহাদ*, (কায়রো: দারুস সালাম, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন মুজতাহিদের জন্য বুনিয়াদি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ভিত্তিহীন কোনো ইমারত যেভাবে খাড়া থাকতে পারে না। তদ্রুপ উসূলে ফিক্‌হ এর পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে ইজতিহাদের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না। এ শাস্ত্রের জ্ঞান শরীয়তের উৎসমূল থেকে হুকুম উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর এটি ইজতিহাদের জন্য দ্বিতীয় শর্ত। ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র) (৫৪৪-৬০৪ হি.) এর দৃষ্টিতে উসূলে ফিক্‌হ মুজতাহিদের জন্য মৌলিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হামেদ গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেন, ইজতিহাদ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান তিন প্রকার। হাদীস শাস্ত্র, আরবী ভাষাতত্ত্ব ও উসূলে ফিক্‌হ। ইমামুল হারামাইন আল জুআইনী বলেন, উসূলে ফিক্‌হ মুজতাহিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র।[২৮৩]

উসূলে ফিক্‌হ এর সংজ্ঞা

উসূলে ফিক্‌হকে দুইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ১. সম্বন্ধগত সংজ্ঞা (المعنى الإضافي) ২. উপাধিগত সংজ্ঞা। (المعنى اللقبيّ)

‘উসূলে ফিক্‌হ’ নামক যৌগিক বাক্যটি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। এক. উসূল, দুই. ফিক্‌হ।

أ صول শব্দটি أ صل এর বহুবচন। প্রতিটি বস্তুর নিম্নাংশকে আসল বলা হয়। অথবা অন্যান্য বস্তুসমূহ যার উপর ভিত্তি স্থাপিত হয় তাকে আসল বলে। সুতরাং যার উপর হুকুমটি মৌলিকভাবে সাব্যস্ত হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে হুকুমটি শাখা হিসেবে প্রমাণিত হয় তাকে (اصل) আসল বলে।[২৮৪] পারিভাষিকভাবে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়

১. فرع বা শাখা। অর্থাৎ আসল এর বিপরীত। আরবীতে বলা হয়, الأب أصل والولد فرع له। পিতা হলো মূল আর সন্তান হলো তার শাখা।
২. راجح বা অগ্রাধিকার প্রদান। উসূল শাস্ত্রবিদগণ বলেন, القرآن الكريم أصل للقياس অর্থাৎ আল কুরআন দলীল হিসেবে কিয়াসের তুলনায় অগ্রাধিকার যোগ্য।
৩. المستصحب বা মূল অবস্থা । যেমন الأصل الطهارة এর অর্থ হলো, পবিত্রতা-অপবিত্রতায় সন্দেহ পোষণকারীর জন্য পবিত্রতাই হলো মূল অবস্থা।
৪. القاعدة বা মূল ভিত্তি। যার উপর অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যেমন বলা হয়, بني الإسلام على خمسة أصول ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ভিত্তির উপর সুগঠিত।
৫. الدليل বা প্রমাণ। ফকীহ ও উসূল শাস্ত্রবিদগণের নিকট প্রচলিত দলীল-প্রমাণ। যেমন বলা হয়, أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا، ومن السنة حديث كذا এই হুকুমের প্রমাণ হলো, আল কুরআনের অমুক আয়াত অথবা অমুক সুন্নাহ।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় উসূলে ফিকহ এর সংজ্ঞা হলো,

معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد،

“সংক্ষিপ্তভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রমাণাদির পরিচয় লাভ করা, তা দ্বারা উপকৃত হবার পদ্ধতি এবং উপকার গ্রহণকারী শাস্ত্রজ্ঞের অবস্থা অবহিত হওয়া” ।[২৮৫]

---

[২৮৩] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তাফা, *কিতাবুল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, (কাতার: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৯২।

[২৮৪] আল জুরজানী, সায়্যিদ শরিফ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *মুজামুত তারীফাত*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ সিদ্দীক আল মানশাবী, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৮।

[২৮৫] আবু মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আবদুর রহিম ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন আলী *নিহায়াতুস সূল শারহু মিনহাজিল উসূল*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭।

নিম্নের আয়াতসমূহ প্রণিধানযোগ্য।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود (৫:১)، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (২:৪৩)وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،(২;১৯০)
উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ উসূল শাস্ত্রবিদদের কতিপয় দলীল। এই আয়াতসমূহ থেকে অঙ্গীকার পালন করা, নামায কায়েম করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার বিধান লাভ করা যায়।

উসূলে ফিক্‌হ এর বিষয়বস্তু

শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্যগত ব্যক্তির (مكلف) ইবাদত, মোআমালাত ও স্বভাব-চরিত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম হলো উসূলে ফিক্‌হ এর বিষয়বস্তু। শরীয়া পালনকারী ব্যক্তির জন্য এ সকল বিধান ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম সংক্রান্ত বিষয়ে উসূলে ফিক্‌হে আলোচনা করা হয়।
ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ এর বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হলো, উসূল শাস্ত্রবিদগণ সামগ্রিক দলীল-প্রমাণ ও মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ প্রতিটি দলীল-প্রমাণের খুঁটি-নাটি ও শাখাগত দলীলসমূহের প্রয়োগ-পদ্ধতি আলোচনা করে।[২৮৬]

২.২.৮. মাকাসিদুশ শরীয়া বা শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান

مقاصد শব্দটি مقصد এর বহুবচন। আভিধানিকভাবে এটি রাস্তা অথবা ভিত্তি সুগঠিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে مقاصد দুই প্রকার।
ক. مقاصد المكلف: যে সকল মূলনীতির উপর ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত, তাকে مقاصد المكلف বা শরীয়ত পালনকারীর উদ্দেশ্য বলে।
খ. مقاصد الشارع অথবা مقاصد الشريعة: শরীয়ত প্রণেতা বা শরীয়তের উদ্দেশ্য। مقاصد الشارع হলো মানবকল্যাণে প্রতিবন্ধক সকল প্রকার ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করা। মানবাধিকার বা মানব কল্যাণের সাথে পাঁচটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১. জীবনের নিরাপত্তা حفظ النفس
২. ধর্মীয় অনুভূতি বা দীনের বিধান পালনের নিরাপত্তা حفظ الدين
৩. বিবেক-বুদ্ধির নিরাপত্তা حفظ العقل
৪. বংশধারার নিরাপত্তা حفظ النسل
৫. সম্পদের নিরাপত্তা حفظ المال

مقاصد الشريعة প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বলেন,
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ،
"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য চান সহজ পন্থা এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তিনি তা চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো"।[২৮৭]

---

২৮৬ ইবনুন নাজ্জার, তাকিউদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল ফাতূহী, *শারহুল কাওকাবিল মুনীর*, সম্পাদনা: ড. যুহাইলী, মাকতাবাতুল আকাবান, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬।

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) বলেন,

يريد الله بكم أيها المؤمنون التخفيف عليكم لِعِلمِه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوا ل،

"ধাল্লাহর জানা মতে এই সকল অবস্থা তোমাদের জন্য কষ্টকর প্রমাণিত হবার কারণে তিনি সহজ পন্থা কামনা করেন"।[২৮৮]

নিম্নের হাদীসটি مقاصد الشريعة এর এশটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তিনদিন সালাতুত তারাবিহ আদায় করার পর পরবর্তীকালে নামাযের জন্য বের না হবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন,

ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم،

"তিন দিন পর নামাযের জন্য বের না হবার কারণ হলো, এ নামায তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবার আশংঙ্কা"।[২৮৯]

ইব্ন হাজার আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه،

"রমজান মাসের রাত্রীকালীন নামায নিয়মতি আদায় করা হলে উম্মতের দুর্বল শ্রেণির জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ ত্যাগ করার কারণে তারা গোনাহগার হিসেবে গণ্য হবে"।[২৯০]

আভিধানিক অর্থে পানি পান করার উৎসকে الشرع, الشرعة ও الشريعة বলা হয়।[২৯১] পরবর্তীতে আরবগণ সোজা ও সঠিক পথ বোঝনোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করে। এ অর্থে আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ثم جعلناك علي شريعة من الامر فاتبعها।" অতঃপর আমি আপনাকে দীনের এশটি সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। সুতরাং আপনি সে পথের অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।[২৯২]

দুনিয়া-আখিরাতের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য আকিদা, ইবাদত, আখলাক ও লেন-দেনসহ জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে যে বিধান প্রণয়ন করেন, তাকে পারিভাষিক অর্থে شريعة বলে। আধুনিককালে আল্লাহ প্রদত্ত সকল প্রকার কর্মগত বিধানের জন্য শরীয়ত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এ প্রয়োগে الشريعة শব্দটি ফিক্হ শব্দের সমার্থবোধক। مقاصد الشريعة দ্বারা ঐ সকল বিষয় উদ্ধেশ্য, যা বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং শরীয়ত প্রণয়নপূর্বক তা আমল করা ও বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মাকাসিদুশ শারীয়া (مقاصد الشريعة) সম্পর্কীয় জ্ঞান মুজতহিদের জন্য এশটি প্রধান শর্ত। শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনে এই শাস্ত্রের জ্ঞান মুজতাহিদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এই সংক্রান্ত জ্ঞান মুজতাহিদের চিন্তার বৈকল্য ও বিবেকের জড়তা দূরীভূত করে। 'নস' এর বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে

---

[২৮৭] আল কুরআন, ২; ১৮৫।

[২৮৮] আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযিদ আল তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬২।

[২৮৯] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ.৭০৭ ।

[২৯০] আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার, *ফতহুল বারী*, (বৈরুতঃ দারুল মারিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৩।

[২৯১] ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়া আল কাযবীনী, *মাকায়ীসুল লুগাহ*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ.২৫৬।

[২৯২] আল কুরআন, ৪৫; ১৮।

শরীয়ত প্রণ্ণোর ভাবার্থ ও মৌলিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পলন করে। মাকাসিদুশ শারীয়া সম্পর্কীয় জ্ঞান নস এর বিপরীতধর্মী অর্থের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বিধান ও সঠিক মর্ম নির্ণয়ে মুজতাহিদকে পথনির্দেশ করে। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে ও জনসমস্যা লাঘব করে। যা জান, মাল, ইজ্জত-আবরু ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও বংশধারা সংরক্ষণের গ্যারান্টি প্রদান করে।[২৯৩] মাকাসিদুশ শারীয়া (مقاصد الشريعة) সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং এর বাস্তবায়ন কুরআন-সুন্নাহর নসসমূহ বোঝার পূর্বশর্ত। অনেক ক্ষেত্রে এশটি শব্দ এশাধিক অর্থ প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারীয়া (مقاصد الشريعة) সম্পর্কীয় জ্ঞান ব্যতীত কোনো অর্থকে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়। তেমনিভাবে বিপরীতধর্মী দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারীয়া এর শাখা হিসেবে الاستحسان, المصلحة المرسلة অথবা العرف দ্বারা এশটি দলীলকে ১১০গ্রাধিকারপ্_দান করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী (৫৩৮-৫৮৯ হি.) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

الشريعة مبنية على اعتبار المصالح وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه و سلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله،

“মানব কল্যাণের উপরই শরীয়তের ভিত্তি। শরীয়ত প্রণ্ণোর নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশের উপর এটি নির্ভরশীল। মানুষের বোধ-জ্ঞানের উপর নয়। স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতার কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও ভিন্নতর হয়। অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত, মানব কল্যাণের তিনটি স্তর রয়েছে। মানুষ এশটি স্তরে উপনীত হবার পর প্রতিটি মাসআলা ও অধ্যায়ে শরীয়ত প্রণ্ণোর মূল উদ্দেশ্য বোঝার যোগ্যতা অর্জন করে। শিক্ষা, ফতোয়া ও প্রজ্ঞায় নবীর প্রতিনিধির স্থলে অভিষিক্ত হবার কারণে মানুষ এ গুণ অর্জন করে। এ যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত”।[২৯৪]

২.২.৯. যুগের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া

যুগের চাহিদা, সময়ের বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তনের গতি-বিধি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা মুজতাহিদ হবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এতে যুগের চাহিদা ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মাসআলা উদ্ভাবনে সহায়তা লাভ করা যায়। কেননা সময়ের পরিবর্তনে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হওয়া উসূলে ফিক্হ এর একটি অনবদ্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিধান। সামাজিক রীতিনীতি, সময় ও স্থানের বিবর্তনে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হবার ক্ষেত্রে নিম্নের আয়াতটি মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৯৫]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ،

---

[২৯৩] আবু মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আবদুর রহিম ইব্নুল হাসান ইব্ন আলী, *নিহায়াতুস সূল শারহু মিনহাজিল উসূল*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

[২৯৪] শাতিবী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মুয়াফাকাত*, সম্পাদনা: আবু উবাইদা মাশহুর, (কায়রো: দারু ইব্ন আফ্ফান, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০৬।

[২৯৫] আল কুরআন, ৭; ১৯৯।

জালালুদ্দীন সিয়ূতী (র) বলেন, সমাজের প্রচলন ও রীতি-নীতি ইসলামী শরীয়তের দলীল হবার ক্ষেত্রে এই আয়াতটি মূল ভিত্তি।[২৯৬]

ব্যক্তিস্বভাবের প্রভেদ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তনে নিম্নের আয়াতটিও দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[২৯৭]

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ،

এই আয়াত দ্বারা পুরুষের সামর্থ্যের প্রেক্ষিতে দুগ্ধদানকারী শিশুমাতার ভরণ-পোষণ এর বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা সমাজে অসমর্থ ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের বাইরে কোনা কিছু চাপিয়ে দেয়ার বিধান নেই। আবার সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ন্যায্য পাওনা থেকে অব্যাহতি দেয়ারও কোনো প্রচলন নেই।[২৯৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামের বিধান পরিবর্তনের উদাহরণ নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر،

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যদি তোমার এ মুশরিক সম্প্রদায় (কুরাইশ গোত্র) জাহিলী অথবা কুফরী সমাজ থেকে মুসলিম হওয়ার সময় বেশি দেরি না হতো, আমি কাবার তলদেশের ধনভাণ্ডার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতাম। এটির দরজা মাটির সঙ্গে সংযুক্ত করে হাজারে আসওয়াদকে কাবার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম"। [২৯৯]

সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়ে ফতোয়া প্রদান করা মুফতীর জন্য যেভাবে জায়েয নয়, তেমনিভাবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা না করে মাসআলা উদ্ভাবন করাও মুজতাহিদের জন্য কাম্য হতে পারে না। সময় ও যুগের পরিবর্তন সমাজে বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের বিবর্তন শরীয়তের বিধি প্রয়োগে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। পরিবেশ-প্রতিবেশ যাচাই করে মাসআলা উদ্ভাবন করা মুজতাহিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। শরীয়তের বিধি-নিষেধ জ্ঞাত হবার পাশাপাশি সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বভাব-চরিত্র, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল লোকজ আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে ইজতিহাদকর্মে নিয়োজিত হলে সমাজের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হবার সমূহ আশঙ্কা তৈরি হয়। ইসলামে মানবীয় স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তনের কারণে বিধি পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইসলামের সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্নকর্তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করেন। সহীহ বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ،

---

[২৯৬] ইব্‌নুন নাজ্জার আল ফুতূহী, আবুল বাকা তাকিউদ্দীন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *শরহুল কাওকাবিল মুনীর*, সম্পাদনাঃ ড. যুহাইলী, (রিয়াদঃ মাকতাবা আবিকান, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.), খ.৪, পৃ. ৪৪৮।

[২৯৭] আল কুরআন, ২;২৩৩।

[২৯৮] ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, সম্পাদনা: আবদুর রায্‌যাক আল মাহদী, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭২।

[২৯৯] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২. পৃ. ৯৬৯, হাদীস নং- ৪০০।

"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের কোন আমলটি বেশি উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, মানুষকে অন্ন দান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সব মুসলিমকে সালাম করা"।[৩০০]

একই প্রশ্নের ভিন্নধর্মী উত্তর প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ،

"সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের কোন আমলটি বেশি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে"।[৩০১]

মুজতাহিদ হবার জন্য উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যাপারে উসুলে ফিকহ এর ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো, যা কিছু কিছু উসুলবিদ মুজতাহিদ হবার জন্য শর্তারোপ করেছেন।

২.২.১০.ফিক্হ শাস্ত্রে উদ্ভাবিত আনুষঙ্গিক মাসআলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা

ফিক্হ শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালার আলোকে উদ্ভাবিত শাখা মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মুজতাহিদ হবার পূর্বশর্ত। এতে মুজতাহিদের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ হয়। পূর্ববর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের পারস্পরিক মতবিরোধ ও তাদের দলীল গ্রহণ প্রক্রিয়ার চর্চার মাধ্যমে মাসআলা উদ্ভাবনে মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়া সহজতর হয়। ইজতিহাদের ফলাফল বিবেচনায় এটি মুজতাহিদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ،

"পূর্ববর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের আচরিত নিয়ম-নীতি, উক্তিসমূহ, তাদের পারস্পরিক ঐক্য-অনৈক্য ও আরবের ভাষারীতি সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে কারো জন্য ইজতিহাদ করা সংগত নয়"।[৩০২]

ইমাম গাযালী ও অন্যান্য ফকীহদের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত ফুরুআত (শাখা মাসআলা) সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা শর্ত। কেননা পূর্ববর্তী মুজতাহিগণের উদ্ভাবিত ফুরুআত কি কি, কোন পদ্ধতিতে তারা এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, তা জানা থাকলে নতুন নতুন মাসআলা উদ্ভাবন মুজতাহিদের জন্য সহায়ক হয়।

কিছু কিছু উসূল শাস্ত্রবিদের মতে ফিকহী মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মুজতাহিদের জন্য শর্ত নয়। ইমাম ফুতূহী (র) (মৃ.৯৭২ হি.) বলেন, মুজতাহিদের প্রধান কাজই হলো নতুন নতুন মাসআলা উদ্ভাবন করা। এটি ইজতিহাদের ফসল। আর ফলাফল কখনো শর্ত হতে পারে না। সুতরাং উদ্ভাবিত শাখা মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মুজতাহিদের জন্য শর্তযুক্ত করা অযৌক্তিক।

---

[৩০০] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ৬।

[৩০১] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ১০।

[৩০২] আশ শাফিঈ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস, *আর রিসালাহ*, (মিসর: মাকতাবাতুল হালাবী, ১৩৮৫ হি./১৯৪০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫০৯।

২.২.১১. দীনের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা

দীনের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের মর্মার্থ হলো দীনের জরুরি বিষয়াবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। নবী-রাসূলগনের প্রতি ঈমান রাখা ও নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রচারিত শরীয়তকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা। এক দল উসূলবিদের মতে এ বিষয়ে (أصول الدين) জ্ঞান লাভ মুজতাহিদের জন্য শর্ত নয়। তারা মৌলিক বিষয় বলে (أصول الدين) 'ইলমুল কালাম'কে বুঝিয়েছেন। ইলমুল কালাম এর সঙ্গে ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ফুতূহী বলেন,

لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بعلم الكلام أي علم أصول الدّين،

ইমাম রাফিঈ বলেন, উসূল শাস্ত্রবিদগণ ইলমুল কালাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মুজতাহিদের জন্য শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম আল মারমাবী (র) বলেন।

والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزاليّ حيث قال : وعندي أنّه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلّمين بأدلّتهم الّتي يحرّرونها،

"দ্বি-ধারার উসূলবিদগণের মতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, ইমাম গাযালীর উক্তির মর্মার্থ হলো, মুজতাহিদদের জন্য এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। কালাম শাস্ত্রবিদগণ তাদের শাস্ত্রের আলোকে ইলমুল কালামকে যেভাবে দলীল-প্রমাণের আলোকে আলোচনা করে থাকেন, সেভাবে বিশ্লেষণ করা মুজতাহিদ এর জন্য শর্ত নয়। তবে এ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক"।[৩০৩]

২.২.১২.আকলী দলীল সম্পর্কে ধারণা থাকা

ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযীসহ (র) অনেক উসূলবিদ মাসআলা ইসতেম্বাতের ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকার বিষয়টি মুজতাহিদের জন্য শর্তারোপ করেছেন। কেননা নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলির সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে দলীলে আকলী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আবার অনেক উসূলবিদ মুজতাহিদের জন্য মানতিক শাস্ত্রের (তর্কবিদ্যা) জ্ঞান থাকারও শর্তারোপ করেছেন। তবে উসূল শাস্ত্রবিদগণের একটি জামাত এর বিপরীত মত প্রদান করে বলেন, শরয়ী দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে ইজতিহাদী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দলীলে আকলীর উপর ইজতিহাদ নির্ভর নয়। সুতরাং এটি ইজতিহাদের পূর্বশর্ত হতে পারে না। দলীলে আকলী দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধের যৌক্তিকতা তুলে ধরা ও শরীয়া আইনের উপর আরোপিত নেতিবাচক প্রশ্নসমূহের যুক্তিসঙ্গত জবাব উপস্থাপন করা। ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহ বিজ্ঞান ও বিবেকসম্মত হওয়ার বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং এটি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বিবেকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান-টেকনোলোজির ক্রমোন্নতি ও অবাধ তথ্য-প্রবাহের যুগে ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রতিনিয়ত যুক্তিসম্মত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দলীলে আকলীর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুজতাহিদের জন্য দলীলে আকলীর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ইমাম যারকাশী (র) বলেন,

---

[৩০৩] ইব্নুন নাজ্জার আল ফুতূহী, আবুল বাকা তাকিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *শারহুল কাওকাবিল মুনীর*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবিকান, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭।

فَلْيَعْرِفْهُ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ فَإِنَّهُ مَنَاطُ الاِجْتِهَادِ وَأَصْلُ الرَّأْيِ وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَمَنْ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهُ الاِسْتِنْبَاطُ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ نَعَمْ إِنْ جَوَّزْنَا تَجَزُّؤَ الاِجْتِهَادِ فَهَذِهِ الْحَاجَةُ لَا تَعُمُّ وَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى النَّصِّ لَا يُحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ فِيهَا،

"দলীলে আকলীর যাবতীয় শর্ত ও রুকনসমূহ আত্মস্থ করা মুজতাহিদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এটি ইজতিহাদ ও রায় প্রয়োগের অন্যতম ভিত্তি। রায় প্রয়োগের ভিত্তিতে ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাসআলা উদ্ভাবনের জন্য দলীলে আকলী অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে ইজতিহাদকে বিভিন্ন অংশে বিভক্তকরণের বেলায় এটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকতা হারায়। শরীয়তের যে সকল বিধান অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাতে যুক্তিসম্মত দলীলের প্রয়োজনীয়তা একবারেই গৌণ। [৩০৪]

ইব্‌ন দাকিকুল ঈদ (র) (৬২৫-৭০২হি.) বলেন,

وَيَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ هَذَا أَنْ لَا يَكُونَ الظَّاهِرِيَّةُ النُّفَاةُ لِلْقِيَاسِ مُجْتَهِدِينَ،

"ইজতিাদের ক্ষেত্রে দলীলে আকলী শর্তারোপ করার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, জাহিরি (الظاهرية) সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইসলামের চতুর্থ দলীল কিয়াসকে অস্বীকার করে, তাদের মুজতাহিদ হবার পথ রুদ্ধ করা"। [৩০৫]

২.২.১৩. সাহাবী ও তাবিঈদের অভিমত ও ফতোয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা

মুজতাহিদের জন্য কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের পাশাপাশি আহকামে শরঈয়্যাহ সংক্রান্ত সাহাবী ও তাবিঈদের অভিমত ও ফতোয়া জানা থাকা জরুরি। ইমাম বগবী (র) (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন, তাদের অভিমতসমূহ জানা না থাকলে অনেক সময় ইজমা'র বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয় না। সাহাবায়ে কেরামের নীতি-আদর্শ মেনে চলার ব্যাপারে ইমাম বুখারী তার বিশুদ্ধ সংকলন সহীহ বুখারীতে হুজায়ফা (রা) এর একটি উক্তি বর্ণনা করেন,

يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا،

"হে কুরআন-সুন্নাহর পাঠকবর্গ! তোমরা সঠিক পথে অটল থেকো। এভাবেই প্রাথমিক যুগের মনীষীদের অনুকরণে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে। আর ডানে-বামের বিক্ষিপ্ত পথসমূহে চলতে থাকলে, তোমাদের জন্য মারাত্মক গোমরাহীর আশঙ্কা রয়েছে"।[৩০৬]

দীনের সার্বিক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবী হুজায়ফা (রা) বলেন,

كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القُرَّاء خذوا طريق من كان قبلكم،

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম যে পদ্ধতিতে ইবাদত করেননি, তোমরা সে পদ্ধতির ইবাদত করা থেকে বিরত থেকো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

---

[৩০৪] যারকাশী, আবু আবদিল্লাহ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, *আল বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ*, (কায়রো: দারুল কুতবা, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৩, খ. ৮।

[৩০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩, খ. ৮।

[৩০৬] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৯৩, হাদীস নং-৭২৮২।

হাতে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোনো বিষয়ে আপত্তি করার মতো কিছু রেখে যাননি। সুতরাং হে কুরআন-সুন্নাহর পাঠকবর্গ! তোমরা পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করো"।[৩০৭] ইজতিহাদ হলো সর্বোত্তম ইবাদত। এতে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণের বিকল্প নেই। পরবর্তী উম্মতের সংশোধন ও উন্নতির জন্যও সাহাবায়ে কেরামের সার্বিক জীবনালেখ্য চর্চা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র) বলেন,

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،

"এই উম্মতের সর্বশেষ জনগোষ্ঠীর সফলতা ও সংশোধন সে পথেই নিহিত, যে পদ্ধতিতে তাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ সংশোধিত হয়েছিলেন"।[৩০৮]

মুজতাহিদের জন্য আরোপিত শর্তাবলির মধ্যে আরো কয়েকটি শর্তের আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো, যে গুলো অনেক উসূলবিদ মুজতাহিদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে সংযোজন করেছেন।

২.২.১৪. ইজতিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা

মুজতাহিদের মধ্যে ইজতিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা দরকার। কবি ও সাহিত্যিক হওয়ার জন্য যেমন স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। যেনতেন উপায়ে সাহিত্যকর্ম তৈরি করলেই কবি-সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। তদ্রুপ মুজতাহিদ হবার জন্যও ইজতিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল কুরআন হাদীসের বিশাল একটি অংশ মুখস্থ করে নিলেই মুজিতাহিদ হওয়া যায় না। ড. যিদান (জন্ম. ১৯৫৮ খ্রি.) 'আল ওয়াজিয' গ্রন্থে বলেন, কবি হওয়ার জন্য যেমন কেবলমাত্র কতগুলো শব্দ, শব্দের অর্থ ও কবিতার ছন্দ মুখস্থ করা যথেষ্ট হয় না। মূল শাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়া জরুরি। তদ্রুপ মুজতাহিদ হবার জন্যও ইজতিহাদের স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল কুরআন হাদীসের বিশাল একটি অংশ মুখস্থ করে নেয়াই যথেষ্ট নয়। [৩০৯]

২.২.১৫. শরীয়তের মেযাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া

মুজতাহিদের জন্য শরীয়তের মেযাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। মেযাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে দুইজনের রায় ও সিদ্ধান্ত দুইরকম হয়। শরীয়তের মেযাজ সম্পর্কে অবগতি না থাকার দরুণ অনেকেই প্রচুর পড়াশোনা করেও বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। এতে পুরো জাতি ফিতনায় নিমজ্জিত হয়।

---

[৩০৭] সিয়ূতী, জালালুদ্দীন, আবদুর রহমান ইব্‌ন কামালুদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল আমরু বিল ইত্তেবায়ি ওয়ান নাহয়ু আনিল ইবতিদায়ি*, (রিয়াদঃ মাতবাউর রশীদ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ৬২।

[৩০৮] ইব্‌ন তায়মিয়া, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, *ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম*, সম্পাদনা নাসির আবদুল কারীম, (বৈরুতঃ দারু আলামিল কুতুব, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭১৮।

[৩০৯] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫০।

পরিচ্ছেদ- ৩
মুজতাহিদের দলীল

আল কুরআন হলো ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। পার্থিব জগতের অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রও আল কুরআন থেকে উৎসারিত। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ،

"হে রাসূল! আমি আপনার উপর প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি কিতাব নাযিল করেছি"।[৩১০]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি আল কুরআনে কোনো কিছু বাদ দেইনি"।[৩১১]

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত,

إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين،

"তোমরা জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে আল কুরআনকে প্রাধান্য দাও। কেননা এতে রয়েছে পূর্বাপর সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান"।[৩১২]

দীনের যাবতীয় বিষয়ের মতো ইজতিহাদের প্রধান উৎসমূল হলো আল কুরআনের আয়াতসমগ্র। আল কুরআনের অনেক আয়াতে ইজতিহাদের নির্দেশনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আল কুরআন এবং তাঁর বর্ণিত ইজতিহাদ সম্পর্কিত ঘটনাবলিই ইজতিহাদের একমাত্র উৎস ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবর্তমানে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামই ছিলেন সকল প্রকার কর্মকান্ডের আশ্রয়স্থল ও সকলের অনুকরণীয় আদর্শ। পরবর্তী যুগে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি, তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের অনেক কর্মপন্থাও ইজতিহাদের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ নিম্নরূপ,

১.কুরআন القران
২.সুন্নাহ السنة
৩.ইজমা الاجماع(ঐকমত্য)
৪.কিয়াস. قياس (সাদৃশ্যকরণ)
৫. সাহাবায়ে কেরামের অভিমত أقوال الصحابة
৬.ইসতিহসান استحسان (কোনো বিষয়কে উত্তম মনে করা)
৭.ইসতিদলাল استدلال(দলীল গ্রহণ করা)
৮.মুসলিহাত مصلحات (জনকল্যাণ)
৯.ফকীহ ও মুজতাহিদগণের রায় راي الفقهاء و المجتهد ين
১০.তাআমুল تعامل (প্রচলিত রীতিনীতি)
১১.উরফ ও রসম عرف و رسم(প্রচলিত প্রথা ও রেওয়াজ)
১২.অতীতকালের নবীগণের শরীয়ত شرائع الأنبياء السابقة
১৩.দেশজ আইন قانون بلدي

---

[৩১০] আল কুরআন, ১৬: ৮৯।
[৩১১] আল কুরআন, ৬: ৩৮।
[৩১২] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬।

১৪.মাসালিহে মুরসালাহ مصالح مرسله (জনস্বার্থ)
১৫. ইবাহাত اباحة (বৈধতা দেওয়া বা দৃশ্যমান করা)
১৬.ইসতিসহাবে হাল استصحاب حال (বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

২.৩.১. আল কুরআন (القران)

اَلْقُرْآن শব্দটি قرأ ক্রিয়ার ধাতুমূল থেকে নির্গত। অর্থ পাঠ করা, পড়া। এটি পঠিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে আল কুরআনকে এ নামে নামকরণ করা হয়।
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কুরআন এর সংজ্ঞা হলো,
الكتاب المنزل علي الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلامتواترا بلا شبهة،
"কিতাব (কুরআন) ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং মুতাওয়াতির[৩১৩] ও সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে। [৩১৪]
ইমাম রাগিব ইসফাহানী (মৃ. ৫০২/১১০৮) বলেন, قرأ শব্দ থেকে কুরআন শব্দের উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ একত্র করা, জমা করা ইত্যাদি। কোনো বিষয় অধ্যয়ন ও পাঠ করার জন্য প্রচুর অক্ষর ও শব্দসম্ভার একত্র করতে হয়। এ ন্যূনতম সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে 'কুরআন' শব্দটি অধ্যয়ন ও পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩১৫] কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম আমীদী (মৃ.৬৩১ হি.) বলেন,
أَمَّا حَقِيقَةُ الْكِتَابِ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: هُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ بِالْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا،
"মাসহাফে উসমানীতে প্রসিদ্ধ সাত কিরায়াতসম্বলিত মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা যা আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে তা হলো কিতাবুল্লাহ"।[৩১৬]

২.৩.২. সুন্নাহ (السنة)

সুন্নাহ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও রীতি-নীতি ইত্যাদি। আল কুরআনে সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،

---

[৩১৩] মুতাওয়াতির এমন বর্ণনাকে বলা হয়, যা প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অথবা যাদের থেকে আকস্মিকভাবে মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ হওয়া অসম্ভব।
[৩১৪] মোল্লা জিউন, *নূরুল আনওয়ার*, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৫৭।
[৩১৫] রাগিব ইসফাহানী, আবুল কাসিম হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন*, (বৈরুত: দারুল কলম, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ৬৩৯।
[৩১৬] আমীদী, আবুল হুসাইন, সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবি আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, তা./বি), পৃ. ১৬০, খ. ১।

"পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর রীতি। তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না"।[৩১৭]

হাদীস শরীফেও সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সহীহ মুসলিম শরীফে জারির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُول الله من سنّ فِي الْإِسْلَام سنة حَسَنَة فَلهُ أجرهَا وَأجر من عمل بهَا من بعده من غير أَن ينقص من أُجُورهم شَيْء وَمن سنّ فِي الْإِسْلَام سنة سَيِّئَة كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بهَا من بعده من غير أَن ينقص من أوزارهم شَيْء،

وَهَذَا الْمَعْنى روى عَن النَّبِي من عدَّة وُجُوه صِحَاح وَحسان،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পদ্ধতি উদ্ভাবন করলে সে তার সওয়াব পাবে। আর যারা সে অনুযায়ী আমল করবে তার সওয়াবও সে লাভ করবে। এতে কারো নেকি হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে, সে এর গুনাহের ভাগী হবে এবং যে তা অনুসরণ করবে তার পাপেরও সে অংশিদার হবে। তবে কারো পাপ হ্রাস করা হবে না"।[৩১৮]

হাদীসটির মর্ম সহীহ ও হাসান এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাহ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা এবং কাজের উপরও প্রযোজ্য হয়।

সুন্নাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মোস্তফা সিবায়ী (মৃ. ১৩৮৪ হি.) বলেন,

وهي في اصطلاح الْمُحَدِّثِينَ: ما أُثِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيَّة أو خُلُقِيَّة أو سيرةسواء كان قبل البعثة أو بعدها وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم،

"মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা কাজ, সম্মতি, তাঁর সৃষ্টিগত, চরিত্রগত ও বর্ণনাগত যে সকল গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তা হলো সুন্নাহ। এগুলো তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বের হোক বা পরের। অনেকের পরিভাষায় এটিকে হাদীসও বলে"।

মোস্তফা সিবায়ী এর মতে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীস হলো,

ما نقل عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أو فعل أو تقرير،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ এবং সম্মতিকে হাদীস বলা হয়"।[৩১৯]

সুন্নাহ প্রধানত তিন প্রকার

১.সুন্নাতে কাওলি বা বাচানিক সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষিতে যে সব কথা বলেছেন তা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. সুন্নাতে ফেলী বা কর্মজাতীয় সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি সহকারে আদায় করা, হজ পালন করা । এগুলো সবই এ জাতীয় সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

---

[৩১৭] আল কুরআন, ৩৩: ৬২।

[৩১৮] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৭০৪।

[৩১৯] মুসতাফা আস সিবায়ী, *আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী*, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ৬৫।

৩. সুন্নাতে তাকরীরী বা মৌন সমর্থনমূলক সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তার গোচরে বা অগোচরে যে সব কাজ করেছেন, অথবা পরবর্তীতে অবগত হওয়ার পর তাতে মৌন সমর্থন দিয়েছেন। এ জাতীয় কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

২.৩.৩. ইজমা (اجماع)

ইজমা শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো ঐকমত্য ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া। আল কুরআনে ইজমা শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ,

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ،

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদের জমায়েত করো"।[৩২০]

উপর্যুক্ত অর্থে আল হাদীসে ইজমা শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সুনানু আবী দাউদ এ বর্ণিত আছে,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَه،

"যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযা রাখার সংকল্প করবে না তার রোযা হবে না"।[৩২১]

ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান গ্রন্থে ইজমা এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

"একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো বাচনিক ও কর্মসূচক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে"।

'আল উদ্দাহ ফি উসূলিল ফিক্‌হ' গ্রন্থকার বলেন,

وهو في الشرع: عبارةٌ عمن تثبت الحجة بقوله،

"যে সকল মুজতাহিদের কথা দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় তা হলো ইজমা"।[৩২২]

২.৩.৪. কিয়াস (قياس)

ইসলামী শরীয়তের দলীলসমূহের মধ্যে কিয়াস এর অবস্থান হলো চতুর্থ। এটি ইজতিহাদ ও ইসতেম্বাতের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সুন্নাহর আলোচনাকালে নস এর পাশাপাশি তার কারণ বর্ণনা করে কিয়াস ইসলামী শরীয়তের দলীল হওয়ার বিষয়টির বাস্তব পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহ'য় তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। তারা কিয়াসকে শরীয়তের বিধান অন্বেষণে উৎসজ্ঞান করতেন এবং প্রয়োজনের সময় তার বাস্তব প্রয়োগ করেছেন।

---

[৩২০] আল কুরআন, ১০; ৭১।

[৩২১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), পৃ. ৩২৯. খ. ২।

[৩২২] আবু ইয়ালা, মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন, *আল উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, (রিয়াদ: জামিয়াতুল মালিক মুহাম্মদ ইব্‌ন সউদ, ২য় সংস্করণ, ১৪১০/১৯৯০), খ. ৩, পৃ. ৬৬।

কিয়াসের অভিধানিক অর্থ

কিয়াস শব্দটি বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করা, পরিমাপ করা।

আরবরা বলে, قايست الأمرين مقايسة و قياسا 'আমি দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে দেখেছি [৩২৩]'

খ. সমতা বিধান করা। আরবী প্রবচনে বলা হয়, قست هذا الكتاب بذاك اذا ساويت بينهما

'আমি এই পুস্তকটি ঐ পুস্তকের সমপর্যায়ের পেয়েছি'।[৩২৪]'

কিয়াসের পারিভাষিক অর্থ,

الحاق أمر غير منصوص علي حكمه بامر منصوص علي حكمه لاشتراكهما في العلة،

"দুটি হুকুমের ইল্লত ও কারণ এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে যে হুকুমে নস নেই তাকে নসযুক্ত হুকুমের সঙ্গে যুক্ত করা"।[৩২৫]'

কিয়াস ইসলামী শরীয়তের উৎস হওয়ার দলীল,

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ،

"আল্লাহর নিকট নিশ্চয় ঈসা (আ.) এর দৃষ্টান্ত আদম (আ.) এর দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, হয়ে যাও। অমনি তিনি হয়ে গেলেন"।[৩২৬]

এখানে আল্লাহ তায়ালা ঈসাকে (আ.) আদম (আ.) এর সঙ্গে যে বিষয়ে তুলনা করেছেন তা হলো, আদম (আ.) এর সৃষ্টির পেছনে পিতা-মাতার কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আদমকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনিভাবে পিতা ছাড়া ঈসাকে (আ.) সৃষ্টি করতে আল্লাহর কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

কিয়াসের প্রামাণিকতায় সুন্নাহর দলীল

পূর্বে কিয়াসের প্রমাণিকতায় আল কুরআনের দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুন্নাহর দলীল উপস্থাপন করা হলো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত,

هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِوَأَنْتَ صَائِمٌ،

"আমি একদিন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে এই মর্মে ঘটনার বিবরণ দিলাম যে, আমি আজকে একটি মারাত্মক অপরাধ করেছি। রোযা রেখে চুম্বন করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি রোযা

---

[৩২৩] আর রাযী, আবুল হুসাইন যাকারিয়া আহমাদ ইব্ন ফারিস আল কাযবীনী, *মুজামু মাকায়ীসিল লুগাহ,* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি. /১৯৭৯ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪০।

[৩২৪] সানিকী, যাকারিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন যাকারিয়া আল আনসারী যাইনুদ্দীন আবু ইয়াহয়া, *আল হুদূদুল আনীকা ওয়াত তারীফাতিদ দাকীকা*, সম্পাদনাঃ মাযিন আল মুবারক, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১১ হি.), পৃ. ৮১।

[৩২৫] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৮।

যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুতঃ দারুল ফিকরিল মুআসির, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬০৩।

[৩২৬] আল কুরআন, ৩; ৫৯।

রাখাবস্থায় কুলি করো এতে কি রোযার কোনো অসুবিধা হয়? আমি বললাম, না। কোনো অসুবিধা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটাও অনুরূপ।[৩২৭]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভঙ্গ না হবার ব্যাপারে চুম্বন করাকে কুলি করার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দুটি কাজের মধ্যে একটি বিষয়কে অভিন্ন কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তা হলো নিষিদ্ধ কাজ না করেও তার প্রতি মনোভাব পোষণের দিকে অগ্রগামিতা। সুতরাং পানি পান না করে কুলি করলে যেভাবে রোযার কোনো অসুবিধা হয় না, স্ত্রীসঙ্গম না করে চুম্বন করলেও রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।

কিয়াসের উদাহরণ

মদ্যপান নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে আল কুরআন এর বাণী হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর শয়তানের ঘৃণ্য কাজের একটি। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো "।[৩২৮]

আল্লাহ তায়ালা উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা মদ্যপান হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ এতে রয়েছে মাদকতাসহ নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান। আয়াতে বর্ণিত 'খাম্‌র' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি মদ। এ মদ পান করলে মাদকতা আসে। আয়াতে বর্ণিত 'খামর' ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। যা সেবনকারীর মধ্যে মাদকতা আনে। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণ মাদকতা সৃষ্টিকারী অন্যান্য দ্রব্যগুলোকেও 'খাম্‌র' এর অর্ন্তভুক্ত করেন।

অনুরূপভাবে উপর্যূক্ত শরীয়তের দলীল দ্বারা জুয়াও হারাম ঘোষিত হয়েছে। হারাম ঘোষণার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ হরণ করা। লটারির মধ্যে এ কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুজতাহিগণ তাও হারাম ঘোষণা করেছেন।

উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটিতে যে মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে নস নেই, তাকে নস আছে এমন মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছে। উভয় মাসআলার ইল্লত বা কারণ এক ও অভিন্ন। আর ইল্লত অভিন্ন হওয়ার কারণে উভয় মাসআলার হুকুমকে এক পর্যায়ের সাব্যস্ত করাকে উসূলে ফিক্‌হ এর পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়।[৩২৯]

২.৩.৫. সাহাবায়ে কেরামের অভিমত (أقوال الصحابة)

ফকীহ-মুজতাহিদগণ শরীয়তের যে সকল উৎস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন তম্মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। সাহাবায়ে কেরামের উক্তি বলে কোনো বিষয়ে তাঁদের বর্ণনা, নির্দেশ, ফতোয় অথবা আমলকে বোঝায়। এ সকল বিষয় এমন ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

---

[৩২৭] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ), পৃ. ১৪৭, খ. ২. হাদীস নং- ২৩৮৫।

[৩২৮] আল কুরআন, ৫: ৯০।

[৩২৯] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই. ফা. বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৮।

যেখানে কুরআন-সুন্নাহর নস নেই। আকিদা, ঈমান ও ইবাদতসহ যে সকল বিষয়ের ভিত্তি ঐশী বিধানের উপর নির্ভরশীল, সে সকল বিষয়ে তাদের অভিমতের মর্যাদা মরফু হাদীসের (حديث مرفوع) মতো। যার ফলে তাদের অভিমত ইসলামী শরীয়তের দলীল হিসেবে পরিগণিত। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদী সিদ্ধান্ত হলো, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর উপর কোনো ধরনের মিথ্যারোপ করেন না এবং বিরোধিতাও করেন না। সাহাবায়ে কেরামের উক্তি পরবর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের জন্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য সাহাবীর জন্য নয়। তাদের পারস্পরিক ভিন্নমত পরবর্তী উম্মাহর জন্য সত্যের মানদণ্ড হিসেবে ধর্তব্য হবে। এই পবিত্র কাফেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক সান্নিধ্য অর্জনে ধন্য হয়েছেন। কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরীয়তের বিধান লাভ করেছেন। তাঁরা ইসলামের সূচনাকালের পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাগ-বিরাগে, স্বদেশ ও সফরে থাকাবস্থায় তাঁর সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনাবলি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। সব দিক বিবেচনায় সাহাবায়ে কেরামের উক্তি শরীয়তের উৎস হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য।[৩৩০]

وحقيق بمَن كانت آراؤُهم بهذه المنزلة أن يكون رأيُهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب نبيهم ولا واسطة بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس،

সাহাবায়ে কেরামের উক্তি গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত

ক. দীনের মৌলিক বিষয় ও আকায়েদ সংক্রান্ত নীতিমালা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই।

খ. কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে বিশেষত উক্ত বিষয়ে অন্য কোনো সাহাবীর দ্বিমত না থাকলে উক্ত মত গ্রহণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া বলেন,[৩৩১]

وأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنْ انْتَشَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ فِي زَمَانِهِمْ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ويعدونه إجماعا ،

গ, পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের কারো মতের বিপক্ষে অন্য কোনা সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া গেলে ঐ মত দলীল না হবার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কারো দ্বিমত নেই।

ফকীহ-মুজতাহিদগণ এই বিষয়ে কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. ইমাম আবু হানীফা (র) ও জমহুর ফকীহ-মুজতাহিদগণের মতে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ইসলামী শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এটি কিয়াসের উপর অগ্রগামী। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (র) এর একটি মতও অনুরূপ।[৩৩২]

---

[৩৩০] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৪।

[৩৩১] ইব্‌ন তায়মিয়া, তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, সম্পাদনা: আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, (মদীনা মুনাওয়ারা: মাজমাউল মালিক ফাহদ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২০, পৃ. ১৪।

[৩৩২] মাজদুদ্দীন আবদুস সালাম ইব্‌ন তায়মিয়া, *আল মুসাওয়াদা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন কাযী আবদুল হামীদ (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, তা/বি.), খ. ১. পৃ. ৩৩৬।

২. সাহাবায়ে কেরামের উক্তি কিয়াসের অনুকূলে হলে এটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এটি ইমাম শাফিঈ (র) এর দ্বিতীয় মত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,[৩৩৩]

إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم،

৩. ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন,[৩৩৪] অনেক ইমামের মতে এটি কিয়াসের বিপরীত হলেও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৪. ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমাদ এর এক বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ইসলামী শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৩.৬. ইসতিহসান (استحسان)

ইসতিহসান (استحسان) শব্দটি حسن ধাতু থেকে উৎগত। এর অর্থ হলো উত্তম, ভালো, সুন্দর ও মন্দের বিপরীত। এ হিসেবে ইসতিহসান শব্দের অর্থ হলো কোন বিষয়কে কল্যাণকর ও উপকারী মনে করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়-

"একটি বিষয়ের দুটি দিকের মধ্যে কোনো একটি দিককে যুক্তিসঙ্গত দলীলের ভিত্তিতে অপর দিকের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকে ইসতিহসান বলে" ।[৩৩৫]

মাওলানা আবদুর রহীম বলেন, কিয়াস পরিত্যাগ করে জনগণের কল্যাণের স্বার্থে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণকেই ইসতিহসান বলা হয়।[৩৩৬]

ইসলামের চতুর্থ দলীল কিয়াসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিয়াসে জলি (قياس جلي) ও কিয়াসে খফি (قياس خفي)। কিয়াসে খফি এর অপর নাম ইসতিহসান। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিয়াসে জলি একটি বিষয় কামনা করে। অন্য দিকে হাদীস, ইজমা, গোপন কিয়াস ও জনকল্যাণ এর চাহিদা হলো ভিন্ন কিছু। এমতাবস্থায় কিয়াসে জলি বর্জন করে তার বিপরীত আমল করাকে ইসতিহসান বলে।

ইসতিহসানের প্রামাণিকতা

ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য হলো কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা অবলম্বন করা। শরীয়ত প্রণেতার মূল লক্ষ্যও তাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ،

"তোমাদের জন্য যা সহজ আল্লাহ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তিনি তা চান না" ।[৩৩৭]

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

---

[৩৩৩] বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, সম্পাদনাঃ মুাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী, (কুয়েতঃ দারুল খুলাফা লিল কিতাবিল ইসলামী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ১০৯।

[৩৩৪] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, ইলামুল মুয়াক্কিঈন, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯২।

[৩৩৫] সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৯৬ খ্রি.), খ.১, পৃ. ২০।

[৩৩৬] মাওলানা আবদুর রহিম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, (ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৩।

[৩৩৭] আল কুরআন, ২: ১৮৫।

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি"।[৩৩৮]
অন্যত্র বলা হয়েছে,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ،

"যারা কোনো কথা শোনার পর উত্তম কথাটি অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়ত করেছেন এবং তারাই হলো বুদ্ধিমান"।[৩৩৯]

ইসতিহসান এর প্রয়োজনীয়তা

স্থান, কাল, পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কোনো সমস্যার সমাধান যদি ইসলামী শরীয়তের প্রধান চারটি মূল উৎসে পাওয়া না যায়, তখন জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে সমাধানের পথ খোঁজাই হলো যুক্তিসঙ্গত। যা ইসলামী শরীয়তের প্রধান লক্ষ্য। এ বিবেচনায় ইসতিহসান একটি সুন্দর পন্থা। এটিকে আইনের মর্যাদা দেয়াও বিবেকসঙ্গত। ইসলামে স্বীকৃত প্রায় সকল মাযহাবের ইমামগণ এটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২.৩.৭. ইসতিদলাল (استدلال)

الاستدلال শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা। এর অর্থ তলব করা, খোঁজ করা বা দলীল এর সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা, যুক্তি প্রদর্শন করা। ফিক্‌হ শাস্ত্রে এটি এমন একটি পরিভাষা, যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা হয়।

কখনো কখনো এটিকে ইসতিহসান এর চেয়েও ব্যাপক ও শক্তিশালী মনে করা হয়। তবে ইজতিহাদ ও সমস্যা সমাধানের কোনো বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়। বরং ফিক্‌হবিদগণ ইজতিহাদের জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তার প্রায় সবই ইসতিদলাল এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসতিদলাল এর কয়েকটি পর্যায়

ফিক্‌হবিদগণ ইসতিদলাল এর কতিপয় পর্যায় বর্ণনা করেছেন।

১. কল্যাণকর বস্তু মূলত মুবাহ, আর ক্ষতিকর বস্তু মূলত হারাম।

ইসলাম মানবকল্যাণের জীবন দর্শন। মানুষের ক্ষতি হোক, এটা ইসলাম কোনো অবস্থায় চায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন, আর অপবিত্র বস্তুসমূহকে করেছেন হারাম"।[৩৪০]

অপর এক আয়াতে আছে, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"বলুন, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?"[৩৪১]

২. দুটি হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখা।

অর্থাৎ কোনো বিশেষ ইল্লত ছাড়াই একটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন-

---

[৩৩৮] আল কুরআন, ২২; ৭৮।

[৩৩৯] আল কুরআন, ৩৯; ১৮।

[৩৪০] আল কুরআন, ৭; ১৫৭।

[৩৪১] আল কুরআন, ৭; ৩২।

ক. যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে, সে (ايلاء ঈলা[৩৪২]) আল্লাহর নামে শপথ করে স্ত্রী সহবাস বর্জন করার অধিকারও সংরক্ষণ করে। তালাক ও ঈলা উভয় কাজের পরিণতি হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা সম্পর্ক পুন স্থাপন করা। এদিক থেকে এ দুটি হুকুমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
খ. নিয়ত ব্যতীত তায়াম্মুম শুদ্ধ হয় না। কাজেই নিয়ত ব্যতীত ওযুও শুদ্ধ না হওয়া উচিত। এ দুটি নেতিবাচক হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দুটিই পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে করা হয় এবং কখনো কখনো তায়াম্মুম ওযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।
ইতিবাচক প্রথম বাক্যটির সঙ্গে নেতিবাচক দ্বিতীয় বাক্যটির সম্পর্ক تلازم বা বাধ্যবাধকতার। এর মর্ম হলো, যে বিষয়টি জায়েয তা নিষিদ্ধ ও হারাম হতে পারে না। প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক বাক্যের মধ্যে হবে। যেমন যা জায়েয নয় তা নিষিদ্ধ।

২.৩.৮. ইসতিসহাবে হাল (استصحاب حال)

আরবী ইসতিসহাব শব্দটি (صحب) 'সাহবুন' থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো সাহচর্য, সঙ্গে থাকা, কোনো বিষয় বা অবস্থাকে স্থায়ী করতে চাওয়া। (حال) হাল শব্দের অর্থ অবস্থা। পরিভাষায় ইসতিসহাবে হাল বলা হয়,

هو مصاحبة حكم كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحاضر حتى يأتي دليل على تغييره مع بذل الجهد في البحث والطلب،

"অতীতে যে বিধান প্রমাণিত ছিল, বর্তমানেও তাকে সেই অবস্থায় স্থিত রাখার নীতি অবলম্বন করা। যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণা দ্বারা এ বিধান পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া না যায়"।[৩৪৩]
ইমাম ইব্‌ন হাযম (র) (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন,
"নস এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থির ও কার্যকর রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হবার নসভিত্তিক কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়।[৩৪৪]
সরল ভাষায় ইসতিসহাবে হালকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়,
ইসলামী শরীয়তে কোনো হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী ও কার্যকর বলে গণ্য করা, যতক্ষণ না এমন কোনো দলীল পাওয়া না যায়, যা উক্ত হুকুমকে বদলে দেয় বা রদ করে।
ইসতিসহাবে হাল শরীয়তের দলীল হওয়ার প্রমাণ,
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فمن جاءه موعطة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره الي الله ،

"অতঃপর যার নিকট স্বীয় প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত থেকেছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। আর তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত"।[৩৪৫]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[৩৪৩] ড. আতিফ ফজল মুহাম্মদ খলীল, *ইসতেসহাবুল হাল বায়না উসূলিল ফিকহি ওয়ান নাহবি*, (জর্দান: জামিয়াতুল ইসরা, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৩৩৫।
[৩৪৪] ইব্‌ন হাযম, আলী ইব্‌ন আহমদ, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, (বৈরুত: দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা/বি), খ. ৫, পৃ. ৩ ।
[৩৪৫] আল কুরআন, ২; ২৭৫।

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا،

"আব্বাদ ইব্‌ন তামীম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সালাত আদায়কালীন সময়ে জনৈক ব্যক্তির ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার সন্দেহ প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, তিনি উত্তরে বললেন, কেউ যেন কোনো শব্দ বা গন্ধ পাওয়া ছাড়া সালাত পরিত্যাগ না করে"।[৩৪৬]

সহীহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان،

"আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে যে, সে কতো রাকাত আদায় করেছে। তিন রাকাত নাকি চার রাকাত? তখন সে যেন সন্দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে। অতঃপর সালাম ফেরানোর আগে দুটি সাজিদা আদায় করে। সে যদি পাঁচ রাকাত আদায় করে থাকে, তাহলে এ দুই সাজিদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ণ চার রাকাত আদায় করে, তবে সাজিদা দুটি হবে শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের মতো"।[৩৪৭]

ইসতিসহাবে হাল এর উদাহরণ

'সবকিছু পূর্বাবস্থায় থাকাটাই প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব। যেমন ঋণমুক্ত থাকাটাই হলো তার মূল অবস্থা। কাজেই কেউ যদি অপর কারো কাছে কোনো পাওনা দাবি করে, আর যার কাছে পাওনা দাবি করা হয়েছে সে যদি নিজেকে ঋণী হিসেবে স্বীকার না করে, তাহলে তাকে ঋণমুক্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। তবে ঋণদাতা তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করলে তা ভিন্ন কথা। অনুরূপভাবে প্রমাণ ছাড়া কোনো মেয়েকে কুমারিত্বহীন বলা যাবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি একজন যুবতী মেয়েকে কুমারী মনে করে বিয়ে করলো, পরে স্বামী যৌন মিলনকালে দাবী করলো যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তাহলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ না সে তার দাবির পক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ পেশ করবে। ফলে এই জানা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না এর বিপরীত কোনো প্রমাণ মেলে।[৩৪৮]

ইসতিসহাবে হাল থেকে যে সব নিয়ম-নীতি উদ্ভব হয় তার একটি হলো, অতীত মুসলিম বিচারকদের বিচারের রায়। ইসলামী শরীয়তের আইনের উৎস হিসেবে অতীত মুসলিম বিচারকদের রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বিচারকগণ কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে যে সকল বিচার ফায়সালা করেছেন, তা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ'র জন্য অনবদ্য দালীলিক উৎস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির আলোকেই বিচার মীমাংসা করতেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কোনো ফায়সালা দিতেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সান্নিধ্যে শরীয়তের জ্ঞান লাভ করেন। তাদের বিচারের রায় ছিল বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। কোথাও ভুল সংঘটিত হয়ে

---

[৩৪৬] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ১৩৪৯।

[৩৪৭] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৪০০, হাদীস নং- ৫৭১ ।

[৩৪৮] খন্দকার, মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, (ঢাকাঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

গেলে তারা নবীর দরবারে এসে তা শোধরে নিতেন। পরবর্তী যুগের মুসলিম বিচারকগণ ইসলামী আইনের আলোকে যা কিছু রায় দিয়েছেন তাতে ইসলামী আইনের অনেক উপাদান রয়েছে।

২.৩.৯. মুসলিহাত (مصلحات)

মুসলিহাত (مصلحات) এর শাব্দিক অর্থ হলো কল্যাণকর। এটি ইসলামী শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা। মুসলিহাত বলতে এমন কল্যাণকে বুঝায়, যে বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল নেই, অথবা তার এমন কোনো মূল ভিত্তিও নেই, যার উপর নির্ভর করে কিয়াস করা যায়। তবে তা গ্রহণে মুসলিম উম্মাহ'র ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই; বরং এতে নিহিত রয়েছে বিবিধ কল্যাণ। ফিক্হবিদগণ এমন মুসলিহাত গ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে শর্ত হলো, তা অকাট্য ও স্পষ্ট দলিলের বিরোধী হতে পারবে না এবং ইজমা'রও বিপরীত হবে না।
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুসলিহাত এর সংজ্ঞা,
"শরীয়তের লক্ষ্য সংরক্ষণের সীমার মধ্যে থেকে উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ"।[৩৪৯]
মুজতাহিদগণ শরীয়তের মূল উৎসে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনই হলো শরীয়তের প্রধান লক্ষ্য্য। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শরীয়তের এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি"।[৩৫০]
আয়াতে 'রহমত' শব্দের ভিত্তি হলো 'কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতির প্রতিরোধ'। এ বিষয়টি মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। আল কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের কোনো ধরনের কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করেননি। তিনি বান্দার জন্য এমন কোনো বিধান প্রণয়ন করেননি, যা পালন করা বান্দার জন্য দুঃসাধ্য। নবী-রাসূল প্রেরণের মূল লক্ষ্য বিশেষত শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো বান্দার জন্য আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করা। যার প্রতিপাদ্যসার হলো মানবকল্যাণ। কুরআন-সুন্নাহ'য় আল্লাহর বিধান বর্ণনার পর তার মৌলিক যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি হলো মানব হিতৈষণা।
সুতরাং যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'য় স্পষ্ট বিধানের উল্লেখ নেই, সেখানে কিয়াস ও ইজতিহাদ এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন করার বিধান চালু রাখা হয়েছে।
ইসলামী জীবন বিধানে শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তিন প্রকার।
১. জরুরিয়াত: (ضروريات) দীন ও দুনিয়ার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। জরুরিয়াত এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন,
فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ وَفِي الْأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ،

---

[৩৪৯] *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ১৪৭ ।
[৩৫০] আল কুরআন, ২১; ১০৭।

"যার অভাবে দুনিয়ার কল্যাণের পথ ব্যাহত হয় এবং আখিরাতের মুক্তিলাভের পন্থাও সুদূরপরাহত হয়। যার অভাবে মানবজীবনে অপূরণীয় ক্ষতি ও মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে তাকে জরুরিয়াত বলে।[৩৫১]

২.হাজিয়াত: (حاجيات) মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ।

অর্থাৎ মানবজীবনের এমন সব প্রয়োজনীয় বিষয়, যা জীবনে স্বাচ্ছন্দ আনে এবং কঠোরতা ও অসুবিধা দূর করে। যে সব সুযোগ-সুবিধার অবর্তমানে মানুষ বেশ অসুবিধার সম্মুখিন হয়।[৩৫২]

৩. তাহসীনিয়াত: (تحسينيات) শোভাবর্ধক বিষয়সমূহ।

তাহসীনিয়াত এর সংজ্ঞায় ইমাম শাতিবী (৭২০-৭৯০ হি.) বলেন,

وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ، فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَنِّسَاتِ الَّتِي تَأْنَفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ،

"যা উত্তম বলে বিবেচিত তা গ্রহণ করা এবং সুস্থ বিবেক যা ঘৃণা করে তা পরিহার করা"।[৩৫৩]

মানবকল্যাণ ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য। এ হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ নিম্নরূপ-[৩৫৪]

ক.জীবনের নিরাপত্তা

খ.দীনের হেফাজত

গ.বংশধারা সংরক্ষণ

ঘ.বিবেকের হেফাজত

ঙ.সম্পদের নিরাপত্তা

২.৩.১০. ফকীহ ও মুজতাহিদগণের বিচক্ষণ রায় (راي الفقهاء و المجتهد ين)

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হলো ফকীহ ও মুজতাহিদগণের রায় বা অভিমত। তাদের উক্তি, ফতোয়া, সালিশী-মীমাংসা, আদালতের রায়, সরকারী ও বেসরকারী নির্দেশ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাহাবায়ে কেরামের রায় বা অভিমত সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও আদর্শ আইনের মর্যাদায় অগ্রগামী হবার কারণ হলো, তাদের অধিকাংশ উক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শোনা, যদি তারা ইজতিহাদ করে থাকেন, তবে তাদের সিদ্ধান্ত হবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও যথার্থ। কারণ তারা কুরআন নাযিলের সময়কাল প্রত্যক্ষ করছেন। ইসলামের জন্য তারা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যের বরকতপ্রাপ্ত। তারা ছিলেন সর্বোত্তম যুগের অধিবাসী। এ যুগ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

"আমার যুগ হলো সর্বোত্তম যুগ, তার পরের উত্তম যুগ হলো আমার পরের যুগ, এর পর উত্তম যুগ হলো, তাদের পরের যুগ"।[৩৫৫]

---

[৩৫১] শাতিবী, ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা, *আল মুয়াফাকাত*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮।

[৩৫২] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১।

[৩৫৩] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২।

[৩৫৪] ইব্‌ন তায়মিয়া, তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, সম্পাদনা: আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, (মদীনা মুনাওয়ারা: মাজমাউল মালিক ফাহদ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৩৪।

[৩৫৫] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২, খ. ৫, হাদীস নং- ৪১১৯।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবাই সমমর্যাদার ছিলেন না। মুজতাহিদ সাহাবীদের অভিমত এমন সাহাবীদের মতামতের উপর প্রাধান্য লাভ করে যারা মুজতাহিদ নয়। যেমন খুলাফায়ে রাশেদুন, (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, আয়িশা, যাইদ ইব্ন সাবিত, মুআজ ইব্ন জাবাল, উবাই ইব্ন কাব (রা) প্রমুখ মুজতাহিদ সাহাবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

খুলাফায়ে রাশেদুন এর পর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার জন সাহাবীর ইলম সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাদের সর্বশীর্ষে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.)।

خذوا القران من أربعة من ابن أم عبد ومن أبي بن كعب ومن سالم مولي أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل ،

"তোমরা চারজনের নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করো ইব্ন উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ) থেকে, উবাই ইব্ন কাব থেকে, আবু হুযায়ফা এর মুক্তদাস সালিম থেকে এবং মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) থেকে"।[৩৫৬]

বিশিষ্ট তাবিঈ মাসরুক বর্ণনা করেন,

شاممت اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهي الي ستة علي وعبد الله و عمر وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابي بن كعب ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهي الي علي وعبدالله،

"আমি সাহাবীদের যাবতীয় ইলমের একত্র সমাবেশ ছয়জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর মধ্যে পেয়েছি। তারা হলেন, আলী, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, উমার, যাইদ ইব্ন সাবিত, আবুদ দারদা ও উবাই ইব্ন কাব। মাসরুক আরো বলেন, আবার এই ছয়জনের ইলম শুধুমাত্র দুইজনের মধ্যে একত্র সমাবেশ ঘটেছে। তারা হলেন,আলী ও আবদুল্লহ ইব্ন মাসউদ"।[৩৫৭]

মাসরুককে প্রশ্ন করা হলো, আয়িশা (রা) কি খুব ভালো ফারায়েজ জানতেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের তার নিকট ফারায়েজ সম্পর্কে অনেক মাসআলা জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। আবু মুসা আশআরি (রা) বলেন, হাদীস সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের কোনো জটিলতা পরিলক্ষিত হলে আমরা আয়িশা'র নিকট আসতাম। তাকে আমরা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী পেয়েছি। ইব্ন সিরীন বলেন, সাহাবায়ে কেরাম উসমান ইব্ন আফফানকে (রা) হজের আহকাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে জানতেন। উসমান (রা) এর পর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানতেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার। শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কোনো মজলিশে মুআজ ইব্ন জাবাল উপস্থিত থাকলে (অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে) তার দিকে সবাই সমীহের দৃষ্টিতে দেখতেন। মাসরুক (র) বলেন, আমি মদীনায় যাইদ ইব্ন সাবিতকে (রা) পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী (راسخين في العلم) হিসেবে দেখতে পেলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) যাইদ ইব্ন সাবিত (রা) এর কবরে দাড়িয়ে বলেন, এভাবেই ইলম চলে যাবে। ইব্ন সিরীন (র) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ! যতদিন ইব্ন উমারকে (রা) বাঁচিয়ে রাখবেন, ততদিন আমাকেও বাঁচিয়ে রাখুন। যাতে আমি তার অনুসরণ করতে পারি।[৩৫৮]

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবিঈদের অভিমত সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। এ কারণে ফকীহগণ তাদের অভিমতসমূহ আইনের মর্যাদায় সাদরে গ্রহণ করেছেন। বিশেষত যে সকল তাবিঈদের অভিমত সাহাবায়ে

---

[৩৫৬] প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৮৬।

[৩৫৭] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, খ্রি. ২০০৪), খ. ১, পৃ. ২৩।

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩।

কেরামের যুগে মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি অর্জন করে। যেমন কাযী শুরাইহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আলকামা, মাসরুক (রহ.) প্রমুখ তাবিঈ। তাদের অভিমত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

২.৩.১১. তাআমুল (تعامل) বা পারস্পরিক আচরণ

তাআমুল ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস। তাআমুল অর্থ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের আমলের অনুসরণ করা। তাদের আমল শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। ফকীহগণ ইসলামী আইন ও বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র অনুকরণীয় কাফেলা ও হেদায়তের দিকদর্শন। তারা ছিলেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ও মুজতাহিদদের পথপ্রদর্শক। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন, তাওরাত ও ইনজিল কিতাবে আসহাবে রাসূলের প্রশংসা করেছেন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ،

"মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট"।[৩৫৯]

হাদীস গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় তাদের প্রশংসা করেছেন। মুসলমানদের কোনো জামাত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। তাদের মতামতের স্বপক্ষে নাযিল হয়েছে আল কুরআনের অনেক আয়াত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর প্রশংসায় আল কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল হয়। বদরের যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত-পবিত্র বিবীগণকে পর্দাবৃত করা, মাকামে ইবরাহিমে নামায আদায় করা ও আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর জানাযার নামাযে রাসূলের ইমামতি না করার ব্যাপারে উমার (রা) এর মতের পক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। ইসলামের প্রথম চার খলীফাসহ অনেক সাহাবীর গুণকীর্তনে নামে বে-নামে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।

সাদ ইব্ন মুআজকে (রা) বনু কুরায়জার বিচারক নিয়োগ করার পর তার বিচারনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার মতামত হলো, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত তাদের হত্যা করা। তাদের সন্তানদের বন্দী হিসেব গ্রেফতার করা হোক এবং ধন-সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হোক। এমন চমৎকার বিচারব্যবস্থার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سبع سماوات،

"সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তায়ালা যেমন ফায়সালা করেছেন, তুমি অনুরূপ ফায়সালা করেছো"।[৩৬০]

---

৩৫৯ আল কুরআন, ৯; ১০০।

৩৬০ বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১১১, খ. ৫, হাদীস নং- ৪১২১।

তাআমুল এর ব্যাপারে ফকীহ ও মুজতাহিদদের অভিমত হলো, যে সব কথা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে অতঃপর যা তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করেন, তা মেনে চলা ওয়াজিব। আর যে সকল তাআমুল এর ব্যাপারে মতবিরোধ থাকে, তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়।[৩৬১]

মূল কথা হলো, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বৈপরিত্বপূর্ণ মত ব্যতীত যে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে ব্যাপকতা লাভ করে, তা ইজমার সমতুল্য। আবু বকর সিদ্দীক ও উমার (রা) এর ঐকমত্যকে ফকীহগণ শরীয়তের মূলনীতির মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। উসূলবিদ ইমামগণ বলেন,

"যে ব্যাপারে দুই শাইখের ঐকমত্য প্রতিষ্টিত হয়েছে, তা মেনে চলা ওয়াজিব"।[৩৬২]

২.৩.১২. সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ (عرف و رسم)

উরফ (عرف) শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো এক দীর্ঘকাল ধরে মানবসমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি। এটি প্রথা অর্থাৎ রেওয়াজ (رواج) এর সমার্থবোধক শব্দ। আদাত (عادت) শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত। আল কুরআনে শব্দটির বুনিয়াদ হলো নিম্নোক্ত আয়াত

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ،

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো"।[৩৬৩]

উরফ ইসলামী শরীয়তের দলীল হবার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ও উদাহরণ হলো সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস,

قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর দেখতে পেলেন যে, সেখানাকার অধিবাসীরা খেজুর গাছে পরাগায়ন করছে, তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা তোমাদের কোন ধরনের কর্ম? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, এটা আমরা আগে থেকে করে আসছি। তিনি বললেন, এটা না করলে হয়তো তোমাদের জন্য মঙ্গল হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ নির্দেশনার পর সাহাবায়ে কেরাম খেজুর পরাগায়নের কাজ বর্জন করলো। এ কাজটি[৩৬৪] ছেড়ে দেয়ার পর দেখা গেল যে, তাদের কৃষিকর্মে ধস নেমেছে, ফলন খুব কমে গেছে। বিষয়টি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ। সুতরাং আমি দীনি বিষয়ে কোনো কিছু

---

[৩৬১] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই.ফা .বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৫।

[৩৬২] তাফতাযানী, সাদুদ্দীন মাসউদ ইব্ন ফখরুদ্দীন উমার ইব্ন আবদুল্লাহ, *শরহুত তালবীহ আলাত তাওযীহ*, (মিসর: মাকতাবাতুস সাবিহ, তা/বি), পৃ. ১৭, খ. ২।
সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৫।

[৩৬৩] আল কুরআন, ৭; ১৯৯।

[৩৬৪] নববী, মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইব্ন শরফ, *আল মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম* ইবনুল *হাজ্জাজ*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ৩য় সস্করণ, ১৩৯২ হি.), খ. ১৫, পৃ. ১১৭।

নির্দেশ দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর পার্থিব বিষয়ে নিজস্ব মতের আলোকে কোনো কথা বললে, তা মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়"।[৩৬৫]

উরফ ও আদত এর সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হলো ইসতিমাল (استعمال) । শব্দটি তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ফকীহগণ উরফ ও রেওয়াজ এর সংজ্ঞায় বলেন,

"কথা ও কাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভ্যাসের নাম উরফ"।[৩৬৬]

ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী উরফ ও রেওয়াজ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه،

"এমন জীবনাচার, সাধারণ মানুষ যাতে অভ্যস্ত এবং মানব সমাজে প্রচলিত। অথবা এমন কতিপয় শব্দ, যা সমাজে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। শব্দটি শোনার পর সামাজিক অর্থ ব্যতীত ভিন্ন কোনো অর্থ বোঝায় না"।[৩৬৭]

উরফ এর উদাহরণ:- শ্রম বিক্রি ও নির্মাণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তির ব্যাপারে সমাজের সাধারণ প্রচলন। এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার বিশেষ বিশেষ পেশার লোকদের মধ্যে আর এক ধরনের নিয়ম-নীতির প্রচলন থাকে। যারা যে বিষয়ে অবহিত তাদের জন্য এ প্রচলনই একটি অকাট্য দলীল। এমনকি তাতে যদি কিয়াস ও সাধারণ বিকেক-বুদ্ধির বিপরীতও কিছু পাওয়া যায় তবুও তাতে দোষের কিছু নেই। এমনকি ইমাম আবু ইয়ূসুফ (রহ.) পূর্ববর্তী কোনো প্রচলনভিত্তিক অকাট্য দলীল ও এ জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত।[৩৬৮]

ইসলামী আইনের বিকাশে উরফ এর বিশেষ অবদান রয়েছে। আরব-আজমের যে সকল রীতি-নীতি ইসলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থি নয় এবং কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা এ ব্যাপারে নীরব, সে গুলোকে সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের ফকীহ-মুজতাহিদগণ বহাল রেখেছেন। ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়নের যুগে ঐ সকল রীত-নীতি ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাহিলি যুগে 'দিয়াত' তথা রক্তপণের সামাজিক মূল্য ছিল ১০০ উট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব জনৈক মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী রক্তপণের এ সংখ্যা নির্ধারণ করেন। জাহিলী সমাজের এই রীতি কুরআন সুন্নাহর বিধি-বিধানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক না হওয়ায় সাহাবী ও তাবিঈদের যুগেও তা আইনের মর্যাদায় বলবৎ ছিল। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১১৪-১১৭৬ হি.) জাহিলী যুগে আরব সমাজে প্রচলিত ভালো রসম-রেওয়াজকে ইসলামী আইনের উপকরণ বলে অভিহিত করেছেন।[৩৬৯]

---

[৩৬৫] হাদিসে উলিখিত مِنْ رَأْيٍ দ্বারা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা শরীয়ত সংক্রান্ত নয়; একান্ত পার্থিব বিষয়। খেজুর পরাগায়নের কাজটি নিছক একটি দুনিয়াবী বিষয়। হাদীস শরিফের অন্য বর্ণনা থেকে বিষয়টির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে, أنتمُ أعلمُ بـأمورِ دُنيـاكُم 'তোমরা পার্থিব বিষয়ে অধিকতর অবগত' আরো বর্ণিত আছে,'ধারণাবশত কোনো কথা বললে তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জরুরী নয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দিলে তেমরা অবশ্যই তা মেনে চলবে'।

[৩৬৬] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৬।

[৩৬৭] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল ফিকরিল মুআসির, ২০০৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮২৯।

[৩৬৮] মাওলানা আবদুর রহিম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২০।

[৩৬৯] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহিম ইব্‌ন ওয়াজিহুদ্দীন দেহলবী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৩।

ইসলামী আইনবিদগণ উরফকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। ফকীহগণ বলেন, (আদত) একটি সিদ্ধান্তকারী বিষয়। তাদের মতে,

"যে বিষয়টি উরফ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, তা নস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের মতো"।[৩৭০]

অনেক ফকীহ এমনও রয়েছেন, যারা মাসআলার ক্ষেত্রে উরফকে ভিত্তি করে হুকুম জারি করেন। তারা বলেন, সমকালীন উরফ অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া হবে। তা পূর্ববর্তী লোকদের উরফ এর পরিপন্থি হলেও। উরফ নির্ভরযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তার উপর বিপুল সংখ্যক লোকের আমল হওয়া জরুরি। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আমলের ক্ষেত্রে মুফতী ও কাযীর উরফ পরিপন্থি ফতোয়া দেওয়া জায়েয হবে। যখন আদত বহুল প্রচলিত হয় ও প্রাধান্য[৩৭১] বিস্তার করে, তখনই তার বিবেচনা হবে।

২.৩.১৩. দেশজ আইন (قانون بلدي)

মুসলিম উম্মাহ'র ফকীহ-মুজতাহিদগণ পৃথিবীর যেখানেই খেলাফত কায়েম করেছেন, তথাকার রসম-রেওয়াজকে ইসলামী আইনের দোহাই দিয়ে কখনো বাতিল করেননি; বরং সে দেশের ভালো রীতি-নীতিকে উৎসাহিত করে আইনের মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার অনুসারীগণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে আইন কানুন রচনা করে থাকে। এ সকল আইন অনেক সময় পূর্ববর্তী শরীয়তের আলোকেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ পৃথিবীতে যা কিছু কল্যাণকর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রচারিত। এ দৃষ্টিকোণে যে কোনো দেশের ভালো আইন ইসলামী আইনের উৎস।

পূর্বে উরফ ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে যে সকল দলীল উপস্থাপন করা হয়েছিল, দেশজ আইনের ক্ষেত্রেও তা দলীল রূপে গণ্য হবে। দীনি দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে أمر بالمعروف বা সৎকাজের আদেশ। মারুফ (معروف) তথা ভালো বিষয়ে দেশীয় এমন সব আইন কানুনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যা ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদানিন্তন আরবের অনেক আইন সাদরে গ্রহণ করেন। মামলা-মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে আরবদের প্রচলিত নিয়ম ছিল

'প্রমাণ উপস্থাপন করবে বাদী। আর যে ব্যক্তি দাবি অস্বীকার করবে সে শপথ করবে'।

বিয়ের ক্ষেত্রে ইজাব, (ايجاب) প্রস্তাব গ্রহণ এবং কবুল (قبول) ও দেনমোহর (مهر) ইত্যাদিও আরবদের আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পত্তির ব্যবহার ও হস্তান্তর সংক্রান্ত কয়েকটি পদ্ধতি যথা- ক্রয়-বিক্রয়,(بيع) হেবা (هبه) রেহেন, (رهن) ইজারা, (اجاره) ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্যে যেগুলো ত্রুটিপূর্ণ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী তা বাদ দিয়ে ভালো নিয়মগুলো বহাল রাখা হয়েছে।

---

[৩৭০] সারাখসী, শামসুল আয়িম্মাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী সাহল, *শরহু সিয়ারিল কাবির*, (কায়রো: আশ শিরকাতুশ শারকিয়্যাহ লিল ইলানাত, ১৯৭১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১।

[৩৭১] সিয়ূতী, জালালুদ্দীন, আবদুর রহমান ইব্ন কামালুদ্দীন আবু বকর ইব্ন মুহাম্মদ, আল *আশবাহ ওয়ান নাজায়ির*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

২.৩.১৪. মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسله) বা জনকল্যাণ

মসালিহ মুরসালাহ বা জনকল্যাণ ইসলামী শরীয়তের একটি দালীলিক উৎস। এখানে দুটি শব্দ রয়েছে। আরবী 'মাসলাহা' শব্দের বহুবচন হলো মাসালিহ। অর্থাৎ কল্যাণ, মঙ্গল ও স্বার্থ ইত্যাদি। মুরসালাহ অর্থ মুতলাক, মুক্ত বা সাধারণ। ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ ও কল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর সহজ অর্থ হলো জনস্বার্থ।[৩৭২]।

মুহাম্মদ আমীন শানকীতী (১৯০৫-১৯৭৪ খ্রি.) বলেন, 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর উপর ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান নির্ভলশীল। তিনি এটিকে তিনভাগে ভাগ করে করেন,

الأولى منها: ردء المفاسد وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات والثانية: جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات، والتتميمات،

১.জনসমস্যা লাঘব করা। এটিকে উসূলবিদগণ (ضروريات) জরুরিয়াত বলে অভিহিত করে।

২. প্রয়োজন সাধন করা। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে হাজিয়াত যা (حاجيات) নামে পরিচিত।

৩.শোভাবর্ধক সামাজিক রীতি-নীতির অনুসরণ। যাকে উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় তাহসীনিয়াত (تحسينيات) বলা হয়।[৩৭৩]

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া 'মাসালিহ মুরসালাহ'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

"মুজতাহিদগণ যদি মনে করেন, কোনো কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে এবং শরীয়তে উক্ত কাজের বিরোধী কোনো নির্দেশনা বিদ্যমান না থাকে, তাকে মাসালিহ মুরসালাহ বলে"।[৩৭৪]

শরীয়তের পরিভাষায় 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর আরেকটি সংজ্ঞা হলো-

"এমন সব বিষয়, যার পক্ষে শরীয়তের প্রমাণযোগ্য কোনো মূলনীতি থাকে না এবং যাকে বাতিল করার পক্ষেও কোনো দলীল থাকে না। অথচ সুস্থ বিবেক বিষয়গুলো গ্রহণ করে"[৩৭৫]।

মুজতাহিদগণ 'মাসালিহ মুরসালা'কে কাজে লাগাবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি নির্ধারণ করেছেন।

১. শরীয়তে যে সব মাসালিহ এর বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে, তা ইসতিসলাহের বিবেচ্য মাসালিহ বা জনকল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

২. যে মাসলাহাত বা জনকল্যাণ বিবেচনায় ইসতিসলাহ নীতির ভিত্তিতে বিধান দেয়া হয়েছে, তা অর্জিত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অনিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনার ভিত্তিতে ইসতিসলাহ কার্যকর হবে না।

৩. এই মাসালিহ সামগ্রিক দিক থেকে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ'র যুগে মাসালিহ মুরসালাহ এর ভিত্তিতে ইজতিহাদের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত,

كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ

---

[৩৭২] খন্দকার মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, (ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

[৩৭৩] শানকীতী, মুহাম্মদ আমিন ইব্ন মুহাম্মদ আল মুখতার, *আল মাসালিহুল মুরসালাহ,* (মদীনা মুনাওয়ারা: জামিয়া ইসলামিয়্যাহ, ১৪১০ হি.). পৃ. ৬।

[৩৭৪] ইব্ন তায়মিয়া, *মাজমুয়াতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল*, (কায়রো: লাজনাতুত তুরাসিল আরবী ,তা/বি), খ. ৩, পৃ. ২২।

[৩৭৫] শাতিবী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মুয়াফাকাত*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯ ।

فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ،

"একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। আবু বকর ও উমার (রা) ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরতে অনেক দেরি করলেন। এতে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করলাম। সর্বপ্রথম আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠে দাড়ালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে নাজার গোত্রের এক আনসারী সাহাবীর বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু বাগানের চারদিকে দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘোরি করেও কোনো প্রবেশপথ খুঁজে পাইনি। অবশেষে বাগানের ভেতরে প্রবাহিত একটি নালা দিয়ে অনেক কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে পেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল বললেন, আবু হুরাইরা! তোমার কি সমস্যা হলো? আমি বললাম, আপনি তো আমাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘক্ষণ আমাদের নিকট ফিরে না আসায় আমরা আপনার উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করলাম। আপনার প্রতি আমার অতিশয় মহব্বতের কারণে আমার ভয়টা ছিল বেশি। তাই আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই বাগানে চলে আসলাম এবং খুব কষ্টে শিয়ালের মতো সঙ্কুচিত হয়ে এখানে প্রবেশ করলাম। আমাদের সঙ্গীরা সবাই পেছনে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার জুতো মুবারক হাতে দিয়ে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার জুতা জোড়া নিয়ে যাও এবং এই বাগানের বাইরে যার সাথে সাক্ষাত হবে সে যদি অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে। সর্বপ্রথম উমার (রা) এর সঙ্গেই আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা ! এই জুতো দুটি কার? আমি উত্তর দিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল এর। তিনি আমাকে জুতা দুটি হাতে দিয়ে বলেছেন, 'যে অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এ কথার সাক্ষ্য দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। একথা শোনার পর উমার (রা) আমার বুকে আঘাত করলেন। তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। তিনি আরো বললেন, কথাটির পুনরুক্তি না করে পেছনে ফিরে যাও। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফিরে গেলাম। উমার (রা) ও আমার পেছনে পেছনে আগমন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি হলো ? আমি বললাম, উমার এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তাকে আপনার সুসংবাদটি জানিয়ে দেই। তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন, যে আমি চিৎপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। তিনি আমাকে এ সুসংবাদ আর কাউকে না দিয়ে ফিরে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উমারকে (রা) বললেন, হে উমার! কোন বিষয় তোমাকে এ কাজ করতে প্ররোচিত করলো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। আপনি কি আবু হুরায়রাকে জুতা জোড়া দিয়ে এ কথা বলার অনুমতি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, 'পরিপূর্ণ অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, একথার যে সাক্ষ্য দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উমার (রা) বললেন, এমন সুসংবাদ না দিলে ভালো হয়। কেননা আমার ভয় হয়, মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। আপনি মুসলমানদের আমল করার সুযোগ দিলে ভালো হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তাদেরকে আমলের জন্য ছেড়ে দাও।[৩৭৬]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত আবু হুরায়রা (র) এর সুসংবাদ প্রচার না করার পক্ষে যে ইজতিহাদ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সমর্থন প্রদান করেছেন। জনকলাণের চাহিদা হলো, বান্দা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা। এতে কোনো প্রকার অলসতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন না করা। সাহাবায়ে কেরামের এ ধরনের ইজতিহাদ নস এর সরাসরি পরিপন্থি না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সমর্থন প্রদান করার অনেক উদাহরণ রয়েছে।[৩৭৭]

জনকল্যাণ বিবেচনায় ইজতিহাদ করার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর কৃত ইজতিহাদ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ،

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা মক্কায় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। পরেও কারো জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু একটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস ও গাছ-পালা কর্তন করা যাবে না। শিকারী জন্তুকে ভয় দেখানো যাবে না। পরিচিত বস্তু ছাড়া পতিত কোনো জিনিস কুড়িয়ে নেয়া যাবে না'। এ হাদীস শোনার পর আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু 'ইযখার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিলে জনস্বার্থ প্রাধান্য পেতো। কারণ এ ঘাস আমাদের বিভিন্ন জিনিস তৈরি এবং লাশ সমাহিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তা কাটার অনুমতি দেয়া গেলো"।[৩৭৮]

এখানে আব্বাস (রা) নিষিদ্ধ উদ্ভিদসমূহের মধ্যে 'ইযখার' নামক নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কর্তনকে জনকল্যাণের ভিত্তিতে বাদ দেয়ার আবেদন করেন। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন। কারণ এ উদ্ভিদ সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

---

[৩৭৬] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৫৯, হাদীস নং- ৩১১।

[৩৭৭] আল রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, *ইজতিহাতুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি*, (নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ,. ২০১৩ খ্রি,), পৃ. ১৩৩।

[৩৭৮] আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *মুখতাসারু সহীহ লিল ইমামিল বুখারী*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩২ ।

বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস নং ১৩৪৯।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধকরণ, খিলাফতের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগের প্রবর্তন, জেলখানা স্থাপন, জুমুআর নামাজের জন্য সাধারণ আযান (প্রথম আযান) প্রবর্তন, মসজিদে নববীতে স্থান সংকুলানের লক্ষ্যে সন্নিহিত ভূমির ওয়াকফ এর বিধান ইত্যাদি।
শরীয়তের উপর্যুক্ত বিধানসমূহ উদ্ভাবনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের সামনে কোনো নস উপস্থিত ছিল না। নিছক 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর ভিত্তিতে তারা বিষয়সমূহের সমাধান করেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে 'মাসালিহ মুরসালাহ এর বিবেচনায়' মাসআলা উদ্ভাবন করার বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৭৯]
মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম মালিক (রহ.) 'মাসালিহ মুরসালাহ' নীতির ব্যাপকহারে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্র তিনি উপরে বর্ণিত শর্তাবলির কোনো তোয়াক্কা করেননি। তিনি বলেন,
শরীয়ত প্রণেতা সমগ্র হুকুমের ক্ষেত্রেও মাসালিহ বিবেচনা করেছেন। মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও অকল্যাণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে মাসলাহাত বিবেচন ব্যাতিরেকে শরীয়তের কোনো হুকুম প্রবর্তিত হয়নি।[৩৮০]
এ কারণে তাকে ইসতিসলাহ নীতির উদ্ভাবক বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) ইসতিহসানকে এক ধরনের কিয়াস বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) এর ইসতিসলাহকেও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক ধরনের কিয়াসে পরিণত করা যেতে পারে। ইমাম আহমাদ (রহ.) এ ব্যাপারে ইমাম মালিক এর চেয়েও উদারতারতার প্রমাণ দিয়েছেন।

মাসালিহ মুরসালাহ এর উদাহরণ

সাধারণতঃ যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে আইন রচনা, স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে তার বাস্তবায়ন ও সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাসালিহ মুরসালাহ'র ব্যবহার বেশি করা হয়। কখনো কখনো জনকল্যাণ বিবেচনায় কুরআন সুন্নাহর সাধারণ বিধান পরিপন্থি হুকুম দেয়ারও অবকাশ থাকে। যেমন-
ইসলাম ও তাগুতী শক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলছে। শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদের অগ্রদল হিসেবে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এমতাবস্থায় বাস্তব পরিস্থিতি হলো, মুসলিম বন্দীদের উপর আক্রমণ না চালালে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করা সম্ভব হবে না। ফলে শত্রুপক্ষ বিজয়ী হবে এবং মুসলমানদের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে। মুসলমানের রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম বন্দীদের হত্যা করা অপরিহার্য হবে। যেহেতু সাধারণ মাসলাহাত এবং দীনের হেফাজতের সঙ্গে এর সম্পর্ক। এমন পরিস্থিতিতে বন্দী মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করা বৈধ গণ্য করা হয়েছে।

২.৩.১৫. পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত (شرائع الأنبياء السابقة)

আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা মূলত এক ও অভিন্ন। যদিও স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতার কারণে শাখাগত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত তাদের অনুসারীগণ অবিকৃত রাখেনি। পক্ষান্তরে যা অবিকৃত তা পালন করার নির্দেশ রয়েছে এই উম্মতের প্রতি। এ কারণে পূর্ববর্তী নবীগণের অবিকৃত শরীয়ত ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস।

[৩৭৯] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, প. ১৪৩।
[৩৮০] শাতিবী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, *আল মুয়াফাকাত*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০।

পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ،

"তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং আপনি তাদের পথের অনুসরণ করো"।[৩৮১]

অন্য অয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون،

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম এর বিধান দেওয়া হলো। যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে. পারো"।[৩৮২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ،

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিন নূহকে (আ), আর যা আমি আপনার নিকট ওহী হিসেবে নাযিল করেছি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে (আ.) এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না"।[৩৮৩]

যে সকল বিষয়ে সরাসরি ওহী নাযিল না হতো, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাবের প্রতি নাযিলকৃত বিধান অনুসরণ করতেন। শুধুমাত্র আহলে কিতাবের প্রতি নাযিলকৃত বিধানই নয়; বরং জাহিলী যুগের অনেক জনহিতকর আইন কানুনও তিনি অনুসরণ করতেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) তার মুসনাদ কিতাবে বর্ণনা করেন,

"জাহিলী যুগের ভালো কাজের উপর আমল করা যায়"।[৩৮৪]

এ হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসগণ বলেন, পূর্ববর্তী শরীয়তের উপর আমল করা আবশ্যক, যদি আল্লাহ সে বিষয় বাতিল না করে থাকেন।

২.৩.১৬. ইবাহাত (اباحة) বা বৈধকরণ

ইবাহাত অর্থ হলো কোনো বস্তুকে এমনভাবে দৃশ্যমান ও প্রতিভাত করা, যাতে দর্শনকারী এটাকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। ইসলামী শরীয়তে ইবাহত শব্দটি অনেকটা পরস্পর সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'ইবাহাত' এমন একটি বিষয়, যা কারো জন্য যেমন বাধ্যতামূলক নয়, আবার নিষিদ্ধ বা দোষনীয়ও নয়। 'মুবাহ' (مباح) এর সমার্থবোধক অথবা কাছাকাছি আরেকটি শব্দ হচ্ছে 'জায়েয' (جائز)। অর্থাৎ আপত্তিমুক্ত ও বৈধ। কোনো বস্তুকে অনুমোদিত বোঝোনোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অনেকে 'মুবাহ' এর চেয়ে 'জাওয়ায' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থবোধক বলেছেন। অনেকে আবার সীমিত অর্থবোধকও বলেছেন। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'জাওয়ায' শব্দটি হারাম (حرام) এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। 'ইবাহাত' এর সাথে সংশ্লিষ্ট আর একটি পরিভাষা হলো (الحل) 'হিল্ল'। 'যা নিষিদ্ধ নয়' এ অর্থে 'হালাল' (حلال) এর ধারণাটি ব্যাপকতর।[৩৮৫] শব্দটি আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ،

---

[৩৮১] আল কুরআন, ৬; ৯০।

[৩৮২] আল কুরআন, ২; ১৮৩।

[৩৮৩] আল কুরআন, ৪২; ১৩।

[৩৮৪] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪৬।

[৩৮৫] আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদি ও অন্যান্য, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৮৮খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬২।

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।[৩৮৬]
উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় 'ইবাহাত' এর সংজ্ঞা হলো-
هو مَا خُيِّرَ الْمُكَلَّفُ بَينَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ أي: لم يَطلب الشارعُ فعلَه ولم يَنهَ عنه وإنما خيَّر المكلَّف بين فعله وتركِه،
"আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়তের বিধান অর্পিত হয় এমন ব্যক্তিদের যে বিধান আমল করা না করার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকে, এমন কাজকে ইবাহাত বলে"।[৩৮৭]
আত তালখীস ফী উসূলিল ফিকহ গ্রন্থকার ইবাহাত এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,[৩৮৮]
اعْلَم أَن الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن المتضمن تَخْيِير الْمُخَاطب بَين فعل الشَّيْء وَتَركه الْجَارِي مجْرَاه فِي الْإِبَاحَة من غير تَخْصِيص ذمّ وَلَا مدح،
ইবাহাত ইসলামী আইনের একটি স্বীকৃত পরিভাষা। আল কুরআনে শব্দটির কোনো উল্লেখ না থাকলেও নিম্নের আয়াত দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়।
قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ،
"বলুন, হে নবী! আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছু হারাম পাইনি। তবে যদি মৃত প্রাণী হয়"।[৩৮৯]
এছাড়াও কুরআনের এ আয়াত দ্বারাও ইবাহাত এর পক্ষে সমর্থন মেলে।
كلوا واشربوا "তোমরা খাও এবং পান করো" (২:১৮৭)
সাধারণত যে সকল বস্তু 'নস' দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি তা হালালরূপে গণ্য হবে।

২.৩.১৭. বিজিত জাতিসমূহ ও তাদের অনুসৃত আইন-কানুনের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ (معاملة المسلمين مع قوانين الاقوام المغلوبة)

ইসলাম একটি বিজয়ী জীবনব্যবস্থা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী মুসলমানগণ বহু দেশ, বিভিন্ন জাতি ও বিচিত্র আইন-কানুনের সংস্পর্শে আসেন। সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমেও তারা অনেক দেশ জয় করে হরেক রকম আইন কানুনের মুখোমুখি হন। প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন আইন-কানুন, ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তারা সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেন। তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতেন। মুসলিম শাসববর্গ তাদের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস প্রয়াস গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ শুধুমাত্র বিজাতীয়দের উৎকৃষ্ট আইন-কানুন সংরক্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি; তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণেও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত বিজিত দেশসমূহের অফিস আদালতের কার্যক্রম স্থানীয় ভাষায় চালু ছিল। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ইরাকে ফার্সি ভাষায়, সিরিয়ায় রোমান ভাষায় এবং মিসরে

---

[৩৮৬] আল কুরআন, ২; ২৭৫।
[৩৮৭] *আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ*, (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৬।
[৩৮৮] আল জুয়াইনী, আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়ূসুফ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল তালখীস ফী উসূলিল ফিক্হ*, সম্পাদনাঃ আবদুল্লাহ জাওলাম নাবালী ও বশির আহমাদ উমরী, (বৈরুতঃ দারুল বাশায়ির, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৫০।
[৩৮৯] আল কুরআন, ৬: ১৪৫।

কিবতি ভাষায় সরকারী কার্যক্রম পরিচালিত হতো। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক এর সময়কালে আরবী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৯০]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরাক, সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর রোমান, গ্রীক ও ইরানী ভূমিকর ও রাজস্ব আইনের বৃহৎ অংশ অপরিবর্তিত রাখেন। তবে অবিচার ও নিবর্তনমূলক আইন সংশোধন ও পরিবর্তন করে দেন।[৩৯১]

তৃতীয় অধ্যায়
মহানবী (সা) ও সাহাবাযুগে ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ১
মহানবীর ইজতিহাদ

ইসলাম আল্লাহ্প্রদত্ত সর্বশেষ জীবন বিধান। ইজতিহাদ হলো শেষ নবীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। উম্মতের হেদায়তের জন্য নবী-রাসূলগণ কতিপয় স্বতন্ত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। নবী-রাসূলগণ উম্মতের উপর যে সকল অধিকার সংরক্ষণ করেন তা প্রধানত দুইপ্রকার।

ক. শরীয়াবিষয়ক অধিকার। যার অনুসরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব।

খ. শরীয়াবহির্ভূত অধিকার। যার অনুসরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়।

শরীয়া বিষয়ক অধিকার আবার দুই প্রকার।

ক. শরীয়া বিষয়ক বিশেষ অধিকার। যা সময়কাল, স্থান ও ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট। (التصرفات الجزئية أو الخطاب الجزئي) উম্মতের বিচার ফায়সারা করা ও ইমামত সংক্রান্ত অধিকার এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের বিষয় সাধারণ উম্মতের জন্য পালন করা ওয়াজিব নয়।

খ. শরীয়াবিষয়ক সাধারণ অধিকার। যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সর্বস্তরের উম্মতের জন্য মান্য করা ওয়াজিব। যেমন ইসলাম প্রচার-সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধ।

খ. শরীয়াবহির্ভূত হস্তক্ষেপ। এ প্রকারের বিধান অনুযায়ী আমল করা উম্মতের কারো জন্য ওয়াজিব নয়। এ ধরনের অধিকার কয়েক ভাগে বিভক্ত। সৃষ্টিগত, (التصرفات الجبلية) সৃষ্টিগত, (التصرفات العادية) অভ্যাসগত, (التصرفات الدنيوية) পার্থিব, (التصرفات الإرشادية) উপদেশমূলক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজস্ব বা একান্ত ব্যক্তিগত আচার-আচরণ (التصرفات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم) ।

[৩৯০] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪০।

[৩৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

উম্মতের উপর নবী-রাসূলগণের অধিকার চর্চা ও হস্তক্ষেপের প্রকরণের আলোকে মুসলিম উম্মাহর মহা-মনীষী ও উসূল শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে ইজমা সাব্যস্ত করেছেন যে, অন্যান্য মুজতাহিদগণের মতো নবী-রাসূলদেরও ইজতিহাদ করা জায়েয। ইব্ন ফাওরাক[৩৯২] এ সংক্রান্ত ইজমা নকল করেছেন। তারা এ বিষয়েও ইজমা সংগঠিত হবার দাবি করেছেন যে, নবী-রাসূলদের জন্য পার্থিব কল্যাণ, যুদ্ধ পরিচালনাসহ যাবতীয় বিষয়ে ইজতিহাদ করাও জায়েয। কুরআন নাযিল এর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা-সংক্রান্ত নিম্নের আয়াতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ،

"আমি আপনার নিকট সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অবহিত করেছেন"।[৩৯৩]

তবে শরীয়া ও পার্থিব বিষয়ক ইজতিহাদ জায়েয হবার ক্ষেত্রে ইমামদের ইখতিলাফ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে ইজতিহাদ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর নানাবিধ সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জীবনের এমন কোনো বিভাগ অবশিষ্ট নেই, যেখানে শরীয়তের বিধান অনুপস্থিত। শরীয়তের নস এর অবর্তমানে তিনি ইজতিহাদী কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত ইজতিহাদকে স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

৩.১.১. পরিবার ও দাম্পত্য জীবন

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পরিবার। সমাজ ও পরিবার ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ খুবই কঠিন। পরিবারের পরিধি যত বড় হয়, তাতে ঘটন-অঘটন তত বৃদ্ধি পায়। পরিবারবদ্ধ মানুষের জন্য নবী পরিবার হলো অনুপম আদর্শ। এ পরিবার উম্মতের এক বিশাল পাঠশালা। সমাজ ও জাতির কল্যাণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণপূর্বক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশাল পরিবার গঠন করেছিলেন। পারিবারিক নানামাত্রিক সমস্যায় এখানে রয়েছে বহুমাত্রিক সমাধান। নিম্নে পারিবারিক ইজতিহাদের দুই একটি ঘটনা আলোচনা করা হলো,

মধুপান হারাম করা প্রসঙ্গ

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইসলাম ও মুসলমানের বহুমুখী কল্যাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক বিয়ে করেছেন। নবী-পত্নিদের মধ্যে যায়নাব বিনতে জাহাশ ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন অভিজাত নারী ও তাঁর ফুফাতো বোন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালকপুত্র যায়দ ইব্ন

---

[৩৯২] মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ফাওরাক একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও কালাম শাস্ত্রবিদ। উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত। ইরাকে অবস্থানকালে তিনি আবুল হাসান আশআরী (র) এর মতাদর্শ অনুযায়ী কালাম শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ৪০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সূত্র- আয যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, খ. ৩৩, পৃ. ২০৪)

[৩৯৩] আল কুরআন, ৪;১০৫।

হারিসা (রা) থেকে তালাকপ্রাপ্তির পর তাকে বিয়ে করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ম-মাফিক দৈনন্দিন সকল স্ত্রীর কক্ষে গমন করে পারিবারিক খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি যায়নাব বিনতে জাহাশ এর কক্ষে মধু পান করতেন এবং কিছুটা দীর্ঘ সময় কাটাতেন। এটি আয়িশা ও হাফসাসহ (রা) অন্যান্য নবী পত্নিদের আত্মমর্যদাবোধে আঘাত হানে। তারা যায়নাব বিনতে জাহাশ এর কক্ষে মধু পান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিবৃত্ত করতে কৌশল অবলম্বন করেন। তারা এ পানীয় থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ তোলে। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে যায়নাব বিনতে জাহাশ এর নিকট মধু পান নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখতে অনুরোধ করেন। স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি হালাল বস্তু হারাম করার কারণে আল্লাহ তায়ালা ভর্ৎসনামূলক আয়াত নাযিল করেন। ইমাম বুখারী'র বর্ণনায় ঘটনাটি নিম্নরূপ-

عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: ١]- إِلَى - {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ}،

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতে জাহাশ এর কক্ষে কিছুটা দীর্ঘ সময় অবস্থান করে মধু পান করতেন। আমি এবং হাফসা এই মর্মে একমত পোষণ করলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলে বলবো, আমরা আপনার নিকট দুর্গন্ধযুক্ত পানীয়ের ঘ্রাণ অনুভব করছি। সম্ভবত আপনি 'মাগাফির' জাতীয় কোনো জুস পান করেছেন। তিনি আমাদের নিকট প্রবেশ করার পর আমরা সবাই একই কথা বললাম। আমাদের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আমি দুর্গন্ধযুক্ত কিছু পান করিনি। আমি যায়নাব বিনতে জাহাশ এর নিকট মধু পান করেছি মাত্র। তার নিকট রক্ষিত পানীয় দুর্গন্ধযুক্ত হলে, আমি এ মধু আর পান করব না। এরই ভিত্তিতে সূরা তাহরীম এর প্রথম চারটি আয়াত নাযিল হয়।[৩৯৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দুর্গন্ধ পরিহার করে চলতেন এবং স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি ও পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্টার জন্য তিনি ইজতিহাদপূর্বক মধুর ন্যায় একটি হালাল ও উপাদেয় পানীয় নিজের জন্য হারাম করে নেন এবং কয়েকজন স্ত্রীর মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে বিষয়টি অন্যদের নিকট প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন। একটি হালাল বস্তু অহেতুক হারাম করে নেয়া আল্লাহর নিকট মনঃপুত হয়নি। যার ফলে শপথের মাধ্যমে হারামকৃত বস্তু হালাল করা ও অকারণে হালাল বস্তু হারাম না করার বিধানসম্বলিত আয়াত নাযিল হয়,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،

"হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা নিজের জন্য কেন হারাম করলেন? আপনি স্ত্রীদের খুশি করতে চান। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু"।[৩৯৫]

---

[৩৯৪] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪৪, হাদীস নং- ৫২৬৭।

[৩৯৫] আল কুরআন, ৬৬; ১-২।

৩.১.২. প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ বিভাগ

নবী হবার পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সমাজ সংস্কারক ও দয়ালু রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন। তিনি একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও সমাজের বহুমুখী কল্যাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে ইজতিহাদের অনেক উদাহরণ রয়েছে। নিম্নে বৃক্ষের পরাগায়ন সংক্রান্ত ঘটনাটি আলোচনা করা হলো,

বৃক্ষের পরাগায়ন প্রসঙ্গ

বৃক্ষের পরাগায়ন এমন একটি ইজতিহাদ উপযোগী বিষয়, যেখানে সরাসরি নস না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করেছেন। উম্মতের পার্থিব কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি এমন একটি ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা অনাগত সকল মুকাল্লিদ-মুজতাহিদের জন্য শিক্ষণীয়। খেজুর গাছের পরগায়নের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সহীহ মুসলিম শরীফে [৩৯৬]বর্ণিত আছে,

قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর দেখতে পেলেন, সেখানকার অধিবাসীরা খেজুর গাছে পরাগায়ন করছে, তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা তোমাদের কোন ধরণের কর্ম ? তারা উত্তর দিল, এটা আমরা আগে থেকে করে আসছি। তিনি বললেন, এটা না করলে হয়তো তোমাদের জন্য মঙ্গল হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ নির্দেশনার পর সাহাবায়ে কেরাম খেজুর গাছে পরগায়নের কাজ বর্জন করেন। কাজটি[৩৯৭] ছেড়ে দেয়ার পর দেখা গেল, তাদের কৃষিকর্মে ধস নেমেছে, ফলন খুব কমে গেছে। বিষয়টি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি একজন মানুষমাত্র। আমি দীনি বিষয়ে কোনো নির্দেশ দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর আমার নিজস্ব মতের আলোকে কোনো কথা বললে, তা পালন করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়”। [৩৯৮]

বৃক্ষের পরাগায়ন এমন কোনো বিধিবদ্ধ হুকুম নয়, যা পালন করা বা না করার উপর শরীয়তে পুরস্কার বা তিরস্কারের বিধান রয়েছে। উম্মতের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে নিষেধ করলেও পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। এখানে মুজতাহিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, জনকল্যাণের স্বার্থে মুজতাহিদ পূর্বের ইজতিহাদ প্রত্যাহার করে নেয়াই যুক্তিযুক্ত।

---

[৩৯৬] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১২, পৃ. ৫৩, হাদীস নং- ৪৩৫৭।

[৩৯৭] নববী, মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া, *শরহুন নববী আলা মুসলিম*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ৩য় সস্করণ), খ. ১৫, পৃ. ১১৭।

[৩৯৮] হাদিসে উলিখিত مِنْ رَأْيٍ দ্বারা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা শরীয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত নয়; একান্ত পার্থিব বিষয়। খেজুর গাছের পরাগায়নের কাজটি নিছক একটি দুনিয়াবী বিষয়। হাদীস শরীফের অন্য বর্ণনা থেকে বিষয়টির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে, أنتمُ أعلمُ بأمورِ دُنياكُم ‘তোমরা পার্থিব বিষয়ে অধিকতর অবগত’ আরো বর্ণিত আছে,‘ধারণাবশত কোনো কথা বললে তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জরুরী নয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিত হলে তেমরা অবশ্যই তা মেনে চলবে’। (আল ইজতিহাদ বাইনাত তাসীলি ওয়াত তাজদীদ পৃ.৩)

মানুষের ভাষা ও গাত্রবর্ণের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ

পৃথিবীর শৃঙ্খলা বিন্যাসে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রজাতি ও নানা ধরনের ভাষা সৃষ্টি করেছেন। ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা আল্লাহর এক মহা নিদর্শন। সন্তানের বর্ণবৈষম্য কুদরতের এক মহা কারিশ্‌মা। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রব্বুল আলামিন বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ،

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে"।[৩৯৯]

মানবসন্তানের মধ্যেও নানা বর্ণের সমাহার দেখা যায়। সাধারণত সন্তানেরা মাতা-পিতার স্বভাব-চরিত্র ও বর্ণ-আকৃতি ধারণ করে। মাতা-পিতা ফর্সা ও গৌর বর্ণের হলে সন্তানেরাও অনুরূপ হয়। আবার মাতা-পিতার কালো বর্ণের প্রভাব সন্তানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। পরিবার ও সমাজে এ ধরনের ঘটনা নানা বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের জন্ম দেয়। এর সমাধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহীত অভিনব পদ্ধতি আলোকপাত করা হলো। সন্তানের বর্ণবৈচিত্রের এমন ব্যতিক্রম অবস্থা দেখে আরবের একজন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করেন। যা আবু হুরায়রা (রা) এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله وُلد لي غلام أسود فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حُمْر قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم قال : فأنَّى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق قال : فلعل ابنك هذا نزعه،

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন ব্যক্তি এসে বলল, আমার কালো বর্ণের একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কী কোনো উট আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেগুলো কী বর্ণের? লোকটি উত্তর দিল, লাল। তিনি বললেন, সেখানে কী কোনো ধূসর বর্ণের উট আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ রং কোত্থেকে আসলো? লোকটি উত্তর দিল, সম্ভবত এটি বংশগতভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার এই সন্তানটিও বংশগতভাবে এ বর্ণ ধারণ করেছে"।[৪০০]

উপর্যুক্ত ঘটনাসম্বলিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদপূর্বক প্রশ্নকর্তার সমাধান উদ্ভাবন করেছেন।

৩.১.৩. যুদ্ধ ও সমরনীতি বিভাগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমরনীতি ও রণকৌশল ছিল চমৎকার ও বাস্তবমুখী। যাতে তিনি বিচক্ষণতার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। বদর যুদ্ধ পরবর্তী বন্দী-নীতিতে সরাসরি শরীয়তের নস না থাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ দ্বারা তার সমাধান করেন। তবে তিনি নিজে ইজতিহাদ না করে সাহাবায়ে কেরাম এর সঙ্গে পরামর্শ করে এ সমস্যা সমাধান করেন। যাতে ইজতিহাদের বাস্তব নমুনা পর্যবেক্ষণপূর্বক বৃহত্তর পরিসরে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

---

[৩৯৯] আল কুরআন, ৩০;২২।

[৪০০] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৫৩, হাদীস নং- ৫৩০৫।

বদর যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী প্রথম যে কূপটির দখল নিয়েছিলেন তার পাশেই তাঁবু গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাত করে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেখানে তাঁবু তৈরির সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়েছে তা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাকি আপনার নিজস্ব কৌশল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। হুবাব বললেন, এটি নির্ভুল ও উত্তম সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে তিনি বলেন, কুরাইশদের সবচেয়ে কাছের কূপগুলো দখলে নিয়ে অন্য কূপগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলে যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবাব এর প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।[৪০১]

বদরের যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদ এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ও মূল উপাদান। আল কুরআনের সূরা আনফাল এর বৃহদাংশে এ সংক্রান্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

বদরের যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ

যে সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের সুস্পষ্ট নস নেই, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদের অনেক উদাহরণ হাদীস ও সিরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, বদরের যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত ঘটনা।

বদরের যুদ্ধে মক্কার যে সকল মুশরিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, তাদের ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোনো নস না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শমূলক যে মাসআলা ইসতেম্বাত করেন, তা এ পর্যায়ের। আল কুরআনে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ,

ما كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ،

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কানো নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো"।[৪০২]

হাদীস, তাফসীর ও সিরাতের কিতাবসমূহের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, বদরের যুদ্ধবন্দীদের যখন গ্রেফতার করে মদীনায় আনা হলো, তাদের মধ্যে অনেক কুরাইশ সর্দারও ধৃত হয়। কুরাইশ নেতাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলো যে, তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হোক। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবু বকর সিদ্দীকসহ (রা) একদল সাহাবী মত দিলেন যে, যুদ্ধবন্দীরা হলো আমাদের আত্মীয়-স্বজন। অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হলে কোনো দিন আল্লাহ হয়তো তাদেরকে হেদায়ত দান করবেন। উমার ইবনুল খাত্তাবসহ (রা) আর একদল সাহাবী কুরাইশ নেতাদের হত্যা করার পরামর্শ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) ও তার মতানুযায়ী পরামর্শদানকারী সাহাবীদের পরামর্শ

---

[৪০১] ড. তারিক রামাদান, *মুসলমানদের জন্য ক্রিটিক্যাল থিংকিং,* অনুবাদঃ তারিকুর রহমান শামিম, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৫ এপ্রিল, শুক্রবার, ২০১৬ ।

[৪০২] আল কুরআন, ৮; ৬৭,৬৮।

গ্রহণ করেন। কারণ এতে রয়েছে মুসলমানদের বহুবিধ দীনি ও অর্থনৈতিক কল্যাণ। যা রহমতের একটি নিদর্শনও বটে।[৪০৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃত এ ইজতিহাদের প্রধান দৃষ্টিনন্দন দিকটি হলো, মানুষের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করা। যে সকল বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই এবং গুনাহের কোনো আশঙ্কাও নেই, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি ছিল সহজ পন্থাটি গ্রহণ করা। [৪০৪]

"বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) এর নিকট পরামর্শ চেয়ে বললেন, আবু বকর! তাদের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? আবু বকর (রা) তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়পূর্বক ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। অতপর উমার (রা) এর কাছে এ ব্যাপারে মতামত চাইলেন। উমার (রা) তাদের হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। উমার (রা) বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয় দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে দেখলাম যে তিনি ও আবু বকর (রা) কান্নাকাটি করছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এবং আপনার সঙ্গী কী কারণে কান্নাকাটি করছেন? আমিও আপনাদের দুঃখে কাঁদতে চাই। কান্না না আসলে তার ভান করে হলেও আপনাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধ-বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করার কারণে ভর্ৎসনাপূর্বক আল্লাহ তায়ালা যে আয়াত নাযিল করেছেন তার কারণে আমরা কান্নাকাটি করছি"। [৪০৫]

উপর্যুক্ত ঘটনায় ইজতিহাদ এর একটি চমৎকার পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ইজতিহাদ না করে শীর্ষস্থানীয় ও প্রজ্ঞাবান সাহাবীদের মতামত চাইলেন। সবার শেষে নিজে একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ সিদ্ধান্ত ছিল আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। যা সংশোধনের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন।

তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে কয়েকজন সাহাবীর অব্যাহতি

উত্তর হেজাযের 'তাবুক' নামক স্থানে রোমান সেনাবাহিনী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধটি ইসলামের ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধ বা 'গাযওয়াতুল উসাইরা' (غزوة العسيرة) নামে পরিচিত। এ ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিশ্ব মানচিত্রে মুসলমানদের উদীয়মান শক্তি হিসেবে উত্থানের একটি টার্নিং পয়েন্ট। বিকাশমান ইসলামী শক্তিকে চিরতরে নিপাত করার লক্ষ্যে রোমান বাহিনী সীমান্ত এলাকায় চল্লিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে। পক্ষান্তরে মসলিম বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার। প্রচণ্ড গরমে যুদ্ধাভিযান ও পাথেয় স্বল্পতার কারণে কুরআনের ভাষায় এটিকে কঠিন যুদ্ধ হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও কয়েকজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অব্যাহতির আবেদন করেন। তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ইসলামী শক্তির রণকৌশল দেখে পিছুটান দেয়। ফলে কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

---

[৪০৩] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সউদী বাদশাহ ফাহদ ইব্ন আবদুল আবদুল আযীয কর্তৃক প্রচারিত, তা/বি.), পৃ. ৫৪৫।

[৪০৪] আয়াতুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ মাহদী শামশুদ্দীন, *আল ইজতিহাদ ওয়াত তাজদীদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: আল মুআসসাসাতুদ দুয়ালিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯।

[৪০৫] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৮৫,।

ঘটে এবং মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। ইমাম ইব্‌ন কাসীর বর্ণনা করেন, عفا الله عنك لم اذنت لهم حتي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
"আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা আপনার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন"।[৪০৬] আয়াতটি কয়েকজন সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি কামনা করেছিলেন।[৪০৭]

অব্যাহতিপ্রার্থীগণ খোঁড়া অযুহাত দেখিয়ে বলেছিলেন, অব্যাহতি পেলেও যুদ্ধে যাব না। না পেলেও যাব না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদপূর্বক তাদের অব্যাহতির আবেদন মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলেন, সত্য-মিথ্যা নির্ণয় না করে আপনি তাদেরকে কেন অব্যাহতি দিয়ে দিলেন? তারা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে, আপনি তাদেরকে অনুমতি না দিলেও তারা যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকবে।

তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে কয়েকজন সাহাবীর অব্যাহতি দেয়ার ঘটনাটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৈমিত্তিক ইজতিহাদের একটি অংশ। নবী ও প্রধান অধিনায়ক হিসেবে যে কাউকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন। এ অধিকার বলে তিনি একটি কঠিন সময়ে তিনজন সাহাবীকে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু খোঁড়া অযুহাত দেখিয়ে অব্যাহতি প্রার্থনা এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে আবেদন কবুল করার কারণে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভর্ৎসনার ভাষায় আয়াত নাযিল করেন।

৩.১.৪. বিদেশনীতি ও পররাষ্ট্র বিভাগ

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগের যে সব ক্ষেত্রে শরীয়তের সুস্পষ্ট নস নেই, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত,
اعْتَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذِي القَعْدَةِ فأبَى أهْلُ مَكَّةَ أنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حتَّى قَاضَاهُمْ علَى أنْ يُقِيمَ بهَا ثَلَاثَةَ أيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الكِتَابَ كَتَبُوا هذا ما قَاضَى عليه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ فَقالوا: لا نُقِرُّ بهَا فلوْ نَعْلَمُ أنَّكَ رَسولُ اللَّهِ ما مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أنْتَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ قَالَ: أنَا رَسولُ اللَّهِ وأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسولُ اللَّهِ قَالَ: لا واللَّهِ لا أمْحُوكَ أبَدًا فأخَذَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الكِتَابَ فَكَتَبَ هذا ما قَاضَى عليه مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إلَّا في القِرَابِ وأَنْ لا يَخْرُجَ مِن أهْلِهَا بأَحَدٍ إنْ أرَادَ أنْ يَتَّبِعَهُ، وأَنْ لا يَمْنَعَ أحَدًا مِن أصْحَابِهِ أرَادَ أنْ يُقِيمَ بهَا،
"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলকাদা মাসে উমরা পালনের উদ্দেশে মক্কা আগমন করেন। কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা তাঁকে সেখানে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। অবশেষে তিনদিন তথায় অবস্থান করার পর দ্বি-পাক্ষিক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ,

---

[৪০৬] আল কুরআন, ৯; ৪৩।

[৪০৭] ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ হুসাইন শামসুদ্দীন, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪৯১ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৯।

‘চুক্তিটি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে সম্পাদিত’
মক্কার কাফিরগণ বলল, আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করি না। রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করলে তো আপনাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিতাম না। আমাদের জানা মতে, আপনি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি একাধারে আল্লাহর রাসূল এবং আবদুল্লাহর পুত্র’। অতঃপর তিনি আলীকে (রা) বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দটি মুছে দাও। আলী (রা) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে মুছে ফেলতে পারি না’।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিপত্রটি নিজ হাতে নিয়ে লিখে দিলেন, ‘এটি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এর পক্ষে সম্পাদিত’।
সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে। তরবারি খাপমুক্ত রেখে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এখানকার কোনো অধিবাসীকে মুসলমান বানিয়ে মদীনা নিয়ে যেতে পারবে না। তার সঙ্গীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে মক্কায় আসতে বাধা প্রদান করতে পারবে না”।[৪০৮]
হুদায়বিয়ার সন্ধির এ ঘটনায় ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নবুওয়াত ও রিসালতের মূল পরিচয়টি মুছে দিলেন। কেননা সাময়িকভাবে এ পরিচয় মুছে ফেলাতে বাস্তবতায় কোনো প্রভাব ফেলে না। ‘আমি আল্লাহর রাসূল এবং আবদুল্লাহর পুত্র’ এ উক্তি দ্বারা তাঁর রেসালতের প্রামাণ্যতা আরো জোরালোভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তিনি ইজতিহাদপূর্বক বুঝতে পারলেন, কিছুক্ষণের জন্য এ পরিচয় বাদ দেয়াতে মুসলমানদের জন্য বহুমুখী কল্যাণ অপেক্ষা করছে। তাই তিনি চুক্তিতে লিখিত ‘রাসূলুল্লাহ’ পরিচয়টি মুছে দিলেন এবং উম্মতের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রতম স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। এখানে মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয়ের জন্য যে সূক্ষ্ম বিষয়টি উহ্য রয়েছে তা হলো, মুজতাহিদ কী উদ্দেশ্যে এবং কী কারণে ইজতিহাদটি করেছেন অনেক সময় যে মুজতাহিদ নয় তার নিকট বিষয়টি প্রতিভাত হয় না। এক সময় মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির নিকটও তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুজতাহিদ হওয়া অনেক কঠিন ও সাধনার কাজ। স্থূল বুদ্ধির অধিকারী কেনো ব্যক্তি মুজতাহিদ হতে পারে না। মুজতাহিদকে গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার মাধ্যমে মাসআলা ইসতেম্বাত করতে হয়।

৩.১.৫. আইন ও বিচার বিভাগ

দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা এমন একটি বিষয়, যার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা শরীয়তের নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদ করার বিধিমালা নির্দেশ করেছেন। বিচারের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদ উম্মতের আলিমদের সর্ববাদী মতানুযায়ী জায়েয। এর পক্ষে দলীল হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহ্যিক যুক্তি-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার ফায়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীন ও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করার হুকুম প্রদান

---

[৪০৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ২৬৯৯।

করা হয়নি। মানুষের মনের গোপন অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ،

"আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিভিন্ন বিরোধ নিয়ে উপস্থিত হও। তোমাদের মধ্যে অনেকে নিজের যুক্তি ভালোভাবে উপস্থাপনে পারঙ্গম। আমি মজবুত যুক্তি-প্রমাণ ও দৃঢ় উপস্থাপনা বিবেচনায় রেখে বিচার মীমাংসা করে থাকি। সুতরাং তোমাদের নিকট নিজের ভাইয়ের কোনো হক চলে গেলে তা গ্রহণ করো না। যে অন্যের হক গ্রহণ করলো সে যেন জাহান্নামের একটি টুকরো গ্রহণ করলো"।[৪০৯]

৩.১.৬. অমুসলিম নিকটাত্মীয় ও নেতৃবর্গের সঙ্গে আচরণ

কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা প্রসঙ্গে কুরআন সুন্নাহ'য় কোনো নস বর্ণিত নেই। শরীয়তে এ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কারো জন্য ইসতেগফার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব ছিলেন পিতৃধর্মে অবিচল একজন মুশরিক। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি ছিল একটি ইজতিহাদী মাসআলা। এ বিষয়ে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদপূর্বক স্বীয় চাচা আবু তালিবের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ،

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সংগত নয়। যখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চয় তারা জাহান্নামী"।[৪১০]

আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم،

"আবু তালিব এর মৃত্যুশয্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গৃহে প্রবেশ করেন। আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবি উমাইয়াও তথায় উপস্থিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু

---

[৪০৯] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ৩০১, হাদীস নং- ৩৫৮৩।

[৪১০] আল কুরআন, ৯; ১১৩।

তালিব এর উদ্দেশে বললেন, 'হে আমার চাচা! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এ বাক্য উচ্চারণের কারণে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবো। এ কথা শোনার পর আবু জাহল ও আবদুল্লাহ বললো, হে আবু তালিব! আপনি পিতৃধর্ম ত্যাগ করছেন? তারা বারবার কথাটি পুনর্ব্যক্ত করতে লাগল। সর্বশেষ যে কথার উপর আবু তালিব এর মৃত্যু হয় তা ছিল, আামি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অটল আছি এবং তার উপর মৃত্যুবরণ করছি। একথা শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। যতক্ষণ না আমাকে বারণ করা হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত আয়াত নাযিল হয়।[৪১১]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও নবুওয়াত এমন দুটি বিষয়, যা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যার কারণ আল কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ,

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ،

"তাদের জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হবার পর"।[৪১২]

আপন চাচা ও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি এমন একটি অধ্যায়, যা ইজতিহাদের পরিধিভুক্ত। এ বিষয়ে পূর্ব থেকে নিষেধাজ্ঞাসূচক কোনো নস না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করেন। পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবার কারণে তিনি এ কাজ থেকে বিরত হন। যেভাবে ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তাদের জানাযার নামায প্রসঙ্গ

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর জানাযার নামায আদায়ের বিষয়টিও ইজতিহাদের অর্ন্তভুক্ত একটি মাসআলা। শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নস না থাকার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা) এর পীড়াপীড়ি উপেক্ষা করে তার জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল এর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযার নামায পড়ানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ানোর প্রস্তুতি নেয়ার পর আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সত্যিই আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন আপনার বিরুদ্ধে ও মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করেছে। এই বলে আমি তার সকল বিরূপ মন্তব্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসকি হেসে বললেন। উমার আমাকে একটু সুযোগ দাও। এরপরও আমি পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন, আমাকে এ বিষয়ে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং আমি নামায পড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে যদি তার মাগফেরাত হবার বিষয়ে নিশ্চিত হতাম, আমি তার চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। উমার (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ফিরে আসলেন। একটু পরই সূরা বারাআতের এই আয়াত দুটি নাযিল হয়।

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ،

---

[৪১১] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস নং- ১৩৬০।

মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৫৪।

[৪১২] ৯:১১৩

"তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তাদের জন্য জানাযার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে"।[৪১৩]

উমার (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সেদিন এমন দুঃসাহস দেখানোর জন্যে পরবর্তীতে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি।

মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ এ কথা প্রমাণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায পড়ানোর বিষয়টি ওহীর ভিত্তিতে ছিল না। এটি ছিল ইজতিহাদের আলোকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন, তাতে মাঝে-মধ্যে যে ভুল-ত্রুটি হয়নি তা নয়। তবে এ ভুলের উপর কখনো তিনি স্থির ছিলেন না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সংশোধনী এসে গেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা রাসূলের আনুগত্য করাকে আল্লাহর আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করলো"।[৪১৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থেকো"।[৪১৫]

এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে ওহী কিংবা ইজতিহাদের কোনো পার্থক্য করা হয়নি। ওহির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইঙ্গিত দ্বারা যে সকল ইজতিহাদী মাসআলা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। ক্ষেত-খামার ও শিল্প-কারখানা বিষয়ক ইজতিহাদে ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। রাসূলের শানে এটা দোষণীয়ও নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিদা, শরীয়ত ও আখলাক সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি কোনো পেশা বা শিল্পের কারিগর হিসেবে প্রেরিত হননি। অবশ্য বিচার ও দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে ভুল-ত্রুটি হবার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও তা প্রচুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তায়ালা কোনো হিকমতের কারণে তার নবীর মাধ্যমে তা সংঘটিত করেছেন।[৪১৬]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্ম্ মাকতুম (রা) এর আগমন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর মনোভাব

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্ম্ মাকতুম (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন বয়োবৃদ্ধ ও অন্ধ সাহাবী। তিনি কুরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নবীপত্নি খাদিজা (রা) এর খালাতো ভাই। ইমাম তিরমিযী আয়িশা (রা) থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের মুশরিক নেতা ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা এর সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগিরা'র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্ম্ মাকতুম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে কুরআনের বিভিন্ন

---

[৪১৩] আল কুরআন, ৯; ৮৪।

[৪১৪] আল কুরআন, ৪; ৮০।

[৪১৫] আল কুরআন, ৫৯;৭।

[৪১৬] আয়াতুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ মাহদী শামশুদ্দীন, *আল ইজতিহাদ ওয়াত তাজদীদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: আল মুআস্‌সাসাতুদ দুয়ালিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৪।

বিষয়ে জানতে চাইলেন। ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা এর সঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্ম্ মাকতুম (রা) এর আগমন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অপছন্দনীয়। কারণ তার আগমনে ওয়ালিদ এর সঙ্গে আলোচনায় ছন্দপতন ঘটেছিল। কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতুম (রা) এর পৌনঃপুনিক প্রশ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্তবোধ করেন এবং ভ্রুকুটি করে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সর্বাধিক মনোযোগী ছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা আবাসা এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ،

"তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল। আপনি কি জানেন সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার জন্য উপকারী হতো। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযেগী হয়েছেন। সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আর যে আপনার নিকট আল্লাহর ভয়ে দৌড়ে এসেছে আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন"।[৪১৭]

এ ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজতিহাদের বিষয়টি ছিল, ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা। কুরাইশের প্রধান প্রধান সর্দারগণ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি মিশনের প্রধান টার্গেট। তাঁর প্রবল ইচ্ছা অনুযায়ী মুশরিকদের এ নেতা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতুম (রা) ছিলেন নিষ্ঠাবান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁর ইচ্ছা ছিল মুশরিক সর্দারের সঙ্গে আলাপচারিতার এই অধিবেশনে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতুম (রা) এর মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উপস্থিতি না থাকাটাই ইসলামের জন্য মঙ্গলজনক। একজন মুশরিক সর্দারের ইসলাম গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতুম (রা) এর পীড়াপীড়িমূলক প্রশ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপালে বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। একজন নিষ্ঠাবান সাহাবীর সঙ্গে এমন আচরণ ছিল আল্লাহর নিকট অশোভনীয়। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

৩.১.৭. রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী

যে সকল বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নস নেই, তাই হলো ইজতিহাদের প্রধান ক্ষেত্র। সরাসরি নস এ ইজতিহাদ করার সুযোগ না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে নস এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং তা হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করতেন। 'সালাতুল লাইল' তথা রাত্রিকালীন ইবাদত ছিল নবীদের জন্য একটি ফরজ আমল। যা উম্মতের জন্য সুন্নাত। সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদম মোবারক ফুলে যেতো। তিনি সালাতুল লাইল এর ব্যাপারে কোনো রকম ইজতিহাদ না করলেও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ইজতিহাদ করেন। তিনি কিয়াম লম্বা করলেও উম্মতের সুবিধার্থে রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতেন না। উম্মতের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি ইজতিহাদপূর্বক সহজ পন্থা অবলম্বন করেন।

---

[৪১৭] ৮০:১-১০

সুতরাং তিনি কখনো এগারো রাকাত নামায আদায় করতেন, আবার কখনো তেরো রাকাত। ইমাম বুখারী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[৪১৮]

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ،

তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবা-রাত্রির নিয়মিত সুন্নাত কখনো বারো রাকাত আদায় করতেন। আবার কখনো দশ রাকাত আদায় করতেন।[৪১৯]

তিনি চার রাকাত চাশত এর নামায আদায় করতেন। আবার কখনো অধিক সংখ্যক রাকাত চাশত এর নামায হিসেবে আদায় করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান ছাড়া অন্য সময় প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতেন।[৪২০]

সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। প্রতি বছর শাবান মাসে কখনো মাস এর বেশির ভাগ রোযা রাখতেন। আবার কখনো এ মাসে রোযার সংখ্যা কমিয়ে দিতেন। তিনি নিজে লাগাতার রোযা পালন করতেন। কিন্তু উম্মতকে এ রোযা রাখতে নিষেধ করতেন।

মানতকৃত হজের কাজা প্রসঙ্গ

হজ ইসলামের পঞ্চম রুকন। সামর্থবান ব্যক্তির উপর যেভাবে হজ ফরজ হয়, মানতের মাধ্যমে ওয়াজিবকৃত নফল হজও ফরজে পরিণত হয়। কোনো ব্যক্তি হজ এর মানত করার পর তা অনাদায়ী রেখে মারা গেলে তার বিধান কী? এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ،

"জুহায়না গেত্রের জনৈক নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমার মা হজ করার মানত করেছিলেন। তিনি হজ না করেই মৃত্যুবরণ করেন। আমি কী তার পক্ষ থেকে সেই হজ কাজা করতে পারবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারবে। তোমার মায়ের উপর কারো ঋণ অনাদায়ী থাকলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? তেমনিভাবে আল্লাহর পাওনা আদায় করে দাও। আল্লাহর হক আদায় করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত"।[৪২১]

মানতকৃত হজের কাজা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করেন। যেভাবে বান্দার হক আদায় করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান রয়েছে। তেমনিভাবে হজ নামক আল্লাহর হক কাজা করার ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকবে। বরং এ ক্ষেত্রে তা আরো যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী নাযিল না হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদের মাধ্যমে হুকুম জারি করেন। কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদপূর্বক শরীয়তের বিধান লাভ করার আর একটি উদাহরণ-

عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم

[৪১৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং- ১১৪০।

[৪১৯] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস নং- ১১৭২।

[৪২০] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ .২, পৃ. ৮১৮, হাদীস নং-১১৬০।

[৪২১] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ১৮৫২।

قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر،

"আবু যর গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, একদল সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তশালীরা আমাদের মতো নামায আদায় করে এবং রোযা রাখে। কিন্তু বাড়তি সম্পদ ব্যয় করার কারণে তারা অনেক সওয়াবের অধিকারী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জন্যও আল্লাহ তায়ালা সদকা করার আলাদা ব্যবস্থা রেখেছেন। একবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণে একটি সদকা করার সওয়াব রয়েছে। একবার আল্লাহু আকবর বললেও একটি সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। একবার আলহামদু লিল্লাহ বললেও একটি সদকার সওয়াব মেলে। একবার তাহলিল তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারাও অনুরূপ একটি সদকার সওয়াব লাভ করা যায়। সৎ কাজের একটি আদেশ ও অন্যায় কাজে একবার বাধা প্রদান করলেও একটি সদকার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জিত হয়। স্ত্রী সহবাসের কারণেও তোমাদের জন্য সদকা করার সওয়াব রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, আমাদের শারীরিক চাহিদা পূরণের মধ্যেও কি সওয়াব আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যদি হারাম উপায়ে শারীরিক চাহিদা পূরণ করো, তাতে কী গুনাহ হবে না? তেমনিভাবে হালাল উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও সওয়াবের ব্যবস্থা রয়েছে"।[৪২২]

পরিচ্ছেদ- ২
খুলাফায়ে রাশেদূন এর ইজতিহাদ

ইসলামের প্রথম চার খলীফাকে খুলাফায়ে রাশেদুন বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ সান্যিধ্যপ্রাপ্ত এই চার জন সাহাবী সরাসরি নবীর সান্নিধ্যে থেকে ইজতিহাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্যান্য সাহাবী ও পরবর্তী মুজতাহিদগণের জন্য তাদের ইজতিহাদ অনুকরণীয় আদর্শ। এই পরিচ্ছেদে চার খলীফা ও অন্যান্য প্রজ্ঞাবান সাহাবীদের ইজতিহাদ আলাচনা করা হলো।

৩.২.১. মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের প্রকারভেদ

সাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ট মুজতাহিদ। তাঁরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র অনুকরণীয় কাফেলা ও হেদায়তের দিকদর্শন। এ পবিত্র জামাত জাতির সর্বশ্রেষ্ট আলিম ও মুজতাহিদদের পথপ্রদর্শক। তাদের ইজতিহাদ ও মতামতের স্বপক্ষে নাযিল হয়েছে আল কুরআনের অনেক আয়াত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর প্রশংসায় আল কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল হয়। বদরের যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত-পবিত্র বিবীগণকে পর্দাবৃত করা, মাকামে ইবরাহিমে নামায আদায় করা ও মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর জানাযার নামাযে রাসূলের

---

[৪২২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৬৯৭, হাদীস নং- ৫৩।

ইমামতি না করার ব্যাপারে উমার (রা) এর মতের পক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। ইসলামের প্রথম চার খলীফাসহ অনেক সাহাবীর গুণকীর্তনে নামে বে-নামে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদের উন্নতমান ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ 'ইলামূল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন' কিতাবে أفضل الناس في الرأي الصحابة অধ্যায়ে বলেন,

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس،

"তাদের ইজতিহাদ আমাদের ইজতিহাদ থেকে উন্নতমান হওয়াই সঙ্গত। কেননা তাদের ইজতিহাদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে প্রাপ্ত ইমান, ইলম ও মারিফাত দ্বারা পরিপূর্ণ কলব থেকে উৎসারিত। যার পেছনে রয়েছে উম্মতের কল্যাণকামিতা। ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর ও নবীর অন্তরের মধ্যে তৃতীয় কোন মাধ্যম নেই। তারা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক সান্নিধ্যে থেকেই ইলম ও ঈমান আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যেখানে কোনো ধরনের আপত্তি ও বিরোধের অবকাশ নেই। কোনো ধরনের মতবিরোধ তাদের ইজতিহাদকে কালিমাযুক্ত করতে পারেনি। তাদের মতামতের সঙ্গে অন্যদের মতামতের তুলনা করা ভ্রান্ত কিয়াসের পরিচায়ক"।[৪২৩]

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন তাফসীর ও হাদীস ইত্যাদির সূচনা হয়েছিলো সাহাবাযুগ থেকে, তেমনি ইজতিহাদ ও আহকাম গবেষণার বিস্তীর্ণ এ শাখাটিও সাহাবাযুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের মর্যাদায় ক্রমোন্নতি সাধিত হয়।

মুজতাহিদ সাহাবীদের শ্রেণি-বিভাগ

মুজতাহিদ সাহাবীদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১.মুকসিরিন مكثرين (অধিক ইজতিহাদকারী সাহাবী)

২.মুতাওয়াসসিতিন متوسطين (মধ্যম স্তরের ইজতিহাদকারী সাহাবী)

৩ .মুকিল্লিন مقلين (কম ইজতিহাদকারী সাহাবী)

মুকসিরিন (مكثرين) সাহাবী

ঐ সকল সাহাবীদের মুকসিরিন বা অধিক ইজতিহাদকারী সাহাবী বলা হয়, যারা প্রচুর পরিমাণ আহকাম ও মাসাআলা উদ্ভাবন করেছেন এবং এ সকল মাসাআলা তাদের শাগরিদদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রধানত সাতজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা যায়। উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইব্‌ন আবি তালিব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আয়িশা সিদ্দিকা, যাইদ ইব্‌ন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.)।

ইমাম ইব্‌ন হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, সাহাবীদের নিকট থেকে বর্ণিত ফতোয়াসমূহ সংকলন করা হলে তাদের এক এক জন থেকে বর্ণিত ফতোয়ার জন্য কয়েকটি ভলিউমের প্রয়োজন হবে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর ফতোয়াসমূহের একটি সংকলন রচনা করেন। যা বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

---

[৪২৩] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৩।

মুকিল্লীন (مقلين) সাহাবী
মুকিল্লিন সাহাবী বলতে সে সকল সাহাবীদের বোঝায়, যাদের ইজতিহাদের সংখ্যা পরিমাণে অল্প। এ পর্যায়ের সাহাবীর সংখ্যা অগণিত। ইব্‌ন হাযম এর ভাষায়, তাদর নিকট থেকে বর্ণিত ফতোয়া পুস্তকাকারে সংকলন করতে চাইলে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যেই সংকুলান করা যাবে।[৪২৪]

মুতাওয়াসসিতীন (متوسطين) সাহাবী
মুতাওয়াসসিতিন বা মধ্যম স্তরের ইজতিহাদকারী হলেন ঐ সকল সাহাবী, যাদের বর্ণিত ফতোয়ার পরিমাণ বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। এ পর্যায়ে তেরো জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা যায়। তারা হলেন, আবু বকর সিদ্দিক, উম্মু সালামা, আনাস ইব্‌ন মালিক, আবু সাইদ খুদরী, আবু হুরায়রা, উসমান ইব্‌ন আফফান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর, আবু মূসা আশআরী, সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, সালমান ফারেসী, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ ও মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাদি.)।

সালাফের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ
মিসরের বিশিষ্ট মুজতাহিদ লাইস ইব্‌ন সাদ (৯৪-১৭৫ হি.) বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.) থেকে বর্ণনা করেন, 'প্রকৃত আলিম হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম'। জলীলুল কদর তাবিঈ কাতাদা (১৬-১১৮ হি.) নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل أليك من ربك الحق (জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা বাস্তব সত্য)।[৪২৫] তারা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম।

মুআজ ইব্‌ন জাবালকে (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় প্রশ্ন করা হলো, হে আবু আবদির রহমান! আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তোলে বসাও। (উঠে বসার পর তিনি বললেন) "ইলম ও ঈমান যথাস্থানে আছে। যে তালাশ করবে সে অবশ্যই পেয়ে যাবে। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। তিনি আরো বলেন, তোমরা চার জন ব্যক্তি থেকে ইলম তালাশ করো। উআইমির ইব্‌ন আবিদ দারদা, সালমান ফারেসী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম থেকে"।[৪২৬]

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হলেন তিন জন। একজন শামে, একজন কূফায়, আর একজন মদীনায়। এই দুইজন মদীনার আলিম থেকে অনেক বিষয় জেনে নেন, কিন্তু মদীনার আলিমকে ঐ দুই জন থেকে জানতে হয় না।

ইমাম শাবী (১৬-১০৩ হি.) বলেন, তিনজন সাহাবী একজন অপর জনকে প্রশ্ন করে ফতোয়া দিতেন। তারা হলেন, উমার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রাদি.)। আলী, উবাই ইব্‌ন কাব ও আবু মুসা আশআরী পরস্পর থেকে জেনে নিয়ে ফতোয় দিতেন। শায়বানী বলেন, আমি শাবীকে প্রশ্ন করলাম, আবু মুসা আশআরী কোন স্তরের? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন না। আমি বললাম, মুআজ কোন পর্যায়ের? তিনি বললেন, তিনি তো এর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন।

---

[৪২৪] লেখকমণ্ডলি, *ফিকহে ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬২।

[৪২৫] আল কুরআন, ৩৪; ৬।

[৪২৬] লেখকমণ্ডলি, *ফিকহে ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬২।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর ইলম সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

خذوا القران من أربعة من ابن أم عبد ومن أبي بن كعب ومن سالم مولي أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل،

"তোমরা চারজন থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করো। ইব্‌ন উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ) থেকে, উবাই ইব্‌ন কাব থেকে, আবু হোযায়ফা এর মুক্তদাস সালিম থেকে এবং মুআজ ইব্‌ন জাবাল থেকে।[৪২৭]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা নিম্নোক্ত আয়াত এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ،

(অতঃপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে, এইমাত্র তিনি কী বললেন?)[৪২৮]

"সেই জ্ঞানী লোক হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ"।

বিশিষ্ট তাবিঈ মাসরুক (র) (মৃ. ৬২ হি.) বর্ণনা করেন,

شاممت اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهي الي ستة علي وعبد الله و عمر وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابي بن كعب ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهي الي علي وعبدالله،

"সাহাবীদের যাবতীয় ইলম ছয়জন সাহাবীর মধ্যে একত্রে পাওয়া যায়। তারা হলেন, আলী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, উমার, যাইদ ইব্‌ন সাবিত, আবুদ দারদা ও উবাই ইব্‌ন কাব। মাসরুক আরো বলেন, আবার এই ছয় জনের সঞ্চিত সকল প্রকার ইলম দুইজন সাহাবীর মধ্যে সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। তারা হলেন, আলী ও আবদুল্লহ ইব্‌ন মাসউদ (রাদি.)।[৪২৯]

ইব্‌ন সিরীন (৬৫৩-৭২৯ খ্রি.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম উসমান ইব্‌ন আফফানকে (রা) হজের আহকাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে জানতেন। উসমান (রা) এর পর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানতেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.)। শাহর ইব্‌ন হাওশাব বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কোনো মজলিশে মুআজ ইব্‌ন জাবাল উপস্থিত থাকলে (অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে) তার দিকে সবাই মর্যাদার নজরে দেখতেন। মাসরুক বলেন, আমি মদীনায় যাইদ ইব্‌ন সাবিতকে (রা) মজবুত জ্ঞানের অধিকারী (راسخين في العلم) হিসেবে দেখতে পেয়েছি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর কবরে দাড়িয়ে বলেন, এভাবেই ইলম চলে যাবে। ইব্‌ন সিরীন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ! যতদিন ইব্‌ন উমারকে (রা) বাঁচিয়ে রাখবেন, ততদিন আমাকেও বাঁচিয়ে রাখুন। যাতে আমি তার অনুসরণ করতে পারি।[৪৩০]

ইজতিহাদের অনুশীলনে সাহাবায়ে কেরাম

ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের একটি বিধিবদ্ধ দলীল। কুরআন-সুন্নাহর 'নস'সমূহ হাতে গোনা অথচ সংঘটিত ঘটনা অগণিত এবং ভবষ্যিতেও ঘটমান। ঘটমান সমস্যাসমূহের বিশুদ্ধ সমাধানে সাহাবায়ে

---

[৪২৭] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৬।

[৪২৮] আল কুরআন, ৪৭; ১৬ ।

[৪২৯] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

[৪৩০] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩।

কেরামের পদ্ধতি ছিল, শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সর্বসাধারণের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া। তারা উদ্ভাবনী কৌশল দ্বারা এমন কর্মপন্থা নির্ণয় করেন, যা শরীয়া বাস্তবায়নে সহায়ক। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু বকর ও উমার (রা) ছিলেন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ও সবার মধ্যে অগ্রগণ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহ'র প্রথম খলীফা ও অভিভাবক ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক। দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) ছিলেন নবুওয়াতের যোগ্যতাসম্পন্ন সাহাবী। ইজতিহাদগত দূরদৃষ্টির কারণে তিনি আল কুরআনে বর্ণিত যাকাতের হকদার مولفة القلوب (ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে অমুসলিমদের যাকাত প্রদান করা) খাতটি বাতিল ঘোষণা করেন[৪৩১] এবং বাধ্যগত কারণে চুরি করার আশঙ্কা থাকায় দুর্ভিক্ষের সময় চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান স্থগিত করেন। উমার (রা) এর এ নীতির যোগ্য অনুসারী ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ। বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো উমার (রা) এর বিপরীত মত প্রদান করতেন না। আরো বর্ণিত আছে, উমার, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ও যাইদ ইব্ন সাবিত (রা) তিন জন একই ধরনের ফতোয়া প্রদান করতেন। আর আলী, উবাই ইব্ন কাব ও আবু মুসা আশআরীও (রা) একই ধরনের ফতোয়া দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর মুসলিম মিল্লাতের সামনে সর্বপ্রথম যে সমস্যাটি প্রকট রূপ ধারণ করে তা ছিল খলীফা নির্বাচনের জটিলতা। এ বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলে সুনির্দিষ্ট কোনো নস না থকায় ইজতিহাদের বিকল্প ছিল না। ইন্তেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। একদল সাহাবী তার দাফন কাফন নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে আনসারী সাহাবীগণ বনু সায়িদা'র ছায়াবেষ্টিত উদ্যানে একত্রিত হলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আনসারীদের সর্দার সাদ ইব্ন উবাদাকে (রা) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করা। এমতাবস্থায় আবু বকর, উমার ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) সেখানে প্রবেশ করলেন। আবু বকর (রা) তার বক্তব্যে বললেন, মুহাজিরগণ খেলাফতের অধিক হকদার। আনসারীদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠল। 'আমাদের মধ্য থেকে একজন আমির এবং আপনাদের মধ্য থেকে আর একজন আমির হবেন'। সাদ ইব্ন উবাদা বললেন, আল্লাহর কসম এটিই হবে মুসলমানদের প্রধান দুর্বলতা। আবু বকর (রা) বললেন, এভাবে হলে তো দুপক্ষের যুদ্ধ থামানো কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, আমির হবে আমাদের মধ্য থেকে, আর উযির হবে তোমাদের মধ্য থেকে। এ কথার উপর খিলাফতের বিষয়টি স্থিরিকৃত হয় এবং আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হন।[৪৩২]

৩.২.২.আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর ইজতিহাদ

আবু বকর সিদ্দীক (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে হস্তির বছরের দুই বছর ছয় মাস পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ এর শাখাগোত্র তায়মা বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাল্য-বন্ধু। হিজরতের সময় 'সওর' পর্বতের সঙ্গী এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। মদপানও করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবনে তার পেছনে নামায আদায় করেন। আল্লাহর জন্য যিনি জান-মালসহ সর্বস্ব ত্যাগ করেন। মুসলমানদের প্রথম খলীফা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নবম হিজরীতে তিনি ছিলেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র হজের

[৪৩১] সাআলাবী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম, *তাফসীর সাআলাবি*, সম্পাদনা: আবু মুহাম্মদ ইব্ন আশূর, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬০।

[৪৩২] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭৪।

আমির। যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছিলেন,'আবু বকর এর জান-মাল দিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি। দুনিয়াতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলো ভ্রাতৃত্বের ও মহব্বতের। মসজিদে নববীতে আবু বকর এর দরজা ছাড়া কারো দরজা খোলা থাকবে না।[৪৩৩] তিনি ১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা

খলীফা নিযুক্তির অব্যবহিত পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যার উদাহরণ ছিল রাসূলের যুগেও বিরল। একদল মুসলমান নামায রোযা আদায় করেও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। খলীফা আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিষয়টির সমাধানে সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। যার ফলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ ইজতিহাদ করতে বাধ্য হলেন। উমার (রা) এর মত ছিল আবু বকর (রা) এর বিপরীত। তিনি খলীফা'র সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন এবং নিজের দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাদের ইজতিহাদের মূল লক্ষ্য ছিল সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া নয়। এক পর্যায়ে তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে খলীফার সঙ্গে একমত পোষণ করলেন। সত্য উদঘাটিত হবার পর নিজের মত ত্যাগ করলেন।[৪৩৪]

সাহাবীদের মাঝে অর্থবণ্টনে সমতা

শত্রুপক্ষ থেকে যুদ্ধ ছাড়া যে সকল সম্পদ অর্জিত হয়, তা বিতরণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) সাম্যের নীতি অনুসরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কাউকে প্রাধান্য দিতেন না। অনেক জলীলুল কদর সাহাবী তার নিকট নিজেদের শ্রেষ্টত্বের বিষয় উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত পাওনা দাবি করেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন,

فضائلكم عندالله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير،

"আপনাদের শ্রেষ্টত্ব আল্লাহর নিকট। আর জীবনধারণের এ উপকরণে সমতা বিধান করাই শ্রেয়"।[৪৩৫]
আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর এ বন্টননীতি ছিল ইজতিহাদের ভিত্তিতে। কুরআন সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট কোন নস না থাকায় তিনি নিজ ইজতিহাদ দ্বারা এ বন্টননীতি অবলম্বন করেন। প্রথম খলীফা এখানে জনস্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে শেণিবৈষম্য মূলোৎপাটন করেন এবং ন্যায় ও ইনসাফের পতাকা উড্ডীন করেন।[৪৩৬]

উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) খলীফা মনোনয়ন

আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর অন্তিমকালে দ্বিতীয় খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারটি মুসলিম উম্মাহ'র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর প্রথম

---

[৪৩৩] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বৈরুত: দারু তুকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১০০।

[৪৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৭৫।

[৪৩৫] আবু উবাইদ আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, সম্পাদনা: খলীল মুহাম্মদ হারাস, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২৮ হি./ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

[৪৩৬] রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, *ইজতিহাতুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি*, (নাবলুস: জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৮।

খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইজতিহাদ করেন।

ইব্‌ন জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার মৃত্যুশয্যায় আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফকে (রা) ডেকে বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাব এর ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আবদুর রহমান উত্তরে বললেন, আপানি যে বিষয়টি আমার নিকট জানতে চেয়েছেন, সে ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে বেশি অবগত। আবু বকর বললেন, যদি তাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়? আবদুর রহমান বললেন, আল্লাাহর কসম! সেটি হবে তার ব্যাপারে আপনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। অতঃপর উসমানকে (রা) ডেকে বললেন, উমার এর ব্যাপারে আপনার মতামত পেশ করুন। তিনি বললেন, তার ব্যাপারে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি অবগত। তিনি বললেন, হে আবু আবদিল্লাহ! আমি আপনার মতটি জানতে চাই। উসমান (রা) বললেন, আমার জানা মতে তার ভিতরের বিষয়ষমূহ বাহ্যিক বিষয় থেকে বেশি উত্তম। আমাদের মধ্যে তার মতো আর কেউ নেই। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুক! আপনি তার বিষয়টি উপেক্ষা করলে আমি অন্য কারো নিকট তার বিষয়ে জানার চেষ্টা করতাম না। অতঃপর তিনি সাঈদ ইব্‌ন যাইদ, উসাইদ ইব্‌ন হুদাইরসহ (রা) মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরপমর্শ করেন। উসাঈদ (রা) বলেন, আপনার পরে তার মধ্যেই আমি কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি। তিনি যেখানে সন্তুষ্ট থাকা দরকার সেখানে সন্তুষ্ট থাকেন, আর যখন রুষ্ট হওয়া প্রয়োজন তখন রুষ্ট হন। তার ভেতরের বিষয় বাইরের বিষয় থেকে উত্তম। এ কাজের জন্য তার চেয়ে উপযুক্ত আমি আর কাউকে দেখছি না। আবদুর রহমান ও উসমান (রা) এর সঙ্গে খলীফার গোপন পরামর্শের ব্যাপারে অনেক সাহাবী জানতে পারলেন। অনেক সাহাবি তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ভিতরে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, উমারকে খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি কী উত্তর দিবেন? আপনি তো উমার এর কঠোরতার ব্যাপারে ভালই জানেন। আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা আমাকে তোলে বসাও। তোমরা তো আমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে ভয় দেখাচ্ছো। তোমাদের উপর জুলুম হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আমি আল্লাহর নিকট বলবো, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি খলীফা নিযুক্ত করেছি'। হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ থেকে এ কথাটি তাদের নিকট পৌঁছে দাও। এরপর তিনে শুয়ে পড়লেন এবং উসমানকে (রা) ডেকে বললেন, লিখ -

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইহজীবন ত্যাগের শেষ পর্যায়ে এবং পরকালে প্রবেশের সূচনালগ্নে এটি আবু বকর ইব্‌ন আবি কুহাফা'র অঙ্গীকার। যখন কাফের ঈমানদার হয়ে যায়, পাপাচারী সৎপথ গ্রহণ করে ও মিথ্যাবাদী সত্য কথা বলে। 'আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) আমার পরে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করলাম। সুতরাং তোমরা আমার কথা মান্য করো। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর ব্যাপারে এবং দীন ও নিজের ব্যাপারে কারো পরওয়া করি না। তোমরা কল্যাণকে আঁকড়ে ধরো। যদি তিনি ইনসাফ করেন, এটা হবে তার ব্যাপারে আমার জানা-শোনা ও সুধারণা। আর যদি তিনি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তার কর্মফল সে নিজেই ভোগ করবে। আমি কল্যাণই আশা করি, কিন্তু গাইব এর খবর জানি না। 'নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ'। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর ফরমানটিতে সীল মেরে দেয়া হয়।

৩.২.৩. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর ইজতিহাদ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইব্ন নুফাইল হস্তির বছরের তেরো বছর পর ৫৮৬ খ্রি. মক্কা নগরীর তিহামা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ বংশের আদওয়া গোত্রভুক্ত। মুসলিম উম্মাহ'র খলীফা নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানগণ দারুল আরকামে একত্রিত হয়ে ইসলামের দীক্ষা নিতেন। সংখ্যাল্পতার কারণে এবং মুশরিকদের আক্রমণের ভয়ে তারা গোপনে ইসলামের কার্যক্রম চালাতেন। তারা সর্বদা শত্রুদের ভয়ে সন্ত্রস্থ ছিলেন অথচ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে পোষণ করতেন প্রচণ্ড আগ্রহ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন আবু জাহাল ও উমার । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণের লক্ষে উপর্যুক্ত দুইজন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদ পোষণ করতেন। ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুইজনের ব্যাপারে এই দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ،

"হে আল্লাহ! উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবু জাহাল ইব্ন হিশাম এর মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার নিকট বেশি প্রিয়, তাদের একজনের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। এ দুইজনের মধ্যে উমার ছিলেন তার নিকট অধিকতর প্রিয়"।[৪৩৭]

আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেন। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের জিলহজ্ব মাসে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পূর্বে ৩৯ জন পুরুষ ও ২৩ জন নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশে বললেন,

"মুশরিকগণ হল বাতিল, আর আমরা হলাম হক। এতদসত্ত্বেও আমরা কেন গোপনে ইসলামের কাজ করব"?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমরা হলাম সংখ্যায় কম। ইতোপূর্বে আমরা কত বিপদ এর মুখোমুখি হয়েছি তা তো আপনি জানেন'।

উমার বললেন,

"সেই সত্তার শপথ করে বলছি! যেখানে কুফরের আসর বসবে, সেখানে পাশাপাশি অবশ্যই ঈমানের আরেকটি অধিবেশন বসবে"।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে কাবার দিকে এগিয়ে গেলেন। এক সারিতে ছিলেন হামযাহ (রা) অন্য সারিতে ছিলেন উমার (রাদি.)। উমার ও হামযাহকে দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা বেড়ে গেলো। সে দিন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার এর নাম রাখলেন 'ফারুক' তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের প্রকাশ্যে প্রচারে সহযোগিতা করেন এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয়সংকেত। তার হিজরত ছিল ইসলামের মদদ। তার খেলাফত ছিল রহমতস্বরূপ। উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমরা বাইতুল্লাহ'য় নামায আদায় করতে পারতাম না।[৪৩৮] আলী (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উমারই (রা) একমাত্র প্রকাশ্যে হিজরত করন। হিজরতের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তিনি তরবারি ঝুলিয়ে

---

[৪৩৭] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসর: মাতবাআ মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬১৮।

[৪৩৮] প্রাগুক্ত।

নিলেন, কাঁদে ধনুক উঠিয়ে নিলেন, হাতে নিলেন তীর এবং কোমরে বাঁধলেন বর্শা। তিনি কাবার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন কুরাইশদল কাবা চত্বরে উপস্থিত ছিল। তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহিমে নামায আদায় করলেন। অতঃপর মুশরিক নেতাদের উদ্দেশে বললেন,

"মুশরিকদের চেহারা বিশ্রী হোক! এবং তাদের নাকসমূহ ধূলি ধূসরিত হোক! যে তার মাকে সন্তানহারা করতে চায়, সন্তানকে অনাথ বানাতে চায়, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন কাবা চত্বরে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে আসে"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চাইতেন। আবু বকর ও উমার এর মতামতই তাঁর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল। তারা দুজন সত্য উচ্চারণে ছিলেন নির্ভীক এবং নিষ্ঠায় অগ্রগামী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ،

"আল্লাহ উমার (রা) এর মুখে ও অন্তরে হক গেঁথে দিয়েছেন"।[৪৩৯]

উমার (রা) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রজ্ঞার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার মতের অনুকূলে দশ বারের বেশি ওহী নাযিল হয়।

উমার (রা) এর ইজতিহাদী যোগ্যতা

উমার (রাদি.) ছিলেন ইজতিহাদী যোগ্যতায় প্রাগ্রসর। ন্যায় বিচারে নিরাপোস। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ। শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়নে দক্ষ। মুসলমানদের সঙ্গে নম্রতা ও ইনসাফ কায়েমে উদার। সত্যের সঙ্গে তার অবস্থান ছিল কল্যাণমূলক। রাসূলের রেখে যাওয়া স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তিনি ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। উমার (রাদি.) যে সকল মাসআলা ইসতেম্বাত করেছেন, তাতে শরীয়তের রূহ ও মৌলিক অবস্থা প্রস্ফুটিত হয়েছে। তার কাজে-কর্মে শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংরক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবিঈদের ভূয়সী প্রসংশা রয়েছে। এ বিষয়ের অনুকূলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীসটি যথেষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بينا أنا نائم والناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ إلى الثدي ومنها دون ذلك وعرض عليّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله قال: "الدين"،

"একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন কিছু লোক পরস্পর জামা বিতরণ করছে। তারা আমাকেও জামা প্রদান করছে। কিছু কিছু জামা ছিল আবক্ষ ঝুলন্ত। আর কিছু জামা আরো নিচে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে একটি জামা দিলেন, তার কাছে যে জামাটি ছিল তা পা পর্যন্ত ঝোলানো। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এর ব্যাখ্যা কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দীন'।[৪৪০]

তাবিঈদের মধ্যে উমার (রা) এর ইজতিহাদের প্রভাব ছিল অধিক। প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুজাহিদ বলেন, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে তোমরা উমার এর আমলের দিকে তাকাও এবং তাই গ্রহণ করো। আমির আল শাবী (২১-১০০ হি.) বলেন, যে ব্যক্তি মজবুত বিচার ফায়সালার পদ্ধতি জানতে চায়, সে যেন উমার (রা) এর নীতি অনুসরণ করে। ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইজতিহাদী যোগ্যতায় উমার (রা) এর সামনে অন্যরা হলো শিশুর মতো।[৪৪১]

---

[৪৩৯] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসর: মাতবাআ মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬১৭।

[৪৪০] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪২৫হি. /২০০৪খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩।

হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, আল ফাসী *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪০ ।

বিশিষ্ট তাবিঈ মাসরুক বর্ণনা করেন যে, একদা উমার (রা) এর সচিব লিখলেন, উমারকে (রা) আল্লাহ তায়ালা যা সঠিক বলে জানিয়েছেন, আমি তা লিপিবদ্ধ করছি। একথা শুনে উমার (রা) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এমন কথা লিখবে না। বরং এভাবে লিখ। এটি উমার এর বিবেচনার আলোকে লেখা হয়েছে। এটি সঠিক হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর ভুল হলে উমার এর পক্ষ থেকে হবে।[৪৪২]
এখানে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উমার (রা) এর নীতি প্রতিভাত হয়েছে যে, উমার (রা) নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতে সাবধানতা অবলম্বন করতেন। যে ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো স্পষ্ট নস নেই, সে বিষয়ে ভুল হবার আশঙ্কায় তিনি খুব উদ্বিগ্ন থাকতেন। এটি উমার (রা) এর খোদাভীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে উমার (রা) এর ইজতিহাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নারীদের বিবাহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

বিয়ে নবী-রাসূলদের একটি দায়েমি বা স্থায়ী সুন্নাহ। ব্যতিক্রম বাদে সব নবীগণই বিয়ে করেছেন। তবে নবী-রাসূলদের শরীয়তে বিয়ের বিধান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ইসলামে কোন ধরনের নারীদের বিয়ে করা জায়েয? এ বিষয়ে আল কুরআনের ভাষ্য হলো,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،

"আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসসমূহ হালাল করা হলো। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্যও তোমাদের জন্য বৈধ। তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য বৈধ, এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের সচ্চরিত্রা নারীও তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। যদি তোমরা তাদের মাহর প্রদান করো বিয়ের উদ্দেশ্যে, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৪৩]
আয়াতের স্পষ্ট নস দ্বারা আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও খলীফা উমার (রা) মুসলমানদের এ বিষয়ে বারণ করতেন। সাঈদ ইব্ন মনসুর বর্ণনা করেন,

تزوج حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: طَلِّقْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لِمَ؟ أَحَرَامٌ هِيَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا وَلَكِنِّي خِفْتُ أَنْ تَعَاطَوَا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ،

"হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) একজন ইহুদি নারীকে বিয়ে করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ খবর শোনার পর তাকে পত্রযোগে ঐ নারীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন। তদুত্তরে সাহাবী হুজায়ফা লিখেন। আমি কেন ঐ নারীকে তালাক দেবো? এটা কি শরীয়তে নিষিদ্ধ? উত্তরে খলীফা উমার লিখেন। এতে মুসলমানগণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং মুসলিম সমাজে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।[৪৪৪]
আল কুরআনের সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত একটি বিধানে খলীফার নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছিলো ইজতিহাদের ভিত্তিতে। শরীয়ত প্রবর্তকের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি এটি ছিলো তার গভীর দৃষ্টিপাত ও বিচক্ষণতার প্রমাণ।

---

[৪৪১] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫।

[৪৪২] বায়হাকী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী, *আস সুনানুল কুবরা*, সম্পাদনা: আবদুল কাদির আতা, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং- ২০৩৪৮।

[৪৪৩] আল কুরআন, ৫; ৫।

[৪৪৪] সাঈদ ইব্ন মানসূর, *সুনানু সাঈদ ইব্ন মানসূর*, সম্পাদনা: হাবীবুর রহমান আজমী, (ভারত: আদ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৪, হাদীস নং-৭১৬ ।

আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করার অবাধ সুযোগ দিলে কুরআনে বর্ণিত এ বৈধতার সুযোগ ভিন্নখাতে ব্যবহার করার পথ উম্মুক্ত হয়ে যাবে। যা মুসলিম সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।[৪৪৫]

বনু তাগলিব এর খ্রিস্টানদের উপর থেকে জিয্য়া কর বিলোপ

দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাদি.) শরীয়তের বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী বনু তাগলিব এর খ্রিস্টানদের উপর জিয্য়া (جزية)কর আরোপ করেন। করারোপকে অপমানবোধ করে তারা অন্যত্র পালিয়ে যায়। এলাকা ত্যাগের কারণে তাদের শত্রুপক্ষে জোটবদ্ধ হবার প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি ঐ এলাকার মুসলিম প্রতিনিধিদের পরামর্শে জিয্য়া বাস্তবায়নে ইজতিহাদ করেন এবং'জিযয়া'কে ভিন্ন নামে প্রয়োগ করে শরীয়তের বিধান অক্ষুণ্ণ রাখেন।

'আল আমওয়াল' কিতাবে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়-

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْجِزْيَةَ فَهَرَبُوا حَتَّى لَحِقُوا بِأَرْضٍ مِنَ الْأَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَوِ النُّعْمَانُ بْنُ زُرْعَةَ التَّغْلِبِيُّ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَنِي تَغْلِبَ هُمْ وَاللَّهِ الْعَرَبُ يَأْنَفُونَ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهُمْ قَوْمٌ شَدِيدَةٌ نِكَايَتُهُمْ فَلَا تُعِنْ عَدُوَّكَ بِهِمْ وَهُمْ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ أَظُنُّهُ قَالَ أَمْوَالٌ وَإِنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ مَاشِيَةٍ فَضَعْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَرَجَعُوا فَضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ،

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বনু তাগলিব এর খ্রিস্টানদের উপর জিয্য়া (কর) আরোপ করেন। এতে তারা ক্রুব্ধ হয়ে এলাকা ত্যাগ করে। ঐ গোত্রের মুসলিম জননেতা যুরআ ইব্ন নুমান অথবা নুমান ইব্ন যুরআ উমার (রা) এর উদ্দেশে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে বনু তাগলিব এর ব্যাপারে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি। আল্লাহর কসম! তারা হলো নির্ভেজাল আরব বংশোদ্ভূত। নিজেদের উপর করারোপ তাদের নিকট খুবই অপছন্দনীয় ও অপমানজনক। তারা শত্রুর উপর আক্রমণে সিদ্ধহস্ত। তাদেরকে শত্রু ভাববেন না এবং করারোপ করে শত্রুদল ভারী করবেন না। তারা অনেক পশু-সম্পদের মালিক। সুতরাং তাদের উপর 'সদকা' নির্ধারণ করুন। (খলীফার নিকট এ পরামর্শ মনঃপুত হলে) তাদের নিকট এই মর্মে খবরও পাঠানো হলো। ফলে তারা নিজ এলাকায় ফিরে আসে। (জিযয়ার পরিবর্তে) 'সদকা' প্রদানকে তারা হালকা মনে করে ও সম্মানজনক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে"।[৪৪৬]

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের উপর জিয্য়া কর আরোপের নসটি হলো,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ،

"তোমরা যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ এবং তার রাসূল যা হারাম ঘেষণা করেছেন তা হারাম বলে গণ্য করে না এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা সত্য দীনকে অনুসরণ করে না। যতক্ষন না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিয্য়া কর আদায় করে"।[৪৪৭]

খলীফা উমার (রা) নিজ ইজতিহাদ বলে আল কুরআনে উল্লিখিত 'জিয্য়া'র নাম পরিবর্তন করে 'সদকা' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর নির্ধারিত অংশের দ্বিগুণ করারোপ করেন। মুজতাহিদ উমার এখানে 'নস'কে শাব্দিক অর্থে ব্যহারের পরিবর্তে জিয্য়া'র মূল উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নকেই প্রাধান্য দেন। উমার (রা) বনু তাগলিব প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেন, তাতে জিয্য়া'র নাম পরিবর্তনের মূল লক্ষ্যটিই ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

---

[৪৪৫] কারজাবী, ইয়ূসুফ, *আস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ*, (কায়রো: মাকতাবাহ ওয়াহবা, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২০৮।

[৪৪৬] ইব্ন যানজুওয়াইহ, আবু আহমাদ হামিদ, *আল আমওয়াল*, (সউদি আরব: মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩০।

[৪৪৭] আল কুরআন, ৯; ২৯।

هَؤُلَاءِ حمقى رَضوا بِالِاسْمِ وأبوا بِالْمَعْنَى،

"তারা হলো বোকা প্রকৃতির লোক। 'জিয়্যা'র মূল নামটি অস্বীকার করলো এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অকপটে স্বীকার করে নিলো"।[৪৪৮]

দুর্ভিক্ষের সময় চুরির অপরাধে হাত কাটার দণ্ড স্থগিত

জান-মালের নিরাপত্তা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্টার জন্য ইসলাম বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড-বিধি প্রয়োগ করে। চুরির অপরাধে হাত কাটা ইসলামী শরীয়তের একটি অকাট্য দণ্ডবিধি। এ বিষয়ে আল কুরআনের নসটি হলো,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ،

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো। এটি তাদের কর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[৪৪৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় হাত কাটার দণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا،

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হবার একটি ঘটনা কুরাইশদের চিন্তান্বিত করলো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য কারো মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। কিন্তু দণ্ড মওকুপের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সুপারিশ করার এমন দুঃসাহস কার? 'হিব্বুর রাসূল' (রাসূল এর প্রিয়পাত্র) উপাধিপ্রাপ্ত উসামা ইব্‌ন যাইদকে (রা) তারা এমন দুঃসাহসিক কাজের জন্য নির্বাচন করলো। উসামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এ বিষয়ে বথা বললেন। উসামা (রা) এর সুপারিশ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড স্থগিত করার ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। খুতবায় তিনি বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণ হলো, তাদের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ডারোপ না করে রেহাই দেয়া হতো। আর কোনো দুর্বল লোক চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলা হতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে, আমি তার হাত কেটে দেবো"।[৪৫০]

আল কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল দ্বারা চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান প্রমাণিত। কিন্তু খলীফা উমার নিজ ইজতিহাদ দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় হাত কাটার বিধান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলকে (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের সময় চুরি করলে হাত কাটা হবে না। তেমনিভাবে অভাবের তাড়নায় ও প্রয়োজনের নিরিখে বাধ্যগত চুরির কারণেও হাত কাটা হবে না।

---

[৪৪৮] ইবনুল মুলাক্কিন, সিরাজুদ্দীন, *আল বদরুল মুনীর*, সম্পাদনাঃ মুসতাফা আবুল গাইত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান ও ইয়াসির ইব্‌ন কামাল, (রিয়াদঃ দারুল হিজরাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ৯, পৃ. ২১২।

[৪৪৯] আল কুরআন, ৫; ৩৮।

[৪৫০] নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব ইব্‌ন আলী আল খোরাসানী, *সুনানু নাসায়ী*, সম্পাদনাঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, (হালাবঃ মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ), খ. ৮, পৃ.৭৪ ।

এখানে উমার (রা) এর ইজতিহাদগত দৃষ্টিভঙ্গি মূল নস এর গভীরে প্রোথিত। তিনি কুরআনের নস এ কোনো ধরনের পরিবর্তন বা দণ্ডবিধি বাতিল ঘোষণা করেন নি। বরং তিনি দণ্ড প্রয়োগে প্রতিবন্ধক কারণসমূহ পরিপূর্ণরূপে দুরিভূত হওয়া এবং তা কার্যকর করার সামগ্রিক শর্তাবলি বিদ্যমান থাকার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি দণ্ড বাতিল হবার মূল হেতু সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণেই তা মুলতবি করেন। কেননা দণ্ড প্রয়োগে সন্দেহের অবতারণায় তা বাতিল হওয়ার বিধান সর্বসম্মত।[৪৫১]
মূলত এখানে দণ্ড প্রয়োগে সন্দেহ সৃষ্টি হবার কারণেই হাত কাটার শাস্তি স্থগিত করা হয়।

৩.২.৪. উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এর ইজতিহাদ

ইসলামের তৃতীয় খলীফা আবু আবদিল্লাহ উসমান ইব্ন আফফান (রা) ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে হস্তির বছরের ছয় বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। আবিসিনিয়া ও মদীনার উভয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। কাবা ও বাইতুল মুকাদ্দাস দুই কিবলা অভিমুখে নামায আদায় করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই কন্যা বিয়ে করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তীব্র অভাবের সময় তিনি স্বীয় সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। বিভিন্ন এলাকায় বাহিনী প্রেরণ ও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজে যার আর্থিক অবদান অবিস্মরণীয়। সর্বস্তরের মদীনাবাসীদের সুপেয় পানির সমস্যা লাঘবে তিনি ‘রওমা’ কূপ জনস্বার্থে ওয়াকফ করে দেন। হজের বিধি-বিধান সম্পর্কে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। অত্যন্ত লজ্জাশীল ও ধৈর্যগুণে গুণান্বিত। যার শাসনামলে মুসলমানগণ অভাবনীয় সচ্ছলতা অর্জন করেন। এ সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি নৌ-বহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর যুগে ইসলামের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। তার শাসনালে বিজিত অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। এই মতবিরোধের কারণে একটি সম্প্রদায় জীবনের শেষ বয়সে তাঁর গৃহ অবরোধ করে তাকে খেলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করার দাবি জানায়। এক পর্যায়ে ৩৫ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

আল কুরআনকে পুস্তক আকারে (মাসহাফে) সংকলন

উসমান ইব্ন আফফান (রা) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও নিকটাত্মীয়। যা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। পূর্বের দুই খলীফার তিরোধানের পর তার শাসনামলে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। যার ফলে তিনি মুসলিম উম্মাহ’র সমৃদ্ধি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। একাধিক কেরায়াত বা পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ আল কুরআনকে কেরায়াত এর একটিমাত্র পদ্ধতিতে সংকলন করে তিনি ইজতিহাদের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেন। এতে করে তিনি মুসলিম উম্মাহ’কে বড় ধরনের ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উসমান (রা) কম ফতোয়া প্রদানে অভ্যস্থ হলেও আল কুরআনকে একটি মাসহাফে গ্রন্থবদ্ধ করার এ ইজতিহাদ তাঁকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। এ বিষয়ে ইব্ন শিহাব যুহরী বর্ণিত সহীহ বুখারী শরীফ এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

---

[৪৫১] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৭ ।

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي القِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلاَفَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ، أَنْ يُحْرَقَ،

"ইব্‌ন শিহাব যুহরী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হুজায়ফা ইবনুল য়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আজরবাইজানে শাম ও ইরাকবাসীদের সঙ্গে জিহাদরত অবস্থায় একদিন উসমান (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আল কুরআনের কেরায়াত (পঠনপদ্ধতি) নিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধ তাকে শঙ্কিত করে তোলে। তিনি উসমানকে (রা) বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! ইহুদি-খ্রিস্টানগণ যেভাবে আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো, এই উম্মতও অনুরূপ মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। একথা শুনে উসমান (রা) উম্মুল মুমিনীন হাফসাহ (রা) এর নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, 'আপনার নিকট রক্ষিত আল কুরআনের সংকলনটি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আমি পরবর্তীতে যথাসময়ে আপনার নিকট তা ফেরত দেবো'। হাফসাহ (রা) উসমান (রা) এর নিকট সংকলনটি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি যাইদ ইব্‌ন সাবিত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস, আবদুর রহমান ইবনুল হারিসকে (রা) মাসহাফটির কয়েকটি কপি করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয় তিন সদস্যের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের তিন জন এবং যাইদ ইব্‌ন সাবিত এর মধ্যে আল কুরআনের কেরায়াত পদ্ধতিতে মতবিরোধ হলে কুরাইশের ভাষায় লিখবে। কেননা আল কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাদের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর উসমান (রা) হাফসাহ এর নিকট মাসহাফটি ফেরত দেন এবং সংকলিত কুরআনের এক একেকটি কপি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং এ মাসহাফ ছাড়া বাকি সকল মাসহাফ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[৪৫২]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল কুরআন সাতটি পঠনরীতিতে অবতীর্ণ হয় । কিন্তু বিজিত অঞ্চলের অনারব মুসলমানদের নিকট বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল কুরআনের তেলাওয়াত নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তা অশুদ্ধ উচ্চারণের কারণে অর্থবিকৃতিরও আশঙ্কা দেখা দেয়। তদুপরি মুসলমানদের কিছু অংশ জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু অপর মুসলমানের বিশুদ্ধ কেরায়াতকে অশুদ্ধতার অভিযোগ তোলে। যা নব অঙ্কুরিত ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক ফিতনার সৃষ্টি করে। এমন বহুবিধ সমস্যা বিবেচনায় উসমান (রা) ইজতিহাদপূর্বক একটিমাত্র কেরায়াতে আল কুরআন পাঠের ফরমান জারি করেন।

গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়

ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' কিতাবে সহীহ সনদে উসমান (রা) এর এ উক্তি বর্ণনা করেন,

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ،

---

[৪৫২] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং- ৪৯৮৭।

"এটি তোমাদের যাকাত আদায়ের মাস। সুতরাং যার উপর কারো ঋণ আছে সে যেন তা আদায় করে দেয়। এভাবে তোমাদের সম্পদ হস্তগত হবার পর তার যাকাত আদায় করবে"।[৪৫৩]

ঋণ হস্তগত হবার পর তা আদায় করার বিষয়টি উসমান (রা) এর ইজতিহাদপ্রসূত একটি বিধান। যা ইতোপূর্বে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী ফকীহ ও মুজতাহিদগণ এটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে । যার ব্যাপারে মুসলমানদের মৌন সম্মতি ও নীরব ঐক্য (اجماع سكوتي) সংগঠিত হয়েছে।

৩.২.৫.আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) এর ইজতিহাদ

হস্তির বছরের ত্রিশ বছর পর রজব মাসের তেরো তারিখ আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইয়ামেনে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বপ্রথম গভর্নর। তিনি নবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তার লালন-পালন ও বর্ধন। মুসলমানদের মধ্যে যখন পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বিধান জারি করা হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা) এর উদ্দেশে বলেন, 'তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই'। তিনি একাধারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা ও চাচাতো ভাই। তিনি সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর (عشرة مبشرة)অন্যতম এবং তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের নিমিত্তে উমার (রা) কর্তৃক গঠিত কমিটির ছয় সদস্যের একজন। তিনি একজন দুনিয়াত্যাগী, বীরপুরুষ, বাগ্মী ও কবি। এছাড়াও তিনি ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের আধার। তিনি আবু বকর, উমার ও উসমান (রা) এর পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন। উমার (রা) তার অনুপস্থিতির কারণে গোমরাহিতে লিপ্ত না হবার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আামি জ্ঞানের শহর, আর আলী হলেন তার দরজা'[৪৫৪]। তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে মদীনার খলীফা নিযুক্ত থাকার কারণে তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،

"মূসা (আ.) এর নিকট হারুন (আ.) এর যে মর্যাদা, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঠিক তদ্রূপ। তবে আমার পরে কেনো নবী আসবে না।[৪৫৫]

তিনি চল্লিশ হিজরীর তিন রামাদান মসজিদে নববীতে ইমামতিরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন।

ইজতিহাদ এর ক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) এর সহজাত দক্ষতা ও অনন্য বৈশিষ্ঠ্য একটি স্বীকৃত বিষয়। তিনি ছিলেন বিচার মীমাংসায় সিদ্ধহস্ত ও সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অনুপম যোগ্যতা অর্জনে অলৌকিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আলী (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেন।

---

[৪৫৩] মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমীর আল আসবাহী, *আল মুয়াত্তা*, সম্পাদনাঃ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪২৫ হি./ ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং- ১৭।

[৪৫৪] ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী বলেছেন, এটি হাসান। যদিও ইবনুল জাওযী মওযু বলেছেন।

[৪৫৫] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ৩৭৩ ।

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا شَابٌّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: ادْنُ فَدَنَوْتُ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করে ইয়ামেনের পাঠালেন। তখন আমি ছিলাম টগবগে যুবক। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনি আমাকে একটি জাতির নিকট বিচারক হিসেবে পাঠাচ্ছেন, অথচ বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাছে এসো। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি আমার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বললেন, হে আল্লাহ! তার কলবে হেদায়ত দান করুন এবং তার যবানে স্থিরতা দান করুন। আলী (রা) বললেন, এর পর আমি দুইজনের মধ্যে বিচার ফায়সালার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করিনি।[৪৫৬]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুজতাহিদ হিসেবে আলী (রা) এর পরিচিতি ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এমন কি উমার ইবনুল খাত্তাবসহ (রা) প্রথম তিন খলীফার বিশ্বস্থ পরামর্শক ছিলেন তিনি। নিম্নে আলী (রা) এর ইজতিহাদের কয়েকটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

গর্ভধারণের ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস

একটি সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান জন্মদানের জন্য একজন নারী তার গর্ভস্থ ভ্রুণ নয় মাস ধারণ করে। ২৮০ থেকে ২৪৯ দিন পর্যন্ত সন্তান তার মায়ের গর্ভে অবস্থান করতে পারে। তবে ন্যূনতম কতো দিন গর্ভধারণ করলে সন্তানটি বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আলী (রা) ইজতিহাদ করেন। নিম্নের আয়াত থেকে তিনি এই মাসআলা ইসতেম্বাত করেন|

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا،

"তাকে গর্ভধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস।[৪৫৭]

সন্তানকে দুধ পান করানোর সময়কাল প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ،

"যে স্তন্য পান পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে"।[৪৫৮]

আলী (রা) বলেন, উপর্যুক্ত দুটি আয়াতে দুগ্ধদান ও গর্ভধারণ এ দুটি বিষয়ের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়কাল (চব্বিশ মাস) বাদ দিলে ছয় মাস অবিশিষ্ঠ থাকে। সুতরাং গর্ভধারণের ন্যূনতম সময়কাল হবে ছয় মাস।

চিকিৎসায় অবহেলার কারণে কোনো মানুষ বা পশুর ক্ষতি হলে দায়ভার সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের

রোগী চিকিৎসা একটি সেবামূলক পেশা ও আল্লাহর ইবাদতের অংশ। এ পেশায় দক্ষতা অর্জন চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম রোগী চিকিৎসায় সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেছে। রোগীর সেবা করার মাধ্যমে যেভাবে অধিক সওয়াব অর্জন করা যায়, তেমনিভাবে এ পেশায় অবহেলার কারণে ইসলামে শাস্তির বিধান কার্যকর রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[৪৫৬] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *ফাদায়িলুস সাহাবাহ,* (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৮০ ।

[৪৫৭] আল কুরআন, ৪৬; ১৫।

[৪৫৮] আল কুরআন, ২;২৩৩ ।

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ،

"যে ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত না করে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হয়, এতে কারো ক্ষতি হলে চিকিৎসককে তার দায়ভার বহন করতে হবে" ।[৪৫৯]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা ভালোভাবে রপ্ত না করে রোগীর ক্ষতি করলে চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করে পেশাগত অবহেলা বা ত্রুটির কারণে রোগীর ক্ষতিসাধনের বিষয়টি তৎকালীন সময়ের একটি নব-উদ্ভাবিত সমস্যা। আলী (রা) ইজতিহাদপূর্বক এ বিষয়ে শরয়ী সমাধান পেশ করেন। অসতর্কতা এবং অবহেলাজনিত ত্রুটির কারণে চিকিৎসককে দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে হুকুম প্রদান করেন। যা তাঁর গভীর বুদ্ধিমত্তা ও ইজতিহাদী প্রতিভার ফসল।

এ ইজতিহাদের মাধ্যমে জাতির দুধরনের কল্যাণ সাধিত হয়।

এক. চিকিৎসকের পেশাগত সতর্কতা ও নিষ্ঠা।

দুই. দুর্দশাগ্রস্থ ও রোগাক্রান্ত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা।

জবরদস্তিমূলক শপথের মাধ্যমে আদায়কৃত তালাক শর্তভঙ্গের কারণে কার্যকর হবে না

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করে। লোকটি সফরে যেতে চাইলে স্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা এক মাস পর্যন্ত তার ব্যয়ভার বহন না করলে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করলো। তাদের নির্ধারিত সময়ে লোকটি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ পাঠাতে ব্যর্থ হলো। ভ্রমন থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রী পক্ষ আলী (রা) এর নিকট বিচার দায়ের করলো। আলী (রা) তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা জোরপূর্বক তাকে তালাক দিতে বাধ্য করেছো। অতঃপর তিনি মহিলাটিকে লোকটির নিকট ফিরিয়ে দিলেন"।

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলী (রা) এটাকে কার্যকর তালাক এর অর্ন্তভুক্ত করেননি। বরং এটাকে জোরপূর্বক তালাক হিসেবে গণ্য করেন। এটা সর্বজন বিদিত যে, জমহুর ফকীহ এর মতে জবরদস্তিমূলক তালাক কার্যকর হয় না।[৪৬০]

আলী (রা) এর ইজতিহাদের পক্ষে ইব্ন মাজা বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ،

"আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। অসতর্কতাবশত ও জবরদস্তিমূলক কোনো কাজে কাউকে বাধ্য করা হলে তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন"।[৪৬১]

---

[৪৫৯] নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শুআইব ইব্ন আলী আল খোরাসানী, *সুনানু নাসায়ী*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি. /২০০৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫২।

[৪৬০] আল মুগনী, ইব্ন কুদামা, আবু মুহাম্মদ মুয়াফ্ফাকুদ্দীন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ আল মাকদিসী, (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./ ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৮২।

[৪৬১] ইব্ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ আল কাযবীনী, সুনানু ইব্ন মাজাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (কায়রো: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৬৫৯, হাদীস নং- ২০৪৫।

পরিচ্ছেদ- ৩
মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ

৩.৩.১.আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর ইজতিহাদ

আবু আবদির রহমান আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন গাফিল আরবের হুজায়ল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে ইব্‌ন উম্মে আবদও বলা হয়। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমি মুসলমানদের মধ্যে ষষ্ঠ। তখন আমরা গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিলাম না।[৪৬২] তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে কুরাইশের কাফিরদের শুনিয়েছেন। প্রথমে আবিসিনিয়া পরে মদীনায় হিজরত করেন। বদর উহুদসহ সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই বদর যুদ্ধে আহত আবু জাহালকে হত্যা করেন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশ্বস্ত খাদেম ও একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। ইব্‌ন আসাকির (৫৫০-৬২০ হি.) বর্ণনা করেন,

إنَّ عبد الله بن مسعود كان صاحب السواك والوسادة والنعلين ،

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিসওয়াক, ওযুর পানি ও জুতা মুবারকের খাদেম ছিলেন"। [৪৬৩]

ইব্‌ন সাদ (১৬৮-২৩০ হি.) বর্ণনা করেন,

كان عبد الله يُلْبِس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা মুবারক পরিধান করাতেন তিনি কোথাও উপবিষ্ট হলে তা খুলে নিয়ে নিজ দায়িত্বে রাখতেন। তিনি কোথাও উপবেশন করলে তা খুলে রাখতেন। এগিয়ে যাবার সময় লাঠি হাতে তুলে দিতেন। চলার সময় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হাঁটতেন। কক্ষে প্রবেশ করার সময় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে প্রবেশ করতেন।[৪৬৪]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত,

قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينًا ما نرى إلَّا أنَّ عبد الله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا نرى من دخوله ودخول أمِّه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ،

"আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে আগমন করলাম। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আবদুল্লাহ ও তার মাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের সদস্য বলে মনে করতাম। কারণ তিনি এবং তার মা রাসূল

---

[৪৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।
আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১০৭।

[৪৬৩] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩০, পৃ. ২২৭।

[৪৬৪] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে অবাধে ও অধিকহারে প্রবেশ করতেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখতেন"।[৪৬৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যশীল সাহাবী সম্পর্কে হুজাইফা (রা) এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য,

حدثنا عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا ودلا وسمتا فنأخذ عنه ونسمع منه، قال: هو بن مسعود،

"হুজায়ফাকে (রা) প্রশ্ন করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যশীল সাহাবী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। যার নিকট থেকে আমি হাদীস গ্রহণ করতে পারি। তিনি উত্তর দিলেন, ইব্‌ন উম্মে আবদ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিশীল অন্য কাউকে আমি দেখিনি। [৪৬৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ এ বিষয়টি ভালোভাবে জানেন যে, উম্মে আবদ এর পুত্র আল্লাহর নিকট মর্যাদার ক্ষেত্রে অধিকতর নিকটবর্তী।[৪৬৭]

উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত বিষয়ে আবদুল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞানী কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। এ কথা শুনে আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, এর কারণ হলো, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শোনার সুযোগ পাই না, তিনি তখনও শোনার সুযোগ লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমাদের যখন প্রবেশাধিকার থাকে না, তিনি তখনও প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যবান থেকে সত্তরটি সূরা শিখেছি। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮। তিনি সবচেয়ে বেশি দুরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। কুরআন ও ফিকহ এর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার সর্দার। উমার (রা) জলীলুল কদর কোনো সাহাবীকে মদীনা ত্যাগ করতে দিতেন না। এতদসত্ত্বেও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে (রা) কূফায় যাওয়ার অনুমতি দেন। বিদায়কালে সেখানকার অধিবাসীদের উদ্দেশে বলেন,

إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي،

"আমি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে (রা) আমির হিসেবে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে (রা) মুয়াল্লিম ও উযির হিসেবে পাঠাচ্ছি। তারা দুজন হলেন মর্যাাদাবান সাহাবী। যারা বদরে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং তোমরা তারা দুজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। আবদুল্লাহকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিলাম। [৪৬৮]

---

[৪৬৫] তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসরঃ মাকতাবাহ মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫হি./১৯৭৫খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬৭২।

বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ যুহাইর ইব্‌ন নাসির, (দারু তুকিন নাজাত, ১৪২২ হি. খ. ৫, পৃ. ২৮, হাদীস নং- ৩৭৬৩।

[৪৬৬] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬।

[৪৬৭] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৭৩।

তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসরঃ মাকতাবাহ মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬৭৩।

[৪৬৮] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি,), খ. ১, পৃ. ১৬।

কূফা অবস্থানের প্রাক্কালে তার নিকট থেকে মুসলমানগণ কুরআন ও ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন যথাক্রমে তাদের শিক্ষক, বিচারক ও পথ-প্রদর্শক। বিশেষত যেখানে কুরআন সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট নস নেই, সেখানে ইজতিহাদের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তিনি যে সকল মাসআলা ও ফতোয়া ইসতেম্বাত করতেন তার ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে রাখতেন। ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের ছাত্রদেরই নিয়ম ছিল যে, তারা উস্তাদের প্রদত্ত ফতোয়া ও ফিকহের ক্ষেত্রে তার প্রদত্ত অভিমতগুলো লিখে রাখতেন।[৪৬৯] ইব্ন মাসউদ থেকে আলকামা ইব্ন কাইস এ পদ্ধতি যথাযথভাবে আয়ত্ব করেন। আলকামা থেকে ইবরাহীম নাখায়ী। তার নিকট থেকে হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান এ পদ্ধতির প্রবক্তা। এ ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানীফা (র) ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করেন।

ইবরাহীম নাখায়ী (৪৭- ৯৬ হি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো বিষয়ে উমার ও ইব্ন মাসউদ (রা) একমত হলে তিনি কখনো এ মত ত্যাগ করতেন না। তারা উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হলে ইব্ন মাসউদ (রা) এর মত তার নিকট বেশি পছন্দ হতো। কারণ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ছিলেন বেশি উদার ।

আলী (রা) কূফায় আগমন করার পর কূফাবাসীদের একটি দল আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর কথা তার নিকট উল্লেখ করে বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমরা আবদুল্লাহর চেয়ে অধিক চরিত্রবান, সূক্ষ্ম মুয়াল্লিম, সদাচারী ও পরহেজগার আর কাউকে দেখিনি। আলী (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, তার ব্যাপারে আমার মতামতও অনুরূপ। বরং আমি তার চেয়েও উত্তম মনোভাব পোষণ করি। 'তিনি কুরআন পড়েছেন, হালালকে হালাল জেনেছেন এবং হারামকে হারাম জ্ঞান করেছেন। তিনি ছিলেন দীনের ফকীহ। সুন্নাহর সুবিজ্ঞ আলিম।[৪৭০]

আলী ও উসমান (রা) এর খেলাফতকালে তিনি কূফার বাইতুল মালের গভর্নর ছিলেন । তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে মদীনা আগমন করেন এবং ৩২ হিজরীতে উসমান (রা) এর খেলাফতকালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। নিম্নে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো-

যাইদ ইব্ন সাবিত (রা) এর উক্তি হলো, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কেবলমাত্র (حيض) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। ইব্ন মাসউদ ও উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর মত হলো, গোসল না করা পর্যন্ত তার ইদ্দত শেষ হবে না। এই ইখতিলাফের মূল ভিত্তি হলো আল কুরআনে উল্লিখিত (قروء) 'কুরূ' শব্দটি। ইব্ন মাসউদ (রা) এর মতে শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু যাইদ ইব্ন সাবিত (রা) শব্দটি হাইয তথা ঋতুস্রাব অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৪৭১]

৩.৩.২. মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) এর ইজতিহাদ

মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) খাযরাজ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহাবী। তিনি আঠারো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনো তার মুখে দাড়ি গজায়নি। তিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথেও অংশগ্রহণ

---

[৪৬৯] লেখকমণ্ডলি, *ফিকহে ইতিহাস ও দর্শন*, (ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬২।

[৪৭০] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০৯।

[৪৭১] হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২৮।

করেন। হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি পরবর্তীতে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন ও ফিক্‌হ শিক্ষা দেয়ার জন্য মক্কাবাসীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আল কুরআন সংকলনে দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন আনসারী সাহাবীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রাদি.)। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন,

مات النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعِ القُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আল কুরআন সংকলনে চারজন সাহাবী নিয়োজিত ছিলেন। আবুদ দারদা, মুআজ ইব্‌ন জাবাল, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আবু যায়দ (রাদি.)"।[৪৭২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চারজন সাহাবী থেকে আল কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই চারজন সাহাবীর মধ্যে মুআয ইব্‌ন জাবাল ছিলেন অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،

"চারজন সাহাবী থেকে আল কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করো। তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামটি প্রথমে উল্লেখ করেন। আবু হুজায়ফার কৃতদাস সালিম, মুআজ ইব্‌ন জাবাল ও উবাই ইব্‌ন কাব।[৪৭৩]

তাবুক যুদ্ধের পর তিনি ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর তিনি শাম বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। আবু সুফ্‌য়ান (রা) এর পুত্র ইয়াযিদ উমার (রা) এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, শামের মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাবার কারণে সেখানকার অধিবাসীদের কুরআন ও ফিক্‌হ শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে কমপক্ষে তিনজন মুয়াল্লিমের প্রয়োজন। এই পত্রের প্রেক্ষিতে উমার (রা) তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। শামের গভর্নর আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) আমওয়াস নামক মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর মুআজ ইব্‌ন জাবালকে (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই মহামারিতে তার দুই স্ত্রী এবং দুই পুত্র মৃত্যুবরণ করার পর তিনি নিজেও ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বযস হয়েছিল তেত্রিশ বছর।[৪৭৪]

ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুআজ ইব্‌ন জাবালকে (রা) অগ্রগণ্য মনে করা হতো। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদ শব্দটির প্রবক্তাও ছিলেন তিনি। ইয়ামেনের কাযী হিসেবে নিযুক্তির সময় বিচারব্যবস্থায় ইজতিহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হাদীসটি উল্লেখ করা হলো,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي

[৪৭২] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ আল বুখারী, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৫০০৪।

[৪৭৩] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬, হাদীস নং- ৩৮০৮।

[৪৭৪] ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*, (কায়রো: দারুল আদাবিল ইসলামী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৯।

وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ،

"ইয়ামেনে পাঠানোর প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইব্‌ন জাবালকে (রা) প্রশ্ন করেন, তোমার সামনে কোনো সমস্যা উদ্ভব হলে কীভাবে তার ফায়সালা করবে? তিনি উত্তরে দিলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার প্রশ্ন করেন। যদি তার সমাধান কিতাবুল্লাহ'য় পাওয়া না যায়? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী। তিনি আবার প্রশ্ন করেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় যদি তার সমাধান পাওয়া না যায়? তিনি উত্তর দিলেন। আমি রায় প্রয়োগের জন্য ইজতিহাদ করবো। এতে কারো পরওয়া করবো না। এ জবাব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বললেন, আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার তাওফিক দান করেছেন"।[৪৭৫]

যে ক'জন সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ অভিধায় সম্মানিত করেন, তাদের মধ্যে তাঁর উপাধী ছিলেন হালাল-হারাম বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী (أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ،

"আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাদি.)। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.)। সর্বাধিক লজ্জাশীল হলেন উসমান (রাদি.)। হালাল-হারাম বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রাদি.)। আল কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী সাহাবী হলেন উবাই ইবন কাব (রাদি.)। ফারায়েজ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রাদি.)। প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্থ ব্যক্তি থাকে। এ জাতির নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্থ ব্যক্তি হলেন আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রাদি.)।[৪৭৬]

ইজতিহাদ ও ফিক্‌হ বিষয়ে মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) এর মেধার স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।

ان الْعُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ مُعَاذُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رَتْوَةً بِحَجَرٍ،

"কিয়ামতের দিন আলিগণ যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, তখন মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) তাদের চেয়ে এক স্তর উপরে থাকবেন"।[৪৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) ছিলেন সর্ববিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের আশ্রয়স্থল। এ সময় অল্পসংখ্যক যে সকল সাহাবী ফতোয়া দিতেন, তাদের মধ্যে মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) ছিলেন অন্যতম। এ বিষয়ে সাহল ইব্‌ন আবি হাসামা বলেন,

---

[৪৭৫] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, তা/বি.) খ. ৩, পৃ. ৩০৩, হাদীস নং- ৩৫৯২।

[৪৭৬] মাকদিসী, জিয়াউদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ, *আল মুসতাখরাজ মিনাল আহাদিসিল মুখতারাহ*, সম্পাদনা: ড. আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন দুআইশ, (বৈরুত: দারু খাযির, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২২৭, হাদীস নং- ২২৪২।

[৪৭৭] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইবন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ২২৮।

كان الذين يفتون على عهد رسول الله ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ وزيد،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মুহাজিরদের মধ্যে তিনজন সাহাবী ফতোয়া দিতেন। তারা হলেন, উমার, উসমান ও আলী (রাদি.)। আনসারী সাহাবীদের মধ্যেও তিনজন ফতোয়া দিতেন। তারা হলেন, উবাই ইব্‌ন কাব, মুআজ ইব্‌ন জাবাল, ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রাদি.)"।[৪৭৮]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) এর অবস্থান ছিল অত্যন্ত সমীহের।

খোদ খলীফা উমার (রা) তার ইজতিহাদী প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন,

من أراد الفقه، فليأت معاذ بن جبل،

"যে ব্যক্তি ফিক্‌হ শাস্ত্র শিখতে চায়, সে যেন মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) এর নিকট গমন করে"।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুজতাহিদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) এর ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

إن معاذ بن جبل كان أُمة قانتًا لله حنيفا، ولم يك من المشركين،

"মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) ছিলেন এমন জাতির প্রতীক, যিনি সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৪৭৯]

৩.৩.৩. আবু মূসা আশআরী (রা) এর ইজতিহাদ

আবু মূসা আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাইস ইয়েমেনের আশআর গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন সাদ এর বর্ণনা মতে, আবু মূসা আশআরি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়া হিজরত করেন।[৪৮০] ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (১৩০-২০৭) এর বর্ণনা মতে, তিনি আবিসিনিয়া হিজরত করেননি। মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বদেশ ফিরে যান। পরবর্তীতে আশআর গোত্রের একটি বিরাট জনবল নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যবিদ ও আদন অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উমার (রা) এর খেলাফতকালে বাসারা ও উসমান (রা) এর শাসনামলে কূফার গভর্নর ছিলেন। আবু মূসা আশআরী ইজতিহাদ ও ফতোয়ার পাশাপাশি মধুর কন্ঠের অধিকারী একজন সাহাবী ছিলেন। একদিন তার কুরআন তেলাওয়াত শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেন,

إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود،

"আবু মূসা আশআরীকে (রা) দাউদ (আ.) এর মতো মধুর কন্ঠ দান করা হয়েছে"।[৪৮১]

সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিক্‌হ ও বিচারব্যবস্থায় যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু মূসা আশআরী (রাদি.)। ইমাম যাহাবী (র) (৬৭৩-৭৮৪ হি.) বর্ণনা করেন, ।

وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْمَنْ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ أَهْلَ البَصْرَةِ، وَفَقَّهَهُمْ فِي الدِّيْنِ،

---

[৪৭৮] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসতিআব ফী মারিফাতিল আসহাব*, (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪৭৬।

[৪৭৯] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৯।

[৪৮০] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৫।

[৪৮১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৫৪৬, হাদীস নং- ৭৯৩।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন, আবু মূসা আশআরী (রা) ছিলেন তাদের একজন। তিনি বাসারাবাসীদের কুরআন ও ফিকহ এর শিক্ষক ছিলেন"।[৪৮২]

ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, আমি কূফায় আলী ও আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে জ্ঞানী কোনো সাহাবী পাইনি। আবুল বুহতারি বর্ণনা করেন, আমরা আলী (রা) থেকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করে বললেন, কোন সাহাবী সম্পর্কে জানতে চান? আমরা বললাম, ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্পর্কে। আলী (রা) বললেন,

عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، ثُمَّ انْتَهَى، وَكَفَى بِهِ عِلْماً،

"তিনি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সবার শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন"। আমরা আবু মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তর দিলেন,

صُبِغَ فِي العِلْمِ صِبْغَةً ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ،

"তিনি জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে সফলতার সঙ্গে বের হয়েছেন"।

ইমাম শাবী বর্ণনা করেন,

قُضَاةُ الأُمَّةِ: عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأَبُو مُوْسَى،

"এই উম্মতের কাযী হলেন চারজন। উমার, আলী, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আবু মূসা আশআরী (রাদি.)।

ইমাম যাহাবী (র) বলেন,

لَمْ يَكُنْ يُفْتِي فِي المَسْجِدِ زَمَنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَؤُلاَءِ: عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَمُعَاذٍ وَأَبِي مُوْسَى،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মসজিদে নববীতে এই চারজন সাহাবীই ফতোয়া প্রদান করতেন। উমার, আলী, মুআয ও আবু মূসা"।

তাবিঈ মাসরুক (র) বর্ণনা করেন,

كَانَ القَضَاءُ فِي الصَّحَابَةِ إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأُبَيٍّ وَزَيْدٍ وَأَبِي مُوْسَى،

"সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিচার ফায়সালার দায়িত্ব ছয়জন শীর্ষ সাহাবীর নিকট ন্যস্ত ছিল। তারা হলেন, উমার, আলী, ইব্‌ন মাসউদ, উবাই ইব্‌ন কাব, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আবু মূসা আশআরী (রাদি.)"।

তিনি ৪৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। আবু মূসা আশআরী এর ইজতিহাদী প্রতিভা সম্পর্কে অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আবু মূসা আশআরী এর ইজতিহাদকৃত উত্তরাধিকার আইন প্রসঙ্গে একটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

জনৈক ব্যক্তি একজন কন্যা, একজন পৌত্রী এবং একজন বোন রেখে মারা গেলো। এক্ষেত্রে সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে?

উত্তরে আবু মূসা আশআরী (রা) বললেন, কন্যা এবং বোন অর্ধেক অর্ধেক পাবে। তিনি আরো বলেন, ইব্‌ন মাসউদ এর নিকট মাসআলাটি জানতে চাইলে তিনিও একই উত্তর দেবেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর নিকট মাসআলাটি জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মূসা আশআরী যে সমাধান দিয়েছেন তারও উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের মাসআলায় যে সমাধান দিয়েছেন, আমি ঠিক তেমনি সমাধান দেবো। কন্যা অর্ধেক পাবে আর দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার লক্ষ্যে পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ। অবশিষ্ট অংশ পাবে বোন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর প্রদত্ত সমাধান আবু মূসা আশআরী (রা)

---

[৪৮২] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৮১।

এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, এই বিজ্ঞ আলিম যতদিন তোমাদের নিকট বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করো না।[৪৮৩] আবু মূসা আশআরী (রা) ইজতহিাদ করে মাসআলাটির সমাধান দিয়েছেন। পববর্তীতে নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। সম্ভবত তার নিকট এ সংক্রান্ত নসটি পৌছেনি। তাই তিনি ইজতিহাদ করে সমাধান পেশ করেন। আবু মূসা আশআরী (রা) ছিলেন সত্যের অতন্দ্র প্রহরী। সত্য উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফায়সালা দিতেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُوسَى،

"কোনো বিচারকের জন্য সত্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফায়সালা করা উচিত নয়। বিচারকের সামনে সত্য এভাবে স্পষ্ট হওয়া হওয়া চাই, যেভাবে রাত থেকে দিন স্পষ্ট হয়। কথাটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু মূসা ঠিক বলেছেন"। [৪৮৪]

৩.৩.৪. যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর ইজতিহাদ

যাইদ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক ৬১১ খ্রি. মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ও প্রথম সারির ওহী লেখক, আল কুরআনের শ্রেষ্ট তেলাওয়াতকারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মদীনার ফতোয়াদানকারীদের মধ্যে অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার নিকট থেকে আল কুরআন শুনেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফারায়েজ বিষয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার ব্যাপারে বলেন,

أَفْرَضُ أُمَّتِي: زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ،

"আমার উম্মতের মধ্যে ফরায়েজ শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন যাইদ ইব্‌ন সাবিত"।[৪৮৫]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনা আগমনের সময় তার বয়স ছিল এগারো বছর। তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর নির্দেশে কুরআন সংকলনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (র) বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট আলিম হলেন তিন জন। একজন শামে, একজন কূফায়, আর একজন মদীনায়। এই দুইজন মদীনার আলিম থেকে অনেক বিষয় জেনে নেন, কিন্তু মদীনার আলিমকে ঐ দুইজন থেকে জানতে হয় না। ফিক্‌হ শাস্ত্রে যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর মর্যাদা দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) এর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করা যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করেন,

يَرْحَمُهُ اللهُ فَقَدْ كَانَ عَالِمَ النَّاسِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَحَبْرَهَا فَرَّقَهُم عُمَرُ فِي الْبُلْدَانِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يُفْتُوا بِرَأْيِهِمْ وَحَبَسَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ بِالْمَدِيْنَةِ يُفْتِي أَهْلَهَا،

---

[৪৮৩] আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *মুখতাসারু সহীহিল ইমাম আল বুখারী*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

[৪৮৪] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, সম্পাদনাঃ এহসান আব্বাস, (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ ১১৩।

[৪৮৫] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দানঃ মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৭২, হাদীস ন- ৭৯৬২।

"যাইদ ইব্‌ন সাবিতকে (রা) আল্লাহ তায়ালা রহম করুক। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) এর খেলাফতকালে সবচেয়ে শ্রেষ্ট আলিম। উমার (রা) সাহাবায়ে কেরামকে বিজিত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিতেন। তাদেরকে নিজ সিদ্ধান্ত মতে ফতোয়দানে নিষেধ করতেন। কিন্তু যাইদ ইব্‌ন সাবিতকে (রা) মদীনায় ফতোয়া দেয়ার জন্য রেখে দেন"।[৪৮৬]

যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রাদি) এর ইজতিহাদী প্রতিভা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১) ইমাম শাবী'র (১৬-১০৩ হি.) বরাতে বর্ণনা করেন, তিনজন সাহাবী একজন অপর জনকে প্রশ্ন করে ফতোয়া দিতেন। তারা হলেন, উমার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রাদি.)। আলী, উবাই ইব্‌ন কাব ও আবু মুসা আশআরী পরস্পর থেকে জেনে নিয়ে ফতোয় দিতেন। শায়বানী বলেন, আমি শাবীকে প্রশ্ন করলাম, আবু মুসা আশআরী কোন স্তরের? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন না। আমি বললাম, মুআজ কোন পর্যায়ের? তিনি বললেন, তিনি তো এর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন।[৪৮৭] ইমাম যাহাবী নাফি (র) এর বরাতে বর্ণনা করেন, উমার (রা) যাইদ ইব্‌ন সাবিতকে বিচারক পদে নিয়োগদান করেন এবং তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, উমার (রা) এর পর মুসলমানদের ইমাম ছিলেন যাইদ ইব্‌ন সাবিত। তার পর হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার। ইমাম যাহাবী বলেন,

مَا كَانَ عُمَر وَعُثْمَانُ يُقَدِّمَانِ عَلَى زَيْدٍ أَحَداً فِي الفَرَائِضِ وَالفَتْوَى وَالقِرَاءةِ وَالقَضَاءِ،

"খলীফা উমার ও উসমান (রা) ফরায়েজ, ফতোয়া, কেরায়াত ও বিচার ফায়সালায় যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর উপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না"।[৪৮৮]

কোনো স্বাধীন নারীর স্বামী যদি কৃতদাস হয় এবং সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়, এ মাসআলার সমাধানে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী তিন তালাকের অধিকারী নাকি দুই তালাক দ্বারা স্ত্রী বিচ্ছেদ (بائنة) হয়ে যাবে? উসমান (রা) ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, ঐ স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য কখনো হালাল হবে না। তারা উভয়ে এখানে স্বামীর অবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বামী স্বাধীন হলে তিন তালাকের অধিকারী হবে। আর কৃতদাস হলে দুই তালাকের অধিকারী হবে। আলী (রা) এর মতামত হলো, তিন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হবে না। তিনি এক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিম্নে যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর ইজতিহাদকৃত তালাক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুই একটি মাসআলা বর্ণিত হলো।

তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কার অধিকার প্রাধান্য পাবে? এখানে যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি স্বামীর অধিকারকে প্রধান্য দিয়েছেন। কেননা তালাক দেয়ার মূল অধিকারটি স্বামীর। সুতরাং স্বামী স্বাধীন হলে তিন তালাকের অধিকারী হবে, আর কৃতদাস হলে দুই তালাকের অধিকারী হবে।

স্বামী এবং দুই পুত্র রেখে কোনো মহিলা মারা গেলে ইব্‌ন আব্বাস এর মতে স্বামী অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। মা পাবে তৃতীয়াংশ। পিতা বাকি সম্পদের অধিকারী হবে। যাইদ ইব্‌ন সাবিতসহ (রা)

---

[৪৮৬] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৩৪।

[৪৮৭] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ.৭৩।

[৪৮৮] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৩৪।

অন্যান্য ফকীহ সাহাবীগণ এর মতে স্বামী এক তৃতীয়াংশ পবে। কেননা 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে' এই নীতির ভিত্তিতে ভাই ও সন্তানের মতো পিতাও সমান উত্তরাধিকারের মালিক হবে।[৪৮৯]

৩.৩.৫. উবাই ইব্‌ন কাব (রা) এর ইজতিহাদ

আবু মুনযির উবাই ইব্‌ন কাব ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন যাইদ মদীনার খাযরাজ গোত্রের প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী। তিনি একাধারে ফকীহ, কারি ও কাতেবে ওহী। এই মহান সাহাবী ত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে কুরআন সংকলনকারী চার সদস্যের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কাছে নামায আদায়ের সুযোগদানে মর্যাদাবান করেছেন এবং মুসলমানদের সর্দার হিসেবে অভিহিত করেন, ইমাম যাহাবী আমর ইবনুল আস (রা) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ: ادْعُوا لِي سَيِّدَ الأَنْصَارِ؟ فَدَعَوْا أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ،

"একদা ঈদের দিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নিকট আনসারীদের সর্দারকে ডেকে নিয়ে এসো। উপস্থিত সাহাবীগণ উবাই ইব্‌ন কাবকে ডেকে নিয়ে আসলেন"।[৪৯০]

আল কুরআনের বিবিধ জ্ঞানে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ القُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْداً وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذاً وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ المَالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِناً وَقَاسِماً،

"কুরআন সম্পর্কে কারো প্রশ্ন থাকলে সে উবাই ইব্‌ন কাব এর নিকট জেনে নেবে। ফারায়েজ সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দেবেন যায়দ ইব্‌ন সাবিত। ফিক্‌হ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন মুআজ ইব্‌ন জাবাল। কারো অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হলে সে যেন আমার নিকট আসে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উপর অর্থ সঞ্চয়ন ও বন্টনের দায়িত্ব অর্পন করেছেন"।[৪৯১]

তাবিঈ মাসরুক (র) বলেন,

"ছয়জন সাহাবীর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয় ইলম পাওয়া যায়। তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, যাইদ ইব্‌ন সাবিত, উবাই ইব্‌ন কাব ও আবুদ দারদা। মাসরুক আরো বলেন, আবার এই ছয়

---

[৪৮৯] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৬।
হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৬।

[৪৯০] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৬।

[৪৯১] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৪।

জনের সামগ্রিক ইলম দুইজনের মধ্যে একত্রে পাওয়া যায়। তারা হলেন, আলী ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাদি.)"।[৪৯২]

ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,[৪৯৩]

وفي الصحابة نحو من مائة وعشرين نفسا مقلّون في الفتيا جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد البحث كأبيّ بن كعب وأبي الدّرداء وأبي طلحة والمقداد وغيرهم،

"১২০ জনের মতো সাহাবী ফতোয়াদানে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও খুব কম ফতোয়া দিতেন। তাদের অনেকের নিকট থেকে কেবলমাত্র এক, দুই কিংবা তিনটি ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের সকল ফতোয়া একটি ক্ষুদ্র খণ্ডে একত্র করা সম্ভব হবে। উবাই ইব্‌ন কাব, আবু দারদা, আবু তালহা ও মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ তাদের মধ্যে অন্যতম"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তিনি আল কুরআন সংকলন করে তার নিকট উপস্থাপন করেন। ইমাম যাহাবীর বর্ণনা মতে,

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَكَتَبَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ أُبَيٌّ كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،

"ওহী লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার অগ্রগামী। উবাই ইব্‌ন কাব উপস্থিত না থাকলে যায়দ ইব্‌ন সাবিত ওহী লেখার মহৎ কাজটি সম্পন্ন করতেন"।[৪৯৪]

৩.৩.৬. আবুদ দারদা (রা) এর ইজতিহাদ

আবুদ দারদা উআইমির ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন আমির খাযরাজ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহাবী, কুরআন সংকলনকারী ও কাযী। শাম বিজয়ের পর আবুদ দারদা (রা) তথাকার অধিবাসীদের শিক্ষক ও ফকীহ হিসেবে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে দামেস্কের কাযী হিসেবে নিয়েগলাভ করেন এবং উসমান (রা) এর খেলাফতকালে কাযী পদে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হাকিমুল উম্মাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।[৪৯৫]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস আল কুরআন চর্চায় তিনি নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় আল কুরআন হিফজ করে তাঁকে শোনান। আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে কুরআন সংকলনের মতো গুরুদায়িত্বে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত,

مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ،

[৪৯২] নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইব্‌ন শরফ, *আত তাকরীব ওয়াত তায়সীর*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৫হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২১।

[৪৯৩] আসকালানী, ইব্‌ন হাজার আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৬ ।

[৪৯৪] ইবনুল আসির আল জাযরী, আবুল হুসাইন ইজ্জুদ্দীন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা*, (বৈরুত: দারল ফিকর, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬২।

[৪৯৫] প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৮।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর চারজন সাহাবী আল কুরআন সংকলন করেন। আবুদ দারদা, মুআজ ইব্ন জাবাল, যায়দ ইব্ন সাবিত ও আবু যায়দ (রা) ।[৪৯৬]

তিনি আল কুরআনকে ফিক্হ চর্চার মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম গাযালী আবুদ দারদা (রা) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً،

"আল কুরআনের বহুমুখী ব্যাখ্যা না জেনে কেউ ফকীহ হতে পারে না"।[৪৯৭]

আবু নুআইম ইসফাহানী (র) (৩৩৬-৪৩০ হি.) বর্ণনা করেন, আবুদ দারদা (রা) পৃথিবীর সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম।[৪৯৮]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে শামের গভর্নর ইয়াযিদ ইব্ন আবু সুফ্য়ান খলীফার নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে,

ان أهل الشام قد كثروا وملئوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني برجال يعلمونهم،

"শামে মুসলমানের সংখ্যা দিনি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে কুরআন ও ফিক্হ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং আমার নিকট এমন কয়েকজন শিক্ষক প্রেরণ করুন, যারা পারঙ্গমতার সঙ্গে ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম"।

গভর্নরের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে উমার (রা) কয়েকজন জলীলুল কদর সাহাবীকে শামে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। আবুদ দারদা (রা) ছিলেন দামেস্কের সেই শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আমৃত্যু সেখানে কাযী ও শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন,

عَنْ مَكْحُوْلٍ:كَانَتِ الصَّحَابَةُ يَقُوْلُوْنَ: أَرْحَمُنَا بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَنْطَقُنَا بِالحَقِّ عُمَرُ وَأَمِيْنُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَعْلَمُنَا بِالحَرَامِ وَالحَلاَلِ مُعَاذٌ وَأَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَتَبِعَهُم عُوَيْمِرُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالعَقْلِ ،

"মাকহুল (র) থেকে বর্ণিত, সাহবায়ে কেরামের মধ্যে এমন কথা প্রচলিত ছিল যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন সর্বাধিক সত্য উচ্চারণকারী। আবু উবাইদা (রা) আমাদের মধে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন মুআজ ইব্ন জাবাল (রাদি.)। উবাই ইব্ন কাব (রা) ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতকারী। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর নিকট ছিল জ্ঞানের সমাহার। তাদের ধারাবাহিকতায় আবুদ দারদা (রা) ছিলেন বোধজ্ঞানে সবার শ্রেষ্ট"। [৪৯৯]

৩.৩.৭. আয়িশা (রা) এর ইজতিহাদ

আয়িশা বিনতে আবি বকর ইব্ন আবি কুহাফা (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তৃতীয় ও একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি ৬১৩/১৪ খ্রি. মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের ২/৩ বছর

[৪৯৬] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বৈরুতঃ দারু তুকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৫০০৪।

[৪৯৭] গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ, *ইহয়াউ উলুমিদ্দীন*, (বৈরুতঃ দারুল মারিফা, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৮৯।

[৪৯৮] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১১১।

[৪৯৯] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪১।

পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। উহুদ যুদ্ধে আহতদের পানি পানকারী নারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ খণ্ডনে আল্লাহ তায়ালা দশটি আয়াত নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে তীক্ষ্ম মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবার কারণে দীনের এক চতুর্থাংশ বিধান তার নিকট থেকে বর্ণিত হয়। জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম অনেক জটিল বিষয়ে তার নিকট সমাধান চাইতেন। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহিলা, যিনি দীন এর অর্ধাংশ উম্মতের নিকট প্রচার করেছেন। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম। ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রা) এর মতো জলীলুল কদর সাহাবী তার নিকট ফতোয়া তলব করতেন। উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর বলেন, বিচারব্যবস্থা, জাহিলী যুগের ঘটনা, কবিতা আবৃত্তি, ফারায়েজ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে আয়িশা (রা) থেকে অধিক কোনো জ্ঞানীর মজলিসে আমি বসিনি।[৫০০] তিনি সাতান্ন হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন যুবাইর আরো বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،

"হালাল-হারামসহ শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আয়িশা (রা) এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।[৫০১]

আয়িশা (রা) এর ইজতিহাদী দক্ষতা ছিল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিংবদন্তিতুল্য। কুরআন, হাদীস, সাহিত্য, কবিতা ও ফিকহসহ প্রভৃতি শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য জ্ঞানী ও গুণী সমাজে অনস্বীকার্য। ইজতিহাদে তার সূক্ষদর্শিতার কারণে অনেক শীর্ষস্থানীয় সাহাবী তার শরণাপন্ন হতেন। তাবিঈ মাসরুককে প্রশ্ন করা হলো, আয়িশা (রা) কি খুব ভালো ফারায়েজ জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে তার নিকট ফারায়েজ সম্পর্কে অনেক মাসআলা জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন,

مَا أُشكلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا ،

"হাদীস সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের কোনো জটিলতা পরিলক্ষিত হলে আমরা আয়িশা'র নিকট গমন করতাম। তাকে আমরা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী পেতাম"।[৫০২]

আয়িশা (রা) থেকে এক শতের অধিক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী (র) তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি বলে উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে রেওয়ায়াত করেন ১৭৪ টি। এককভাবে ইমাম বুখারী ৫৪টি ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ৯৪ টি।

আয়িশা (রা) এর ইজতিহাদী প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি কুরআন সুন্নাহর গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণ করতেন। নস এর অন্তর্নিহিত মর্ম উদঘাটনে তার দক্ষতা ছিল অররিসীম। নিম্নে কুরআন সুন্নাহ এর আলোকে আয়িশা (রা) এর ইজতিহাদ এর কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

---

[৫০০] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭।

[৫০১] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দান: মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১২, হাদীস নং- ৬৭৩৩।

[৫০২] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

ক. আল কুরআন দ্বারা ইজতিহাদ

উমার (রা) এর উপর কোনো বিপদ সংঘটিত হলে সুহাইব (রা) তার নিকট গিয়ে এই বলে কাঁদতে শুরু করলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! উমার (রা) সুহাইবকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার বিপদে তুমি এভাবে কান্নাকাটি করছো? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ،

"বংশের কারো কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়" [৫০৩]

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) এর মৃত্যুর পর আমি বিষয়টি আয়িশা (রা) এর নিকট আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে বলেন, আল্লাহ উমারকে দয়া করুন! আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বংশের কারো মৃত্যুর কারণে মৃতব্যক্তির উপর শাস্তির কথা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, কাফের ব্যক্তির বংশের কারো কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির উপর শাস্তির মাত্রা বর্ধিত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আল কুরআন এর এ আয়াত দ্বারা নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, তোমাদের জন্য আল কুরআন এর দলীলই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ،

"কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না"।[৫০৪]

খ. সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ

মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করেন, আমাদের কি حيض (ঋতুস্রাব) এর সময় অনাদায়ী নামায কাযা করতে হবে? আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, তুমি কি হারুরিয়া?[৫০৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমাদেরকে ঋতুস্রাব এর সময় রোযা কাজা কারার নির্দেশ দিতেন। নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।[৫০৬]

আয়িশাকে (রা) 'তাবাততুল'(تبتل) (স্ত্রী সংশ্রব পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করা) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, এমন করো না। আল্লাহ তায়ালাকে কি বলতে শোননি?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ،

"আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে আমি দান করেছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি।[৫০৭]

সুতরাং ইসলামে 'তাবাততুল' এর কোনো সুযোগ নেই।[৫০৮]

---

[৫০৩] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮০, হাদীস নং- ১২৮৬।

[৫০৪] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৬৩৯, হাদীস নং-৯২৭।

[৫০৪] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫৬।

[৫০৫] কূফার একটি গোত্রের নাম, যার অধিবাসীগণ খারিজি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

[৫০৭] আল কুরআন, ১৩; ৩৮।

[৫০৮] সানআনী, আবদুর রায্‌যাক আবু বকর, *মুসান্নাফ*, (ভারতঃ আল মাজলিসুল ইলমী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৮২।

৩.৩.৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর ইজতিহাদ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ৬১৮ খ্রি. কুরাইশ এর বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই।
(أَكْرِمُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا)
"কুরাইশ বংশের লোকদের সম্মান করো। কেননা এই বংশের একজন আলিম সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞান দ্বারা পরিপুর্ণ করে দেবেন"।[৫০৯] তিনি এ হাদীসের স্বার্থক প্রয়োগক্ষেত্র। যার উপাধি হলো 'তারজুমানুল কুরআন' [৫১০]

(কুরআন এর ভাষ্যকার) ও 'হিবরুল উম্মাহ' (উম্মতের সর্বশ্রেষ্ট আলিম)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার মাথায় হাত বুলিযে দিয়ে এই মর্মে দোয় করলেন, أللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب
"হে আল্লাহ! তাকে হিকমতের শিক্ষা প্রদান করুন এবং কিতাবুল্লাহ ব্যাখ্যা করার তাওফিক দান করুন"।[৫১১] হিকমতের এই জ্ঞান-গভীরতার কারণে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার নিকট অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান চাইতেন এবং বয়স্ক সাহাবীদের সঙ্গে তাকে পরামর্শ সভায় আহ্বান করতেন।
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর ইজতিহাদের পদ্ধতি ছিল, তিনি সর্বপ্রথম কুরআন সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতেন। এতে সামাধান না পেলে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্যথায় তিনি নিজের রায় প্রয়োগ করতেন। অনেক সময় তিনি আহলে কিতাবের মতামতও গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সুগভির দৃষ্টিপাত ও তীক্ষ্ম সমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মূলত সত্য উদঘাটনের জন্য তার ইজতিহাদ ছিল অবিরাম।
বিশিষ্ট তাবিঈ আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র) (২৭-১১৪ হি.) বলেন, ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো মজলিশ আমি দেখিনি। কুরআন, ফিক্‌হ ও কবিতা শিক্ষার্থীদের একটি বড় জামাত তার নিকট বিশাল মাঠে জ্ঞান অর্জন করতো ।
তাবিঈ তাউস (র) (১২-১০৬ হি.) বলেন, আমি পঞ্চাশ জন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি, তারা প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মতের বিরোধিতা করলে পরবর্তীতে তার মতের প্রতি ফিরে আসতেন। আমাশ (র) বলেন,
كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس فإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت: أعلم الناس،
"ইব্‌ন আব্বাসকে (রা) তোমরা দেখতে পেলে অবশ্যই একথা বলতে বাধ্য হবে যে, তিনি সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি। আলোচনাকালে মনে হবে সবচেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। হাদীস বর্ণনা করলে বোঝা যাবে সর্বাধিক জ্ঞানী লোক।[৫১২]
ফিক্‌হ ও ইজতিহাদে তিনি একজন দূরদর্শী সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত বিচক্ষণতা দ্বারা তিনি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইব্‌ন হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.)

---

[৫০৯] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইনতিকা,* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৮৩।

[৫১০] নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, (জর্দানঃ মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৬১৮, হাদীস নং- ৬২৯১।

[৫১১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম,* সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯২৭ ।

[৫১২] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন,* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪।

বলেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন মূসা (র) বিশ খণ্ডে তার ফতোয়া সংকলন করেছেন। তিনি আটষট্টি হিজরীতে তায়েফ নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩.৩.৯. আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর ইজতিহাদ

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইবনুল খাত্তাব আল আদাবী আল কুরাইশি। তিনি স্বীয় পিতা উমার (রা) এর সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পিতার পূর্বে মদীনা হিজরত করেন। খন্দকসহ পরবর্তী সব জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন।[৫১৩]

ইবনুল আসীর (র) (৫৫৫-৬৩০) বর্ণনা করেন,

كان عبدالله بن عمر كثير الاتِّبَاع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه نزل منازله ويُصلي في كل مكان صلى فيه وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس؛

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি-আদর্শ আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর চেয়ে কেউ বেশি অনুসরণ করেননি। তিনি অক্ষরে অক্ষরে ও কদম ব-কদম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবতরণ করতেন তিনিও সেখানে অবতরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে নামায পড়েন তিনিও সেখানে নামাজ আদায় করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আস্তাবলে নিজের উট বাধঁতেন। [৫১৪]

বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গাছের নিচে অবস্থান গ্রহণ করেন, ইব্ন উমার সেখানে পানি দিয়ে গাছটি সতেজ রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি বেশি হাদীস বর্ণনাকারী ছয় জন সাহাবীর একজন। তিনি ১৬৩০ টি হ্যাদিস বর্ণনা করেন। ১৭০টি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েত করেন। ইমাম বুখারী একা রেওয়ায়েত করেন ৮১টি। ইমাম মুসলিম ৩১টি। জিহাদ, ইবাদত, দুনিয়াবিমুখিতা ও পরকালকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে তিনি একজন শক্তিধর সাহাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, ধীমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, নিম্নের ঘটনা দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবীদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ،

"এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। গাছটির উদাহরণ হলো মুসলিম ব্যক্তির মতো। সে গাছটি কি বলতে পারো? গাছটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম মাঠে চলে গেলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বললেন, এটি যে খেজুর গাছ তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তবে লজ্জাবশত আমি বলিনি।

---

[৫১৩] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

[৫১৪] ইবনুল আসীর আল জাযরী, ইয্যুদ্দীন, আবুল হাসান আলী ইব্ন আবিল কারাম, *উসদুল গাবাহ*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৪০৯ হি./ ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৩৬।

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গাছটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেটি হলো খেজুর গাছ'।[৫১৫]

কিন্তু তিনি এ অসাধারণ মেধা ও বিচক্ষনতা ফিকহী ইজতিহাদে ব্যয় করেননি, তিনি হাদীস মুখস্তকরণ ও তার বর্ণনায় এ যোগ্যতা ব্যয় করেন। আবু জাফর[৫১৬] বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তাতেহ্রাস-বৃদ্ধি না করে হুবহু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর চেয়ে কেউ বেশি উপযুক্ত ছিলেন না।

ইমাম শাবী বলেন, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন, উত্তম ফকীহ ছিলেন না। পরহেজগারী ও আল্লাহর ভয় বেশি ফতোয়া প্রদানে তাকে বিরত রাখতো। তিনি ৬০ বছর ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত ছিলেন এবং কোনা ফিতনায় জড়িত হননি।

ইবনুল আসীর (র) (৫৫৫-৬৩০ হি.) বলেন, ফতোয়া প্রদানে তিনি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। খেলাফত নিয়ে সংঘটিত কোনো বিতর্কে তিনি লিপ্ত হননি। হযরত আলী (রা) এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫১৭]

৩.৩.১০. মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফয়ান (রা) এর ইজতিহাদ

মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফ্য়ান কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে ৬০৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশ্বস্থ সহচর এবং ওহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দীন-দুনিয়ার বিভিন্ন যোগ্যতা ও হেদায়তের দোয়ার বরকতে তিনি ফিক্হ ও ইজতিহাদে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। হাদীসের বিবিধ গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় এই দোয়া বর্ণিত হয়েছে।

اللهمَّ اجعلْه هاديًا مهديًّا [৫১৮]

اللهم عَلِّم معاويةَ الكتاب والحساب، وقِهِ العَذاب[৫১৯]

শাসনক্ষমতা লাভের পর মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দেন। প্রথম সমুদ্র অভিযানে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত ওয়াজিব হবার দোয়া করেছেন। أوَّلُ جيشٍ من أمَّتي يغزون هذا البحرَ قد أوجبوا| [৫২০] মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফয়ান ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৫১৫] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৯, হাদীস নং- ৫৯।

[৫১৬] আবু জাফর আল মাদানী মদীনার ইলমে কিরায়াতের বিশিষ্ঠ ইমাম এবং দশ কারীর অন্যতম কারী। তিনি ১৩২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

[৫১৭] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১৯৫।

[৫১৮] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ৪২৬, হাদীস নং- ১৭৮৯৫।

[৫১৯] ইব্ন খুযায়মা, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, *সহীহ ইব্ন খুযায়মা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুস্তফা আজমী, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২১৪, হাদীস নং- ১৯৩৮।

[৫২০] তাবরানী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ুব, *আল মুজামুল কাবীর*, (কায়রোঃ মাকতাবাহ ইব্ন তায়মিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.), খ, ২৫, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ৩২৩।

আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে পরিচালিত শাম অভিযানে মুআবিয়া ইব্‌ন আবি সুফ্‌য়ান অভাবনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে নবীদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন। উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হবার পর তাকে জর্ডানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে দামেস্কের গভর্নর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। উসমান (রা) এর খেলাফতকালীন সময়ে তিনি সমগ্র শাম অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। আলী (রা) এর শাহাদতের পর হাসান ইব্‌ন আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। কিছুদিন পর হাসান (রা) এর সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে মুআবিয়া মুসলিম বিশ্বের খলীফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি দামেস্ককে রাজধানী করে উমাইয়া খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। মুআবিয়া ৬৮০ খ্রি. দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। নিম্নে মুআবিয়া ইব্‌ন আবি সুফ্‌য়ান এর ইজতিহাদকৃত কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করা হলো।

পরিবেশগত কারণে বাধ্য হয়ে বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করা জায়েয

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার শাম সফর করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন আবি সুফ্‌য়ান ছিলেন তখন শামের গভর্নর। খলীফা দেখতে পেলেন, মুআবিয়া রাজা-বাদশাহর মতো দরজায় পর্দা টাঙ্গিয়ে জনগণ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। আরোহণের জন্য উত্তম সওয়ারী ও উন্নতমানের লেবাস-পোষাক পরিধান করেছেন। খলীফা গভর্নরের নিকট এ ধরনের বিলাসিতার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে গভর্নর বললেন, আমি পরিবেশের কারণে বাধ্য হয়ে এরূপ করেছি। খলীফা বললেন, আমি আপনাকে এমন কাজের অনুমতি দিতে পারি না। আবার এমন কাজ থেকে বাধাও দেবো না। ইমাম ইব্‌ন কাসীর (র) আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেন।[৫২১]

উসূলবিদ আল কারাফি (৬২৬-৬৮৪ হি.) খলীফার এ উক্তির ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ হলো, এ বিষয়ে আপনিই ভালো জানেন। যদি বিশেষ প্রয়োজনে আপনি তা করে থাকেন, তবে এটাকে ভালো হিসেবে অভিহিত করা যায়। আর যদি অপ্রয়োজনে এ কাজ করেন, তবে এটা অতিশয় নিন্দনীয়। উমার (রা) এর উক্তি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, গভর্নর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড সময়-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির অনুপাতে ভিন্নতর হয়। যার কারণে কিছু কিছু সাজ-সজ্জা ও বিলাসিতা যা এক সময় জায়েয ছিল না, বর্তমান আধুনিককালে প্রয়োজনের নিরিখে বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

চুরিকৃত পণ্যের মালিকানা প্রসঙ্গ

ইয়ামামা এর গভর্ণর উসাইদ ইব্‌ন হুদাইর (রা) মারওয়ান এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, মুআবিয়া (রা) আমার নিকট এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, চুরিকৃত পণ্য যেখানেই পাওয়া যাবে, তাতে পণ্যের মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। খলীফার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ পেয়ে উসাইদ মারওয়ানের নিকট এই মর্মে পাল্টা চিঠি লিখেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ সংক্রান্ত একটি ফায়সালা আমার জানা আছে যে, চুরিকৃত বস্তু বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর মালিকের এ অধিকার রয়েছে যে, সে চাইলে ঐ বস্তুর ম্যূল্য পরিশোধ করে ফেরত নিতে পারে অথবা তার কাছে রেখে দিতে পারে। আবু বকর, উমার ও উসমানও (রা) এভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। উসাইদ (রা) এর চিঠিখানা মারওয়ান খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়ে মুআবিয়া মারওয়ানের নিকট পুনরায় লিখলেন যে, তুমি এবং উসাইদ কেউ আমার উপর সিদ্ধান্ত দিতে পারো না। তোমাদের খলীফা হবার সুবাদে একমাত্র আমিই তোমাদের

---

[৫২১] ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (কায়রো: দারু হাজার লিত তাবাআ, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৪১৬।

ফায়সালা দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ তরি। সুতরাং আমার হুকুম কার্যকর করার ব্যবস্থা করো। অতঃপর মারওয়ান খলীফার চিঠিখানা উসাইদ (রা) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৫২২]

মুআবিয়া (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। উসাইদ ইব্ন হুদাইরও (রা) আনসারীদের একজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীস সহীহ হবার ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ পোষণ না করেই মুআবিয়া (রা) সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইজতিহাদপূর্বক এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, চুরিকৃত বস্তুর একমাত্র হকদার হলো মালিক। কোনো অবস্থাতেই তাতে ক্রেতা, চোর অথবা অন্য কারো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৩.৩.১১. আবু হুরায়রা (রা) এর ইজতিহাদ

আবু হুরায়রা উপনামে পরিচিত আবদুর রহমান বা আবদুশ শামস ইব্ন সাখার আল দাওসী সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী একজন ফকীহ সাহাবী। তিনি সাত হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মসজিদে নববীকে নিজ বাসস্থান হিসেবে গ্রহণপূর্বক রাসূল এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। খুলাফায়ে রাশেদুন এর শাসনামলে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী এর বর্ণনা মতে তার নিকট থেকে আটশত এর অধিক রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি খলীফা উমার (রা) এর খেলাফতকালে বাহরাইন এর গভর্নর ছিলেন। ৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাদীস ও ফতোয়াদানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ইমাম যাহাবী (র) বলেন,

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ مَعَ أَشْبَاهٍ لَهُم يُفْتُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَيُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ تُوُفِّيَ عُثْمَانُ إِلَى أَنْ تُوُفُّوا ،

"ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা ও জাবিরসহ (রা) তাদের সমপর্যায়ের সাহাবীগণ উসমান (রা) এর মৃত্যুর পর তাদের তিরোধান পর্যন্ত মদীনায় ফতোয়া প্রদান করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম যাহাবী (র) আরো বলেন, এই পাঁচজন সাহাবীর নিকটই তৎকালীন সময়ে ফতোয় প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।[৫২৩]

ইব্ন হাযম (র) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে যারা মাঝামাঝি স্তরে ছিলেন, তারা হলেন, উসমান ইব্ন আফ্‌ফান, আবু হুরায়রা, আমর ইবনুল আস, উম্মু সালামা, আনাস ইব্ন মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, আবু মূসা আশআরী, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, সাদ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, সালমান ফারেসী, জাবির, মুআয ও আবু বকর সিদ্দীক (রাদি.)।

আবু হুরায়রাকে (রা) মুজতাহিদ সাহাবী হিসেবে গণ্য করে ইমাম যাহাবী (র) বলেন,

بل احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول: أفت يا أبا هريرة،

"বর্তমান ও প্রাচীনকালের মুসলমানগণ আবু হুরায়রা (রা) এর মজবুত স্মরণশক্তি ও ফিকহী মর্যাদার কারণে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) এর মতো মুজতাাহিদ সাহাবী তার

[৫২২] নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শুআইব ইব্ন আলী আল খোরাসানী, *সুনানু নাসায়ী*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৫ ।
হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ, ৩৩১।

[৫২৩] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬০৬।

নিকট শিষ্টাচারের পাঠ গ্রহণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বলতেন, হে আবু হুরায়রা আপনি ফতোয়া প্রদান করুন"।[৫২৪]

তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ প্রণেতা বলেন,

أبو هريرة الدوسي اليماني رضي الله عنه الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع،

"আবু হুরায়রা আল দাওসী আল ইয়ামানী (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফকীহ ও হাফিজে হাদীস সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার ও ফতোয়া দানকারী শীর্ষ সাহাবীদের মধ্যে একজন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাবান, ইবাদতগোযার ও বিনয়ী সাহাবী"।

ইমাম মালিক ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, বুকাইর ইব্ন আল আশাজ মুআবিয়া ইব্ন আবি আয়াশ থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর ও আসিম ইব্ন উমার (রা) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আয়াশ এসে বললেন যে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি? আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর বললেন, এ বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। তোমরা আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) এর নিকট যাও। আমি এই দুইজনকে আয়িশা (রা) এর নিকট অবস্থান করতে দেখেছি। তুমি পরবর্তীতে এসে তাদের প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। তিনি বললেন, আমি তাদের নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস আবু হুরায়রাকে (রা) বললেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি ফতোয়া দিন। আপনার নিকট এ ধরনের মাসআলা জানতে এক মহিলা এসেছিল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এক তালাকেও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে (যদি তা প্রত্যাহার না করে) তিন তালাক দিলে সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষন না দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে।[৫২৫]

---

[৫২৪] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৯।

[৫২৫] ইব্‌নল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন,* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫।

চতুর্থ অধ্যায়
তাবিঈ ও তাদের অনুসারীদের যুগে ইজতিহাদ

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাবিঈদের অবস্থান ছিল সাহাবীদের অনুরূপ। কুরআন-সুন্নাহ'য় উদ্ভূত সমস্যার কোনো সমাধান না পেলেই কেবল তারা ইজতিহাদ করতেন। মাসআলা ইসতেম্বাত এর ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সর্বসাধারণের কল্যাণ। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত হবার পর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণ বিভিন্ন এলাকার প্রশাসক, বিচারক, মুফতী ও মুয়াল্লিম হিসেবে নিযুক্ত হন এবং প্রয়োজনের তাগিদে ইজতিহাদের এ পদ্ধতি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেন। এ যুগের ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কুরআন-সুন্নাহ'য় কোনো সমস্যার সমাধান না পেলে এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোনো মতামত আছে কিনা তা অনুসন্ধান করতেন। এতেও কোনো সমাধান না পেলে ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ তাবিঈদের মধ্যে মদীনার রবিয়াতুর রায় (১৩৬ হি./৭৫৩ খ্রি.) ও কূফার নুমান ইব্‌ন সাবিত (র) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) খ্যাতি লাভ করেন। তাবিঈদের একটি দল ইজতিহাদ করা পছন্দ করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ফতোয়া প্রদান থেকেও বিরত থাকতেন।

পরিচ্ছেদ- ১
মুজতাহিদ তাবিঈদের যুগে ইজতিহাদ

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবিঈদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন, তারা হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, কবিসা ইব্‌ন যুআইব, নাফি মাওলা ইব্‌ন উমার, ইকরামা মাওলা ইব্‌ন আব্বাস, আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ, তাউস ইব্‌ন কায়সান, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন, আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, মাসরুক ইব্‌ন আল আজদা, ইবরাহীম আন নাখায়ী, আলকামা, শাবী, শুরাইহ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মাকহুল আল দামিস্কী,আবু ইদরীস আল খাওলানী।
জাফর ইব্‌ন রবিয়া (মৃ.১৩৬ হি.) বলেন, আমি ইরাক ইব্‌ন মালিককে বললাম, মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ কে? তিনি উত্তর দিলেন, সবচেয়ে বড় ফকীহ ও অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব। তিনি বিচার মীমাংসার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে বেশি জ্ঞানী ছিলেন উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর। ইরাকি বলেন, আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন ইব্‌ন শিহাব। তিনি সব ইলম নিজের মধ্যে একত্রিত করেছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন আসলাম বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস মারা যাবার পর ফিকহ শাস্ত্র মাওয়ালিদের (আযাদকৃত গোলাম) নিকট চলে যায়। তখন মক্কার ফকীহ ছিলেন আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ। ইয়ামেনের ফকীহ ছিলেন তাউস। ইয়ামামার ফকীহ ছিলেন ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীর। কূফার ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী। বসারার ফকীহ হাসান বসরী। শামের ফকীহ মাকহুল। খোরাসানের ফকীহ আতা খোরাসানী। কিন্তু মদীনার একমাত্র ফকীহ হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব। এ বিষয়ে কারো বিরোধ নেই।[৫২৬]

---

[৫২৬] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬।

৪.১.১. মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন মুজতাহিদ তাবিঈর ইজতিহাদ

রাসূলের শহর মদীনায় যে সকল মুজতাহিদ খ্যাতি লাভ করেন তারা হলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, কাসীর ইব্‌ন মুহাম্মদ, খারিজা ইব্‌ন যাইদ, আবু বকর ইব্‌ন আবদির রহমান ইবনুল হারিস ইব্‌ন হিশাম, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ। জনৈক কবি মদীনার মুজতাহিদদের নিম্নের পংক্তিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه
فقل هم عبيد الله عروة قاسم   سعيد أبو بكر سليمان خارجه،

তাছাড়াও আবান ইব্‌ন উসমান, সালিম, নাফি, আবু সালামা ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন আউফ ও আলী ইব্‌ন হোসাইন মদীনার মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৫২৭]

১.সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র)

আবু মুহাম্মদ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ইব্‌ন হুযন আল কুরাইশী আল মাখযুমী আল মাদানী। তার পিতা ও দাদা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। উমার (রা) এর খেলাফতের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর তিনি উমার (রা) এর বর্ণাঢ্য জীবনের সার্বিক বিষয় জানার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি উমার (রা) এর বিচারব্যবস্থা ও শাসননীতির হাফেজ ছিলেন। এমনকি তিনি উমার (রা) এর বর্ণনাকারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা) এর জামাতা হবার সুবাদে তার মুসনাদও মুখস্ত করেন। উসমান, আলী, সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মুল কথা হলো, ফিকহ, দীনদারি, বুজুর্গী, ইবাদত ও মর্যাদায় তিনি তাবিঈদের সর্দার ছিলেন। তাকে 'ফকীহদের ফকীহ' তথা ফকীহসম্রাট বলে ডাকা হতো। মদীনায় তার ফতোয়া কেউ রদ করতে পারতো না। তিনি রাজা-বাদশাহদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। ত্রিশ হাজার দিরহামেরও অধিক অর্থ গ্রহণ করার জন্য তাকে আহ্বান করা হলে তিনি বলেন, আমার এবং বনু মারওয়ানের কারো এ অর্থের প্রয়োজন নেই। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের পুত্র ওয়ালিদের জন্য তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাসীর ইব্‌ন আবু ওয়াদাআকে দুই অথবা তিন দিরহামের বিনিময়ে স্বীয় কন্যার বিয়ে দেন।[৫২৮] আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের পুত্র ওয়ালিদ তারপর সুলায়মান[৫২৯] এর পক্ষে তাকে বাইয়াত গ্রহণের চাপ দিলে তিনি অস্বীকার করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন। বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকারের কারণে তাকে খলীফার নির্দেশে বেত্রাঘাত করা হয় এবং অপমানজনকভাবে বাজারে ঘোরানো হয়। তরবারির মুখোমুখি হয়েও তিনি তার মতের উপর অটল ছিলেন এবং ধৈর্যধারণ করেন। মালিক ইব্‌ন আনাস বর্ণনা করেন,

كان عمر بن عبدالعزيز لا يقضي بقضاء حتى يسأل سعيد بن المسيَّبِ فأرسل إليه إنسانًا فدعاه فجاء حتى دخل فقال عمر: أخطأ الرسول! إنما أرسلناه يسألك في مجلسك؛

---

[৫২৭] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭।

[৫২৮] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (মদীনাঃ মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), খ. ৫, পৃ. ১৩৮।

[৫২৯] উমাইয়া খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদিল মালিক ৫৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় সহোদর ওয়ালিদের মৃত্যুর পর ৯৬ হিজরীতে খিলাফত লাভ করেন। সুলায়মান ইব্‌ন আবদিল মালিক একজন বুদ্ধিমান, প্রাঞ্জলভাষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি নতুন নতুন দেশ জয় করতে অধিক ভালোবাসতেন। তার শাসনামলে জুরজানসহ অনেক দেশ অধিকৃত হয়। ৯৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল আলাম, যিরক্‌লি)

"খলীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে খুব সমীহের দৃষ্টিতে দেখতেন। তার নির্দেশনা ব্যতিরেকে খলীফা কোনো বিচার ফায়সালা করতেন না। একদিন খলীফা জনৈক ব্যক্তিকে একটি মাসআলা জানতে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এর নিকট পাঠালেন। বার্তাবাহক তাকে খলীফার দরবারে ডেকে নিয়ে আসলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে উপস্থিত দেখে খলীফা অবাক হয়ে বললেন, বার্তাবাহক ভুল করে ফেলেছে। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম আপনার দরবারে বসে মাসআলা জেনে আসার জন্যে"।[৫৩০]

ইমাম জাহিজ (র) (১৬৩-২৫৫) বলেন, তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও মর্যাদাবান আর কেউ ছিলেন না। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিচার মীমাংসা করেছেন, আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী (রা) যে বিচার ফায়সালা করেছেন সব বিষয়ে আমি অবগত।[৫৩১] তিনি স্বপ্নের উত্তম ব্যাখ্যাকারী এবং কুরাইশ এর বংশধারা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। অনেক সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন। জাহিলী ও ইসলামী যুগ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। ইজতিহাদী যোগ্যতা, বিনয়, ইবাদত ও মর্যাদার কারণে তিনি সর্বদা খলীফাদের সুদৃষ্টিতে থাকতেন। তিনি চার বার হজ আদায় করেন। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তিনি কখনো প্রথম কাতার ছেড়ে দ্বিতীয় কাতারে নামায আদায় করেননি। তিনি ৯৪ হিজরীতে ওয়ালিদের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তার ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা হলো, তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করেও শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। নিম্নে মজুতদারী সম্পর্কীয় তার ইজতিহাদকৃত আরো একটি মাসআলা দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হলো।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এর মতে মজুতদারী করা জায়েয। মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল উপস্থাপন করেন।

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطيء فقيل لسعيد إنك تحتكر فقال: إن معمر الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একমাত্র দুষ্কৃতকারীরাই মজুতদারী করে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি তো মজুতদারী করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনাকারী মামার নিজেই মজুতদারী করতেন"। [৫৩২]

মুসলিম শরীফ এর হাদীস দ্বারা মজুতদারী নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাকারী ইজতিহাদ করে তার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন, মজুতদারী করা তখন জায়েয হবে না, যদি এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর যদি দেশে ঐ পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত থাকে তবে তা গুদামজাত করা জায়েয হবে।

২. খারিজা ইব্ন যাইদ (রা)

খারিজা ইব্ন যাইদ ইব্ন সাবিত আল আনসারী খাযরাজ গোত্রোদ্ভূত বিশিষ্ট তাবিঈ ও মদীনার সাত ফকীহ এর অন্যতম একজন ফকীহ। তিনি উসমান (রা) এর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০

[৫৩০] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৯১।

[৫৩১] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০।

[৫৩২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, সম্পাদনা: মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ৫. পৃ. ৩১৮, হাদীস নং- ৩৪৪৭।

হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। স্বীয় পিতা যাইদ, উসামা ইব্ন যাইদ ও তার চাচা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন স্বীয় পুত্র সুলায়মান, ভাতিজা সাইদ ইব্ন সুলায়মান ও আবুয যানাদ। ফিক্হ শাস্ত্রে তার প্রধান শিষ্য হলেন আবুয যানাদ। কথিত আছে, খারিজা ইব্ন যাইদ মৃত্যুর পর কথা বলেছিলেন।[৫৩৩]

ঐতিহাসিক শিরাযী (৩৯৩-৪৭৬ হি.) বর্ণনা করেন,

كان خارجة بن زيد بن ثابت وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما،

"খারিজা ইব্ন যাইদ ও তালহা ইব্ন আবদিল্লাহ এর যুগে লোকজন তাদের নিকট ফতোয়া তালাশ করতেন এবং সাধারণ মানুষ তাদেরকেই শেষ ভরসাস্থল হিসেবে গণ্য করতেন"।[৫৩৪]

ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহ'র মহান ইমাম। হাসান ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, তিনি আমাদের নিকট সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে অধিক বোধজ্ঞানসম্পন্ন। কোনো ব্যক্তি সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর নিকট কোনো বিষয়ে মাসআলা জানতে আসলে তিনি খারিজা ইব্ন যাইদ ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার এর নিকট পাঠাতেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদি (১৩০-২০৭ হি.) আবুয যানাদ এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

توفي سنة أربع وتسعين في الأصح كان ثقة فقيهًا عالمًا كثير الحديث،

"খারিজা ইব্ন যাইদ নির্ভরযোগ্য রাবী, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, আলিম ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন"।[৫৩৫]

৩. উরওয়া ইব্নুয যুবাইর (রা)

উরওয়া ইব্নুয যুবাইর ইবনুল আওয়াম আল কুরাইশী ২৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও ঐতিহাসিক মদীনার সপ্ত ফকীহদের একজন। তার খালা আয়িশা (রা) থেকে তিনি অধিকতর হাদীস বর্ণনা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সংকলনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন মুহাদ্দিস। তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করে।[৫৩৬] নিম্নে উরওয়া ইব্নুয যুবাইর এর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ধৃত হওয়ার পর ডাকাতের তাওবা কবুল হবে না

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সমাজে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে লিপ্ত হয় এবং ডাকাতি করে, তাদের শাস্তির বিধান বর্ণনার পর বলা হয়েছে, যদি তারা সরকারের নিকট ধৃত হবার পূর্বে তাওবা করে, তবে তাদের দণ্ড কার্যকর হবে না। উপর্যুক্ত অপরাধীদের বিধান সম্বলিত আয়াতটি নিম্নরূপ,

---

[৫৩৩] ইবনুল আসীর আল জাযরী, আবুল হুসাইন ইজ্জুদ্দীন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা*, (বৈরুত: দারু ইব্ন হাযম, ২০১২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩১৭।

[৫৩৪] শিরাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আলী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, (বৈরুত: দারুর রায়িদ আল আরবী, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬০।

[৫৩৫] হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫৬।

[৫৩৬] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫৫।

انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, তাদের বিধান হলো, হয়তো তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলীতে ছড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্চনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে। জেনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু। [৫৩৭]

উপর্যুক্ত আয়াতে সকল প্রকার অপরাধী সরকারের নিকট ধৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবার ব্যাপারে সাধারণ বিধানের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বিশিষ্ট তাবিঈ উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান ও শরীয়তের দণ্ড কার্যকরণে শিথিলতার পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ডাকাতের তাওবা কবুল না হবার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি ইজতিহাদপূর্বক বলেন, ডাকাতের তাওবা কবুল হলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। তিনি আল কুরআনের সাধারণ বিধানকে নির্দিষ্ট অপরাধীর ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত করে প্রয়োগ করার পক্ষে মত প্রদান করেন। তিনি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এ মত প্রদান করেন।[৫৩৮]

৪. সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)

আবু আইয়ুব সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার একজন বিশিষ্ট তাবিঈ ও মদীনার সাত ফকীহদের মধ্যে অন্যতম একজন ফকীহ। তিনি ৩৪ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যাইদ ইব্‌ন সাবিত, আবু হুরায়রা, আয়িশা ও মাইমুনাসহ (রা) অনেক সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়ত করেন। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তার ভাই আতা ইব্‌ন ইয়াসার, ইব্‌ন শিহাব যুহরী ও আমর ইব্‌ন দিনার প্রমুখ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। মদীনার শীর্ষস্থানীয় ফকীহ হবার সুবাদে মুজতাহিদদের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম যাহাবী তাকে জ্ঞানের পাত্র বলে আখ্যায়িত করেন। ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন।

...كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، كثير الحديث،

"সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী, মর্যাদাবান আলিম, উঁচু স্তরের ফকীহ ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী"।[৫৩৯]

আবুয যানাদ বলেন,

كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل،

"মদীনার আস্থাশীল আলিম ও ফকীহদের মধ্যে আমি যাদের সাক্ষাত পেয়েছি তারা হলেন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর, কাসিম, আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান, খারিজা ইব্‌ন যাইদ,

---

৫৩৭ আল কুরআন, ৫; ৩৩,৩৪।

৫৩৮ যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্ক: দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩০।

৫৩৯ যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪৬।

উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার। এছাড়াও তাদের অনুরূপ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট ফকীহদের মধ্যে তারাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়" ।[৫৪০]

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার এর ফিকহী প্রতিভা মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইমাম মালিক বলেন,

كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيب وكان كثيرًا ما يوافق سعيدًا وكان سعيد لا يجترئ عليه،

"সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর পর সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ছিলেন মুসলমানদের নিকট আস্থাবান ও গ্রহণযোগ্য আলিম। তিনি বেশিরভাগ মাসআলায় সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিবও তার কথার বিপরীত ফতোয়া প্রদান করতেন না" ।[৫৪১]

৫. উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)

উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ আল হুযালী মদীনার সাত ফকীহ এর মধ্যে অন্যতম একজন মুজতাহিদ তাবিঈ। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি জলীলুল কদর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর পৌত্র। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আয়িশা, উম্মু সালামাসহ (রা) অনেক সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবুয যানাদ ও ইব্‌ন শিহাব যুহরী প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস তার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পাদিত হয় তারই সুনিপুণ হাতে। উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এর ফিকহী মজলিশ ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। যেখানে প্রতিনিয়ত ইসলামী শরীয়তের মূল্যবান মনি-মুক্তা ঝরতো। তার জ্ঞানের মজলিশ সম্পর্কে উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন,

لانْ يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إليَّ من الدنيا،

"উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এর ফিক্‌হ শাস্ত্রের একটি মজলিশ আমার নিকট দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু" । [৫৪২]

তিনি আরো বলেন,

والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال،

"আল্লাহর কসম! আমি মনে করি বায়তুল মালের হাজার দিনার দিয়ে তার একটি ফিকহী মজলিশ ক্রয় করলেও তার হক আদায় হবে না" । [৫৪৩]

উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান দেয়ার অভিনব দক্ষতা রাখতেন। এ বিষয়ে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন,

كان عبيد الله بن عبد الله لا أشاء أن أقع منه على ما لا أجده إلا عنده إلا وقعت عليه،

"আমি যখন যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এর নিকট তার সমাধান পেয়েছি" ।

তিনি আরো বলেন,

أدركت أربعة بحور كان عبيد الله بن عبد الله بحرًا من بحور العلم وقال: سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي شيء،

---

[৫৪০] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫।

[৫৪১] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫।

[৫৪২] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫।

[৫৪৩] প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫।

"আমি জ্ঞানের চারটি মহাসাগরের সন্ধান পেয়েছি। উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ছিলেন সেই মহা-সাগরের একটি। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার পর আমার মনে হয়েছে, এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ এর সাক্ষাত লাভ করার পর মনে হয়েছে, আমি একটি খালি পাত্র"। [৫৪৪]

ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন,

ما جالستُ أحدًا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلا عبيد الله فإنه لم آته إلا وجدت عنده علمًا طريفًا،

"প্রতিটি আলিম এর মজলিশ থেকে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি। তাদের নিকট অনেক নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ এর শিক্ষা মজলিশে অনেক দুর্লভ জ্ঞানের মজুদ দেখতে পেয়েছি"।[৫৪৫]

৬. আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র)

আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ একজন বিশিষ্ট তাবিঈ ও মদীনার অন্যতম ফকীহ ও কাযী । তিনি দশ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বেহেশতের দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীর অন্যতম আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এর পুত্র। তিনি উসামা ইব্ন যাইদ, আবু আইয়ুব আনসারী, আয়িশা, উম্মু সালামাসহ (রা) অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তদীয় পুত্র উমার ইব্ন আবি সালামা, ভাতিজা সাদ ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুল মাজিদ ইব্ন সুহাইল। তদুপরি যুরারা ইব্ন মুসআবসহ অগণিত তাবিঈ, মুহাদ্দিস ও ফকীহও তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। মদীনার শীর্ষস্থানীয় সাত ফকীহ এর অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ছিলেন ফকীহ ও মুজতাহিদদের নিকট অতি সমাদৃত। ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রের ইমামদের নিকট তিনি সমান শ্রদ্ধেয়। তারাজুম ও তাবাকাতের (হাদীস বর্ণনাকারী ও মনীষীদের জীবনী সংক্রান্ত) গ্রন্থাবলিতে তার বৈচিত্র্যময় জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম ইজলী (র) (১৮২-২৬১ হি.) বর্ণনা করেন,

...كان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيهًا كثير الحديث،

"আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, ফকীহ ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী"।[৫৪৬]

আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান এর ফিকহী প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে
ওয়াকী আদ দাব্বী বলেন,

أبو سلمة في زمانه خيرٌ من ابن عمر في زمانه،

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর যুগে তার যতটুকু প্রভাব ছিল, আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান এর যুগে তার প্রভাব ঢের বেশি ছিল"।[৫৪৭]

---

[৫৪৪] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ২, পৃ. ১৮৮।

[৫৪৫] ইব্ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫।

[৫৪৬] ইজলী, আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ, *মারিফাতুস সিকাত*, (মদীনা মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪০৫।

[৫৪৭] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (কায়রো: আল ফারুকুল হাদীসা লিত তাবাআ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ১৩৬।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদানের কারণে মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফ্‌য়ান (রা) তাকে মদীনার কাযী পদে নিয়োগ দান করেন।
ইমাম যাহাবী আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম শাবী এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,
قَدِمَ أَبُو سَلَمَةَ الْكُوْفَةَ فَكَانَ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فَسُئِلَ عَنْ أَعْلَمِ مَنْ بَقِيَ فَتَمَنَّعَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ بَيْنَكُمَا،
"আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান কূফা আগমন করেন। তিনি আমার ও অন্য একজন ব্যক্তির মাঝখানে হাঁটছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, বর্তমান সময়ে সর্বাধিক জ্ঞানী লোক কে? তিনি একটু সময় নিয়ে বললেন, যে লোকটি তোমাদের দুইজনের মাঝখানে"। [৫৪৮]
"ইব্‌ন শিহাব যুহরী থেকে উকাইল বর্ণনা করে বলেন, আমি মিসরে আগমনের পর সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলাম। ইবরাহীম ইব্‌ন কারিজ বললেন, আপনি কেবলমাত্র সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকেই হাদীস বর্ণনা করছেন কেন? আমি উত্তর দিলাম সঙ্গত কারণে। ইবরাহীম ইব্‌ন কারিজ বললেন, আপনার গোত্রে এমন দুইজন ব্যক্তি আছেন, আমার জানা মতে তাদের চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আমি মদীনায় ফিরে এসে দেখলাম, উরওয়া এমন এক বিশাল জ্ঞানের পাত্র, যা সিঞ্চন করে শেষ করা যাবে না। আমি বললাম, আপনার গোত্রের আবু সালামা থেকে তিনি বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি। তাদের মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য ছিল। নতুবা জ্ঞানের গভীরতায় আবু সালামা উরওয়া থেকে কোনো অংশে কম নয়"।[৫৪৯]

৭. কাবীসা ইব্‌ন যুআইব (র)

আবু সাইদ কবিসা ইব্‌ন যুআইব ইব্‌ন হালহালা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কুলাইব আল খুযায়ী ৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণকারী মদীনার একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি মদীনার ফকীহ ও শিশুদের মুয়াল্লিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর সচিব ও ডাক বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান, বিলাল ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন স্বীয় পুত্র ইসহাক, যুহরী, মাকহুল প্রমুখ তাবিঈ। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, কবিসা ইব্‌ন যুআইব সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব ও উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর এর সমপর্যায়ের। তিনি ৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৫৫০]
ইব্‌ন শিহাব যুহরী কাবীসা ইব্‌ন যুআইব এর প্রসঙ্গ আসলে বলতেন,

...كان من علماء هذه الامة،

"তিনি এই উম্মা'হর শ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন"।[৫৫১]
আবুয যানাদ বর্ণনা করেন,
...كان عبد الملك بن مروان رابع اربعة في الفقه والنسك هو وسعيد بن المسيب وقبيصة بن ذوئب وعروة بن الزبير،

---

[৫৪৮] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৯০।
[৫৪৯] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।
[৫৫০] আসকালানী, ইব্‌ন হাজার আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৯০।
[৫৫১] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসতিআব ফী মারিফাতিল আসহাব*, (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১২৭২।

"আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান চার ফকীহ এর মধ্যে চতুর্থ ফকীহ। অবশিষ্ট তিনজন হলেন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর ও কাবীসা ইব্‌ন যুআইব"।[৫৫২]
ইমাম শাবী কাবীসা ইব্‌ন যুআইব এর ইজতিহাদী প্রতিভা ও ফিকহী যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

...كان قبيصة من اعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت،

"কাবীসা ইব্‌ন যুআইব যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন"।[৫৫৩]

৪.১.২. মদীনার প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ তাবিঈদের ইজতিহাদ

১.কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর (র)

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন আবি কুহাফা আল তাইমী আল কুরইশি ৩৫ হিজরীতে আলী (রা) এর খেলাফতকালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফুফু আয়িশা (রা) এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন এবং তার নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ছিলেন তার পরিবারের সকলের চেয়ে পিতামহ আবু বকর (রা) এর সঙ্গে অধিক সদৃশ। তিনি এবং তার ফুফাতো ভাই উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের দুই প্রধান বর্ণনাকারী। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ও মাতামহ আসমা ইব্‌নতে উমাইস (রা) ছিলেন তার শিক্ষক তালিকার অগ্রভাগে। তিনি মদীনার প্রধান সাত ফিকহদের অন্যতম এবং হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল। পুত্র আবদুর রহমান, নাফি, ইব্‌ন শিহাব যুহরী ও জাফর সাদিক তার প্রধান শিষ্য। ইয়াহয়া ইব্‌ন সাইদ আল কাত্তান (র) বলেন,

فقهاء المدينة عشرة فذكر منهم القاسم،

"মদীনার ফকীহ দশজন। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ সেই দশ জনের অন্যতম"।[৫৫৪]
তিনি ১০৭ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন, তিনি শীর্ষস্থানীয়, নির্ভরযোগ্য, উঁচু মাপের ফকীহ ও আলিম ছিলেন। অত্যন্ত পরহেযগার ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী একজন জলীলুল কদর তাবিঈ।[৫৫৫]
ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (র) বলেন, মদীনায় কাসিম থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কাউকে আমি পাইনি। আবু যানাদ ও সুফ্‌য়ান সাওরী বলেন,

ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد وما كان الرجل يُعد رجلاً حتى يعرف السنة وما رأيت أحد ذهنًا من القاسم إن كان ليضحك من أهل الشُّبَه كما يضحك الفتى،

---

[৫৫২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬২।
[৫৫৩] শিরাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আলী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, (বৈরুত: দারুর রায়িদ আল আরবী, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬২।
[৫৫৪] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৬।
[৫৫৫] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪২।

"সুন্নাহ সম্পর্কে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ থেকে শ্রেষ্ট জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। তৎকালীন সময়ে সুন্নাহর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই প্রকৃত মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। নবী যেভাবে হাসতেন, সে নিয়মে একমাত্র যুবক কাসিম ইব্ন মুহাম্মদই হাসতেন"।[৫৫৬]
ইমাম যাহাবী ইমাম ইজলি এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

...كَانَ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ وَفُقَهَائِهِم وَقَالَ: مَدَنِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ نَزِهٌ رَجُلٌ صَالِحٌ،

"শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ফকীহ। ইমাম ইজলি আরো বলেন, তিনি মদীনায় বসবাসকারী একজন নির্ভরযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন তাবিঈ। সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে তার জনশ্রুতি রয়েছে"।[৫৫৭]
ইব্ন ওয়াহাব বলেন, ইমামু দারিল হিজরাহ হিসেবে খ্যাত মদীনার শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম মালিক কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ এর আলোচনার প্রাক্কালে বলেন,

ذَكَرَ مَالِكٌ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ هَذِهِ الأمة،

"কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ছিলেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের অন্যতম।[৫৫৮]

২.আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (র)

আবুল ওয়ালিদ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইব্ন আবিল আস ইব্ন উমাইয়া আল কুরাশী (২৬-৮৬) পঞ্চম উমাইয়া খলীফা।[৫৫৯] তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেন। খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইবাদত-বন্দেগী ও ফিক্হ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে মদীনার প্রধান চার জন ফকীহ এর অন্যতম একজন ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আমাশ আবুয যানাদ থেকে বর্ণনা করেন, মদীনার ফকীহ হলেন চার জন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, কবীসা ইব্ন যুআইব ও আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। তিনি স্বীয় পিতা মারওয়ান এর পর ৬৫ হিজরীতে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১১ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৫৬০]
ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আলিম ও ফকীহদের মজলিসে বসতেন এবং তাদের নিকট থেকে দীনি জ্ঞান হাসিল করতেন। তবে তিনি হাদীস খুব কম বর্ণনা করতেন।[৫৬১]
ইব্ন উমার (রা) এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) নাফি বলেন, মদীনার যুবকদের মধ্যে আমি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এর চেয়ে অধিক ইবাদতগোযার, নামায আদায়কারী, কুরআন তেলাওয়াতকারী, জ্ঞান অর্জনকারী ও উপযুক্ত ফকীহ আর কাউকে দেখিনি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেন, মানুষ অনেক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু মারওয়ান যে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সে সন্তানের বয়সে পিতা

---

[৫৫৬] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ৪৩০।
: https://www.alukah.net/culture/0/96758/#ixzz6ROE5PGzG
[৫৫৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৭।
[৫৫৮] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৬।
[৫৫৯] মাহমুদ শাকের, *আত তারীখুল ইসলামী আল আহদুল উমাবী*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ৬ষ্ট সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।
[৫৬০] আবদুল হালিম উয়াইস, *বানু উমাইয়াতা বাইনাল ইনতিহারি ওয়াস সুকূত*, (কায়রোঃ সুবারলার লিন নাশরি, তা/বি), পৃ. ২৫।
[৫৬১] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *আল তারিখুল কাবির*, (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মাআরিফ,তা/বি), খ. ৫, পৃ. ৪২৯।

হবার যোগ্য। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রা) প্রশ্ন করা হলো, কুরাইশ এর মহাজ্ঞানীগণ বিদায় নিতে শুরু করেছে। আপনাদের পরে আমরা কার নিকট জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করবো? তিনি উত্তর দিলেন, মারওয়ান এর একজন ফকীহ্ সন্তান আছে। তোমরা তার নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য যেতে পারো।[৫৬২]
আবু বকর ইবনুল আরবী (র) (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন, ইমাম মালিক মুয়াত্তা কিতাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর ফিক্‌হ ও বিচার ফায়সালা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার এর বরাতে বর্ণনা করেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর পক্ষে খেলাফতের বাইয়াত উপলক্ষে লোক সমাবেশের প্রাক্কালে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রণীত বিধি-বিধানের আলোকে যথাসম্ভব আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিক এর আনুগত্য স্বীকার করি। আমার সন্তানেরাও তা মেনে নিয়েছে।[৫৬৩]
ইব্‌ন আসাকির (র) (৫৫০-৬২০ হি.) নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান বলেন, আমি খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে আয়িশা (রা) এর আযাদকৃতা দাসী বারীরা (রা) এর নিকট গমন করতাম। তিনি আমাকে বলতেন, হে আবদুল মালিক! আমি তোমার নিকট এ জাতিকে শাসন করার উপযোগী কয়েকটি গুণ দেখতে পাচ্ছি, তুমি দায়িত্ব পালনকালে কখনো রক্তপাত করবে না। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ হাদীস শুনেছি।

إن الرجل ليدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق،

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমের এক শিশি পরিমাণ রক্তও প্রবাহিত করেছে, তাকে জান্নাতের দিকে তাকানো দূরের কথা জান্নাতের দরজাতেই বারণ করা হবে"।[৫৬৪]
মক্কা ও মদীনার হারামে সকল প্রকার অপরাধ কার্যক্রম ইসলামের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের দিন কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের জন্য মক্কার হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তবে উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক খলীফা নিজেদের খেলাফত কন্টকমুক্ত রাখার জন্য মক্কা ও মদীনার হারামে এমন কার্যক্রম জায়েয মনে করতেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান স্বীয় খেলাফতকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং উমাইয়া খেলাফতকে নিরাপদ রাখার নিমিত্তে শরীয়তবিরোধী অনৈতিক কার্যক্রম জায়েয মনে করতেন। যেভাবে ইতোপূর্বে ইয়াযিদ ইব্‌ন মুআবিয়া তিন দিন পর্যন্ত মক্কায় ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করার অনুমোদন দিয়েছিলেন।[৫৬৫]

৩.সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)

আবু উমার সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন উমার ইবনুল খাত্তাব তৃতীয় খলীফা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) এর শাসনামলে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে এতা সমৃদ্ধ ছিলেন যে, মদীনার সাধারণ মুসলমানগণও তার নিকট ফতোয়া তলব করতেন। তিনি পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারসহ (রা) জলীলুল কদর সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ

---

[৫৬২] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১২৬।

[৫৬৩] ইবনুল আরবী, কাযী আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, (রিয়াদঃ ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ২৪৯।

[৫৬৪] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র লিন নাশরি, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩৭, পৃ. ১১২।

[৫৬৫] মোস্তফা শিবলী, *আল মাদখাল ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুতঃ দারুল জামিয়া, ১০ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১২৫।

এর নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন তদীয় পুত্র আবু বকর, আমর ইব্‌ন দীনার ও ইব্‌ন শিহাব যুহরী প্রমুখ। আবু কিলাবা (র) তার প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ সপ্ত ফকীহ্ এর অন্যতম। মদীনায় নিযুক্ত বিচারকগণও প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ্ এর সিদ্ধান্তের বাইরে বিচার মীমাংসা করতেন না।[৫৬৬]নিম্নে সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ এর ইজতিহাদপ্রসূত মাসআলা আলোচনা করা হলো,

ইদ্দতপালনকালে নারীদের সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গ

ইদ্দতকালীন সময়ে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবার বিষয়টি একটি বিধিবদ্ধ মাসআলা। ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়।

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জনৈক মহিলা প্রশ্ন করল, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। সে চক্ষুরোগে আক্রান্ত। আমরা কি তাকে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার কিংবা তিনবার না সূচক উত্তর দিলেন।[৫৬৭]

এই হাদীসের বাহ্যিক মমার্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, চোখের সমস্যাসহ যত অসুবিধাই হোক, কোনো অবস্থাতেই ইদ্দতকালীন সময়ে সুরমা ব্যবহার করা যাবে না। তাবিঈ মুজতাহিদগণ এই হাদীসে ব্যাপক গবেষণা করেন। তারা ইজতিহাদপূর্বক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মূলত এ নিষেধাজ্ঞা ছিল বিধবা নারীদের এমন সাজ-সজ্জা পরিত্যাগে কঠোরতা আরোপ করা সংক্রান্ত, যাতে তারা বিয়ের প্রস্তাবে আগ্রহীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত না হয়। কিন্তু পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ সর্বসাধারণের সমস্যা নিরসনকল্পে এতে সহজ পন্থা অনুসরণ করেন এবং রোগ-ব্যাধির কারণে সুরমার ব্যবহার জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেন। তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের মূল কারণ অনুসন্ধানপূর্বক এ ইজতিহাদ করনে। মদীনার দুইজন ফকীহ্ তাবিঈ সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ও সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ এই মর্মে ইজতিহাদ করেন যে, স্বামী-বিগত মহিলা চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হলে তার জন্য সুরমা ব্যবহার করা জায়েয। ইদ্দতকালীন সময়ে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হলেও চিকিৎসার নিমিত্তে সুরমা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই।[৫৬৮]

৪. সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)

উম্মুল মুমিনিনি মায়মুনা (রা) এর মুক্তদাস আবু আবদির রহমান সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) এর খেলাফতকালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন স্বীয় ভ্রাতা আতা ইব্‌ন ইয়াসার, ইব্‌ন শিহাব যুহরী, আমর ইব্‌ন দীনার, আমর ইব্‌ন মায়মুন ও রবিয়াতুর রায় প্রমুখ তাবিঈ। মদীনার বিশিষ্ট মুফতী ও মুজতাহিদ আতা ইব্‌ন ইয়াসার তার সহোদর। তিনি মদীনার সাত ফকীহ্ এর অন্যতম। ইব্‌ন সাদ (র) বলেন,

...كَانَ ثِقَةً، عَالِماً، رَفِيْعاً، فَقِيْهاً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمائَةٍ،

---

[৫৬৬] আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *তাহযীবুত তাহযীব*, (ভারতঃ মাতবাউ দায়িরাতিল মাআরিফ আন নিজামিয়্যাহ, ১৯৩৬ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৩৭।

[৫৬৭] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১১২৪, হাদীস নং- ১৪৮৮।

[৫৬৮] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৭৭।

"সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, উঁচু মাপের আলিম, বিশিষ্ট ফকীহ্ ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন"।[৫৬৯]

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার এর ফিকহী প্রতিভার মূল্যায়ন করে ইমাম মালিক (র) বলেন,

...كَانَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ بَعْدَ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَكَانَ كَثِيْراً مَا يُوْافِقُ سَعِيْداً وَكَانَ سَعِيْدٌ لاَ يُجْتَرَأُ عَلَيْهِ،

"সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর পর সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ছিলেন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি বিভিন্ন মাসআলায় অধিকাংশ সময় সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর সঙ্গে একমত পোষণ করতেন। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব তার মতের বাইরে সহজে ফতোয়া দিতেন না"।[৫৭০]

মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা'র পুত্র হাসান বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার আমাদের জন্য সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকেও অধিক বোধজ্ঞানসম্পন্ন ফকীহ। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব নিজেই অনেক ফতোয়া প্রার্থীদের সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার এর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। পাঠানোর সময় বলতেন, বর্তমানে অবশিষ্ট ফকীহদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী । ইমাম যুহরী (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম। ইমাম নাসায়ী তাকে মুসলিম উম্মাহর ইমামদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আবুয যানাদ মদীনার ফকীহদের ফিরস্থি বর্ণনা করার পর সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে মদীনার শ্রেষ্ট ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেন।

سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍفِي مَشْيَخَةٍ أَجِلَّةٍ سِوَاهُم مِنْ نُظَرَائِهِم أَهْلُ فَقْهٍ وَصَلاَحٍ وَفَضْلٍ ،

"সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ছিলেন মদীনার অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় মুফতী ও ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রত্যেকে ছিলেন পরিপূর্ণ ফিকহী প্রতিভার অধিকারী। অনন্য যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তাদের ভূষণ"।[৫৭১]

৫. আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)

আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনুল মুগীরা কুরাইশ গোত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। অনেকেই তার নাম মুহাম্মদ বলেছেন।[৫৭২] তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান একজন দানশীল, ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। এমনকি তাকে মদীনার সাত ফকীহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবেও অভিহিত করা হয়। মুসলিম উম্মাহ'র ইমাম হিসেবেও তিনি খ্যাত।[৫৭৩]

তিনি আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির, আবু মাসউদ আনসারী ও আবু হুরায়রাসহ (রা) জলীলুল কদর রাবীদের নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান সম্পর্কে বলেন,

وددتُ أنِّي كان في عشرة من الولد من رسول الله كلُّ واحدٍ مثل أبي بكر بن عبد الرحمن،

---

[৫৬৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪৬।

[৫৭০] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬।

[৫৭১] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫।

[৫৭২] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), খ. ৩৩, পৃ. ১১২।

[৫৭৩] আল বাজী, আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইব্‌ন খালাফ, *আল তাদীলু ওয়াল জারহু লিমান খাররাজা লাহুল বুখারী ফিল জামি আস সহীহ*, (রিয়াদ: দারুল লিওয়া লিন নাশরি, সম্পাদনা: আবু লুবাবাহ হুসাইন, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১২৫৪।

"আমার ইচ্ছে হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঔরসে আমার দশজন সন্তান জন্ম লাভ করুক, যারা প্রত্যেকে হবে আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান এর মতো।[৫৭৪]
উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলেন,

إنِّي أهمُّ بالشَّيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، فأذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحي منه وأترك ذلك الأمر من أجله ،

"উমাইয়া খলীফাদের প্রতি বিরূপ আচরণের কারণে মদীনাবাসীদের বিপক্ষে এমন কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাকে প্ররোচিত করে, যা তাদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান এর মতো জ্ঞানী ব্যক্তির কারণে তা বাস্তবায়নে আমি লজ্জাবোধ করি।[৫৭৫]

৬.কাযী শুরাইহ (র)

কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস আল কিন্দী (৫৯৩-৬৯৭) একজন জলীলুল কদর তাবিঈ। রাসূল এর ইন্তেকালের পাঁচ বছর পূর্বে ইয়ামেনের হাদারা মওত শহরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৬৮ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইজতিহাদের বিকাশধারায় তিনি অসাধারণ অবদান রেখেছেন। খুলাফায়ে রাশেদুনসহ শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি ইজতিহাদের মূলপাঠ গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন, ইবরাহীম নাখায়ী ও আমির আল শাবী তার সুযোগ্য শাগরিদ দীর্ঘ ৬০ বছরের বিচার কার্যক্রম তার ইজতিহাদী কর্মধারার সাক্ষ্য প্রদান করে। ন্যায়বিচারের প্রতীক স্বয়ং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে তিনি ইজতিহাদের মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাযী শুরাইহ ইবনুল হারিস এর নিকট লিখিত একটি সরকারী ফরমানে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন,

إذا أتاك أمر في كتاب الله فأقض به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله فاقض به فإن لم يكن فيهما فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلمُ لك،

"আপনার নিকট কিতাবুল্লাহর কোনো দলীল থাকলে তা দ্বারা বিচার ফায়সালা করবেন। কিতাবুল্লাহ'য় প্রমাণ পাওয়া না গেলে রাসূল এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল এ ফায়সালা পাওয়া না গেলে হেদায়তের উপর অধিষ্ঠিত পূর্বেকার বিচারকদের সিদ্ধান্তের আলোকে বিচার করবেন। তাতেও কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলে এ ব্যাপারে আপনার এখতেয়ার থাকবে। নিজের মত প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করতে পারবেন অথবা আমার পরামর্শ নিতে পারেন। তবে আমার পরামর্শ আপনার জন্য অধিক নিরাপদ"।[৫৭৬]
কাযী শুরাইহ আলী (রা) থেকেও ফিক্‌হ, ইজতিহাদ ও বিচারব্যবস্থার পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির এক পর্যায়ে আলী (রা) তার উদ্দেশে বলেন,

قم فأنك أقضى العرب أو من أقضى العرب،

---

[৫৭৪] ইবনুল মানজুর, জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকার্‌রম, *মুখতাসারু তারীখি দামেস্ক*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ২২৫।

[৫৭৫] ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৮ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৫০৩।

[৫৭৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০১।

"বাহ! আপনি আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারক"।[৫৭৭]

ইমাম শাবী (২১-১০০ হি.) বলেন, শুরাইহ ছিলেন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মহাপণ্ডিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার জন্য একশত দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। ইবরাহীম নাখায়ী বর্ণনা করেন, কাযী শুরাইহ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর বিচারপদ্ধতি দ্বারা ফায়সালা প্রদান করতেন। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন, জনৈক ফকীহ কাযী শুরাইহ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, আপনি বিচার ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। উত্তরে কাযী শুরাইহ বলেন,

إِنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا، فَأَحْدَثْتُ،

"নতুন প্রজন্মের জন্য আমি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি"।[৫৭৮]

বিশিষ্ট তাবিঈ ইব্ন সিরীন থেকে বর্ণিত,

أَدْرَكْتُ الكُوْفَةَ وَبِهَا أَرْبَعَةٌ مِمَّنْ يُعَدُّ بِالفِقْهِ فَمَنْ بَدَأَ بِالحَارِثِ ثَنَّى بِعَبِيْدَةَ وَمَنْ بَدَأَ بِعَبِيْدَةَ ثَنَّى بِالحَارِثِ ثُمَّ عَلْقَمَةَ ثُمَّ شُرَيْحٍ،

"কূফায় আমি চারজন ফকীহ এর সাক্ষাত পেয়েছি। ক্রমানুসারে আবিদা ও হারিস প্রথম ও ২য়। অতঃপর আলকামাহ, তারপর শুরাইহ"।[৫৭৯]

কাযী শুরাইহ এর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা নিম্নরূপ,

কাযী শুরাইহ এর বিচারালয়ে এই মর্মে একটি মামলা দায়ের করা হয় যে, ধোপার ঘর পুড়ে যাবার কারণে এক ব্যক্তির কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। কাযী শুরাইহ ধোপাকে ঐ কাপড় এর ক্ষতিপূরণ দেয়ার ফায়সালা দেন। ধোপা কাযীর নিকট আরজ করল, আমার ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, আর আপনি আমার উপর ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দিলেন? কাযী শুরাইহ বললেন, যদি কোনো কারণে কাপড়ের মালিকের ঘর পুড়ে যেতো। তুমি কি তোমার পাওনা ছেড়ে দিতে?

কাযী শুরাইহ জন-স্বার্থ প্রাধান্য দিতে গিয়ে ধোপার উপর ক্ষতিপূরণ স্থগিত করেননি। অথচ ঘর পুড়ে যাবার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবেই গ্রাহকের কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, কারো ঘর পুড়ে যাবার কারণে ক্ষতিপূরণ মাফ হতে পারে না। যেভাবে কাপড়ের মালিকের ঘর পুড়ে গেলে শ্রমিকের মজুরি রহিত হয় না।[৫৮০]

৭.আবু বকর ইব্ন হাযম (র)

আবু বকর ইব্ন হাযম আল আনসারী আল খাযরাজী ৩৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ও উমার ইব্ন আবদুল আযীয এর খেলাফতকালে ইব্ন হাযম মদীনার বিচারক ও আমির ছিলেন। জলীলুল কদর তাবিঈদের নিকট থেকে তিনি হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। খারিজা ইব্ন যাইদ, সালিম ইব্ন আবদিল্লাহ ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ, ইব্ন শিহাব যুহরী, ইয়াহয়া ইব্ন সাইদ আনসারী ও আমর ইব্ন দীনার। ইমাম যাহাবী (র) বলেন,

...كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالقَضَاءِ ،

---

[৫৭৭] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, সম্পাদনাঃ আবদুল আযীয মুস্তফা আল মারাগী, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৩৬ হি./১৯৪৭), খ. ২, পৃ. ১৯৪।

[৫৭৮] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০২।

[৫৭৯] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.১০২।

[৫৮০] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৫।

"বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আবু বকর ইব্ন হাযম ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী "।[৫৮১]
মদীনার কাযী হিসেবে তার ইজতিহাদ পরবর্তী মুজতাহিদদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। নিম্নে তার ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো।

কোনো মুসলিম অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার বিধান সম্পর্কে ফকীহগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। মুসলমান কর্তৃক নিহত অমুসলিম ব্যক্তি তিন প্রকার। ১.মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অমুসলিম। ২. নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম। ৩.যিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে কর আদায়কারী অমুসলিম নাগরিক)।

কোনো মুসলিম যুদ্ধবাজ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে ঐ মুসলিমের উপর জমহুর ফকীহ-মুজতাহিদদের মতে কিসাস এর বিধান কার্যকর হবে না। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ও 'যিম্মি'কে কোনো মুসলিম হত্যা করলে তার উপর কিসাস কার্যকর করার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মাসআলা হলো, কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে ঐ মুসলিমের উপর কিসাস এর বিধান কার্যকর হবে না। ইমাম বুখারী বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْت لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের নিকট কী আল কুরআনের ওহী ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষায়িত ইলম আছে? আলী (রা) উত্তর দিলেন, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং শস্য উদগত করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে প্রদত্ত আল কুরআনের বোধজ্ঞান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লিখিত এই কিতাব ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এই সহিফাতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দিয়ত' এর বিধান, মানব মুক্তি এবং কোনো মুসলিমকে কাফেরের পরিবর্তে হত্যা করা হবে না"।[৫৮২]

আবু বকর ইব্ন হাযম এর ইজতিহাদ উপর্যুক্ত হাদীসের বিপরীত। তিনি স্বীয় ইজতিহাদের আলোকে এ মত প্রদান করেন। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন,

أن أبا بكر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم قتل مسلماً بذمي قتله غيلةٍ

"আবু বকর ইব্ন হাযম মদীনার কাযী থাকাকালীন সময়ে একজন অমুসলিম নাগরিককে প্রতারণামূলকভাবে হত্যার দায়ে একজন মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন"।[৫৮৩]

ইসলামী শরীয়তে অমুসলিমকে হত্যার দায়ে কোনো মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান নেই। কাযী দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার লক্ষ্যে অন্য কোনো শাস্তির বিধান জারি করতে পারেন। কিন্তু আবু বকর ইব্ন হাযম ইজতিহাদপূর্বক একজন মুসলিমের উপর এ বিধান কার্যকর করেন। দেশে শান্তি বজায় রাখার নিমিত্তে তিনি এ শাস্তি প্রয়োগ করেন।

তেমনিভাবে কাযী আবু বকর জনৈক স্বাধীন নারীর উপর যেনার মিথ্যা অপবাদ (قذ ف) দেয়ার কারণে একজন কৃতদাসকে আশি বেত্রাঘাত করেন। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন

---

[৫৮১] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩১৪।

[৫৮২] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৬৯, হাদীস নং- ৩০৪৭।

[৫৮৩] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, সম্পাদনা: আবদুল আযীয মুস্তফা আল মারাগী, (মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৩৩৬ হি./১৯৪৭), খ. ১, পৃ. ১৩৯ ।

রবিয়া (রা) এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছে তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকাল থেকে এ পর্যন্ত সকল কাযীকে দেখেছি যে, তারা প্রত্যেকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন। [৫৮৪]

৮. আতা ইব্ন ইয়াসার (র)

আতা ইব্ন য়াসার উসমান (র) এর খেলাফতকালে ২৯ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইয়াসার পারস্য যুদ্ধবন্দীদের একজন। তিনি উম্মুল মুমিনিনি মায়মুনা বিনতুল হারিস (রা) এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি জলীলুল কদর ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যায়দ ইব্ন আসলাম, আমর ইব্ন দীনার, হাবীব ইব্ন আবি সাবিত ও মুহাম্মদ আল বাকির ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য শিষ্য। তিনি ১০৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র। জ্ঞান-পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা মসজিদে তাদের জ্ঞান চর্চা করতেন। আতা ইব্ন ইয়াসার মসজিদে বেশি সময় ব্যয় করার কারণে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হন। আবু হাযিম বর্ণনা করেন,

مَا رَأَيْتُ رَجُلاً كَانَ أَلْزَمَ لِمَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ،

"আমি আতা ইব্ন ইয়াসার থেকে মসজিদে বেশি সময় ব্যয়কারী কোনো ব্যক্তি দেখিনি"।[৫৮৫] নিম্নে আতা ইব্ন ইয়াসার এর তালাক সংক্রান্ত একটি ইজতিহাদ আলোচনা করা হলো।

নুমান ইব্ন আবি আইয়াশ থেকে বর্ণিত, তিনি আতা ইব্ন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করে বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) এর নিকট প্রশ্ন করেন, একজন লোক তার স্ত্রীকে সহবাস করার পূর্বে তিন তালাক দিল। এখন তার হুকুম কী?

আতা ইব্ন ইয়াসার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন-

إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ،

"সহবাস করার পূর্বে তালাক দিলে ঐ নারীর উপর এক তালাক কার্যকর হবে"।[৫৮৬]

একথা শোনার পর আমর ইবনুল আস বলেন, এক তালাকে ঐ স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর তিন তালাক দিলে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

সাধারণত একজন স্বাধীন মহিলার উপর তিন তালাক আর কৃতদাসীর উপর দুই তালাক কার্যকর হয়। এখানে সহবাস করার কোনো শর্ত নেই। কিন্তু মুজতাহিদ তাবিঈ আতা ইব্ন ইয়াসার ইজতিহাদ করে বলেন, সহবাস করার পূর্বে তালাক দিলে এক তালাক কার্যকর হবে। তার ইজতিহাদকৃত এ মাসআলার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস।

৯.ইব্ন আবি যি'ব (র)

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল মুগীরা ইবনুল হারিস ইব্ন আবি যি'ব মদীনার একজন বিশিষ্ট তাবিঈ ফকীহ। কুরাইশ বংশীয় এই ফকীহ ৮০ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৮ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন। জীবনীকার যিরিক্লী (র) (১৩১০-১৩৯৬ হি.) বলেন,

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ من أهل المدينة كان يفتي بها يشبّه بسعيد بن المسيب ،

---

[৫৮৪] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯।

[৫৮৫] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, সিয়ারু *আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৪৯।

[৫৮৬] আশ শাফিঈ, মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস, *মুসনাদুশ শাফিঈ*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০০ হি. তা/বি), খ. ১, পৃ. ১০২।

"ইব্ন আবি যি'ব ছিলেন মদীনার অধিবাসী। তিনি মদীনার ফিক্‌হ অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর সমপর্যায়ের ফকীহ।[৫৮৭]

ইকরামা, ইব্ন শিহাব যুহরী ও মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদীর থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহয়া ইব্ন সাইদ আল কাত্তান ও ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ প্রমুখ তার উল্লেখযোগ্য শিষ্য। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বলেন,

...كان يشبّه بسعيد بن المسيّب وما خلّف مثله كان أفضل من مالك إلّا أنّ مالكا أشدّ تنقية للرّجال،

"ইব্ন আবি যি'ব সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর সমপর্যায়ের ফকীহ। তবে তার মতো ফকীহ পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেননি। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইব্ন আবি যি'ব ইমাম মালিক এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তবে ইমাম মালিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন"। [৫৮৮]

ইমাম যাহাবী (র) তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

...وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ ثِقَةً فَاضِلاً قَوَّالاً بِالحَقِّ مَهِيْباً،

"ইব্ন আবি যি'ব জ্ঞানের একজন সংরক্ষণকারী বাহক, নির্ভরযোগ্য ও শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস, সত্য উচ্চারণকারী ও প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চারকারী মহা-মনীষী"।[৫৮৯] মুসআব আল যুবাইরি বলেন,

...كَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَقِيْهَ المَدِيْنَةِ ،

"ইব্ন আবি যি'ব ছিলেন মদীনার ফকীহ"।

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আব্বাসী খলীফা মাহদী হজের প্রাক্কালে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। একমাত্র ইব্ন আবি যি'ব ব্যতীত সকলেই তার সম্মানার্থে দাড়িয়ে যায়। তাকে বলা হলো, আমিরুল মুমিনীন এর জন্য আপনি দাড়াচ্ছেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, إِنَّمَا يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالِمِيْنَ.

"একমাত্র বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সবার দাঁড়ানো উচিত"। মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ শাফিঈ (র) বলেন,

مَا فَاتَنِي أَحَدٌ فَأَسِفْتُ عَلَيْهِ مَا أَسِفْتُ عَلَى اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

"কারো মৃত্যুর কারণে আমার তেমন আফসোস হয়নি। কিন্তু দুইজন ব্যক্তির মৃত্যুতে আমি বেশ আফসোস করেছি। একজন লাইস ইব্ন সাদ। দ্বিতীয়জন ইব্ন আবি যি'ব"।[৫৯০]

ইব্ন খল্লিকান ইব্ন আবি যি'বকে أحد الأئمة المشاهير 'মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ফকীহ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের সহচর। ইমাম মালিক খলীফা মনসুর এর নিকট আগমনের প্রাক্কালে খলীফা জিজ্ঞেস করেন, মদীনার শ্রেষ্ঠ ফকীহদের মধ্যে কে কে অবশিষ্ট আছেন? তিনি বলেন, ইব্ন আবি যি'ব, ইব্ন আবি সালামা ও ইব্ন আবি সাবুরা।[৫৯১]

---

[৫৮৭] যিরিক্‌লি, খাইরুদ্দীন ইব্ন মাহমুদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ফারিস, *আল আলাম*, (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মিলিয়ন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৮৯, খ. ৬।

[৫৮৮] আবুল ফালাহ আবদুল হাই আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারী মান যাহাব*, সম্পাদনা: মাহমুদ আল আরনাউত, (বৈরুত: দারু ইব্ন কাসীর, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৬৫।

[৫৮৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ১৪০।

[৫৯০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি,), খ.৭, পৃ. ১৪০।

[৫৯১] ইব্ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৩।

১০.নাফি মাওলা ইব্ন উমার (র)

আবু আবদুল্লাহ নাফি ইব্ন হুরমুয মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২৬ খ্রি./১১৭ হি. ইন্তেকাল করেন। তিনি দাইলাম গোত্রের কয়েদী হিসেবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর গোলামে পরিণত হন। ইব্ন উমার (রা) তাকে শিক্ষা-দীক্ষায় সুসভ্যরূপে গড়ে তোলেন এবং তার নিকট থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা, উম্মে সালামাসহ (রা) অন্যান্য সাহাবী থেকেও তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তার নিকট থেকে সালিহ ইব্ন কাইসান, যুহরী, আওয়ায়ী, মালিক ইব্ন আনাসসহ অনেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত। উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) (৯৯-১০১) তাকে মিসরবাসীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেন।[৫৯২] তিনি স্বর্ণালী সনদ السلسلة (الذهبية) এর রাবীদের একজন। ইমাম আবু দাউদ যে সনদকে সর্বোত্তম সনদ বলেছেন নাফি সে সনদের রাবী। ইমাম ইব্ন কাসীর বলেন,

كان نافعٌ من الثقات النبلاء والأئمة الأجلاء،

"নাফি মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মধ্যে গণ্য"।[৫৯৩]

ইমাম মালিক বলেন, নাফি থেকে কোনো হাদীস শোনার পর তার বিশুদ্ধতার সমর্থনে অন্য কারো থেকে তা শোনার প্রয়োজন পড়ে না। ইব্ন সাদ (১৬৮-২৩০) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবী। ইব্ন উমার (রা) এর নিকট তার অনেক অবদান রয়েছে। তার কাছে নাফি এর অবস্থান ছিল অতি সম্মানজনক। নাফি এর কোনো বর্ণনায় কোনো ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায়নি।[৫৯৪]

হাদীস ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে তিনি সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তার দক্ষতা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর পুত্র সালিম বর্ণনা করেন,

سلُوا نافعًا فإنه أعلمُنا بحديث ابن عمر؛

"তোমরা নাফি এর নিকট হাদীস ও ফিক্হ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ জিজ্ঞেস করো। তিনি ইব্ন উমার এর হাদীস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞাত"।[৫৯৫]

ইমাম নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন, নাফি এর শিষ্যদের মধ্যে ইমাম মালিক ছিলেন স্বীয় উস্তায এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছাত্র। সালিম ও নাফি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এর প্রধান দুজন শিষ্য। সালিম বয়সে নাফি থেকে বড়। সালিম এর জীবদ্দশায় তিনি ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয়ে ইখতিলাফ করেছেন। এ ক্ষেত্রে নাফি এর বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে স্ত্রীর এর সঙ্গে পুং মৈথুন এর বৈধতার বিষয়ে তিনি যে বর্ণনাটি করেছেন, সে বিষয়ে মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, বৃদ্ধ বয়সে যখন তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, তখনই তিনি এ উক্তি করেন। এ বিষয়ে সালিম বলেন, ইব্ন উমার (রা) থেকে যে এমন বর্ণনা করে, সে নিশ্চয়

---

[৫৯২] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৪৩।

[৫৯৩] ইব্ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩৪৯।

[৫৯৪] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১৪২।

[৫৯৫] ফাসাবী, ইয়াকুব ইব্ন সুফ্য়ান, *আল মারিফাতু ওয়াত তারীখ*, সম্পাদনা: আকরাম জিয়া আল উমারী, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২৪।

মিথ্যুক অথবা ভুল বর্ণনা করেছেন। মূলত সামনে অথবা পেছন থেকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সহবাস করার বৈধতার বিষয়টিই ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।[৫৯৬]

নাফি এর প্রধান শিষ্য ইমাম মালিক স্বীয় শাইখ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

إذا قال نافعٌ شيئًا فاختِمْ عليه،

"কোনো বিষয়ে নাফি এর মতামত পাওয়া গেলে এটিকে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করি"।[৫৯৭]

৪.১.৩. মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (র) এর ইজতিহাদ

আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালিব আল হাশিমী আল কুরাইশী। মায়ের নাম খাওলা বিনতে জাফর আল হানাফিয়্যাহ। উপনাম আবুল কাসিম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ও উপনামে কারো নাম রাখা নিষিদ্ধ হলেও আলী (রা) এর সন্তানের জন্য তিনি এ অনুমোদন দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ ২১ হিজরীতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাসনামলে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবসহ (রা) উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আবু হুরায়রা, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস রেওয়ায়াত করে। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ,আবু জাফর আল বাকির ও আমর ইব্‌ন দীনার প্রমুখ। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ একজন মুসলিম বীর, পরহেযগার, প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, ফকীহ ও হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তার একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫৯৮] সাইয়িদ হিময়ারী বলেন,

أنّ محمّد ابن الحنفيّة كان أحدَ رجال الدهر في العلم والزهد والعبادة والشجاعة وهو أفضلُ وُلْد الإمام عليّ رضي الله عنه بعد الحسن والحسين رضي الله عنهما،

"মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দুনিয়াবিমুখিতা, ইবাদত, ও বীরত্বে যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। হাসান ও হুসাইন (রা) এর পর আলী (রা) এর সন্তানদের মধ্যে তিনি সবার শীর্ষে"।

ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন,

أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ كَانَ يُكْنَى أَبَا القَاسِمِ وَكَانَ وَرِعاً كَثِيْرَ العِلْمِ،

"মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ এর উপনাম হলো আবুল কাসিম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী"।[৫৯৯]

---

[৫৯৬] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১০০।

[৫৯৭] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩২, খ. ৬১।

[৫৯৮] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১১১।

[৫৯৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১১৫।

৪.১.৪. যায়নুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন (র) এর ইজতিহাদ

আলী ইবনুল হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবি তালিব ৩৮ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি অসুস্থতার কারণে কারবালায় অবস্থান সত্ত্বেও পিতার সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারবালার যুদ্ধ শেষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে তাকেও দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম থেকে উলুমে শরীয়ার জ্ঞান লাভ করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন তদীয় পুত্র মুহাম্মদ আল বাকির, ইব্ন শিহাব যুহরী ও আমর ইব্ন দীনার প্রমুখ। [৬০০]

ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন, আমি আলী ইব্নুল হুসাইন এর সঙ্গে বেশি সময় অতিবাহিত করতাম। কারণ ফিক্হ শাস্ত্রে তিনিই অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। ইব্ন সাদ 'আত তাবাকাত আল কুবরা' কিতাবে সাবিত সুলামী এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি আবু জাফরকে বলতে শুনেছেন যে, আলী (রা) এর পৌত্র আলী ইবনুল হুসাইন শৌচাগারে প্রবেশ করেন, তখন আমি বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার জন্য অযুর পানি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। আবু জাফর বলেন, তিনি বের হয়ে আমাকে বললেন, "হে প্রিয় বৎস! আমি বললাম, জী! আমি হাজির। তিনি বললেন, আমি শৌচাগারে সন্দেহপূর্ণ কিছু বস্তু দেখতে পেয়েছি। আমি প্রশ্ন করলাম। তা কি? তিনি বললেন, কিছু মাছি ময়লায় পতিত হয়ে আবার উড়ে এসে মানুষের শরীরে বসে। আমি চিন্তা করলাম, এ ধরনের নাপাকী থেকে বাঁচার জন্য শৌচাগারে প্রবেশের সময় একটি অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করব। তিনি আবার বললেন, আমার পক্ষে এমন কাজ করা সমীচীন হবে না, যা পালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়"।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আলী ইবনুল হুসাইন সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য শৌচাগারে প্রবেশের সময় একটি অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করার চিন্তা করেন। সন্দেহমুক্ত পবিত্রতা হাসিলের ক্ষেত্রে যা একটি জায়েয বিষয়। আবার তিনি কাজটি এ কারণে পরিহার করেন যে, তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে এ কাজ করা শুরু করলে পরবর্তী প্রজন্ম এটাকে জরুরি মনে করে তার অনুসরণ করতে শুরু করবে। যা সাধারণ মানুষের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাড়াবে।[৬০১]

আলী ইবনুল হুসাইন সফরে জমা বাইনাস সালাতাইন (جمع بين الصلاتين) করতেন। তিনি এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়মিত আমল ও সুন্নাহ মনে করতেন। ইব্ন সাদ বলেন,

وكان علي بن حسين يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو غير عجل ولا خائف،

"আলী ইবনুল হুসাইন সফরের সময়ে জোহর-আসর ও মাগরিব-এশার নামায একত্রে আদায় করতেন। তিনি বলতেন, কোনো প্রকার তাড়াহুড়া ও ভয় না থাকা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে নামায আদায় করতেন"।[৬০২]

ইমাম তিরমিযী বলেন, জমা বাইনাস সালাতাইন বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আহলে ইলমদের মতে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত জমা বাইনাস সালাতাইন জায়েয নেই। তাবিঈদের একটি জামাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এটি বৈধ মনে করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ এ মত পোষণ করেন। অনেকের মতে, বৃষ্টির কারণে জমা বাইনাস সালাতাইন করা যাবে। ইমাম শাফিঈ

---

[৬০০] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬৩।

[৬০১] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৯।

[৬০২] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬৯।

(র) এই মতের প্রবক্তা। ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন এর দলীল হলো ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীস-

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর এর ক্ষেত্রে তড়িগড়ি হলে মাগরিব-ইশা দুই ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে জমা বাইনাস সালাতাইন করতেন।[৬০৩]

জমহুর উলামার মতে আরাফার মাঠে জোহর-আসর ও মুযদালিফায় মাগরিব-ইশা এর মধ্যে জমা বাইনাস সালাতাইন করা সুন্নাত। অনেকেই সফর অবস্থায় কোনো অসুবিধা ব্যতিরেকে জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা এক সাথে আদায় করা সুন্নাত মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত কোনো অবস্থায় দুই ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করা জায়েয নয়। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ জমা বাইনাস সালাতাইন সংক্রান্ত হাদীসসমূকে জামযে সূরি (جمع صوري) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ একটি নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে এবং পরবর্তী ওয়াক্তের নামায তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন,

بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون،

"মুসাফিরের জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট নামায কসর করা সুন্নাত। অসুবিধা হোক বা না হোক। জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা এর মধ্যে জমা বাইনাস সালাতাইন করা হলো প্রয়োজনের মুহূর্তে উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা তথা রুখসাত; এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়মিত আমল বা সুন্নাত নয়। দুটির বৈশিষ্ট্য এক নয়। শরীয়তে রুখসাত এর আলাদা সুবিধা রয়েছে এবং সুন্নাতের রয়েছে ভিন্ন শান-মান"।[৬০৪]

দুই ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করা সুন্নাত নয় বরং রুখসাত। এ কারণে মালিকী মাযহাবের ইমামগণ সফর অবস্থায় প্রত্যক নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় করাকে উত্তম মনে করেন। তাদের মতে জমা বাইনা আল সালাতাইন মাকরুহ নয়। তারা দুটিকে জায়েয মনে করলেও বৈধতার ক্ষেত্রে সমান মনে করেন না।[৬০৫] (الجواز غير مستوي الطرفين)

৪.১.৫. যাইদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসাইন (র) এর ইজতিহাদ

হুসাইন (রা) এর দৌহিত্র যাইদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসাইন ৭৬ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। যাইনুল আবেদীন ছিল তার প্রধান উপাধি। তিনি স্বীয় পিতা, ভ্রাতা ইমাম বাকির ও উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তারা হলেন, ভাতিজা জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, শুবা ও ইব্‌ন আবিয যনাদ।[৬০৬]

---

[৬০৩] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ. ২৯৩, হাদীস নং- ১০৫৫।

[৬০৪] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *আল ওয়াবিলুস সায়্যিব*, সম্পাদনাঃ সাইয়্যিদ ইবরাহীম, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪।

[৬০৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *মিনাহুল জালীল*, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪১৪।

[৬০৬] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৯০।

ইসলামী শরীয়তের বিবিধ শাখা-উপ-শাখায় প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জনের কারণে তিনি তৎকালীন যুগের ইমামের আসনে অধিষ্ঠিত হন। উলুমুল কুরআন ও ক্বেরাত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার কারণে তাকে حليف القران বলা হতো। ইমাম আবু হানীফা (র) তার প্রশংসায় বলেন,

ما رأيتُ في زمانه أفقَهَ منه ولا أسرعَ جوابًا ولا أبيَن قولًا،

"যাইদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসাইন এর যুগে ফিক্হ শাস্ত্রে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। দ্রুত জবাবদান ও স্পষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি সবার শীর্ষে"।[৬০৭]

ফিকহ শাস্ত্রে রচিত তার প্রধান কিতাবটি হলো المجموع 'আল মাজমু'। ইমামত মতাদর্শে বিশ্বাসী শিয়া সম্প্রদায়ের যাইদিয়া উপদল তার নামনুসারেই পরিচিত। তাকে স্বতন্ত্র এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো, كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 'আল বাহরুয যাখ্খার আল জামি লি মাযাহিবি 'উলামাইল আমসার'। এই মাযহাব প্রচলিত চার মাযহাবের সঙ্গে বেশির ভাগ মাসআলায় এমকমত পোষণ করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এই মাযহাবের আলোকে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। এ মাযহাবের অনুসারীগণ অমুসলিমদের জবাইকৃত পশু হারাম বলে স্বীকার করে না। তারা আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করাও জায়েয মনে করে না।[৬০৮]

৪.১.৬. উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) এর ইজতিহাদ

আবু হাফস উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ৬১ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা ওয়ালিদ ৮৭ হিজরীতে তাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। সুলায়মান ইব্ন আবদিল মালিক এর ইন্তেকালের পর তিনি অষ্টম উমাইয়া খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় উমার হিসেবে পরিচিত। তিনি ১০১ হিজরীতে শামের ইদলিব প্রদেশে ইন্তেকাল করেন। উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) এমন একজন খলীফা, যার মধ্যে সকল প্রকার যোগ্যতার সমাহার ছিল। ইব্ন সাদ বর্ণনা করেন,

كان عمر بن عبدالعزيز ثقةً مأمونًا له فقه وعلم ووَرَع وروى حديثًا كثيرًا وكان إمام عدل رحمه الله ورضي عنه؛

"উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্থ মুহাদ্দিস। যার মধ্যে ফিক্হ, ইলম ও পরহেযগারীর সন্নিবেশ রয়েছে। তিনি অনেক হাদীসের রাবী। সর্বোপরি তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুক ও সন্তুষ্ট হোক"।[৬০৯]

ইব্ন সাদ আরো বর্ণনা করেন, "উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হবার পর মদীনার ফকীহ ও আলিমদের এক অধিবেশন ডাকেন। সমাবেশে তিনি ফকীহদের উদ্দেশ করে বলেন, আপনারা হলেন, সত্যের সহায়ক। আমি আপনাদের মতামতের বাইরে কেনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না।

---

[৬০৭] https://www.alukah.net/literature_language/0/99765/#ixzz6RIRV93Hv

[৬০৮] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিকহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪২।

[৬০৯] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩১১।

আমার কর্মচারীদের কেউ কোনো প্রকার জুলুম অথবা বিপথগামীতায় লিপ্ত হলে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন"।[৬১০]

উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) ইসলামী খেলাফতকে খুলাফায়ে রাশেদূন এর আদলে ঢেলে সাজান। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত ইজতিহাদী যোগ্যতা বলে উমাইয়া খলীফাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন। তিনি সাহাবী ও তাবিঈদের অনুসৃত পন্থায় ইজতিহাদ এর বিকাশধারা অব্যাহত রাখেন। ইজতিহাদের বিকাশে অসামান্য অবদানের কারণে তাকে প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলা হয়। প্রশাসনের প্রতিটি সেক্টরে আমূল পরিবর্তন সাধন তার ন্যায়পরায়ণতা ও অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় বহন করে। প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট পাঠানো নিম্নের ফরমান তার উজ্জ্বল প্রমাণ । উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) বলেন,

"কারাবন্দিদের অধিকারের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। কারো ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে সমস্যা হলে আমার নিকট সমাধান চাইবে। অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা তাদের কারাবরণই এক প্রকারের শাস্তি। অসুস্থ কয়েদীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। নারীদের কারাগারের আলাদা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করবে। কোনো অপরাধের কারণে ধৃত ধার্মিক ব্যক্তি ও দুস্কৃতকারীদের কারাগারের এক কক্ষে রাখা যাবে না"।

উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) এর এ ইজতিহাদ ছিল তার পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর ইজতিহাদ ও নির্দেশনার আলোকে। তিনি সন্দেহজনক অপরাধের কারণে কাউকে গ্রেফতার করতে নিষেধ করেন। কারা কর্তৃপক্ষকে কারাবন্দিদের রেজিস্টার তৈরির নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে কারো অপরাধ প্রমাণিত না হলে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার হুকুম দেন। তিনি অপরাধী ও নিরপরাধীদের আলাদা কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সৎ ও অসৎ কয়েদী একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করলে অসৎ লোকদের অপরাধের প্রতিক্রিয়া সৎ লোকদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।[৬১১]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি অনেক প্রাগ্রসর তাবিঈদের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। বিশিষ্ট তাবিঈ মুজতাহিদ ও মুফাসসির মুজাহিদ ইব্ন জাব্র (র) এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

أتينا عمر بن عبدالعزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إلينا فيما خرجنا من عنده حتى احتجنا إليه؛

"ফিক্হ সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আমরা উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমাদের ধারণা ছিল এ বিষয়ে তিনি আমাদের প্রয়োজনবোধ করবেন। পরিশেষে দেখলাম, তার প্রয়োজন আমাদের ঢের বেশি"। [৬১২] নিম্নে তার ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো।

বায়তুল মাল থেকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গ

অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি অকৃষ্ট করার নিমিত্তে যাকাতের অর্থ প্রদান করা আল কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের মধ্যে একটি অন্যতম খাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা) এর কর্মধারা ছিল ঠিক অনুরূপ, যেভাবে আল কুরআনে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর উমার (রা) বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে খলীফা আবু বকর (রা) এর নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে তিনি বলেন,

"এখন অমুসলিমদের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। অমুসলিমদের মনোরঞ্জনের কোনো প্রয়োজন এখন অবশিষ্ট নেই"।

---

[৬১০] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

[৬১১] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রো: মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৬।

[৬১২] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩১১।

উমার (রা) এর এ ইজতিহাদ আবু বকর (রা) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি তার ইজতিহাদের যথার্থতা উপলব্ধিপূর্বক এর অনুমোদন দেন।[৬১৩]

সময় ও চাহিদার বিবেচনায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) অমুসলিমদের মনোরঞ্জনে যাকাতের অর্থ প্রদান করার খাতটি ইজতিহাদ এর ভিত্তিতে বাতিল ঘোষণা করেন। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদুন ও উমাইয়া খলীফাগণের আমল ছিল উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর ইজতিহাদের আলোকে। অথচ উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (রহ) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে বাইতুল মাল থেকে অমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করার বৈধতার বিষয়ে নতুন করে ইজতিহাদ করেন। যা উমার ইবনুল খাত্তাব এর যুগে সকল সাহাবীর সর্বসম্মতিক্রমে (اجماع) বাতিল হয়ে যায়। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অমুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে সহায়তা করার বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে বাতিল হবার ব্যাপারে উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) এর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ইজতিহাদ করেন। তৎকালীন সময়ে প্রয়োজনের নিরিখে তিনি এটিকে জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেন।[৬১৪]

৪.১.৭. ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) এর ইজতিহাদ

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল মুসলিম ইব্‌ন উবাইদিল্লাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন শিহাব আয যুহরী ৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস সংকলনের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা ও মদীনার শীর্ষস্থানীয় ফকীহ। হাদীস সংকলনের পাশাপাশি তিনি ফিকহ চর্চায় অনবদ্য অবদান রাখেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহ তার ফতোয়াসমূহ তিনটি বৃহৎ খণ্ডে সংকলন করেন। এগুলো ফিকহী অধ্যায়ের আলোকে সুবিন্যস্ত। খলীফা ওয়ালিদ ইব্‌ন অবদুল মালিক বিভিন্ন মাসআলায় তার কাছে ফতোয়া তলব করতেন। আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন, ফতোয়াদানকারী ইমামদের মধ্যে ইমাম যুহরী ছিলেন সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর সমকক্ষ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ইব্‌ন শিহাব যুহরী ১২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৬১৫]

ইব্‌ন শিহাব যুহরী স্বতন্ত্র ইজতিহাদী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন মাসআলায় তার সঙ্গে অন্যান্য বিশিষ্ট ইমামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। সমতা (كفو) রক্ষাপূর্বক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো নারীর বিয়ে সংগঠিত হলে তা বৈধ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। জমহুর ফকীহদের মতে বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি একান্ত অপরিহার্য। অভিভাবকের অনুমতিহীন কোনো বিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। নিম্নের হাদীসটি তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

---

[৬১৩] আল জাস্‌সাস, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *আহকামুল কুরআন*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩২৫।

[৬১৪] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রো: মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৬।

[৬১৫] ড. আ ক ম আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা*, (ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা , ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন করে, তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন"।[৬১৬]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কোনো নারী সমতা রক্ষা করে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে সম্পন্ন করলে তা সহীহ বলে গণ্য হবে। ইমাম আউযায়ীও একই মত পোষণ করেন।

জমহুর আলিমগণ এই হাদীসটি তাদের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন,

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا،

"বিধবা নারীগণ বিয়ের ক্ষেত্রে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। কুমারী নারীদের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। তাদের অনুমতি হলো নীরবতা"।[৬১৭]

ইমাম যুহরী (র) তার মতের পক্ষে দলীল গ্রহণপূর্বক বলেন, আল কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আকদে নিকাহকে নারীদের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ،

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ،

فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ،

তদুপরি ভিন্ন মতাবলম্বীদের দলীল খণ্ডন করে তিনি বলেন, মুসনাদ আহমাদসহ সকল হাদীসে الْأَيِّم এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম যুহরী বলেন, আরবী ভাষাবিদদের বিশুদ্ধ মতে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত স্বামীহীন নারীদের الْأَيِّم বলা হয়। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের বিয়ে তাদের অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া সহীহ হবে। যে সকল হাদীসে অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে সে সকল হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে কৃতদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও উম্মাদ নারীদের বোঝানো হয়েছে। অথবা হুকুমটি মুসতাহাব বলে গণ্য হবে। যা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীদের স্ব-উদ্যোগে সংগঠিত বিয়ে-শাদী সিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।[৬১৮]

পরিচ্ছেদ- ২
মক্কার মুজতাহিদ তাবিঈদের ইজতিহাদ

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর শিষ্যগণই হলেন তাবিঈ যুগে মক্কার প্রধান ফকীহ ও মুজতাহিদ। ইজহিহাদের এ মহান খিদমত তারাই আঞ্জাম দেন। তাদের ইজতিহাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল কুরআন ও তার তাফসীর। সুন্নাতে রাসূল থেকে মাসআলা ইসতেম্বাত করার চেয়ে আল কুরআন এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই তারা বেশি প্রাধান্য দেন। যার ফলে ফিকহী মাসআলায় তাদের ইজতিহাদের সংখ্যা অপ্রতুল। তাফসীর এর ক্ষেত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) এর শিষ্যদের অবদান অনস্বীকার্য। নিম্নে তাদের ইজতিহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কীর্তি আলোচনা করা হলো। মক্কার মুজতাহিদদের মধ্যে আতা ইব্ন আবি রাবাহ, তাউস ইব্ন কাইসান, মুজাহিদ ইব্ন জাব্র, উবাইদ ইব্ন উমাইর, আমর ইব্ন দীনার, আবদুল্লাহ

---

[৬১৬] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, (কায়রোঃ আর রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ২২৯, হাদীস নং- ২০৮৩।

[৬১৭] আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং- ১৮৮৮।

[৬১৮] জামাল ইউসুফ আল মিসরী, *ফিকহুল ইমাম আয যুহরি*, (গাযাঃ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ২০।

ইব্‌ন আবি মুলাইকা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত ও ইকরামা খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীতে আবু যুবাইর মক্কী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আসিদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৬১৯]

৪.২.১. মুজাহিদ ইব্‌ন জাব্‌র (র) এর ইজতিহাদ

মুজাহিদ ইব্‌ন জাবর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে ২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মুজাহিদ ইব্‌ন জাব্‌র কাইস ইব্‌ন সায়িব এর আযাদকৃত গোলাম। তার উপনাম হলো আবুল হাজ্জাজ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস, তাফসীর ও কেরায়াত এর পাঠ গ্রহণ করেন। তাছাড়া আয়িশা, আবু হুরায়রা, সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, ইব্‌ন উমার, আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছে ইব্‌ন কাসীর আল দারী ও আবু আমর ইবনুল আলা। আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ, তাউস ও ইকরামা সতীর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে কেরায়াত, ফিক্‌হ ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম। মুজাহিদ বলেন,

عَرَضْتُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَ عَرْضَاتٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ أَسْأَلُهُ فِيْمَ نَزَلَتْ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ،

"আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট তিনবার আল কুরআন এর তাফসীর পাঠ করেছি। প্রতিটি আয়াতের শেষে তার নিকট এই মর্মে প্রশ্ন করেছি যে, আয়াতটি কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে? কিভাবে নাযিল হয়েছে?"

ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতার কারণে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) স্বয়ং স্বীয় ছাত্র মুজাহিদের খেদমত করতেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) এর খেদমতে হাজির হলাম। আমি তার খেদমত করতে চাইলে তিনি নিজে আমার খেদমত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কাতাদা থেকে বর্ণিত,

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ مُجَاهِدٌ ثِقَةٌ فَقِيْهٌ عَالِمٌ كَثِيْرُ الحَدِيْثِ،

"ইব্‌ন সাদ (র) বলেন, মুজাহিদ একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি মহাজ্ঞানী ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী"।[৬২০]

মুজাহিদ বলেন, الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

"প্রকৃত ফকীহ হলেন যিনি আল্লাহকে ভয় করেন"।[৬২১]

সুফ্য়ান সাওরী বলেন,

خذوا التفسير عن أربعة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك بن مزاحم،

"তিনজন তাবিঈ থেকে তাফসীর এর শিক্ষা গ্রহণ করো। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরামা ও দাহ্‌হাক ইব্‌ন মাযাহিম"।[৬২২]

---

[৬১৯] *লেখকমণ্ডলি*, ফিকহে ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, ২০১৪), খ.১, পৃ. ৫১।

[৬২০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৫০।

[৬২১] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৮০।

[৬২২] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫৭, পৃ. ২৮।

কাতাদা বলেন, হালাল-হারাম সম্পর্কীয় অবশিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন ইমাম যুহরী এবং তাফসীর এর অবশিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন মুজাহিদ ইব্ন জাব্র।[৬২৩]

৪.২.২. আতা ইব্ন আবী রাবাহ (র) এর ইজতিহাদ

আবু মুহাম্মদ আতা ইব্ন আবী রাবাহ (২৭-১১৪ হি.) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এর খেলাফতকালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস এবং জলীলুল কদর তাবিঈ ছিলেন। তিনি মক্কার মুফতী হিসেবে খ্যাত। অনেক সাহাবী ও শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন,

لاَ يُفْتِي النَّاسَ إِلاَّ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَطَاءٌ فَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي نَجِيْحٍ،

“মক্কায় ফতোয়া প্রদানের অধিকার একমাত্র আতা ইব্ন আবি রাবাহই (র) সংরক্ষণ করেন। তার অবর্তমানে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবি নাজিহ ফতোয়া প্রদান করতেন”। [৬২৪]

আতা ইব্ন আবী রাবাহ ছিলেন ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল। কুরআন সুন্নাহর বাইরে ইজতিহাদ করতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করতেন। একদা তার নিকট কোনো বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি জানি না। তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো, এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব কোনো মতামত থাকলে আমাদের বলুন। তিনি বললেন, আমার মতামত দ্বারা পৃথিবী ঋণী হয়ে থাকবে এটা আমার জন্য খুবই লজ্জাকর।[৬২৫]

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত,

مَا رَأَيْتُ فِيْمَنْ لَقِيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَلاَ لَقِيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ قَطُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءنِي فِيْهِ بِحَدِيْثٍ، وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيْثٍ مِنْ رَأْيِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا،

“আমার সঙ্গে তাবিঈদের মধ্যে যাদের সাক্ষাত হয়েছে, তাদের মধ্যে আতা ইব্ন আবী রাবাহ থেকে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি। আর জাবির যুফী থেকে কাউকে মিথ্যাবাদী দেখিনি। যখনই তার নিকট কেনো বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, তিনি হাদীস দ্বারা উত্তর দিয়েছেন। তার নিকট এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা তিনি কখনো আলোচনা করেননি”।[৬২৬]

তৎকালীন সময়ে হজের মাসআলা সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক অবগত আর কেউ ছিলেন না। এমনকি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী একজন অতি সাধারণ ব্যক্তিও অনেক জ্ঞানের অধিকারী হতো।

---

[৬২৩] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (মদীনাঃ মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৯ ।

[৬২৪] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৮২।

[৬২৫] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল* (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ২০, পৃ. ৮২।

[৬২৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৮৩।

ইমাম আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেন, হজ্ব করতে গিয়ে আমি পাঁচটি কাজ ভুল করেছি। একজন নরসুন্দর আমাকে ভুলগুলো শোধরে দিয়েছেন।

ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার লক্ষ্যে আমি একজন নাপিতের নিকট গেলাম ।

তাকে বললাম, আমার মাথা মুণ্ডাতে হবে। এ জন্য আপনাকে কী পারিশ্রমিক দিতে হবে?

উত্তরে নাপিত বলল, আল্লাহ আপনাকে হেদায়াত দান করুক। হজের একটি বিধান আদায়ে সাহয্য করতে গিয়ে আমি দর-দাম করা সমীচীন মনে করি না।

আপনি বসুন এবং হলক করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যান।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন,

একজন নরসুন্দর এর ধর্মীয় চেতনাবোধ দেখে আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম এবং হলক করতে বসে গেলাম।

তবে আমার বসাটি ছিল কিবলাবিমূখ হয়ে।

নাপিত আমাকে কিবলামুখী হয়ে বসতে ইশারা করলো।

এতে আমি আরো বেশি লজ্জিত হলাম।

তবে হলক করার জন্য আমি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিলাম।

নাপিত বললো,

আপনি ডানপাশে ঘুরে বসুন। আমি ঘুরে বসলাম।

এবার নাপিত মাথা মুণ্ডাতে লাগলো, আর আমি নীরব থেকে তার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। একজন নাপিত হয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে তার সতর্কদৃষ্টি আমাকে অবাক করলো।

এবার নাপিত আমাকে বললো, চুপ করে আছেন কেনো? তাকাবীর বলতে থাকুন।

আমি তাকাবীর বলতে বলতে চলে যাবার প্রস্তুতি নিলাম।

নাপিত আমাকে বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

বললাম, আমার গন্তব্যে।

নাপিত বললো, দুই রাতকাত নামায আদায় করুন। তার পর যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

আমি দুইরাকাত নামায পড়লাম। নামায শেষে মনে মনে চিন্তা করলাম। একজন নিরেট নাপিতের পক্ষে ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়ে এমন মূল্যবান কথা বলা অসম্ভব। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি কোনো জ্ঞানী লোক হবেন।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

হজের এই মাসআলাসমূহ আপনি কীভাবে শিখেছেন?

তিনি আমার জন্য দোয়া করে বললেন, আমি তেমন প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়া জানা মানুষ নই। তবে আতা ইব্ন আবি রাবাহকে (রহ.) এমন করতে দেখেছি। তার কাছ থেকে শেখার পর থেকে মানুষকে তা আদায় করার জন্য অনুপ্রাণিত করে আসছি।[৬২৭]

---

[৬২৭] ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন*, (কায়রো: দারুল আদাবিল ইসলামী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৬।

৪.২.৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মুক্তদাস ইকরামা (র) এর ইজতিহাদ

আবু আবদিল্লাহ ইকরামা ইব্‌ন আবদিল্লাহ ২৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮০ বছর বয়সে ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি দুইশত সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাত লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন তার প্রধান শিক্ষক। তাফসীর ও ফিক্‌হই ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাফসীর শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য সর্বজনবীদিত। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার দক্ষতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, হাসান বসরীর মতো তাবিঈ তার উপস্থিতিতে ফতোয়াদানে বিরত থাকতেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মৃত্যু অবধি ইকরামা ছিলেন কৃতদাস। পরবর্তীতে তার সন্তানেরা ইকরামাকে চার হাজার দীনার এর বিনিময়ে বিক্রয় করে দেন। ঘটনাটি শোনার পর অনেকে বিরূপ মন্তব্য করে বললেন, আপনার পিতার সম্পদকে মাত্র চার হাজার দীনার এর বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলেন? একথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর সন্তানেরা বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে তাকে ফিরিয়ে নিলেন এবং আযাদ করে দিলেন।[৬২৮]

মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক শ্রেণির সাহাবী কেবলমাত্র সংঘটিত ঘটনাবলিতে ইজতিহাদ করা পছন্দ করতেন। যে সকল সমস্যা এখনো উদ্ভূত হয়নি, তারা এমন বিষয়ে অনুমানপূর্বক সমাধান পেশ করা সমীচীন মনে করতেন না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তার শিষ্যদের মধ্যেও এ নীতি প্রতিফলিত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত,

তিনি একদা ইকরামাকে (র) বললেন,

اذهب فافت الناس وانا لك عون فمن سالك عما يعنيه فافته ومن سالك عما لا يعنيه فلا تفته فانك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس،

"তোমাকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিলাম। এতে আমার সহযোগিতা তোমার জন্য অবারিত থাকবে। তবে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করবে। অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকবে। এতে দুই তৃতীয়াংশ মানুষের সমস্যা লাঘব করতে পারবে"।[৬২৯]

ফারাযদাক ইব্‌ন জাওয়াস বলেন, আমরা একদা শাহর ইব্‌ন হাওশাব এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ইকরামা উপস্থিত হলেন, আমরা শাহর ইব্‌ন হাওশাবকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি ইকরামা এর নিকট যেতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই। প্রত্যেক জাতির একজন মহা পণ্ডিত থাকে। আর এ গোলামটি হলেন এই উম্মতের পণ্ডিত ।[৬৩০]

আইয়ুব আল সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১ হি.) বলেন,

كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَرْحَلَ إِلَى عِكْرِمَةَ إِلَى أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ قَالَ: فَأَتَى يَعْنِي سُوقَ الْبَصْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى حِمَارٍ قِيلَ لِي: هَذَا عِكْرِمَةُ قَالَ: وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَمَا قَدَرْتُ عَلَى شَيْءٍ أَسْأَلُهُ عَنْهُ ذَهَبَتِ الْمَسَائِلُ مِنِّي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِ حِمَارِهِ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَأَنَا أَحْفَظُ ،

"ইকরামা এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আমার খুব ইচ্ছে ছিল। একদিন আমি বসারার বাজারে অবস্থান করছিলাম। এমন সময়ে গাধায় আরোহী একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। জানতে পারলাম, তিনি হচ্ছেন ইকরামা। তার চার পাশে মানুষ এতো বেশি ভীড় জমালো যে, আমি কাছে ঘেঁষে কিছুই জিজ্ঞেস

[৬২৮] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২১৯।

[৬২৯] মোস্তফা শিবলী, *আল মাদখাল ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল জামিয়া, ১০ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১১৯।

[৬৩০] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩২৮।

করতে পারলাম না। তবে আমি তার গাধার নিকটে দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং লোকজন তার নিকট যা প্রশ্ন করছিল তা মুখস্ত করতে লাগলাম"।[৬৩১]

ইকরামা এর ইন্তেকালের পর জোহরের নামায শেষে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অনেক মানুষের সমাগম হয়। লোকজনের মুখে মুখে এ কথা ভাসতে লাগলো যে, আজ সবচেয়ে বড় ফকীহ ও কবি ইন্তেকাল করেছেন। ইকরামা ছিলেন হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের একটি বিশাল সাগর।[৬৩২]

৪.২.৪. ইব্ন জুরাইজ (র) এর ইজতিহাদ

আবুল ওয়ালিদ আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন জুরাইজ ৮০ হিজরীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ। ইলমে কেরায়াত ও হাদীস শাস্ত্রের কিংবদন্তি ইমাম। দীর্ঘ ১৭ বছর আতা ইব্ন আবী রাবাহ এর নিকট তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর আমর ইব্ন দীনার এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং তার নিকট থেকে দীর্ঘ নয় বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুর রায্যাক আস সানআনি তার প্রধান শিষ্য। ইসলামী শরীয়তের বিবিধ শাখায় তার দক্ষতা ছিল সমসাময়িক ফকীহ ও মুজতাহিদদের নিকট একান্ত স্বীকৃত। এমনকি স্বীয় উস্তায প্রিয় শিষ্যের প্রশংসা করে বলেন, ইব্ন জুরাইজ আরবের জ্ঞানের রাজ্যের সম্রাট ও দিকপাল। ইমাম ইব্ন হিব্বান বলেন,

...كان من فقهاء اهل الحجاز وقرائهم و متقنيهم وكان يدلس،

"ইব্ন জুরাইজ আরবের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের একজন। তিনি ইলমে কেরায়াতেরও একজন মহান ও প্রাজ্ঞ ইমাম। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি তাদলিস করতেন"।[৬৩৩]

আবু যুরআ আর রাযী (২০০-২৬৪) বলেন, ، بخ ذَلِك من الأيمة

"মুসলিম বিশ্বের মহান ইমাম হিসেবে তিনি কতইনা চমৎকার"।[৬৩৪]

ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন, ইয়াহয়া ইব্ন সাইদ আল কাত্তান বলেন,

لَمْ يَكُنِ ابْنُ جُرَيْجٍ عِنْدِي بِدُونِ مَالِكٍ فِي نَافِعٍ،

"আমার নিকট ইব্ন জুরাইজ এর মর্যাদা নাফি এর নিকট ইমাম মালিক এর মর্যাদার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়"।

আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন,

لَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ أَعْلَمَ بِعَطَاءٍ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

"আতা ইব্ন আবী রাবাহ এর ইলম এর ধারক হিসেবে ইব্ন জুরাইজ এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই"।[৬৩৫]

---

[৬৩১] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২২১।

[৬৩২] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৪।

[৬৩৩] ইব্ন হিব্বান আল বুসতী, মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মুআজ, *আস সিকাত*, (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়্যাহ, তা/বি), খ. ৭, পৃ. ৯৩।

[৬৩৪] আল বাজি, আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইব্ন খালাফ ইব্ন সাদ, *আল তাদীলু ওয়াত তাজরীহ লিমান খাররাজা লাহুল বুখারী ফিস সহীহ*, সম্পাদনাঃ আবু লুবাবা হুসাইন, (রিয়াদঃ দারুল লিওয়া, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯০৪।

[৬৩৫] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *তারীখুল ইসলাম*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৯১৯।

ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন,

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وأبو خالد القرشي الفقيه أحد الاعلام،

"আবুল ওয়ালিদ আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন জুরাইজ এবং আবু খালিদ আল কুরাইশী মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের একজন"।

ইমাম যাহাবী আরো বলেন, ইব্ন জুরাইজ (র) ছিলেন জ্ঞানের মহাসাগর। তিনিই সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলামী শরীয়াকে সুবিন্যস্থ করেন। তালহা ইব্ন আমর আতা ইব্ন আবি রাবাহকে প্রশ্ন করেন, আপনার পর জ্ঞান আহরণের জন্য আমরা কার নিকট যাবো? তিনি উত্তর দিলেন,

"এই যুবক। অর্থাৎ ইব্ন জুরাইজ বেঁচে থাকলে তার নিকট যাবে"।[৬৩৬]

৪.২.৫. ইব্ন আবী মুলাইকা (র) এর ইজতিহাদ

আবু বকর ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন উবাইদিল্লাহ ইব্ন আবী মুলাইকা আত তাইমী একজন বিশিষ্ট তাবিঈ ও মুহাদ্দিস। আলী (রা) এর খেলাফতকালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর এর খেলাফতকালে তিনি তায়েফ এর কাযী ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। আয়িশা ও আসমা বিনতে আবী বকর, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। আতা ইব্ন আবি রাবাহ, আমর ইব্ন দীনার ও আইয়ুব আল সাখতিয়ানীসহ অনেক জলীলুল কদর তাবিঈ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি মক্কার মুফতী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আতা ইব্ন আবী রাবাহ এর সমপর্যায়ের ফকীহ ছিলেন।

ইমাম যাহাবী বলেন,

...كان عالمًا مفتيًا صاحب حديث وإتقان،

"ইব্ন আবী মুলাইকা তাবিঈদের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ মুফতী ও হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন"।[৬৩৭]

পরিচ্ছেদ- ৩
কূফা ও অন্যান্য অঞ্চলের মুজতাহিদ তাবিঈদের ইজতিহাদ

কূফায় ইজতিহাদ

তাবিঈদের একটি দল ইজতিহাদের বিধি-পদ্ধতি পুরোদমে প্রয়োগ করেন। তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের প্রতিটি বিধান বিবেকসম্মত। যা বান্দার কল্যাণের নিমিত্তে প্রণীত। এগুলো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীয়তের প্রতিটি বিধান প্রণয়নের পেছনে রয়েছে শরীয়তপ্রণেতার বিবিধ হিকমত ও নিগূঢ়

---

[৬৩৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩২৮।

[৬৩৭] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯০।

রহস্য। তারা প্রতিটি হুকুমের অন্তর্নিহিত কারণ ও রহস্য উদঘাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কূফার ফকীহগণ শরীয়তের বিধি-বিধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর প্রদত্ত শিক্ষা কাজে লাগান। তিনি ছিলেন হযরত উমার (রা) এর পদাঙ্ক অনুসারী। যার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا، وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا وَشِعْبًا، سَلَكْتُ وَادِيَ عُمَرَ وَشِعْبَهُ،

"যদি সকল মানুষ এক পথে চলে, আর উমার চলে ভিন্ন পথে, আমি উমার এর পথই অনুসরণ করব"।[৬৩৮]

কূফার অধিবাসীগণ উমার (রা) এর নিকট উপস্থিত হলে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দেন। কিন্তু শামের অধিবাসীদের তাদের উপর প্রাধান্য দেন। এতে কূফার অধিবাসীগণ বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি আমাদের উপর শামের অধিবাসীদের প্রাধান্য দিলেন? উত্তরে উমার (রা) বললেন,

يا أهل الكوفة أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم وقد أثرتكم بابن أم عبد،

"তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দিয়ে থাকলে তা তাদের দীর্ঘ সফরের কারণে। আর তোমাদেরকে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছি"।[৬৩৯]

উমার ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর অনুসারীগণ কূফায় ইজতিহাদ এর ক্ষেত্রে একটি যোগ্য ও দক্ষ কাফেলা গড়ে তোলেন। এ কাফেলার অন্যতম সিপাহসালার হলেন, আলকামা ইব্‌ন কাইস (র)। যিনি ইবরাহীম নাখায়ীর উসতায। শরীয়তের অন্যতম উৎস ইজতিহাদ যথাযথ মর্যাদায় বাস্তবায়নে কূফার ফকীহদের বিশেষ অবদান রয়েছে। কারণ আরবের বাইরে বিজিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ইরাকের অবস্থান ছিল সমীহপূর্ণ। এটি সাহাবায়ে কেরামের পরশধন্য একটি অনন্য মর্যাদাবান এলাকা। এখানে বেশিরভাগ মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামের আগমন ঘটে। ইরাক ছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর মজবুত ঘাঁটি। সুদূর খোরাসান পর্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকার বিজয় এখান থেকেই সূচিত হয়। জ্ঞানী-গুণী বেশিরভাগ সাহাবী এখানে নিজেদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। তদুপরি হযরত আলী (রা) এর খেলাফতকালে কূফা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। ইতোপূর্বে এ এলাকাটি যাদের আগমনে ধন্য হয়, তারা হলেন ,আবুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির, ইমরান ইব্‌ন হোসাইন, আবু মুসা আশআরি, মুগীরা ইব্‌ন শোবা প্রমুখ।

কূফার বহুমাত্রিক তাৎপর্যের পাশাপাশি শহরটি ছিল শিয়াদের উৎপত্তিস্থল। খারিজীদের মূলকেন্দ্র ও ফিতনা ফ্যাসাদের আবাসভূমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপপূর্বক জাল হাদীস রচনার ভয়ানক ষড়যন্ত্র এখান থেকে শুরু হয়। যার কারণে এখানকার ফকীহগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর শর্তারোপ করেন। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান এবং অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত ইরাকের জনগোষ্ঠীর ইসলামের নব-সভ্যতায় সন্তরণের কারণে এখানে নতুন নতুন সঙ্কটের উদ্ভব হয়। যার সমাধানে কূফার ফকীহগণ ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা ভবিষ্যতের সঙ্কট মোকাবেলায় এমন অনেক মাসআলা ইসতেম্বাত করেন, যা এখনো সংঘটিত হয়নি। তারা অনুমানপূর্বক অনেক শাখা মাসআলাও উদ্ভাবন করেন। শীর্ষস্থানীয় রাবীদের এখানে অবস্থানের কারণে ইলমে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডারও পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল। তবে হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্তারোপ ও অনির্ভরযোগ্যতার অভিযোগে অনেক হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়।[৬৪০]

---

[৬৩৮] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: কামাল ইয়ূসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৩, হাদীস নং- ৬৯৮৪।

[৬৩৯] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

[৬৪০] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

৪.৩.১. কূফার মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

কূফার মুজতাহিদ তাবিঈদের মধ্যে রয়েছেন, আলকামা ইব্ন কাইস আল নাখায়ী, আলকামার চাচা আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ আল নাখায়ী, আমর ইব্ন শারাহিল আল হামাদানী, মাসরুক ইব্নল আজদা আল হামাদানী, আবিদা আস সালমানী, সুলায়মান ইব্ন রবিয়া আল বাহিলী, যাইদ ইব্ন সওহান, সুআইদ ইব্ন গাফলা, হারিস ইব্ন কাইস আল জুফী, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ আল নাখায়ী, কাযী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, খাইসামা ইব্ন আবদির রহমান, সালামা ইব্ন সুহাইব, মালিক ইব্ন আমির, আবদুল্লাহ ইব্ন সাখবারাহ, যির্ ইব্ন হুবাইশ, খাল্লাস ইব্ন আমর, আমর ইব্ন মাইমুন আল আওদী, হাম্মাম ইবনুল হারিস, হারিস ইব্ন সুআইদ, ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া আল নাখায়ী, রবি ইবনুল খাইসাম, উতবা ইব্ন আল ফারকাদ, সিলা ইব্ন যুফার, শারীক ইব্ন হাম্বল, আবু ওয়ায়েল শাকীক ইব্ন সালামা, উবাইদ ইব্ন সালামা।[৬৪১]নিম্নে কূফার বিশিষ্ট তাবিঈদের ইজতিহাদ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

আলকামা ইব্ন কাইস আল নাখায়ী (র)

আবু শিব্ল আলকামা ইব্ন কাইস ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মালিক আন নাখায়ী রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আবু বকর ও উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আলী, উসমান ও ইব্ন মাসউদ (রা) এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করেন। ইবরাহীম নাখায়ী ও মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন তার প্রধান দুই শিষ্য। বেশি হাদীস বর্ণনার কারণে তিনি 'আলাকামা আর রাবী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলী ও ইব্ন মাসউদ (রা) এর পর তিনি ইমামত ও মুফতী পদে আসীন হন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জেনে নিতেন। আলকামা ছিলেন একজন ফকীহ, ইমাম ও সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতকারী। আলকামা বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত মজবুত। তিনি মানুষের মঙ্গলকামী ও অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। তিনি ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অনেকের মতে তার ইন্তেকালের সাল হলো ৬২।[৬৪২]

ইমাম যাহাবী তার প্রতিভাকে এভাবে চিত্রিত করেন। الإمام الحافظ المجوّد المجتهد الكبير

"আলকামা ছিলেন সুযোগ্য ও সুদক্ষ হাফিজুল হাদীস ও একজন মহান মুজতাহিদ"।[৬৪৩] আলকামা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

وَلاَزَمَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ حَتَّى رَأَسَ فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ وَتَفَقَّهَ بِهِ العُلَمَاءُ وَبَعُدَ صِيتُهُ،

"ইব্ন মাসউদ (রা) এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করার কারণে তিনি ইলম ও আমলে উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার নিকট থেকে আলিমগণ ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে"।[৬৪৪]

ইব্ন হাজার আসকালানী ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন (র) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

...كان أشبه الناس بعبد الله سمتا وهديا ،

"ইব্ন মাসউদ (রা) এর শিষ্যদে মধ্যে আলকামা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-আদর্শে ইব্ন মাসউদ (রা) এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে চলতেন"।[৬৪৫]

---

[৬৪১] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮।

[৬৪২] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১৪৩।

[৬৪৩] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৪।

[৬৪৪] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন,

ما أقرأ شيئًا ولا أعلمه إلا وعلقمة يقرؤه ويعلمه،

"আমি যা পড়ি ও জানি আলকামাও ঠিক তা পড়েন ও জানেন"।[৬৪৬]

কাবুস ইব্‌ন আবি যাবয়ান বলেন,

قُلْتُ لأَبِي لأَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَأْتِي عَلْقَمَةَ وَتَدَعُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَلْقَمَةَ وَيَسْتَفْتُوْنَهُ،

"আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে আলকামার কাছে কেন আসেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি অনেক সাহাবীকে আলকামার নিকট থেকে ফতোয়া জেনে নিতে দেখেছি"।

ইমাম শাবী বলেন,

كَانَ الفُقَهَاءُ بَعْدَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالكُوْفَةِ فِي أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ: عَلْقَمَةُ وَعَبِيْدَةُ وَشُرَيْحٌ وَمَسْرُوْقٌ،

"সাহাবায়ে কেরামের পর কূফার ফকীহদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর শিষ্যরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আলকামা, আবিদা আস সালমানি, শুরাইহ ও মাসরুক"।

নিম্নে আলকামা ইব্‌ন কাইস (র) এর ইজতিহাদ আলোচনা করা হলো, মুজতাহিদ ও ফকীহ আমর ইব্‌ন শুরাহবিলও ঠিক একই ইজতিহাদ করেন। আলকামা ইব্‌ন কাইস আসওয়াদকে এই মর্মে অসিয়ত করেন,

إذا أنا حضرت فأجلسوا عندي من يلقنني لا إله إلا اللهوأسرعوا بي إلى حفرتي ولا تنعوني إلى الناس فإني أخاف أن يكون ذلك نعيًا كنعي الجاهلية،

"তুমি যদি জানতে পারো যে, আমি মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়েছি, আমাকে কালিমার তালকিন করবে। আমার মৃত্যুর পর দ্রুত কাফন-দাফনের কাজ সমাপ্ত করে নিবে। জানাযায় শরিক হবার ব্যাপারে কাউকে খবর দেয়ার দরকার নেই। আমার আশঙ্কা হয়, কাফন-দাফনের জন্য প্রচার-প্রসার একদিন মৃত ব্যক্তির জন্য জাহিলী যুগের সম্মিলিতভাবে ডাকাডাকি করে কান্নাকাটি করার পর্যায়ে চলে যাবে"।[৬৪৭]

অনুরূপভাবে আমর ইব্‌ন শুরাহবিল আলকামকে অসিয়ত করেন যে, 'আমার মনে হয় আজ রাতেই আমি মৃত্যুবরণ করবো। আমার মৃত্যু পরবর্তী দাফন-কাফনপর্ব উপস্থিত ব্যক্তিরাই সেরে নেবে। সাধারণ মানুষের নিকট তার প্রচার করো না। কেননা এটি একটি জাহিলিয়্যাত অথবা জাহিলি প্রথা'। [৬৪৮]

মুসলমানদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণের নিমিত্তে মৃত্যুসংবাদ প্রচার একটি বৈধ কাজ। সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছেন। এ ব্যাপারে কারো নিকট থেকে নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উপর্যুক্ত তাবিঈদ্বয় বিষয়টি জায়েয হওয়া সত্ত্বেও তাতে বাধা প্রদান করেন। তারা এটাকে জাহিলী যুগের একটি খারাপ রসমের সঙ্গে তুলনা করেন। এ কথাটি সর্বজনবীদিত যে, অমুসলিমদের যে কোনো রসম-

---

[৬৪৫] আসকালানী, ইব্‌ন হাজার আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, সম্পাদনা: আদিল আহমাদ ও আলী মুহাম্মদ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ১০৬।

[৬৪৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৪।

[৬৪৭] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৮।

তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, (মিসরঃ মাতাবাআতুল মুসতাফা আল বাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ৩০৪, হাদীস নং- ৯৮৬।

[৬৪৮] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮৮।

রেওয়াজ সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। তাদের ইজতিহাদের ভিত্তি হলো, একটি মুবাহ তথা বৈধ কাজকে অতি গুরুত্বসহকারে পালন করা হলে তাতে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। আর এই অতিরঞ্জন এক সময় জাহিলী যুগের প্রথায় পর্যবসিত হয়।

ইবরাহীম আন নাখায়ী (র) এর ইজতিহাদ

আবু ইমরান ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন কাইস আন নাখায়ী ৪৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাসরুক, আলকামা, শুরাইহসহ অনেক জলীলুল কদর তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কূফায় অনেক সাহাবীর বসবাস থাকা সত্ত্বেও কারো থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেননি। [৬৪৯] ইবরাহীম নাখায়ী ইমাম আবু হানীফার শাইখ হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান এর উস্তায। ইজতিহাদে তার অসাধারণ যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবরাহীম নাখায়ী এর ইন্তেকালের পর ইমাম শাবী তার এক শিষ্যকে প্রশ্ন করেন,

أَدَفَنْتُم صَاحِبَكُم؟ قُلْتُ: نَعَمْ.قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا تَرَكَ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهَ مِنْهُ قُلْتُ: وَلاَ الحَسَنَ وَلاَ ابْنَ سِيْرِيْنَ قَالَ: نَعَمْ وَلاَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ وَلاَ مِنْ أَ هْلِ الكُوْفَةِ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الحِجَازِ و فِي رِوَايَةٍ: وَلاَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،

"তোমরা কী তোমাদের শাইখকে দাফন করে ফেলেছো? শিষ্যটি বললেন হ্যাঁ, শাবী বললেন, আমি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও ফকীহ আর কাউকে দেখিনি। শিষ্যটি আবার প্রশ্ন করলেন, তিনি কি হাসান বাসারী ও ইব্‌ন সিরীন এর চেয়েও বেশি জ্ঞানী ? শাবী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। বাসারা, কূফা, হিজায এমনকি শামেও তার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই"। [৬৫০]

ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল। আমাশ থেকে বর্ণিত আছে, ইবরাহীম নাখায়ী ছিলেন (صيرا في الحديث) হাদীস এর খাজাঞ্চী। [৬৫১]

ইমাম যাহাবী তাকে এভাবে মূল্যায়ন করেন,

- وَكانَ مُفْتِيَ أَهْلِ الكُوْفَةِ هُوَ وَالشَّعْبِيُّ فِي زَمَانِهِمَا وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً، فَقِيْهاً،

"ইবরাহীম নাখায়ী ও শাবী দুইজন ছিলেন তৎকালীন যুগে কূফার মুফতী । তিনি সজ্জন ও ফকীহ ছিলেন"।[৬৫২]

ইবরাহীম নাখায়ী এর উদ্ভাবিত নীতিমালা ও মাযহাব থেকেই হানাফী মাযহাবের উদ্ভব হয়। তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ এর অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আত্মগোপনরত অবস্থায় ৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৬৫৩]

ইব্‌ন আবি হাতিম আসিম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

كان الرجل يأتي أبا وائل يستفتيه فيقول اذهب إلى إبراهيم فسله ثم أخبرني بما قال لك عن الأعمش قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا وجدت عنده منه أصلا قال علي بن المديني كان إبراهيم

---

[৬৪৯] ইজলী, আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, *মারিফাতুস সিকাত*, (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৩।

[৬৫০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫২৭।

[৬৫১] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ২১৯।

[৬৫২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫২৬।

[৬৫৩] আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১৪৪।

عندي من أعلم الناس بأصحاب عبد الله وأبطنهم به حدثنا عبد الرحمن سمعت أبا زرعة يقول إبراهيم النخعي عالم من أعلام أهل الإسلام وفقيه من فقهائهم،

"লোকজন আবু ওয়ায়িল এর নিকট বিভিন্ন মাসআলা জানার জন্য আগমন করতো। তিনি বলতেন, ইবরাহীম নাখায়ী এর নিকট যাও। তিনি কী জবাব দেন তা আমাকে জানাবে। আমাশ বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী এর নিকট প্রশ্ন করলে আমি আসল বিষয়টা জানতে পারি। আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ এর ছাত্রদের মধ্যে তার রহস্যজ্ঞান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ইবরাহীম নাখায়ী। আবু যুরআ বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী ইসলামের শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং ফকীহদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ"।[৬৫৪]

নিম্নে ইবরাহীম নাখায়ী এর ইজতিহাদকৃত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো,

হালওয়ান ও কাদিসিয়া অঞ্চলের ভূমির ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গ

উল্লিখিত এলাকা দুটি এমন কতিপয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যা মুসলমানদের জন্য 'ফাই'[৬৫৫] হিসেবে গণ্য। আফ্রিকা ও তার পার্শ্ববর্তী কতিপয় এলাকায় রয়েছে সর্বসাধারণের অধিকার। পূর্ববর্তী খলীফাদের শাসনামল থেকে এভাবেই চলে আসছে। উমাইয়া শাসনামলে যার ব্যতিক্রম ঘটে। তারা সাধারণ মুসলমানদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাতে বেচা-কেনার প্রক্রিয়া চালু করে। হালওয়ান ও কাদিসিয়া এলাকায় যখন ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়ে গেলো ইবরাহীম নাখায়ী ইজতিহাদপূর্বক সে এলাকার ভূমির বেচা-কেনা নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া প্রদান করেন। ইব্‌ন জারীর তাবারী 'তারীখুল রুসুল ওয়াল মুলুক' নামক ইতিহাস গ্রন্থে তার বর্ণনা প্রদান করেন।

وَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ غَدًا إِفْرِيقِيَّةَ فَلَكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ نَفْلًا،

"উসমান (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাদকে বলেন, যদি আগামীতে আপনি আফ্রিকা বিজয় করেন তবে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা 'ফাই' হিসেবে যা দান করেছেন তা থেকে গনিমত হিসেবে তার এক পঞ্চমাংশ পাবেন"।[৬৫৬]

অলংকৃত তরবারি ও পাথরবিশিষ্ট রূপার আংটি যে কোনো মূল্যে বেচা-কেনা প্রসঙ্গ

ইবরাহীম নাখায়ীর ইজতিহাদকৃত মাসআলাসমূহের মধ্যে একটি মাসআলা হলো, যে রূপার আংটির উপর পাথর সংযুক্ত রয়েছে, তা কম-বেশি যে কোনো মূল্যে বেচা-কেনা করা জায়েয। আংটি এবং পাথর এর মূল্যের মধ্যে সমতা থাকা শর্ত নয়। অলংকৃত তরবারির বিধানও তাই। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ীর শিষ্য ইমাম আবু হানীফা (র) উস্তাযের বিরোধিতা করে বলেন, বিক্রিত মূল্য আংটির রূপার মূল্যের চেয়ে বেশি না হলে তা বিক্রি করা জায়েয হবে না। এখানে বর্ধিত মূল্যটি পাথরের বলে বিবেচিত হবে। তেমনিভাবে

---

[৬৫৪] ইব্‌ন আবি হাতিম, আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস, *আল জারহু ওয়াত তাদীল*, (ভারত: দায়িরাতুল মাআরিফ, ১২৭১ হি./১৯৫২ খি.), খ. ২, পৃ. ১৪৪।

[৬৫৫] অমুসলিম যোদ্ধাদের নিকট থেকে মুসলমানগণ বিনাযুদ্ধে যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'ফাই' বলে ।

[৬৫৬] তাবারী, ইব্‌ন জারির, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, *তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, (দারু হিজরাহ লিত তাবাআহ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৫২।

অলংকৃত তরবারির মূল্য তার মূল্যের চেয়ে বেশি না হওয়া পর্যন্ত ঐ তরবারির বেচা-কেনা জায়েয হবে না[৬৫৭]।

ইবরাহীম নাখায়ী এর নিকট এই মর্মে একটি ফতোয়া তলব করা হলো যে, 'জনৈক ব্যক্তির গৃহে রাত্রে একজন ব্যক্তি আগমন করে মৃত্যুবরণ করে। গৃহকর্তার পরিবারের পক্ষে এ দাবি উত্থাপন করা হলো যে, আগন্তুক ব্যক্তি গৃহকর্তাকে শত্রুতাবশত হত্যা করতে এসেছে। যার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইবরাহীম নাখায়ী ফতোয়া দিলেন, নিহত ব্যক্তি দুস্কৃতকারী স্বভাবের হলে তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়েরপূর্বক কিসাস (দণ্ডবিধি) বাতিল হয়ে যাবে এবং দিয়ত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। যদি নিহত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় এবং ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকে, তবে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। যদি গৃহকর্তার পক্ষে এমন দাবি করা হয় যে, গৃহকর্তার স্ত্রীকে জোরর্পূক ব্যভিচাররত অস্থায় দেখার কারণে আগন্তুক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। ইবরাহীম নাখায়ী এর জবাবে বলেন, যদি আগন্তুক ব্যক্তি দুস্কর্মপ্রবণ হয় এবং তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ থাকে, তবে কিসাস বাতিল হয়ে যাবে এবং দিয়ত বা রক্তমূল্য ওয়াজিব হবে। যদি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকে এবং সৎকর্মশীল হিসেবে পরিচিত হয়, তাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে।

এখানে ইবরাহীম নাখায়ী কিসাস (দণ্ডবিধি) ও দিয়ত (রক্তপণ) প্রয়োগের ব্যাপারে কোনা ধরনের সাক্ষী কিংবা দলীল-প্রমাণের শর্তারোপ করেননি।

দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোনো অপরাধ সাব্যস্থ হতে পারে না। এ ব্যাপারে শরীয়তের মূল দলীল হলো, 'দাবিদারকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে আর অস্বীকারীকে শপথ করতে হবে'। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী জন-স্বার্থ বিবেচনায় কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া ফতোয়া প্রদান করেন।[৬৫৮]

হাম্মাদ ইব্ন আবি সুলায়মান (র)

হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান এর জন্ম ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ আশআর গোত্রে । তার পিতা মুসলিম ছিলেন আবু মুসা আশআরী (রা) এর পুত্র ইবরাহীম এর আযাদকৃত গোলাম। তার জন্ম ও মৃত্যুসাল সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইমাম যাহাবীর বর্ণনা মতে তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইব্ন সাদ এ বিষয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদদের ঐকমত্য বর্ণনা করেন। তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৬৫৯]

হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান স্বীয় জন্মভূমি কূফা ছাড়াও মক্কা, মদীনা ও বসারার জলীলুল কদর তাবিঈদের নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আতা ইব্ন আবি রাবাহ, মুজাহিদ ইব্ন জাব্র ও ইবরাহীম আন নাখায়ী ছিলেন তার প্রধান শাইখ। ইমাম আবু হানীফা (র) ও সুফ্য়ান সাওরী ছিলেন তার প্রধান শিষ্য। তিনি হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তাফসীর, সিরাত ও কালামসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান ছিলেন ফিক্হ শাস্ত্রে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ট ইমাম। এমনকি ফকীহ শব্দটি তার নামের অংশ ও উপাধি হিসেবে গণ্য হয়েছে। ফিক্হ শাস্ত্রে তার অবদানের এতই জনশ্রুতি ছিল যে, অনেকে বলেছেন, হাম্মাদ

[৬৫৭] ইব্ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন সাদ, *আল মুহাল্লা বিল আসার*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, তা/বি), খ. ৮, পৃ. ৪৯৫।

[৬৫৮] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৮০।

[৬৫৯] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৩৩।

ইব্‌ন আবী সুলায়মান এর জন্ম না হলে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের সঙ্গে অপরিচিত থেকে যেতো।[৬৬০]

ইমাম যাহাবী (র) তার প্রতিভার মূল্যায়ন করে বলেন,

الْعَلاَّمَةُ الإِمَامُ فَقِيْهُ الْعِرَاقِ رَوَى عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ وَتَفَقَّهَ بِإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَهُوَ أَنْبَلُ أَصْحَابِهِ وَأَفْقَهُهُم وَأَقْيَسُهُم وَأَبْصَرُهُم بِالْمُنَاظَرَةِ وَالرَّأْيِ،

"হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী, মুসলিম উম্মাহ'র ইমাম ও ইরাকের ফকীহ। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইবরাহীম নাখায়ী থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের দরস গ্রহণ করেন। তিনি ইবরাহীম নাখায়ী এর শাগরিদগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ফকীহ হিসেবে গণ্য হতেন। কিয়াস সম্পর্কে তিনি ছিলেন অধিকতর পারঙ্গম। তর্কবিদ্যা ও রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ"।[৬৬১]

ইমাম যাহাবী হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান (র) এর পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলেন,

ثقة إمام مجتهد كريم جواد قال أبو إسحاق الشيباني هو أفقه من الشعبي قلت لكن الشعبي أثبت منه،

"তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ইমাম, মর্যাদাবান ও দানশীল ব্যক্তি। আবু ইসহাক আল শায়বানী বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান ইমাম শাবী থেকেও অধিকতর ফকীহ। তবে হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য"।[৬৬২]

হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান স্বীয় উস্তায ইবরাহীম নাখায়ী ও আলকামাহ এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের যে সনদ লাভ করেন, তার মূল উৎস ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এই চারটিই ছিল তার মাযহাবের মূলনীতি। তিনি ইসলামী শরীয়তের প্রথম তিনটি উৎসের অবর্তমানে কিয়াস দ্বারা ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি কখনো কিয়াসকে ঐ তিনটির উপর প্রাধান্য দিতেন না। নিম্নে তার প্রদত্ত ফতোয়ার দুটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

মৃত ব্যক্তির নখ কর্তনের বিষয়টি তৎকালীন সময়ের মুজতাহিদগণের মধ্যে ছিল একটি আলোচনার বিষয়। ইব্‌ন আবি শায়বা বর্ণনা করেন, হাসান বাসারী এর মতে মৃত ব্যক্তির নখ নিয়মবহির্ভূত বর্ধিত হয়ে গেলে তা কেটে ফেলা মুস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে তিনি মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছন্নতার দিকটি প্রাধান্য দেন। পরবর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের মধ্যে বিষয়টি একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা হিসেবে পরিগণিত হয়। ইমাম শাফিঈ (র) থেকে এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা (র) এর মাযহাবে মৃত ব্যক্তির নখ, বগল ও নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম কর্তন করা মাকরূহ। তারা এ কাজটি মৃত ব্যক্তির জন্য অমর্যাদাকর ও অঙ্গ কর্তনের শামিল বলে মনে করেন। উপরন্তু নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম কর্তনে সতর খোলা ও তা দেখার প্রয়োজন হয়, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস শুবা (র) ইমাম হাম্মাদ এর নিকট মাসআলাটি জানতে চাইলেন। তিনি নেতিবাচক উত্তর দিয়ে বলেন, 'যদি মৃত ব্যক্তি খতনাবিহীন হয়, তাকে কি খতনা করানো যাবে'? ইব্‌ন আবি শায়বার বর্ণনাটি নিম্নরূপ-[৬৬৩]

---

[৬৬০] হাজীলী, ঈদ ইব্‌ন সাফার ইব্‌ন মুসফির, *ফিকহু হাম্মাদ ইব্‌ন আবি সুলায়মান জামআন ওয়া দিরাসাতান*, (মদীনাঃ আল জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৭০।

[৬৬১] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৩১।

[৬৬২] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *আল কাশিফ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আওয়ামা আহমাদ মুহাম্মদ, (জিদ্দাঃ মুয়াস্‌সাসাহ উলুমিল কুরআন, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৯ ।

[৬৬৩] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, মুসান্নাফ, সম্পাদনাঃকামাল ইয়ূসুফ আল হুত, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং- ১০৯৪৬।

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ؟

হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান মৃত ব্যক্তির নখ কাটার বিষয়টি তার খতনা করার উপর কিয়াস করেছেন। নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম কর্তন করা এবং খতনা করা ইসলামের ফিতরাত তথা দায়েমী সুন্নাহ এবং সমান গুরুত্ববহ। যদি মৃত ব্যক্তির খতনা করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত না হয়, নখ কাটাও তার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান কিয়াসের আলোকে যে ইজতিহাদ করেছেন তার আর একটি উদাহরণ হলো, পাওনাদারের নিকট প্রাপ্ত ঋণ পৌঁছে দেয়ার পূর্বে যদি মাল হারিয়ে যায় ঐ ঋণ মাফ হবে না। তিনি মাসআলাটি যাকাতের উপর কিয়াস করেছেন। কোনো ব্যক্তি যাকাত আদায় করার জন্য যাওয়ার পথে যাকাতের মাল হারিয়ে গেলে, যাকাত আদায় থেকে ঐ ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না। এ বিষয়ে আবদুর রায্যাক সানআনী হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ،

"হাসান বাসারী থেকে বর্ণিত, যাকাত আদায়ের জন্য যাওয়ার পথে ঐ মাল চুরি হয়ে গেলে, তার জরিমানা আদায় করতে হবে। সুফ্য়ান সাওরী বলেন, হাম্মাদ ইব্ন আবি সুলায়মানও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন।[৬৬৪]

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)

আবু আবদিল্লাহ সাইদ ইব্ন জুবাইর ইব্ন হিশাম আল আসাদী একজন জলীলুল কদর ফকীহ তাবিঈ, মুফাসসির ও কারী। তিনি ৪৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ও আয়িশা (রা) এর নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন আইয়ুব আল সাখতিয়ানী, হাম্মাদ ইব্ন আবি সুলায়মান, সুলায়মান আল আমাশ প্রমুখ।[৬৬৫]

তিনি কূফাবসীদের ইমাম ও শিক্ষাগুরু হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্বপালন করেন এবং বনু উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে হাজ্জাজ ইব্ন ইয়ূসুফ এর বাহিনীর হাতে ৯৫ হিজরীতে শাহাদত করণ করেন। সাইদ ইব্ন জুবাইর স্বীয় উস্তাযদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর নিকট তিনি ছিলেন খুবই আস্থাভাজন। একদা তার উদ্দেশে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সাইদ! তুমি হাদীস বর্ণনা করো। সাইদ ইব্ন জুবাইর বললেন, আপনার সামনে আমি কী হাদীস বর্ণনা করবো? আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার উপস্থিতিতে তোমার হাদীস বর্ণনার সৌভাগ্য আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। তুমি সঠিকভাবে বলতে পারলে খুব ভালো। আর অশুদ্ধ হলে আমি শোধরে দেবো।[৬৬৬]

সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশাতেই তিনি পরবর্তী যুগের মুসলমানদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। উস্তাযগণ তাকে উপযুক্ত শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর উপস্থিতিতে তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দেয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। ইব্ন সাদ বর্ণনা করেন,

كان عبدالله بن عبَّاس بعدما عَمِيَ إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه، قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني سعيد بن جُبَير،

---

[৬৬৪] সানআনী, আবু বকর, আবদুর রায্যাক, *মুসান্নাফ*, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), পৃ ৩৬৮, খ.4, হাদীস নং- ৬৯৩৮।

[৬৬৫] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩২২।

[৬৬৬] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৬. পৃ, ২৬৭।

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) অন্ধ হয়ে যাবার পর কূফার কিছু লোক তার নিকট কতিপয় বিষয় জানতে আসলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের নিকট উম্মু দাহমা এর পুত্র অর্থাৎ সাইদ ইব্‌ন জুবাইর থাকতে আমার নিকট আসার কী প্রয়োজন"?[৬৬৭]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) সাইদ ইব্‌ন জুবাইর এর ফিকহী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সাইদ ইব্‌ন জুবাইর স্বয়ং বর্ণনা করেন,

جاء رجلٌ إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال: ائتِ سعيد بن جُبَير فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض،

"জনৈক লোক আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) এর নিকট ফারায়েজ সম্পর্কীয় একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বললেন, সাইদ ইব্‌ন জুবাইর এর নিকট যাও। তিনি গণিত শাস্ত্রে আমার চেয়ে ভালো। ফারায়েজ সম্পর্কে আমি যা বলবো তিনিও তাই বলতে পারবেন"।[৬৬৮]

আবু নুআইম ইস্পাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.) বর্ণনা করেন, সাইদ ইব্‌ন জুবাইর ছিলেন ফকীহদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ফিক্‌হ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।[৬৬৯]

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বর্ণনা করেন,

وكان سعيد من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع وغيرها من صفات أهل الخير،

"সাইদ ইব্‌ন জুবাইর ছিলেন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয়। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, ইবাদত, বুজুর্গী ও পরহেযগারীসহ সকল প্রকার ভালো গুণে সবার শীর্ষে"।[৬৭০]

আমর ইব্‌ন মায়মুন স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

لقد مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه،

"সাইদ ইব্‌ন জুবাইর ইন্তেকাল করেছেন। পৃথিবীর সকল ব্যক্তি তার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিল"।[৬৭১]

মাসরুক ইবনুল আজদা (র)

মাসরুক ইবনুল আজদা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমাইয়া একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পিতা আজদাও মুসলমান ছিলেন। মাসরুক অর্থ চুরিকৃত। জীবনীকার ইজলি (র) (১৮২-২৬১ হি.) বর্ণনা করেন, শৈশবকালে মাসরুক চুরি হয়ে যায়। যার কারণে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীক, উমার, উসমান, আলী, মুআয ইব্‌ন জাবাল, খাব্বাব ইব্‌নুল আরাত, আয়িশা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। শাবী, ইবরাহীম নাখায়ী, ইব্‌ন সিরীন ও মাকহুল তার প্রধান প্রধান

---

[৬৬৭] প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৮।

[৬৬৮] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৬৯।

[৬৬৯] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৩।

[৬৭০] নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইব্‌ন শরফ, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২১৬।

[৬৭১] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৯৭ খৃ.), খ. ৪, পৃ. ২৭২।

শিষ্য। মাসরুক আয়িশা (রা) এর দরবারে বেশি সময় কাটাতেন। যার কারণে আয়িশা (রা) মাসরুককে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন।[৬৭২]

قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا مَسْرُوْقُ إِنَّكَ مِنْ وَلَدِي وَإِنَّكَ لَمِنْ أَحَبِّهِم إِلَيَّ،

"আয়িশা (রা) বলেন, হে মাসরুক! তুমি আমার প্রিয় সন্তানতুল্য এবং আমার একান্ত প্রিয় ব্যক্তি"। ইমাম শাবী (২১-১০০ হি.) বর্ণনা করেন,

كَانَ مَسْرُوْقٌ أَعْلَمَ بِالفَتْوَى مِنْ شُرَيْحٍ وَكَانَ شُرَيْحٌ أَعْلَمَ بِالقَضَاءِ مِنْ مَسْرُوْقٍ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَشِيْرُ مَسْرُوْقاً وَكَانَ مَسْرُوْقٌ لاَ يَسْتَشِيْرُ شُرَيْحاً،

"মাসরুক ফতোয়াসংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ থেকে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। তবে শুরাইহ বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে মাসরুক এর চেয়ে বেশি জ্ঞাত। শুরাইহ মাসরুক থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কিন্তু মাসরুক শুরায়হ (র) থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন না"। [৬৭৩]

মাসরুক এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার উভয় পা ফুলে যেতো। কাদিসিয়ার যুদ্ধে আহত হবার কারণে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। উসমান (রা) এর শাহদাতের পর ফিতনা থেকে পরিত্রান পাওয়ার লক্ষ্যে একাকিত্ব জীবনকে প্রধান্য দেন এবং হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ৬২ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন।[৬৭৪] ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন মুকূটহীন সম্রাট। জ্ঞান অর্জনই ছিল তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ইজতিহাদ ও বিচার ব্যবস্থা ছিল তার অনুসন্ধিৎসার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলতেন, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে একদিন ইজতিহাদে সময় ব্যয় করা আমার নিকট এক বছর জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয়। ইবরাহীম নাখায়ী (৪৭-৯৬ হি.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর শিষ্যদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন তারা চার জন। আলকামা, আসওয়াদ, আবিদা ও মাসরুক। ইমাম যাহাবী শাবী থেকে বর্ণনা করেন,

مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً كَانَ أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ مِنْ مَسْرُوْقٍ،

"পৃথিবীর চতুষ্প্রান্তে মাসরুক এর চেয়ে অধিক জ্ঞানপিপাসু আমি দেখিনি"।[৬৭৫]

নিম্নে সন্তান কুরবানী করার মানত করা প্রসঙ্গে মাসরুক এর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো,

কোনো ব্যক্তি যদি এই মর্মে মানত করে যে, সে তার সন্তান কুরবানী করবে। এ ক্ষেত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) এর ইজতিহাদ হলো, তাকে একশ উট কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু তাবিঈ মাসরুক ইবনুল আজদা এর অভিমত হলো, তাকে একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে। মাসরুক ইজতিহাদ করে বলেন, কোনো ব্যক্তির সন্তান ইসমাঈল (আ) থেকে উত্তম হতে পারে না। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে (আ) কুররবানী করার মানত করলে আল্লাহ তায়ালা তার পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি বকরী পাঠিয়ে দেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি স্বীয় সন্তান কুরবানী করার মানত করলে তাকে কেবলমাত্র একটি বকরীই কুরবানী করতে হবে।[৬৭৬]

---

[৬৭২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৬৬।

[৬৭৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৬৫।

[৬৭৪] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪।

[৬৭৫] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৫।

[৬৭৬] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, (দামেস্ক: দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৪।

আবিদা ইব্ন কাইস আস সালমানী (র)

আবিদা ইব্ন আমর ইব্ন কাইস আস সালমানী আল মুরাদী কূফায় বসবাসকারী একজন জলীলুল কদর তাবিঈ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের দুই বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইব্ন মাসউদ ও আলী (রা) এর প্রধান শিষ্য। ইমাম যাহাবী জীবনীকার ইজলি (র) এর বরাতে বর্ণনা করেন,

كَانَ عَبِيْدَةُ أَحَدَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ الَّذِيْنَ يُقْرِئُوْنَ وَيُفْتُوْنَ وَكَانَ أَعْوَرَ،

"আবিদা সালমানী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম। যারা ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শিক্ষক ও মুফতী। তিনি ছিলেন অন্ধ"।[৬৭৭]

ইবরাহীম নাখায়ী, শাবী, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন ও আবু ইসহাক তার নিকট ফিক্হ ও হাদীসের দরস গ্রহণ করেন। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য। ইমাম শাবীর বর্ণনা মতে তিনি বিচারকার্যে কাযী শুরাইহ এর সমতুল্য। আয়মান বিনতে আবদুর রহমান আল যুম্মান আবিদা আল সালমানীকে ফিক্হ, ফতোয়া ও কিরায়াত শাস্ত্রে কূফার শ্রেষ্ঠ তাবিঈ বলে অভিহিত করে বলেন,

ورأسِ الفقه والإفتاء والإقراء بالكوفة ألا وهو عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ رحمه الله،[৬৭৮]

'আবিদা ইব্ন কাইস ৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। নিম্নে তার ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা বর্ণনা করা হলো। ইব্ন সাদ (র) (১৬৮-২৩০ হি.) বর্ণনা করেন,

دَعَا عَبِيدَةُ بِكُتُبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَمَحَاهَا وَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَلِيَهَا أَحَدٌ بَعْدِي فَيَضَعُوهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ،

"আবিদা ইব্ন কাইস মৃত্যুর সময় তার লিখিত অনেক বই-পুস্তক এর লেখা এই বলে মুছে দেন যে, আমার লিখিত গ্রন্থাবলি হয়তো এমন কারো হাতে পৌছঁবে, যাদের নিকট এগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম ভালোভাবে বোধগম্য হবে না। সাধারণ মানুষ এগুলোকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করবে।[৬৭৯]

অথচ এ বিষয়টি সর্বজনবীদিত যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকে অনেক উপাদেয় বিষয় সন্নিবেশিত থাকে, যা জ্ঞানার্জনের জন্য উপকারী। দীনের প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি লেখকের জন্য তা অনেক নেকির কারণ হয়। এতদসত্ত্বেও মুজতাহিদ আবিদা ইব্ন কাইস এ আশঙ্কায় কিতাবগুলো মুছে ফেলেন যে, অনেকেই এগুলোর ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হবে না, অনেক ক্ষেত্রে তার অশুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হবে, যা বিভিন্ন ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ হতে পারে এবং মুসলিম জাতির নানাবিধ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণ অর্থে কোনো বিশুদ্ধ বই-পুস্তক ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ হতে পারে না। বই-পুস্তক হলো জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাটি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক। দীনের প্রচার-প্রসারের উত্তম সহায়ক। কিন্তু উপর্যুক্ত মুজতাহিদ হয়তো এমন কোনো পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিলেন, যার পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বইগুলো অনেকের গোমরাহীর কারণ হতে পারে। যার কারণে তিনি বইগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন ।

---

[৬৭৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪১।

[৬৭৮] আয়মান বিনতে আবদুর রহমান আয যুম্মান, *আকওয়ালু আবীদা আস সালমানী ফিত তাফসীর*, (সউদি আরবঃ জামিয়া মুহাম্মদ ইব্ন সাউদ, ১৪৩৭ হি./ ২০১৬ খ্রি.), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[৬৭৯] ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৬, পৃ.৯৪।

আমির আল শাবী (র)

আবু আমর আমির ইব্ন শারাহিল আল শাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাসনামলে ২১ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জলীলুল সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং শীর্ষস্থানীয় তাবিঈগণ তার নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের দরস লাভ করেন। তার স্মরণশক্তি এতো মজবুত ছিল যে, তিনি কখনো কোনো কিছু লিখে রাখতেন না। ইমাম আবু হানীফা (র) তার নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তিনি ১০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইলম, আমল, তাকওয়াসহ সার্বিক বিবেচনায় শাবী ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের যোগ্য উত্তরসূরী ও আদর্শ মুখপাত্র এবং পরবর্তী প্রজন্মের আশ্রয়স্থল। খতীব বাগদাদী মুসলিম উম্মাহ'র নেতৃস্থানীয় ইমামদের ফিরিস্থি বর্ণনার ধারাবাহিকতায় শাবীকে তালিকাভুক্ত করে বলেন,

كان عمر في زمانه رأس الناس وهو جامعٌ وكان بعده ابن عباسٍ في زمانه وكان بعده الشَّعبي في زمانه وكان بعده الثوري في زمانه ثم كان بعده يحيى بن آدم،

"সাহাবায়ে কেরামের যুগে উমার (রা) ছিলেন যুগের অবিসংবাদিত ইমাম। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুনান্বিত। পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস উমার (রা) এর শুন্য আসন অলংকৃত করেন। ইব্ন আব্বাস এর পর শাবী তার প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তী যুগে সুফ্য়ান সাওরী যুগের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন। তৎপরবর্তী সময়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ইয়াহয়া ইব্ন আদম"।[৬৮০]

ইসলামী শরীয়তের বিবিধ শাখায় গভীরতা অর্জনের কারণে মুসলমানগণ তার নিকট পঙ্গপালের মতো ছুটে যেতো। তার দরস থাকতো সর্বদা লোকারণ্য ও প্রাণবন্ত। ইমাম শাবীর বিশিষ্ট শাগরিদ মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন বলেন,

قدمت الكوفة وللشعبي حلقةٌ عظيمةٌ والصحابة يومئذٍ كثيرٌ،

"আমি কূফা আগমন করার পর দেখলাম। শাবীর দরসে প্রচুর লোকজনের ভিড়। অথচ অনেক সাহাবায়ে কেরাম তখনো জীবিত ছিলেন"।[৬৮১]

খতীব বাগদাদী ইব্ন শিহাব যুহরী এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের পর চার জন আলিম ছিলেন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মদীনায় সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, বাসারায় হাসান বসরী, কূফায় শাবী ও শামে মাকহুল (র)। আবু বকর আল হুযালীকে মাকহুল উপদেশ দিয়ে বলেন, তুমি কূফা সফর করলে শাবী থেকে অধিকহারে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করবে। কেননা তিনি এমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান করতেন। ইব্ন সাদ মাকহুল শামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ সম্পর্কে শাবীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। আবু নুআইম ইস্পাহানী উসমান ইব্ন আসিম এর বরাতে বলেন,

ما رأيت أحدًا قط كان أفقَهَ مِن الشَّعبي،

"শাবীর চেয়ে ফিক্হ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি"।[৬৮২]

নিম্নে শাবীর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো,

কূফার বিশিষ্ট মুজতাহিদ ও কাযী দের মধ্যে আমির ইব্ন শারাহিল অন্যতম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মতের বাইরে সাধারণত ইজতিহাদ করতেন না। ঈসা আল খাইয়াত বলেন, জনৈক ব্যক্তি শাবীর নিকট

---

[৬৮০] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১৪৩।

[৬৮১] ইব্ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২৫, পৃ. ৩৫৭ ।

[৬৮২] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩১০।

একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ এ মাসআলায় এভাবে সমাধান দিয়েছেন। লোকটি বলল, এ বিষয়ে আপনার মতামত পেশ করুন। শাবী বললেন, আশ্চর্য! আমি জলীলুল কদর সাহাবী ইব্ন মাসউদ (রা) এর মতামত বর্ণনা করছি। আর তুমি আমার মত জানতে চাও।[৬৮৩] তিনি আরো বলেন, কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের সমাধান পাওয়া গেলে তাই গ্রহণ করবে। তাদের সিদ্ধান্তের বাইরে কারো উক্তি পাওয়া গেলে তা কখনো গ্রহণ করবে না। তিনি যথাসম্ভব নিজস্ব মতামত পেশ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন। শাবীকে জনৈক লোক প্রশ্ন করল, আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরে আপনি (لا أدري) 'জানি না' বলে উত্তর দেন। যাতে আমরা বেশ লাজ্জিত হয়। উত্তরে তিনি বলেন, ফেরেশতাদের কোনো বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করলে তারা জবাব দেন,

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [البقرة: 32]

ফেরশেতারা না জানাকে দোষণীয় মনে করেন না। আমি জানি না বললে আপত্তি কীসের? ইব্ন বাহরাম বলেন, কোনো ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তে শাবীর অবস্থানে পৌঁছলে (لا أدري) 'আমি জানি না' বলতে সঙ্কোচবোধ করে না। নিম্নে ইমাম শাবীর বিচার ফায়সালা সংক্রান্ত একটি ইজতিহাদী মাসআলা আলোচনা করা হলো।

ইমাম শাবীর বিচারালয়ে একজন মুসলিম ও একজন খ্রিস্টান পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। জনৈক খ্রিস্টান একজন মুসলিমের উপর যেনা করার মিথ্য অপবাদ আরোপ করে। তেমনিভাবে একজন মুসলিম জনৈক খ্রিস্টানের বিরুদ্ধেও তেমন অপবাদ আরোপ করে। মুজতাহিদ আমির ইব্ন শারাহিল মুসলিম এর উপর অপবাদ দেয়ার কারণে খ্রিস্টানকে দুইশত বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু মুসলিম এর উপর কোনো দণ্ড আরোপ করেননি। তিরি রায় ঘোষণাপূর্বক বলেন, খ্রিস্টানের মধ্যে এর চেয়েও বড় অপরাধ সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজমান। তাহলো শির্ক।[৬৮৪]

তার ইজতিহদকৃত আরেকটি মাসআলা হলো, একজন বালকের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করা হয় যে, বালকটি একজন বালিকার কান কেটে দিয়েছে।আমির ইব্ন শারাহিল এর দরবারে এ অভিযোগ দায়ের হলে তিনি বালকের নিকট অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চান। বিচারকের সামনে বালকটি তার অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু মুজতাহিদ বিচারক বালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।[৬৮৫]

ফিক্হ শাস্ত্রে তার ইজতিহাদী প্রতিভা ও ধী-শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সাহাবী ও তাবিঈদের পারস্পরিক মতপার্থক্যসহ ফিকহী মাসআলা ছিল তার নখদর্পনে। ফকীহ-মুজতাহিদগণ হাজ্জাজ ইব্ন ইয়ূসুফ কর্তৃক বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হবার প্রাক্কালে একদিন ইমাম শাবী তার রোষাণলের শিকার হন। কিন্তু তার জ্ঞান-গভীরতা ও ফিকহী বিচক্ষণতার কারণে তিনি হাজ্জাজ এর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এক পর্যায়ে হাজ্জাজ তার নিকট উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। বললেন, বোন, মা ও দাদা উত্তরাধিকারী রেখে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তাদের সম্পদ বন্টননীতি কী হবে? শাবী উত্তর দিলেন, এ মাসআলায় পাঁচ জন সাহাবী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উসমান ইব্ন আফ্ফান, যায়দ ইব্ন সাবিত, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আলী ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। হাজ্জাজ প্রশ্ন করলেন, একজন মুজতাহিদ হিসেবে এ মাসআলায় আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর মতামত কী ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি দাদাকে পিতা সাব্যস্ত করেন এবং মাকে

---

[৬৮৩] ইব্ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২৫, পৃ. ৩৭০ ।

[৬৮৪] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি./১৯৪৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪১৫।

[৬৮৫] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৫ ।

এক তৃতীয়াংশ দেয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন । তিনি বোনকে কোনো অংশ দেননি। হাজ্জাজ আবার প্রশ্ন করে বললেন, আমিরুল মুমিনিন উসমান (রা) এ ব্যাপারে কী বলেছিলেন, শাবী উত্তর দিলেন, তিনি যাবতীয় সম্পদ তিনভাগে ভাগ করেন। হাজ্জাজ আবার প্রশ্ন করলেন, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) এর মত কি ছিল? শাবী উত্তর দিলেন, তিনি মোট সম্পদ নয় ভাগে ভাগ করেন। মাকে তিনভাগ, দাদাকে চার ভাগ এবং বোনকে দুই ভাগ দেয়ার মত প্রকাশ করেন। হাজ্জাজ আবার প্রশ্ন করলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর মত কি ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি মোট সম্পদ ছয় ভাগ করেন। বোনকে তিন ভাগ, মাকে এক ভাগ, দাদাকে দুই ভাগ প্রদান করেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আবু তোরাব (আলী রা) এর মত কি ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি মোট সম্পদ ছয় ভাগে ভাগ করেন। বোনকে তিনভাগ, দাদাকে একভাগ এবং মাকে দুই ভাগ দিয়ে তিনি সমুদয় সম্পদ বন্টন করেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ বললেন, কাযীকে নির্দেশ দাও। তিনি যেনো উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান এর মতানুযায়ী ফায়সালা প্রদান করেন।[৬৮৬]

ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ (র)

ওয়াকি ইবনুল জার্‌রাহ ইব্‌ন মালিহ ইব্‌ন আদি ইব্‌ন ফারাস ইরাকের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ১২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সুলায়মান আল আমাশ, আওযায়ী, মালিক ইব্‌ন আনাস প্রমুখ মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করেন, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, আবু বকর ইব্‌ন আবি শাইবাসহ (র) অনেক জগদ্বিখ্যাত মুজতাহিদ। ইলমে হাদীসের পাশাপাশি তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ এর আসন অলংকৃত করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চাসনের কারণে তৎকালীন খলীফা হারুন আর রশিদ তাকে বিচারক পদে নিয়োগদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাকে উদ্দেশ করে খলীফা বলেন, 'আপনার দেশের জনগণের চাহিদা অনুয়ায়ী তথায় একজন বিচারক প্রয়োজন। আমার পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে এ পদে আপনাকে নিয়োগ দিতে চাই'। তিনি এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেন, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। আমার এক চোখ অন্ধ। দ্বিতীয় চোখটিও দুর্বল। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আম্মার বলেন,

ما كان بالكوفة في زمان وكيع افقه ولا اعلم بالحديث من وكيع وكان جهبذا،

"ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ এর যুগে কূফায় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস আর কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ"।[৬৮৭]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ তার পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গেছেন। জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস সুফ্‌য়ান সাওরী এর সঙ্গে তাকে তুলনা করা হয়। ইব্‌ন আসাকির (৫৫০-৬২০ হি.) ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ এর ফিকহী মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন,

لما مات سفيان الثوري جلس وكيع موضعه،

"সুফ্‌য়ান সাওরী এর মৃত্যুর পর ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ তার শুন্যস্থান পূরণ করেছেন"। [৬৮৮]

ইমাম আহদ ইব্‌ন হাম্বল (র) স্বীয় উস্তায এর ফিকহী প্রতিভার মূল্যায়ন করে বলেন,

---

[৬৮৬] ইসফাহানী, আবু নুআইম, আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩২৫।

[৬৮৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১৪১।

[৬৮৮] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুত:দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৬৩, পৃ. ৬৯ ।

ما رات عيناي مثل وكيع قط يحفظ الحديث جيدا ويذاكر الفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في احد،

"হাদীস মুখস্ত করার ক্ষেত্রে ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ এর চেয়ে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি আমি দেখিনি। তিনি হাদীসের দরসে ফিক্‌হ এর আলোচনা দ্বারা মজলিশ প্রাণবন্ত রাখতেন। এতে তার ইজতিহাদী প্রজ্ঞা ও দীনদারী প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে তিনি কারো মতামত গ্রহণ করেন না"।

খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ এর ইজতিহাদী প্রতিভা বর্ণনা করে বলেন,

وكيع كوفي ثقة عابد صالح اديب من حفاظ الحديث وكان مفتيا،

"কূফার অধিবাসী ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। ইবাদতগোযার ও নেককার। হাদীসের হাফেজদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ভদ্র। তিনি ছিলেন যুগের মুফতী "।[৬৮৯]

ইব্‌ন শুবরুমা (র)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুবরুমা ইব্‌নুত তুফাইল ইব্‌ন হাস্‌সান কূফার মুজতাহিদদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ। বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী উমারা ইব্‌ন কা'কা' এর সহোদর ইব্‌ন শুবরুমা ৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাবিঈ মুজতাহিদদের মধ্যে তিনি الإمام العلامة فقيه العراق قاضي الكوفة হিসেবে উপাধি লাভ করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক, আবুত তুফাইল ও আমির শাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। সুফয়াস সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়াইনা তার শিষ্য। আবু জাফর মনসূর এর শাসনামলে তিনি কূফার কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালীন সময়ের অন্যান্য মুজতাহিদ তাবিঈদের মধ্যে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত সমীহপূর্ণ। ইব্‌ন শুবরুমা ১৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি সততা ও বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্নমুখী প্রতিভাসমৃদ্ধ একজন অনন্য ব্যক্তি। ইমাম সুফ্‌য়ান সাওরীকে কেউ প্রশ্ন করেন, আপনাদের মুফতী কে? উত্তরে তিনি বলেন,

وكان سفيان الثوري إذا قيل له من مفتيكم؟ قال مفتينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكان ابن شبرمة عفيفا صارما عاقلا فقيها يشبه النساك ثقة في الحديث شاعرا حسن الخلق جوادا،

"আমাদের মুফতী হলেন, ইব্‌ন আবী লাইলা ও ইব্‌ন শুবরুমা। ইব্‌ন শুবরুমা ছিলেন সৎকর্মপরায়ন, ক্ষুরধার যুক্তিবাদী ও ধীমান ফকীহ। তিনি আপাদমস্তক একজন ইবাদতগোযার। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী, কবি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। [৬৯০]

তাহযীবুল কামাল গ্রন্থকার বলেন, ইব্‌ন শুবরুমা বিচারক পদকে জীবনের চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেন। বিচারালয়ে বসার পূর্বে তিনি স্বীয় কৃতদাসীকে বলতেন,

قربي غدائي حتى أقوم إلى بلائي،

"আমার খাবার প্রস্তুত করো। যাতে জীবনের পরীক্ষায় সুদৃঢ় থাকতে পারি"।

ইমাম যাহাবী (র) তার গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন,

...كَانَ قَارِئاً فَقِيْهاً مُفْتِياً ثِقَةً،

"তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কারী, ফকীহ, মুফতী ও নির্ভরযোগ্য রাবী"।

ইব্‌ন মাকুলা'র বরাতে খতীব বাগদাদী এর উদ্ধৃতি দিয়ে যাহাবী বর্ণনা করেন,

...كَانَ قَارِئاً مُفْتِياً أَفتَى فِي زَمَنِ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَكَانَ أَدِيْباً فَصِيْحاً،

---

[৬৮৯] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৬৪৭।

[৬৯০] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৭৯।

"ইব্‌ন শুবরুমা ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীবও উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবু জাফর এর সময়কালে ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী সাহিত্যকর্মী"।[৬৯১]

ইব্‌ন শুবরুমা বিবিধ মাসআলায় অনেক মুজতাহিদদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। নিম্নের মাসআলাটি প্রণিধানযোগ্য।

আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন, আমি কূফায় আগমন করলাম। একটি মজলিশে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবি লাইলা, ইব্‌ন শুবরুমা ও ইমাম আবু হানীফা (র) উপস্থিত ছিলেন। আমি ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম-

"কোনা ব্যবসায়ী বেচা-কেনার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করলে তার হুকুম কী হবে?

ইমাম আবু হানীফা (র) উত্তর দিলেন,

'ঐ বেচা-কেনা বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং শর্তও বাতিল হবে'।

আমি ইব্‌ন শুবরুমার নিকট এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন,

'বেচা-কেনা ও শর্তারোপ উভয়টি জায়েয'।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লাইলা এর নিকট মাসআলাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন-

'বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে'।

আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! ইরাকের তিনজন ফকীহ একটি মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মত প্রদান করলেন। আমি ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট গিয়ে তিনজন ফকীহ এর তিনটি আলাদা মতামত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ইমাম আবু হানীফা (র) উত্তর দিলেন,

তারা কোন দলীলের ভিত্তিতে নিজেদের মতামত প্রদান করেছেন আমি জানি না। তবে আমার মতের পক্ষে দলীল হলো-

أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَن أبيه عَن جده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن شرط وبيع فالبيع باطل والشرط باطل،

"আমাকে আমর ইব্‌ন শুআইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তযুক্ত বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। এমতাবস্থায় বেচা-কেনা ও শর্ত দুটিই বাতিল হবে"।

অতঃপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লাইলা এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলাম,

তিনি বললেন, তাদের মতামত সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

তবে আমার মতের পক্ষে দলীল হলো-

أَخْبَرَنِي هشام بْن عروة عَن أبيه عَن عَائِشَة قالت قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي اشترى بريرة واشترطي فالبيع جائز والشرط باطل،

"আমার নিকট হিশাম ইব্‌ন উরওয়াতার পিতা থেকে তিনি আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বরিরাকে ক্রয় করে নাও এবং এতে কিছু শর্তারোপ করো। এমতাবস্থায় বেচা-কেনা জায়েয হবে কিন্তু শর্ত বাতিল হবে"।

অতঃপর আমি ইব্‌ন শুবরুমা এর নিকট বিষয়টি আলোচনা করলাম। তিনি বললেন,

তারা কীসের ভিত্তিতে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন আমি জানি না। তবে আমার মতের পক্ষে দলীল হলো-

---

[৬৯১] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৫২।

حَدَّثَنِي مسعر بْن كدام عَن محارب بْن دثار عَن جابر قَالَ: اشترى مني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيراً وشرط لي حلابه إِلَى المدينة البيع جائز والشرط جائز،

আমাকে মিসআর ইব্‌ন কিদাম মাহারিব ইব্‌ন দিসার থেকে তিনি জাবির (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গিয়ে দুধ দোহন করার শর্তে একটি উট কিনলেন। সুতরাং বেচা-কেনা এবং শর্তারোপ দুটোই জায়েয।[৬৯২]

আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী (র)

আবুল আসওয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুফয়ান আদ দুয়ালী আল কিনানী (১৬-৬৯ হি.) একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও কবি ছিলেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব, উবাই ইব্‌ন কাব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদসহ (রা) অনেক শীর্ষস্থানীয় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তদীয় পুত্র আবু হারব, নাস্‌র ইব্‌ন আসিম ও ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়ামার তার নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। ফিকহ ও ইজতিহাদের জগতে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। আলী (রা) তাকে বাসারার আমির ও কাযী পদে নিয়োগদান করেন। আলী (রা) এর ঘনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে তিনি সিফফিন জামালসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তার নিকট থেকে ফিক্‌হ ও ইজতিহাদের মূলনীতি আয়ত্ত করেন। জীবনীকারগণ আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালীকে নানাবিধ উপাধিতে স্মরণ করেছেন। ইমাম জাহিজ এর উদ্ধৃতি দিয়ে জালালুদ্দীন সিয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন,

أَبُو الْأسود مَعْدُود فِي طَبَقَات النَّاس وَهُوَ فِي كلهَا مقدم مأثور عَنهُ فِي جَمِيعهَا مَعْدُود فِي التَّابِعين وَالْفُقَهَاء والمحدثين وَالشعرَاء والأشراف والفرسان والأمراء،

"আবুল আসওয়াদ মানবশ্রেণির সম্ভ্রান্ত স্তরের মনীষী। তিনি সর্ববিষয়ে অগ্রগামী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তার অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি একাধারে তাবিঈ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, কবি, সম্ভ্রান্ত, যোদ্ধা ও আমির"।[৬৯৩]

আল কুরআনে নুকতা ও স্বরধ্বনী সংযোজন তার ইজতিহাদী প্রতিভার অন্যতম প্রমাণ। জামিউল কুরআন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) তার খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এর ভিত্তিতে কুরআনের সকল কেরায়াত মনসুখ করে একটিমাত্র মাসহাফে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন। 'মাসহাফে উসমানী' এর লিখনরীতি ছিল কূফাবাসীদের লিখন পদ্ধতিতে। যাতে কোনো নুকতা বা স্বরধ্বণী যুক্ত ছিল না। অমুসলিমগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশের ফলে অনারবদের জন্য আল কুরআনের তেলাওয়াত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় ভুল কেরায়াতের কারণে অর্থবিকৃতিরও আশঙ্কা দেখা দেয়। জাতির এমন ক্রান্তিলগ্নে আলী (রা) এর বিশিষ্ট শিষ্য ও মুজতাহিদ তাবিঈ আবুল আসওয়াদ আল দুয়ালী ও ইরাকের গভর্নর যিয়াদ খলীফাতুল মুসলিমিন আলী (রা) এর নিকট আল কুরআনে নুকতা ও স্বরধ্বনী সংযোজনের পরামর্শ প্রদান করেন। যাতে অনারবদের জন্য আল কুরআন এর তেলাওয়াত সহজসাধ্য হয়। তারা ইজতিহাদ করে প্রথমে হরফের উপরে একটি নুকতা দিয়ে 'যবর', নিচে নুকতা দিয়ে 'যের', এবং পাশে নুকতা দিয়ে 'পেশ' এবং দুই নুকতা দিয়ে 'তানভিন' এর আকৃতি তৈরি করেন।

পরবর্তীতে খলীল ইব্‌ন আহমাদ এই চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করেন। তিনি যবর বোঝানোর জন্য হরফের উপরে বিস্তৃত আলীফ' যের বুঝানোর জন্য হরফের নিচে 'ইয়া' এবং পেশ বুঝানোর জন্য হরফের উপরে

---

[৬৯২] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি,/১৯৪৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৬ ।

[৬৯৩] সিয়ূতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর, *বুগয়াতুল ওয়াআত*, সম্পাদনা: আবুল ফজল ইবরাহীম, (লেবানন: আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ২২।

'ওয়াও' নির্দেশ করেন। পরবর্তীতে নাসর ইব্ন আসিম হাজ্জাজ ইব্ন ইয়ূসূফ এর নির্দেশে বর্তমানে প্রচলিত নুকতা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।[৬৯৪]

৪.৩.২. বসারার মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

বাসারা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান নগরী। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কূফা ও বাসারা শহর দুটির গোড়াপত্তন করেন এবং অনেক গণ্যমান্য সাহাবায়ে কেরাম সেখানে বসতি স্থাপন করেন। আলী (রা) দারুল খিলাফত মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তরের কারণে পার্শ্ববর্তী শহর হিসেবে বসারার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় থেকেই শহর দুটি জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত বছর আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী ছিল কূফার অন্তর্গত বাগদাদ নগরী। তখন জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল বিশ্বব্যাপী। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার কারণে তথায় ফিক্হ শাস্ত্রের চর্চা ও ইজতিহাদের একটি মনোরম পরিবেশ গড়ে ওঠে। মুজতাহিদদের একটি বিশাল জামাত ইজতিহাদকেই নিজেদের জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বসারার বিখ্যাত মুজতাহিদদের মধ্যে ছিলেন আমর ইব্ন সালামা আল জারমী, আবু মারয়াম আল হানাফি, কাব ইবন সূর, হাসান বসরী, আবু শা'সা জাবির ইব্ন যাইদ, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন, আবু কিলাবা, আবদুল্লাহ ইব্ন যাইদ আল জারমী, মুসলিম ইব্ন ইয়াসার, আবুল আলীয়া, হুমাইদ ইব্ন আবদির রহমান, মুতাররাফ ইব্ন আবদিল্লাহ, যুরারাহ ইব্ন আবি আওফা, আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা।[৬৯৫] নিম্নে বসারার উল্লেখযোগ্য মুজতাহিদগণের ইজতিহাদী কার্যক্রমের কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

হাসান বসরী (র)

হাসান ইব্ন ইয়াসার বসরী যাইদ ইব্ন সাবিতের আযাদকৃত গোলাম। তার পিতার নাম আবুল হাসান ইয়াসার। তিনি উমার (রা) এর খেলাফত এর শেষ পর্যায়ে ২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে মুসলিম উম্মাহর ইমাম, কাযী, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। অনেক সাহাবী ও তাবিঈ থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেন। মুমিনমাতা উম্মু সালামা (রা) এর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ছিলেন তিনি। যার বরকতে তিনি মুসলিম বিশ্বে এই উচ্চাসন লাভ করেন। উম্মু সালামা (রা) শৈশবকালে তাকে সাহাবায়ে কেরামের দরবারে নিয়ে যেতেন এবং তার জন্য দোয়া চাইতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার জন্য এই মর্মে দোয়া করেন।

اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس،

"আল্লাহ! তাকে ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান দান করুন এবং মানুষের নিকট প্রিয়ভাজন করুন"।[৬৯৬]

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ছিলেন তার প্রধান শিক্ষক। কাতাদা, ওয়াসিল ইব্ন আতা ও আইয়ুব আল সাখতিয়ানী তার প্রধান শিষ্য। নির্ভরযোগ্য ফকীহ ও অনেক গুণাবলিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন হাসান বসরী।

---

[৬৯৪] খাল্লাফ, আবদুল ওয়াহহাব, *খুলাসাতু তারীখিত তাশরীঈল ইসলামী*, (কুয়েতঃ লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী, তা/বি.), পৃ. ৬৬।

[৬৯৫] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭।

[৬৯৬] ইব্ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ২৭৮।

ইব্‌ন সাদ (১৬৮-২৩০ হি.) বলেন, হাসান বসরী ছিলেন একজন উঁচু মাপের ফকীহ, নির্ভরযোগ্য রাবী ও ইবাদতগোযার। তিনি প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী, প্রাঞ্জলভাষী ও সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। মুসলিম উম্মাহ'র হৃদয়ে হাসান বসরী এর মহান অবস্থানের জন্য সাহাবী আনাস ইব্‌ন মালিক (রহ.) এর উক্তিটি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি তার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করার পর উত্তরে তিনি বলেন,

عليكم مولانا الحسن فسَلُوه فقالوا يا أبا حمزة نسألك وتقول سلوا مولانا الحسن! فقال إنا سمِعنا وسمِع فحفِظ ونسينا،

"তোমরা আমাদের সবার প্রিয় হাসান বসরী এর সান্নিধ্য গ্রহণ করো এবং তার নিকট থেকে জেনে নাও। লোকটি প্রশ্ন করল, হে আবু হামযা! আমরা আপনার নিকট জানতে এসেছি, আর আপনি বলছেন হাসান বসরী থেকে জেনে নিতে? তিনি উত্তর দিলেন, এর কারণ হলো, অনেক হাদীস হাসান বসরীও শুনেছে আমরাও শুনেছি। কিন্তু সে মুখস্ত রেখেছে, আর আমরা ভুলে গিয়েছি"। [৬৯৭]

হাসান বসরী এর সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও দূরদর্শিতার কারণে এই মর্মে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, হাসান বসরী সাহাবীদের সামনে উপস্থিত হলে অবশ্যই তারা হাসান বসরীর মতামতের মুখাপেক্ষী হতেন। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয এর খেলাফতকালে তিনি বসারার কাযী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাবিঈ কাতাদা বলেন,

كان الحسنُ مِن أعلم الناس بالحلال والحرام؛

"হাসান বসরী হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন"।[৬৯৮]

কাতাদা (র) আরো বলেন,

ما جمعتُ علمَ الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدتُ له فضلًا عليه غيرَ أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله وما جالستُ فقيهًا قط إلا رأيت فضل الحسن،

"হাসান বসরী এর জ্ঞান অন্য আলিমদের সঙ্গে তুলনা করার পর আমি তার জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করেছি। কোনো বিষয়ে তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব এর নিকট পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধান চাইতেন। সব ফকীহ এর মজলিশে বসার পরই আমি হাসান বসরী এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছি"।[৬৯৯]

হাসান বসরী পূর্বঘটিত কোনো রাজনৈতিক ঘটনায় নিজেকে জড়াননি। বিতর্কিত ঘটনাবলি সম্পর্কীত বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, যে রক্তপাত থেকে আল্লাহ আমাদের তরবারি পবিত্র রেখেছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করে নিজেদের জিহ্বা কর্দমাক্ত করা সমীচীন নয়। ইমাম আবু জাফর বাকির (র) এর সামনে তার সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলতেন, হাসান বসরী এমন এক ব্যক্তি, যার কথা নবী-রাসূলদের কথার মতো। তিনি সে যুগের সবচেয়ে সাহসী পুরুষ ছিলেন। পশম ব্যবসা ছিল তার জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ী । উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) এর যুগে আলী ইবনুল আরতাত তাকে বসারার কাযী হিসেবে নিয়োগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি এ পদ থেকে ইস্তেফা দেন। তিনি ইলম, প্রজ্ঞা, সুভাষণ ও সচ্চরিত্রে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কাযী আয়ায (র) তাকে অনুসরণীয় ও প্রবর্তিত মাযহাবসমূহের একজন ইমাম হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি **১১০**

---

[৬৯৭] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৩০।

[৬৯৮] প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২০।

[৬৯৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৭৩।

হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বসারার সকল মানুষ তার জানাযায় উপস্থিত থাকার কারণে সেদিন মসজিদে আসরের নামাযের জন্য কোনো মুসল্লি পাওয়া যায়নি।[৭০০]

নিম্নে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ এর বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রসঙ্গে হাসান বসরী এর ইজতিহাদটি আলোচনা করা হলো,

বসরার প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ হাসান বসরী এর নিকট হাজ্জাজ ইব্‌ন ইয়ূসুফ এর জুলুমের প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হলো। জালিম গভর্নর হাজ্জাজ নিরীহ জনগণের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে জব্দ করছে ও নামায পরিত্যাগ করছে, ইত্যাদি অপকর্ম প্রতিকারে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন,

'আমি তার বিরুদ্ধে কোনে প্রতিকারে যাওয়া ভালো মনে করি না। কেননা যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তবে তোমরা তরবারির মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে পারবে না। আর যদি হাজ্জাজ কোনো বিপদ হিসেবে আপতিত হয়, তবে উত্তম বিচারকের ফায়সালা পর্যন্ত অপেক্ষা করো' (فاصبر حتي يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين)

ফতোয়া তলবকারীগণ তার কথা অগ্রাহ্য করে হাজ্জাজ এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। যার ফলাফল ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত। হাজ্জাজ এর কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছিল সকল মুসলমানের জন্য জরুরি। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان،

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখলে, সর্বশক্তি দিয়ে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। শক্তিপ্রয়োগে সক্ষম না হলে মুখে প্রতিবাদ করবে। অপারগতায় অন্তরে হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা করবে।[৭০১]

হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধের ফলাফল বিবেচনা করে হাসান বসরী চিন্তা করলেন যে, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সাধারণ মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি অপেক্ষা করছে, তা মুসলমানদের জন্য হবে মারাত্মক ভয়াবহ। তিনি উপর্যুক্ত হাদীসকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করার পরিবর্তে সর্বসাধারণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োগ করতে ইজতিহাদ করেন। তার ইজতিহাদের মূলনীতি ছিলো এই, হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার মূল লক্ষ্য হলো, সর্বসাধারণের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। যা হাজ্জাজ এর কারণে বিঘ্নিত হয়েছিল। হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে গেলে মহা ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবার প্রবল আশঙ্কা ছিল। এতে সুফলের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই ভারি হবে। যার কারণে তিনি হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি প্রদান করেন নি। তিনি জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয হবার জন্য এ শর্ত আরোপ করেন যে, জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত সুফল বর্তমান অবস্থার চেয়ে প্রবল হবার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যদি জিহাদের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়, তবে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

কাতাদা ইব্‌ন দাআমা (র)

আবুল খাত্তাব কাতাদা ইব্‌ন দাআমা আল সাদুসী (৬০/৬৮০) বাসারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ১২৭ হিজরীতে ইরাকের ওয়াসিত জেলায় ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে একজন

---

[৭০০] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪ ।

আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১৪৪।

[৭০১] মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১ পৃ. ৬৯।

তাবিঈ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। আনাস ইব্‌ন মালিক, আবুত তুফাইল, (রা) সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আবুল আলীয়া (র) থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। আইয়ুব আল সাখতিয়ানী, শুবা ইবনুল হাজ্জাজ ও আওযায়ী তার অন্যতম শিষ্য। তার স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কাতাদা বলেন, আমি হাদীসের দরসে কোনো উস্তাযকে কোনো কথা পুনরুক্তি করতে বলিনি। আমার কানে যাই ধ্বনিত হয়েছে অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। ইমাম যুহরীকে প্রশ্ন করা হলো, কাতাদা বেশি জ্ঞানী নাকি মাকহুল? তিনি উত্তর দিলেন, কাতাদা। মাকহুল এর নিকট ছিল সামান্য জ্ঞান।[৭০২]

সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, ، ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة

"ইরাকের অধিবাসীদের মধ্যে আমার নিকট কাতাদা এর চেয়ে অধিক স্মরণ শক্তিসম্পন্ন আর কেউ জ্ঞান অর্জন করতে আসেনি। দরস এর তৃতীয় দিনে তিনি কাতাদাকে উদ্দেশ করে বলেন,

فقال له في اليوم الثالث ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني،

"হে অন্ধ শাগরেদ! এখন যেতে পারো। তুমি অনেক যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছো"।[৭০৩]

সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন,

لم أر في هؤلاء أفقه من الزهري وقتادة وحماد،

"যুহরী, কাতাদা ও হাম্মাদ এর চেয়ে অধিক ফকীহ আমি আর কাউকে দেখিনি"। [৭০৪]

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন,

قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء ثم وصفه بالفقه والحفظ،

"তাফসীর শাস্ত্র ও আলিমদের ইখতিলাফ প্রসঙ্গে তার জ্ঞান ছিল সুদূরপ্রসারী। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার দক্ষতা ও স্মরণশক্তি ছিল প্রশংসনীয়"।[৭০৫]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কাতাদা সর্বদা কুরআন সুন্নাহর নসকে প্রাধান্য দিতেন। ক্ষুরধার স্মরণশক্তি সত্ত্বেও তিনি ভেবে-চিন্তে ফতোয়া প্রদান করতেন। নিজের সতর্কতার বিষয়ে তিনি বলেন,

ما أفتيت برأيي منذ ثلاثين سنة،

"দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি নিজ সিদ্ধান্তে কখনো ফতোয়া প্রদান করিনি"।[৭০৬]

আমির ইব্‌ন আবদিল্লাহ আত তামিমী (র)

আবু আবদিল্লাহ আমির ইব্‌ন কাইস আল তামিমী আল আম্বরী বাসারার একজন দুনিয়াবিমূখ, মুজতাহিদ ও শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। উমার ইবনুল খাত্তাব ও সালমান ফারেসী (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। হাসান বসরী ও ইব্‌ন সিরীন প্রমুখ জলীলুল কদর তাবিঈ তার শিষ্য। তিনি মুআবিয়া (রা) এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক বাসারা শহরের গোড়াপত্তনের পর অনেক প্রজ্ঞাবান ও ফকীহ সাহাবীদের তথায় বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনার

---

[৭০২] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৭১

[৭০৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৭।

[৭০৪] প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭।

[৭০৫] প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭।

[৭০৬] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২. পৃ. ৩৩৩।

অংশ হিসেবে আবু মুসা আশআরী (রা) বাসারার ফকীহ ও মুয়াল্লিম হিসেব নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আমির ইব্‌ন কাইস আল তামিমী আবু মুসা আশআরী (রা) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং তার নিকট থেকে কুরআন সুন্নাহ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর ইজতিহাদে উৎসর্গ করেন। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন,

فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ فَيُقْرِئُهُمُ القُرْآنَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي إِلَى الظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَى العَصْرِثُمَّ يُقْرِئُ النَّاسَ إِلَى المَغْرِبِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَيْنَ العِشَاءيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَأْكُلُ رَغِيْفاً وَيَنَامُ نَوْمَةً خَفِيْفَةً ثُمَّ يَقُوْمُ لِصَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَسَحَّرُ رَغِيْفاً وَيَخْرُجُ،

"তিনি সকালবেলা কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য জনসমক্ষে আগমন করতেন। তা একটানা যুহর এর নামায পর্যন্ত চলতো। যুহরের পর আসর পর্যন্ত দ্বিতীয় দরস চলতো। তৃতীয় দরস চলতো মাগরিব পর্যন্ত। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি নামাযে মশগুল থাকতেন। এরপর নিজ গৃহে প্রবেশ করে হালকা খাবার গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার সাহরীর সময়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সকালে হালকা নাস্তা খেয়ে আবার কুরআন শিক্ষায় নিয়োজিত হতেন"।[৭০৭]

তিনি স্বীয় জীবনের প্রতিটি অংশ কার্যকর রাখেন এবং নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করেন। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বসারার মসজিদে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হ চর্চায় ব্যয় করেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি একাকী আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন, যার কারণে তার পদযুগল ফুলে যেতো। তৃতীয় অংশ তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করতেন। নিজের জীবনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত রাখার কারণে তিনি অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৭০৮]

বাসারার গভর্নর তৎকালীন খলীফার নির্দেশক্রমে আমির ইব্‌ন আবদিল্লাহকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন,

প্রথম প্রশ্ন:-

আপনি কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ বর্জন করে কুমারিত্ব বরণ করছেন?

উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর প্রতি বিমূখ হয়ে কুমারিত্ব বরণ করিনি। আমি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। তবে আমি চাই আমার জীবনটা একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হোক। বিয়ে করার মাধ্যমে স্ত্রীর দায়-দায়িত্বের কারণে এ পথে কোনো অন্তরায় হোক তা আমি চাই না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন:-

আপনি গোশত খাওয়া কেন ছেড়ে দিয়েছেন?

উত্তরে তিনি বলেন, গোশত পাওয়া গেলে এবং খাওয়ার প্রতি আমার রুচি থাকলে অবশ্যই খাই।

তৃতীয় প্রশ্ন:-

আপনি কেন পনির খান না?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি এমন এলাকায় বাস করি, যেখানে অগ্নিপূজকদের বসবাস। তারা পনির তৈরি করার সময় মৃত পশু ও জবাইকৃত পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। আমার আশঙ্কা হয়, পনির এর মধ্যে এমন কোনো পশুর চর্বি থাকতে পারে, যা শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়নি। দুইজন মুসলমানের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয়, ঐ পনির হালাল পশুর চর্বি দ্বারা তৈরি, তা খেতে আমার আপত্তি নেই।

চতুর্থ প্রশ্ন:-

---

[৭০৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৫।

[৭০৮] ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবিঈন*, (কায়রো: দারুল আদাবিল ইসলামী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৩।

আপনি কেন সরকারী কর্মকর্তাদের দরবারে উপস্থিত থাকেন না।

উত্তরে তিনি বলেন, আপনাদের দরবারে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থীদের ভীড় থাকে। দরবারে তাদের উপস্থিত থাকা একান্ত সঙ্গত। প্রয়োজন না হলে অনর্থক আনাগোনা দরবারের জন্য বেমানান।[৭০৯]

কাব ইব্ন সূর (র)

কাব ইব্ন সূর ইব্ন বাকার ইব্ন আযদী ইয়ামেনের আয্দ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খেলাফতকালে বাসারা'র বিচারক ছিলেন এবং উমার ইবনুল খাত্তাব এর ইন্তেকাল অবধি দীর্ঘ ১২ বছর যাবত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারী এর বর্ণনা মতে তিনি জামাল যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৭১০]

বর্ণিত আছে, কাব ইব্ন সূর এর গৃহে জনৈক লোক কিছু খাদ্য হাদিয়া হিসেবে দিয়ে গেলো। তার কন্যা ঐ খাদ্য পিতার সামনে আনার পর তিনি খেয়ে নিলেন। জ্ঞাত হবার পর তিনি ঐ খাদ্য এই বলে বমি করে ফেললেন যে, বিচারকের ঘরে উপঢৌকন ঘুষে পরিণত হয়। এটি বিচারকার্যে বিচারককে প্রভাবিত করে।

ইজতিহাদ ও বিচারব্যবস্থায় কাব ইব্ন সূর এর দক্ষতা নিম্নের ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়। ইমাম শাবী বর্ণনা করেন, একদিন কাব ইব্ন সূর উমার ইবনুল খাত্তাব এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন মহিলা এসে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্বামীর চেয়ে উত্তম কোনো স্বামী জীবনে চোখে দেখিনি। তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করেন। আর প্রচণ্ড গরমের দিনেও রোযা রাখেন। কখনো রোযা ভঙ্গ করেন না। মহিলাটির কথা শুনে খলীফা তার জন্য দোয়া করলেন এবং তার প্রশংসা করে বললেন, তোমার মতো মহিলা সাধারণত পাওয়া যায় না। খলীফার প্রশংসা শুনে মহিলাটি একটু পেছনে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। এ অবস্থা দেখে কাব বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! মহিলাটি আপনার নিকট সাহায্য চাইতে এসেছেন, অথচ আপনি তাকে সাহায্য করেননি। উমার বললেন, সে কি বাস্তবে সাহায্য চাইতে এসেছে? কাব মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, তুমি নিশ্চয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছো। লজ্জা-শরম বাদ দিয়ে সত্য কথাটি বলো। তখন মহিলা বললো, আমি একজন যুবতী নারী। স্বামীর নিকট আমি তাই কামনা করি, অন্য একজন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট যা কামনা করে। এ কথা শোনার পর তার স্বামীকে ডেকে আনা হলো। মহিলাটির স্বামী আসার পর খলীফা কাবকে বললেন, হে কাব! দু'জনের মধ্যে তুমি ফায়সালা করে দাও। কারণ মহিলাটির মনের কথা তুমিই বুঝতে পেরেছো, যা আমি বুঝতে পারিনি। কাব বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! ফায়সালা দেবার বিষয়ে আপনিই হকদার। উমার (রা) বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বিষয়ে তুমিই ফায়সালা দিবে। কাব ফায়সালা প্রদানপূর্বক বললেন, আমার মনে হয় ঐ স্বামীর আরো তিন জন স্ত্রী আছে এবং মহিলাটি চতুর্থ। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তিনদিন আল্লাহর ইবাদত করলে চতুর্থ দিন স্ত্রীকে সময় দেয়ার ফায়সাল দিলাম। এ সিদ্ধান্ত শোনার পর উমার (রা) বললেন, তোমার বিচার দক্ষতা ও ইজতিহাদী প্রতিভা খুবই চমৎকার। যেভাবে পূর্বের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসার দাবিদার। আজ থেকে তোমাকে আমি বসরার কাযী পদে নিয়োগদান করলাম।

কাব ইব্ন সূর এর ইজতিহাদকৃত আরো দুটি মাসআলা আালোচনা করা হলো, যা তার ফিকহী দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। 'আখবারুল কুদাত' গ্রন্থকার আবু লাবিদ এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন,

---

[৭০৯] ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন*, (কায়রোঃ দারুল আদাবিল ইসলামী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৪।

[৭১০] আসকালানী, ইব্ন হাজার আবুল ফজল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৮০।

جاء كعب بْن سور إِلَى مسجدنا فسأله رجل من الحي قال إني ربيت جارية يتيمة وأنها تدعوني يا أبته وأنا أقول لها يا ابنته؛ أفترى لي أن أتزوجها ? قال: هي لك حلال، وأحب إِلَى ألا تتزوجها،

"কাব ইব্‌ন সূর আমাদের মসজিদে আগমন করেন। গোত্রের একজন লোক তাকে প্রশ্ন করেন, আমি একজন এতিম বালিকা লালন পালন করেছি। সে আমাকে পিতা বলে সম্বোধন করে। আমিও তাকে মেয়ে বলে ডাকি। তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, ঐ বালিকা আপনার জন্য হালাল। তবে তাকে বিয়ে করা আপনার জন্য সমীচীন হবে না।[৭১১]

কাতাদা থেকে বর্ণিত, একজন লোক গাধায় আরোহণ করে অপর জন উটে আরোহণ করে পরস্পর সাক্ষাত করলো। উট সামনে আসার পর গাধাটি ভয় পেয়ে আরোহীকে ফেলে দিল। এতে তার শরীরের একটি অঙ্গ ভেঙ্গে গেলো। তারা দু'জন কাব ইব্‌ন সূর এর নিকট বিচার চাইল। কাব কারো উপর কোনো জরিমানা আরোপ করেন নি।[৭১২]

আবুল আলীয়া আর রিয়াহী (র)

রফি ইব্‌ন মিহরান আবুল আলীয়া আর রিয়াহী ছিলেন বাসরার একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ ও মুজতাহিদ। হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য রাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের দুই বছর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৯০ অথবা ৯৩ হিজরীতে বাসারায় ইন্তেকাল করেন। আবু বকর, উমার আলীসহ (রা) অনেক সাহাবীর নিকট থেকে আবুল আলীয়া কুরআন সুন্নাহর পাঠ গ্রহণ করেন এবং হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর খুব ঘনিষ্ঠ। তিনিই ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এ বিষয়ে আবুল আলীয়া নিজেই বলেন,

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ،

"আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট তিনবার আল কুরআনের পাঠ গ্রহণ করেছি"।[৭১৩]

কাতাদা ও রবি ইব্‌ন আনাস প্রমুখ তাবিঈ তার ছাত্র। তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন তাবিঈ। জীবনীকার দাউদী আবু বকর ইব্‌ন আবী দাউদ এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ثم سعيد بن جبير،

"সাহাবায়ে কেরামের পর আবুল আলীয়া আর রিয়াহী ছিলেন আল কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক। অতঃপর সাইদ ইব্‌ন জুবাইর"।[৭১৪]

আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) এর মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। ইজতিহাদপূর্বক তিনি যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে আসেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে বর্ণনা করেন।

"আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) এর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। আমি ছিলাম তখন টগবগে যুবক। যুদ্ধে শহিদ হওয়া আমার নিকট ভালো আহার্যের চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল। তাই আমিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো বলে মনস্থ করলাম। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিতও হলাম। তারপর রওয়ানা দিলাম যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে। সেখানে গিয়ে দেখলাম। উভয় পক্ষ সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে। দুই দলে সৈন্যসংখ্যা এত বেশি যে, এক পার্শ্বে দাঁড়ালে অন্য পার্শ্ব দেখাই যায় না। আরো দেখলাম, একদল নারায়ে তাকাবীর বললে আরেক দলও

---

[৭১১] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি./১৯৪৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৯।

[৭১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

[৭১৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০৮।

[৭১৪] দাউদী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আহমদ, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ১৭৮।

'আল্লাহু আববর' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। এবার আমি ভাবতে লাগলাম। কি করা যায় ? কোন দলে যোগ দেয়া যায়? যুদ্ধরত কোন দলকে কাফির সাব্যস্ত করা যায়? আর কোন দলকে মুমিন বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়? অতপর আমি মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। আমাকে এ যুদ্ধে যোগদানে কে বাধ্য করেছে? জবাব পেলাম, কেউ না। ফলে সন্ধ্যা হতে হতেই আমি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করি" ।[৭১৫]

৪.৩.৩. শামের মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

মক্কা মদীনার পর শাম সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বরকতময় স্থান। আল কুরআনে এটিকে 'আল আরদুল মুকাদ্দাসা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে শামের অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। শামের বিভিন্নমুখী তাৎপর্যের কারণে অনেক সাহাবায়ে কেরাম এতে বসতি স্থাপন করেছেন। এই বরকতের সুবাদে শাম ইসলামী জ্ঞানের একটি বিশাল মারকাযে পরিণত হয়। কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও ইজতিহাদের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অনেক ফকীহ ও মুজতাহিদের পরশধন্য এ ভূখণ্ডে অদ্যাবধি ইজতিহাদের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম দুই শতকে এখানে ইজতিহাদের যে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে তারই কিয়দংশ এখানে আলোচনা করা হলো। শামের প্রখ্যাত মুজতাহিদগণের মধ্যে রয়েছেন, আবু ইদরীস আল খাওলানী, শারাহবিল ইব্‌ন আস সাম্‌ত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবি যাকারিয়া আল খুযায়ী, কাবীসা ইব্‌ন যুআইব আল খুযায়ী, জানাদা ইব্‌ন আবি উমাইয়া, সুলায়মান ইব্‌ন হাবীব আল মুহারিবী, হারিস ইব্‌ন উমাইর আল যুবাইদী, খালিদ ইব্‌ন মাদান, আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম আল আশআরী, জুবাইর ইব্‌ন নাফির। আরো রয়েছেন, আবদুর রহমার ইব্‌ন জুবাইর ইব্‌ন নাফির, মাকহুল, উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয, রাজা ইব্‌ন হাইওয়াহ, হাদির ইব্‌ন কুরাইব, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকেও খলীফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করা হতো।

এছাড়াও কাযী ইয়াহয়া ইব্‌ন হামযাহ, আবু আমর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আল আওযায়ী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবিল মুহাজির, সুলায়মান ইব্‌ন মুসা আল উমাবী, সাঈদ ইব্‌ন আবদিল আযীয, মাখলাদ ইব্‌ন হোসাইন, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম, আব্বাস ইব্‌ন ইয়াযিদ, শোআইব ইব্‌ন ইসহাক, আবু ইসহাক আল ফাযারী।[৭১৬]

মাকহুল আশ শামি (র)

মাকহুল ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল শামী আল হুযালী কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং **১১৩** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি দামেস্কে বসতি স্থাপন করেন। মাকহুল হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের দিকপাল ও শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ (كبار التابعين) হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি উবাই ইব্‌ন কাব, উবাদা ইব্‌নুস সামিত এবং আয়িশা (রা) থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। মাকহুলকে আলিমু আহলিশ শাম' عالم) (اهل الشام তথা শামের সর্বাধিক জ্ঞানী বলা হয়। আবু উমামা আল বাহিলি, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ও

---

[৭১৫] মাওলানা সাঈদ আহমদ, গোলামানে ইসলাম, (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ, **১৯৯১** খ্রি.), পৃ. ২০২।

[৭১৬] প্রাগুক্ত।

ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, **১৩৬৬** হি/**১৯৪৭** খ্রি.), পৃ. ২৯।

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), খ. **১**, পৃ. ২৯।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এর মতো জলীলুল কদর সাহাবীদের পাশাপাশি তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের নিকট থেকেও মুরসাল হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তার নিকট থেকে আলা ইবনুল হারিস, হাজ্জাজ ইবনুল আরতাত ও আওযায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাদীস রেওয়ায়াত করেন। জ্ঞান অর্জনে তার পিপাসা ছিল অদম্য। যা ইব্‌ন ইসহাক (র) এর বর্ণনায় এভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে,

عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته في ما أرى ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها،

"আমি মিসরে আযাদ হবার পর সেখানকার প্রয়োজনীয় সব ইলম আয়ত্ত করেছি। অতঃপর ইরাক হয়ে মদীনায় গেলাম এবং এই দুই শহরের যাবতীয় ইলম হাসিল করেছি। এর পর শাম আসলাম এবং তথাকার সব উৎকৃষ্ট জ্ঞান হাসিল করলাম"।[৭১৭]

ইমাম যুহরী (মৃ. ১২৩/২৪ হি.) বলেন, মুসলিম বিশ্বে তিন জন মহান আলিম আছেন। মাকহুল তাদের মধ্যে অন্যতম। আবু হাতিম বলেন, আমি শামে মাকহুলের চেয়ে বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি। ইমাম যাহাবী মাকহুল এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,,

كنت عبدا لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل بمصر فما خرجت من مصر حتى ظننت أن ليس بها علم إلا وقد سمعته،

"আমি সাঈদ ইবনুল আস এর গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে মিসরের হুযাইল গোত্রের এক মহিলার নিকট দান করে দেন। মিসর থেকে বের হবার পর আমার মনে হলো, মিসরের সব ইলম আমার আয়ত্ত হয়ে গেছে"।[৭১৮]

সাইদ ইবনুল আস বলেন, মাকহুল যুহরীর চেয়েও বেশি জ্ঞানী।[৭১৯]

আবু ইদরীস আল খাওলানী (র)

আবু ইদরীস আয়িযুল্লহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবাহ আল খাওলানী শামের শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি ৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবু যর গিফারী, আবু মুসা আশআরী, উবাদা ইব্‌ন সামিতসহ (রা) অনেক সাহাবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তার পিতাও ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতপ্রাপ্ত একজন সাহাবী। মাকহুল, যুহরীসহ অনেক জলীলুল কদর তাবিঈ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর খেলাফতকালে তিনি দামেস্কের কাযী ছিলেন।

ইমাম যাহাবী ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيْسَ الخَوْلاَنِيُّ وَكَانَ من فقهاء أهل الشام،

"আবু ইদরীস আল খাওলানী শামের অন্যতম ফকীহ"।[৭২০]

শামের প্রসিদ্ধ ফকীহ মাকহুল (র) বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي إِدْرِيْسَ الخَوْلاَنِيِّ وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو إِدْرِيْسَ عَالِمَ الشَّامِ بَعْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ،

---

[৭১৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,), খ. ১, পৃ. ৮২।

[৭১৮] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮২।

[৭১৯] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *আত তারীখুল কাবীর*, (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মাআরিফ, তা/বি.), খ. ৮, পৃ. ২১।

[৭২০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৫৬।

"আবু ইদরীস আল খাওলানী এর মতো ফকীহ আমি দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আবুদ দারদা (রা) এর পর শামের প্রধান ফকীহ হলেন আবু ইদরীস আল খাওলানী।[৭২১]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আলী ইব্‌ন ওয়াদিহ আল হানজালী আল মুরুযী **১১৮** হিজরীতে তুর্কমিনিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং **১৮১** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৭২২] তার পিতা মুবারক হামাদান এর জনৈক ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা, আবদুর রহমার আল আউযায়ী, শুবা ইবনুল হাজ্জাজ ও সুফ্‌য়ান সাওরী থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ এর দরস গ্রহণ করেন। ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈন, আবু বকর ইব্‌ন আবি শাইবা ও আবু দাউদ তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক। এছাড়াও ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি সার্থকতার স্বাক্ষর রাখেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর ইলম ও ফিক্‌হ এর খ্যাতি ছিল সর্বত্র। প্রজা সাধারণের উপর তৎকালীন খলীফার প্রভাব এর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর জ্ঞানের প্রভাব। একদা বাদশাহ হারুনুর রশিদ রিক্কায় আগমন করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর আগমন উপলক্ষে সাধারণ মানুষ একটি সমাবেশে মিলিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় বহরে আগত রাজ পরিবারের একজন নারী সদস্য জিজ্ঞেস করলেন, এটি কীসের সমাবেশ? তিনি জানতে পারলেন, খোরাসানের একজন আলিম এর আগমনে এ সমাবেশের আয়োজন। তখন তিনি মন্তব্য করলেন। রাষ্ট্রীয় প্রটোকলে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করাকে রাজত্ব বা কৃতিত্ব বলা যায় না। অকৃত্রিম ভালোবাসার টানে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাগমই হলো আসল রাজত্ব।[৭২৩]

আবু নুআইম ইস্পাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতামির বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আরবের ফকীহ কে? তিনি উত্তর দিলেন, সুফ্‌য়ান সাওরী। সুফ্‌য়ান সাওরী এর মৃত্যুর পর আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এখন আরবের ফকীহ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক।[৭২৪]

জ্ঞানের রাজ্যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর বিচরণ সম্পর্কে খতীব বাগদাদী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

قال عبدالرحمن بن أبي جميل كنا حول ابن المبارك بمكة فقلنا له: يا عالم الشرق حدِّثنا وسفيان الثوري قريبٌ منا يسمع فقال سفيان وَيْحَكم! عالم المشرق والمغرب وما بينهما؛

"আবদুর রহমান ইব্‌ন আবি জামিল বলেন, আমরা একদা মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর পাশে অবস্থান করছিলাম। আমরা তাকে সম্বোধন করে বললাম, হে প্রতিচ্যের আলিম! আমাদের উদ্দেশে হাদীস বর্ণনা করুন। সুফ্‌য়ান সাওরী অদূরে অবস্থান করে আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, তার প্রতি তোমাদের মূল্যায়ন ঠিক হয়নি। তিনি কেবলমাত্র প্রাচ্য-প্রতিচ্যের আলিম নন। বরং বিশ্বজগতের আলিম"।[৭২৫]

---

[৭২১] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৭।

[৭২২] ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩২, পৃ. ৪০২।

[৭২৩] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৮৮।

[৭২৪] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৩।

[৭২৫] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৪০০।

ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন,

قال يحيى بن يحيى الليثي كنا عند مالك فاستُؤذِن لعبدالله بن المبارك بالدخول فأذِن له فرأينا مالكًا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه وما رأيت مالكًا تزحزح لأحد في مجلسه غيره، فكان القارئ يقرأ على مالك فربما مرَّ بشيء فيسأله مالك ما مذهبكم في هذا؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيتُ ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج فأعجِب مالكٌ بأدبه ثم قال لنا مالك هذا ابن المبارك فقيهُ خراسان،

"ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া আল লাইসী বলেন, আমরা একদা ইমাম মালিক এর দরসে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রবেশ করলেন। আমরা ইমাম মালিককে দেখলাম যে, তিনি নড়েচড়ে বসলেন এবং তাকে কাছে বসালেন। ইমাম মালিককে আমরা কারো সম্মানে কখনো নড়েচড়ে বসতে দেখিনি। দরস চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে অনেক সময় তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে উদ্দেশ করে বলতেন, এ বিষয়ে আপনার মাযহাব কি? অথবা এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনায়াসে নিজের মতামত পেশ করতেন। ইমাম মালিক তার প্রজ্ঞা ও শিষ্টাচার দেখে অবাক হতেন। তিনি আমাদের উদ্দেশে বলেন, ইনিই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। খোরাসানের ফকীহ"।[৭২৬]

ইমাম বুখারী (র) এর উস্তায আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, "দুজন ব্যক্তির নিকট ইলম এর পরিসমাপ্তি হয়েছে। একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। দ্বিতীয় জন ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন"। [৭২৭]

আতা আল খুরাসানী (র)

আতা ইব্ন আবি মুসলিম ইব্ন আবি সুফরা আল আযদী আল খোরাসানী একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ ও মুফাসসির। তিনি ৬০ হিজরীতে বালাখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫ হিজরীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে ইন্তেকাল করেন। জীবনের সূচনাকাল তিনি খোরাসানে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে তথাকার বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি শামে ভ্রমন করে তাবিঈ মাকহুল (র) এর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। যাইদ ইব্ন আসলাম থেকে তিনি তাফসীর শাস্ত্রের শিক্ষা হাসিল করেন। খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এর শাসনামলে দামেস্কে বসতি স্থাপন করেন ।[৭২৮]

আতা আল খোরাসানী হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী ও ফতোয়াদানে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। ইয়াকুব ইব্ন শাইবা বলেন, আতা আল খোরাসানী ইজতিহাদ ও ফতোয়াদানে একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ইব্ন আবদিল বার (র) বলেন,

عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْفُضَلَاءِ وَلَهُ أَخْبَارٌ طَيِّبَةٌ عَجِيبَةٌ فِي فَضَائِلِهِ،

"আতা আল খোরাসানী মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী । ইসলামের ইতিহাসে তার অবদান সম্পর্কে বিস্ময়ক বর্ণনা রয়েছে"।[৭২৯]

তাবিঈ আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা (র) বলেন,

---

[৭২৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৪২১।

[৭২৭] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৪০০।

[৭২৮] সাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল জাওয়াদ, *আকওয়ালু আতা আল খোরাসানী ফিত তাফসীর*, (মক্কা: জামিয়া উম্মুল কুরা, ২০১৮ হি.), পৃ. ৬৮।

[৭২৯] ইব্ন আবদিল বার, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্ন আবদিল্লাহ, *আত তামহীদ*, (মরক্কো: ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ২১।

لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص: صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي فقيه مكة عطاء وفقيه اليمن طاوس وفقيه اليمامة يحيى بن أبي كثيروفقيه البصرة الحسن وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي وفقيه الشام مكحول وفقيه خراسان عطاء الخراساني إلا المدينة فإن الله تعالى خصها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب،

"আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) এর ইন্তেকালের পর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ফিক্হ শাস্ত্র মাওয়ালিদের (আযাদকৃত গোলাম) আয়ত্বে চলে যায়। মক্কার ফকীহ হলেন, আতা ইব্ন আবি রাবাহ, ইয়ামেনের ফকীহ তাউস, ইয়ামামাহ এর ফকীহ ইয়াহয়া ইব্ন আবি কাসীর, বাসারার ফকীহ হাসান বসরী, কূফার ফকীহ ইবরাহীম আল নাখায়ী, শামের ফকীহ মাকহুল ও খোরাসানের ফকীহ আতা আল খোরাসানী। কিন্তু একমাত্র মদীনা তার ব্যতিক্রম। এখানের ফকীহ হলেন কুরাইশ বংশদ্ভূত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র)। যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মদীনার।[৭৩০]

ফিক্হ শাস্ত্রে আতা আল খোরাসানী এর অবদান সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের মনীষীগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। আবু নাঈম ইস্পাহানী বলেন, তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ও আমলদার ফকীহ। বাগ্মীতায় তার কৃতিত্ব অসাধাণ। ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.) বলেন,

مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام،

"যিকর এর মজলিস মানে হালাল হারাম তথা ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করা"।

আতা আল খোরাসানী এর পুত্র উসমান ইব্ন আতা স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

إن أوثق عملي في نفسي نشري للعلم،

"ফিক্হ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারই হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মজবুত আমল"।[৭৩১]

দাহ্হাক ইব্ন মাযাহিম (র)

আবু মুহাম্মদ দাহ্হাক ইব্ন মাযাহিম আল হিলালী একজন বিশিষ্ট তাবিঈ। তিনি বালাখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন বুখারা ও সমরকন্দে অবস্থান করার পর ১০২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইব্ন আব্বাস, আবু সাইদ খুদরী, ইব্ন উমার ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সাইদ ইব্ন জুবাইর, আতা, তাউসসহ (র) অনেক তাবিঈ থেকেও তিনি হাদীস ও ফিকহ এর দরস লাভ করেন। 'মাশাহিরু উলামাইল আমসার' এর লেখক বলেন, আবুল কাসিম দাহ্হাক কোনো সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেননি।[৭৩২]

তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও পরহেযগার ফকীহ ছিলেন, ফিকহ ও তাফসীর শাস্ত্র ছিল তার মজ্জাগত। তার চিন্তা-চেতনার অংশ ছিল এ দুটি বিষয়। তিনি বলেন,

حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها ،

---

[৭৩০] হামাবী, আবু আবদিল্লাহ শিহাবুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ ইয়াকুত, *মুজামুল বুলদান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৪।

[৭৩১] ইবনুল জাওযী, জামালুদ্দীন আবুল ফরজ আবদুর রহমান, *সিফাতুস সাফওয়া*, সম্পাদনা: আহমাদ ইব্ন আলী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ, ৩৩৪।

[৭৩২] ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল বুসতী, *মাশাহীরু উলামাইল আমসার*, (আল মানসূরা: দারুল ওয়াফা লিত তাবাআ, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০৮।

"কুরআনের শিক্ষা অর্জনকারী প্রতিটি ব্যক্তির ফকীহ হওয়া প্রয়োজন"।[৭৩৩]

নিম্নে দাহ্‌হাক ইব্‌ন মাযাহিম এর ইজতিহাদকৃত ও মুজতাহিদদের নিকট বিরোধপূর্ণ একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো,

ইবনুল মুনযির বলেন, নারী-পুরুষ উভয়ের সাক্ষ্যদান ইসলামে গৃহীত। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। তারা বলেন, দণ্ডবিধি ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য নয়। নিকাহ, তালাক ও বংশ সাব্যস্তকরণের বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসবসহ নারীসংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে পুরুষদের অবগতি লাভ করা সক্ষম নয়, সেখানে এককভাবে নারী-সাক্ষ্য গৃহীত হবার ক্ষেত্রে ফকীহগণ একমত। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) বলেন, লেন-দেনের ক্ষেত্রে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্যদান ও নারী-সাক্ষ্যের সংখ্যা নির্ধারণে ফকীহদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।[৭৩৪]

দাহ্‌হাক ইব্‌ন মাযাহিম নিম্নের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ[৭৩৫]

لَوْلا جَاؤُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ[৭৩৬]

"যারা সাধ্বী রমনীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী"।

"তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সেই কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যবাদী"।

তিনি বলেন, উপর্যুক্ত আয়াত দু'টিতে ব্যভিচারের অপবাদ প্রমাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা সংখ্যাবাচক শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করে পুরুষের সাক্ষ্য বাধ্যতামূলক করেছেন এবং নারী-সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, ব্যভিচারের অপবাদসহ সকল প্রকার অপাধমূলক বিষয়ে নারী-সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ইমাম যুহরী (র) বর্ণিত নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারাও নিজ অভিমতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন।

مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরবর্তী দুই খলীফার সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে নারী-সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"।[৭৩৭]

তাবিঈ ও পরবর্তী ফকীহদের একটি অংশ নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করে না। আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ, কাতাদা, হাসান বসরী (র) এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন হাযম (র) আল মুহাল্লা গ্রন্থে নিম্নের আয়ত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন।

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]

আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করছেন এবং সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি গুণ যাতে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো

---

[৭৩৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৫৮।

[৭৩৪] সারমীনী, মুহাম্মদ আনাস, *আহলিয়্যাতুল মারআতিল মুসলিমাহ*, (ইস্তাম্বুল: আল কুল্লিয়াতুদ দুওয়ালিয়্যাহ, তা/বি), পৃ. ৮।

[৭৩৫] আল কুরআন, ২৪; ৪।

[৭৩৬] আল কুরআন, ২৪; ১৩।

[৭৩৭] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: কামাল ইয়ূসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং- ২৮৭১৪।

তারতম্য নেই। নিম্নের আয়াতে লেন-দেনের ক্ষেত্রে নারী সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া ও নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের সমতার বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে।

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [৭৩৮]

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক"

ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ (র)

আবু ইয়াকুব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাখলাদ আল হানজালী আল মুরুযী আত তামিমী ১৬০ হিজরীতে তুর্কমেনিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৮ হিজরীতে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তিনি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের একজন অবিসংবাদিত ইমাম। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের দিকপাল। রিজাল শাস্ত্রেরও তিনি একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। বহুমুখী প্রতিভাধর এর মনীষীর মধ্যে স্মরণশক্তি, সততা, দুনিয়াবিমুখিতা ও পরহেযগারীর অপূর্ব সমন্বয় ছিল। ইমাম শাফিঈ (র) ছিলেন তার প্রধান উস্তায ও ইমাম বুখারী (র) প্রধান শিষ্য। ইমাম ইব্ন মাজা (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অধিকাংশ সংকলক তার শিষ্যত্ব বরণ করেন।[৭৩৯]

আহলে ইলমদের নিকট তার মর্যাদার যথেষ্ট স্বীকৃতি ছিল। নাইম ইব্ন হাম্মাদ (র) (মৃ.২২৪ হি.) বলেন,

إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه،

"খোরাসানের কোনো ব্যক্তি ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তাকে দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করতে হবে"।[৭৪০]

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, খোরাসানে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ এর মতো কোনো ফকীহ জন্মগ্রহণ করেননি। এমনকি সমগ্র ইরাকে তার কোনো নজির নেই। তাজুদ্দীন আস সুবকী (র) (৬৮৩-৭৫৬ হি.) বলেন,

ان ابن راهويه أعلم الناس وكل من كان أعلم الناس كان أخشى الناس ينتج كان إسحاق أخشى الناس،

"ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আল্লাহকে অধিক ভয় করেন। সুতরাং ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ আল্লাহকে অধিক ভয় করেন"।

মুহাম্মদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন,

لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق،

"সুফয়ান সাওরী জীবিত থাকলে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ এর অর্জিত হাদীস ও ফিক্হ এর প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন"।

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ইমামদের অন্যতম। আমি সাইদ ইব্ন যুআইবকে বলতে শুনেছি, সমগ্র পৃথিবীতে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ এর মতো কোনো ফকীহ আছে কিনা আমার জানা নেই। ইব্ন খুযায়মা বলেন,

والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه،

---

[৭৩৮] আল কুরআন, ২; ২৮২।

[৭৩৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *মিযানুল ইতিদাল*, (বৈরুতঃ দারুল মারিফাহ, ১৯৬৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮২।

[৭৪০] আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার, *ফতহুল বারী*, (বৈরুতঃ দারুল মারিফা, ১৩৭৯ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৫০২।

"ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত হলে স্মরণশক্তি, প্রজ্ঞা ও ফিকহ শাস্ত্রে তার দক্ষতার স্বীকৃতি পেতেন"।

ইমাম হাকিম (র) বলেন, স্মরণশক্তি ও ফতোয়াদানে তিনি ছিলেন যুগের ইমাম। ইব্‌ন ইসহাক আশ শিরাযী বলেন, তিনি হাদীস, ফিকহ ও বুজুর্গীর মতো তিনটি মহান গুণ আয়ত্ত করেছেন।[৭৪১]

হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ এর মেধা প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের ছাড়িয়ে গেছেন। ফকীহ মুজতাহিদদের সঙ্গে ফিক্‌হ বিষয়ক বিতর্কে তিনি জয়লাভ করে তার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিম্নে ইমাম শাফিঈ (র) ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এর সঙ্গে একটি ফিকহী মোনাযারা (তর্ক) উল্লেখ করা হলো,

ফকীহ ও মুজতাহিদদের এক অনুষ্ঠানে ইমাম শাফিঈ (র) বললেন, পরিশোধনের মাধ্যমে পশুর চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ প্রশ্ন করলেন, এর প্রমাণ কী? ইমাম শাফিঈ (র) নিজস্ব সনদে নিচের হাদীসটি বর্ণনা করলেন,

حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدها،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, তোমরা এটির ছামড়া কেন কাজে লাগাওনি"?

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পূর্বে ইব্‌ন আকিম এর নিকট লিখিত পত্রটি উল্লেখ করেন।

حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ،

"মৃত জন্তুর ছামড়া ও হাড় দ্বারা উপকৃত হয়ো না"।

তিনি বলেন, এ হাদীস দ্বারা মায়মুনা (রা) বর্ণিত উপরের হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফিঈ (র) বললেন, আপনার হাদীসটি একটি পত্র। আমার হাদীস শ্রবণনির্ভর। (هذا كتاب وذاك سماع) সুতরাং আমার দলীল অগ্রাধিকারযোগ্য।

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য ও রোমান সম্রাটের নিকট চিঠি পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যা অনবদ্য দলীল হিসেবে গণ্য।

এ যুক্তি শোনার পর ইমাম শাফিঈ (র) নীরব হয়ে গেলেন।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এ যুক্তি শুনে নিজের মত ত্যাগ করে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ এর মতে ফিরে আসলেন এবং সে মতে ফতোয়া দিতে লাগলেন। কিন্তু ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ ইমাম শাফিঈ (র) এর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেন।

এ বিতর্ক দ্বারা যেভাবে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ এর অকাট্য যুক্তি ও ক্ষুরধার ফিকহী যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনিভাবে ফকীহদের পারস্পরিক সহনশীলতা ও অপরের মতামত গ্রহণে উদারতার প্রমাণ মেলে।[৭৪২]

---

[৭৪১] সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন আলী, *আত তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাতুল কুবরা*, (কায়রো: দারু হাজার, ১৯৯২, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৮৩।

[৭৪২] সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়হ্হাব ইব্‌ন আলী, *আত তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাতুল কুবরা*, (কায়রো: দারু হাজার, ১৯৯২, ২য় সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৮৩।

৪.৩.৪. হিজায এর মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

আরব ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট অঞ্চলকে হিজায বলে। মক্কা-মদীনা তার প্রধানতম অংশ হলেও আরবের বিস্তৃত এলাকা হিজাযের অর্ন্তভুক্ত। হাদীস শরীফে হিজায এর অনেক তাৎপর্য বর্ণিত আছে। এটিই ঈমানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। শেষ যামানায় সমগ্র পৃথিবী থেকে ঈমান সঙ্কুচিত হয়ে হিজাযে চলে যাবে। মক্কা-মদীনা ছাড়াও আরবের বিভিন্ন এলাকায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পশাপাশি ঈমান আমলের চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ফিক্হ চর্চায় হিজাযের মুজতাহিদগণের অবদান অনস্বীকার্য। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অনেক ফকীহ খ্যাতি লাভ করেন। নিম্নে তাদের ইজতিহাদী কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র)

আবু নসর রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র) ইব্ন জারওয়াল আল কিন্দী ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণকারী একজন শ্রেষ্ঠ তাবিঈ ও মুজতাহিদ। তিনি ছিলেন উমার ইব্ন আবদুল আযীয এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং খলীফা আবদুল মালিক ইবনুল মারওয়ান এর মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা। তিনি উমার ইব্ন আবদুল আযীযকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুআজ ইব্ন জাবাল, আবুদ দারদা, উবাদা ইব্নুস সামিতসহ (রা) অনেক জলীলুল কদর সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। তার নিকট থেকে মাকহুল, যুহরী, কাতাদাসহ অনেক তাবিঈ হাদীস ও ফিক্হ এর সবক লাভ করেন। রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র) শামের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হবার সুবাদে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ও আশ্রয়স্থল ছিলেন। আল মিয্যী (র) এর বর্ণনা তার ফিকহী প্রতিভার প্রমাণ বহন করে,

كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد فسأل رجل مكحولا عن مسألة فقال مكحول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة،

"একদা রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ, আদি ইব্ন আদি ও মাকহুল (র) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক লোক মাকহুল এর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে। মকহুল বললেন, আমাদের শাইখ ও সর্দার রাজা ইব্ন হাইওয়া এর নিকট এর সামাধান তালাশ করো"।[৭৪৩]

ইব্ন আউন থেকে বর্ণিত,

"আমি দুনিয়াতে তিনজন ব্যক্তির কোনো উদাহরণ দেখিনি। ইরাকে মুহাম্মদ ইব্ন সিরিন, হিজাযে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ও শামে রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র)"।

নুয়াইম ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত,

قال نعيم بن سلامة ما بالشام أحد أحب إلي أن أقتدي به من رجاء بن حيوة،

"আমার অনুকরণ-অনুসরণের জন্য শামে রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র) থেকে পছন্দনীয় কোনো ব্যক্তি নেই"।[৭৪৪]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে রাজা ইব্ন হায়ওয়াহ (র) এর দক্ষতা সম্পর্কে ইমাম ইব্ন হিব্বান (র) বলেন,

رجاء بن حيوة الكندي أبو المقدام من عباد أهل الشام وزهادهم وفقهاء التابعين وعلمائهم مات سنة اثنتي عشرة ومائة،

[৭৪৩] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১৫৪।

[৭৪৪] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইব্ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১৫৪।

"আবুল মিকদাম রাজা ইব্‌ন হায়ওয়াহ (র) আল কিন্দী ছিলেন শামের শ্রেষ্ঠ আবিদ, দুনিয়াবিমুখ দরবেশ ও তাবিঈদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফকীহ। তিনি **১১২** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন"।[৭৪৫]

৪.৩.৫. ইয়ামামার মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

ইয়ামামা হিজাযের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। সাহাবায়ে কেরামের মুবারক পরশে এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়। আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর খেলাফতকালে মুসাইলামাতুল কায্যাব এর বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধ অঞ্চলটির গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এখানে অনেক ফকীহ মুজতাহিদের উদ্ভব হয়। নিম্নে তাদের ফিকহী কর্মধারা আলোচনা করা হলো।

ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীর (র)

আবু নসর ইয়াহয়া ইব্‌ন সালিহ ইব্‌নুল মুতাওয়াক্কিল আত তায়ী ইয়ামামার একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি বাসারায় কিছুদিন অবস্থান করার পর খোরাসানে গমন করেন এবং দীর্ঘ দশ বছরকাল মদীনায় বসবাস করেন। জলীলুল কদর সাহাবী ও তাবিঈদের নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি তাবিঈদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির (صغار التابعين) অন্তর্ভুক্ত। কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ভাষাতত্ত্ব ও লিখন শিল্পে ছিল তার বহুমুখী দক্ষতা। আবুল আসওয়াদ আল দুয়ালী থেকে নাহু শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে তিনি প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য রাবী। যদিও মাঝে-মধ্যে মুরসাল রেওয়ায়াত করেন। কোনো এক জালিম বাদশাহর সামনে সত্য উচ্চারণের কারণে জুলুমের শিকার হয়ে **১২৯** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৭৪৬]

ইব্‌ন সাদ ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীরকে খোরাসানের ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং শীর্ষস্থানীয় তাবিঈদের (كبار التابعين) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইব্‌ন খায়্যাতও তাকে খোরাসানের প্রথম স্তরের তাবিঈদের মধ্যে শামিল করেছেন।

ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীর নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে গবেষণামূলক অনেক মাসআলা ইসতেম্বাত করেন। তিনি আগুনে পাকানো খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করার পর অযু করা ওয়াজিব মনে করতেন। ইবনুল মুনযির ও ইব্‌ন হাযম তার নিকট থেকে এই মাসআলা বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আয়িশা, আবু হুরায়রা ও ইব্‌ন উমার (রা) এর মতো অনেকেই এই মত পোষণ করেন। তারা আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন।

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضئوا مما مست النار،

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আগুনে পাকানো খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করার পর তোমরা অযু করো"।[৭৪৭]

চার খলীফা, ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাসসহ (রা) অনেক শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর মতে আগুনে পাকানো খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করার পর অযু করা ওয়াজিব নয়। জমহুর তাবিঈ, হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও ইমাম

---

[৭৪৫] ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন মুআয আল বুসতী, *মাশাহীরু উলামাইল আমসার*, (মানসূরা: দারুল ওয়াফা লিত তাবাআ, সম্পাদনা: মারযুক আলী ইবরাহীম, ১৪১১ হি./ ১৯৯১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮৯।

[৭৪৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৭।

[৭৪৭] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৭২, হাদীস নং- ৩৫২।

আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) থেকে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত হয়েছে। তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ،

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি বাহু আহার করার পর অযু না করেই নামায আদায় করেছেন"।[৭৪৮]

ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীরসহ এ মতের অনুসারীগণ এই হাদীসের জবাবে বলেন, উপর্যুক্ত হাদীসে অযু না করার কোনো প্রমাণ নেই। তদুপরি অযু করার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসসমূহ দ্বারা অযু না করার হাদীসসমূহ মানসূখ হয়ে গেছে।

ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া (র)

আবু ওয়াসিলা ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রাহ আল মুযানী ৪৬ হিজরীতে নজদ এর ইয়ামামা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রারম্ভেই তার মধ্যে ইজতিহাদের প্রতিভা পরিদৃষ্ট হয়। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞজনেরা তার নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান খলীফা হবার পূর্বে বাসারায় তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তার ইজতিহাদী যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। আইয়ুব আল সাখতিয়ানী (র), হামীদ আল তাবীল ও হাম্মাদ ইব্‌ন আবি সালামা তার শিষ্যত্ব বরণ করেন।[৭৪৯]

তিনি ছিলেন বাসারার বিশিষ্ট কাযী ও মুজতাহিদ। দাইনুরী বলেন, ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ও সচ্চরিত্রবান ফকীহ ছিলেন। যার কারণে উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয তাকে বাসারর কাযী হিসেবে নিয়োগদান করেন।[৭৫০]

ইব্‌ন শুবরুমা এর সঙ্গে সংঘটিত নিম্নের ঘটনায় তার প্রখর ইজতিহাদী যোগ্যতার প্রমাণ মেলে। ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন,

كان إياس بن معاوية من أفقه أهل البصرة فلما قدم إلى مدينة واسط جعل الناس يقولون قدم البصري قدم البصري فأتاه ابن شبرمة بمسائل قد أعدها له وجلس بين يديه وقال له أتأذن لي أن أسألك؟ قال إياس إن كانت لا تعيب القائل ولا تؤذي الجليس فسل فسأله ابن شبرمة عن بضع وسبعين مسألة فما اختلفا يومئذ إلا في ثلاث مسائل أو أربع رده فيها إياس،

"ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া ছিলেন বসারার শ্রেষ্ঠ ফকীহ। একদা তিনি ওয়াসিত শহরে আগমন করলে। লোকজন বলতে লাগলো, একজন বসরী ফকীহ আগমন করেছে। ইরাকের বিশিষ্ট ফকীহ ইব্‌ন শুবরুমা (র) তার নিকট আসলেন এবং শুধুমাত্র তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য কিছু মাসআলা তৈরি করলেন। তার কাছে ইব্‌ন শুবরুমা বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি। ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া বললেন, বক্তা ও শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক না হলে প্রশ্ন করতে পারেন। ইব্‌ন শুবরুমা তার নিকট ৭০ এর অধিক মাসআলা পেশ করেন। এ মাসআলাসমূহের মধ্যে তিনটি কিংবা চারটির মধ্যেই কেবল তারা ভিন্নমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট মাসআলায় তারা একমত ছিলেন"।[৭৫১]

---

[৭৪৮] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১২৭, হাদীস নং- ২০৭।

[৭৪৯] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৭।

[৭৫০] দাইনুরী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবা, *আল মাআরিফ*, সম্পাদনা: সারওয়াত উকাশা, (কায়রো: আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৭।

[৭৫১] ইব্‌ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৭৫।

নিম্নে তার ইজতিহাদপ্রসূত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো।
ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া তালাকের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য অনুমোদন করতেন। অথচ তখনকার সময়ের অনেক বিশিষ্ট তাবিঈ তালাকের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। তাবিঈ কাতাদা (র) বলেন, আমি হাসান বসরীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, তালাকের ক্ষেত্রে কোনো মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আদি ইব্ন আরতাত উমার ইব্ন আবদিল আযীয (রহ) এর নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তরে তিনি লিখেন, হাসান বসরী ঠিক করেছেন আর ইয়াস ভুল করেছেন।[৭৫২]
তেমনিভাবে তিনি প্রতিবেশীর জন্য শুফআ[৭৫৩] এর অধিকার সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু উমার ইব্ন আবদিল আযীয (রহ) এর পত্র আসার পর থেকে এই দুইটি বিষয়ে শুফআ এর ফায়সালা দিতেন। যদি দুইজন শরিকদার অংশিদারের ভিত্তিতে কোনো জায়গার মালিক হতেন অথবা এমন কোনো আবদ্ধ ঘর হয় যেখানে একটিমাত্র দরজা থাকে।
ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া একজন মুসলিম এর বিরুদ্ধে কোনো অমুসলিম নাগরিক এর শুফআ'র ব্যাপারে মামলা দায়ের করলে অমুসলিম নাগরিক এর পক্ষে শুফআ এর ফায়সালা প্রদান করেন।[৭৫৪]
ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া পরিচিত অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি কোনো বিচারের ক্ষেত্রে কাদতাদা এর সাক্ষ্য গ্রহণ করে বলেন, আমি আপনাকে না চিনলে কখনো আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম না।

মায়মুন ইব্ন মিহরান (র)

আবু আইয়ুব মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) আল জাযরী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়ার (ফোরাত নদীর উপকূলীয়) আল রাক্কা শহরে বসতি স্থপিন করেন। আবু হুরায়রা, আয়িশা, ইব্ন আব্বাস, ও ইব্ন উমার (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সুলায়মান আল আমাশ, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত ও আবদুর রহমান আল আওযায়ী তার শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ, কাযী, মুসলিম বিশ্বের ইমাম ও মুজতাহিদ। উমার ইব্ন আবদুল আযীয তাকে স্বীয় সন্তানদের শিক্ষক ও বিচারক পদে নিয়োগদান করেন।[৭৫৫]
তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইকরামা থেকেও অধিকতর নির্ভরযোগ্য।[৭৫৬]
মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ফিক্হ শাস্ত্রে মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) এর অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জীবনীকার মিয্যী (৬৫৪-৭৪২ হি.) বর্ণনা করেন,

---

[৭৫২] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি,/ ১৯৪৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০, ।

[৭৫৩] ক্রেতার ভূমির সঙ্গে কারো ভূমি সংযুক্ত হওয়ার কারণে অংশিদারিত্ব ও প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে অন্যের ভূমির উপর অধিকার লাভ করাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শোফআ বলা হয়। (আল ইনায়াঃ শরহুল হেদায়া)

[৭৫৪] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৬৬ হি,/ ১৯৪৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৬ ।

[৭৫৫] যিরিক্লি, খাইরুদ্দীন ইব্ন মাহমুদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী, *আল আলাম*, (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মিলিয়ন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৪২।

[৭৫৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭৮।

حدثنا ميمون ابن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فجعلت أسأله فقال: إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما هاهنا قبل اليوم،

"মায়মুন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) বলেন, আমি মদীনায় আগমনের পর তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আমি জানতে পারলাম। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হলেন মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ। আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলাম। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব আমাকে বললেন, আপনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় প্রশ্ন করছেন। মনে হয় আপনি এখানকার সর্ববিষয়ে পূর্ব থেকে পূর্ণ অবগতি লাভ করেছেন"।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করার পর বললেন, আরব উপদ্বীপের কোনো লোক আমার নিকট এতো জটিল বিষয়ে সমাধান চায়নি।

উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) মায়মুন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) সম্পর্কে বলেন,

إذا ذهب هذاوضرباؤه صار الناس من بعده رجاجا،

"এই লোকটি অথবা এই শ্রেণির লোক পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে"।

খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান আরবের ফকীহ সম্পর্কে জানতে চাইলে সবাই মায়মুন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) এর নাম বলেন।[৭৫৭]

নিম্নে মায়মুন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) এর ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা বর্ণনা করা হলো, ফরজ গোসলের নিয়ম হলো, নিয়ত সহকারে সমগ্র শরীরে পানি ভাসিয়ে দেয়া। কুলি করা, নাকে পানি দেয়া ও শরীর মালিশ করা গোসলের ওয়াজিব নয়। ইব্‌ন আবদিল বার (র) (মৃ.৪৬৩) বলেন, গোসলের ফরজ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলসহ (র) জমহুর ফকীহদের মতে পুরো শরীরে পানি পৌঁছে গেলে মালিশ না করলেও গোসল সম্পন্ন হয়ে যাবে। সুফ্‌য়ান সাওরী, আওযায়ী, শাবী, ইবরাহীম নাখায়ী ও হাসান বসরী এবং অধিকাংশ ফকীহ এই মত পোষণ করেন।[৭৫৮]

তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।[৭৫৯]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ فِي الْغُسْلِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ،[৭৬০]

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا،[৭৬১]

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৩ হি.) বলেন, অযু-গোসলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মালিশ করা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। কোনো ব্যক্তি নিয়ত সহকারে হাত দ্বারা স্পর্শ না করে পুরো শরীরে পানি পৌঁছালে, অথবা পানিতে ডুব

---

[৭৫৭] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ২১৫।

[৭৫৮] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল কুরতুবী, *আল তামহীদ*, সম্পাদনা: মুস্তফা ইব্‌ন আহমাদ আল আলাবী, (মরক্কো: ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.), খ, ২২, পৃ. ৯২।

[৭৫৯] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), পৃ. ২৫৯, হাদীস নং- ৩৩০।

[৭৬০] বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, *আল সুনানুস সগির*, সম্পাদনা: আবদুল মুতী, (করাচি: জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস নং- ১৪৯।

[৭৬১] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ যুহাইর ইব্‌ন নাসির, (দারু তুকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ২৫৬।

দিলে, কিংবা বৃষ্টি ও ঝরনার পানিতে গা ভাসিয়ে দিলে তার অযু-গোসল আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (র) এর মতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ মালিশ না করলে গোসল আদায় হবে না। তিনি বলেন,

إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالته يدك،

"ফরজ গোসলের সময় শরীর মলতে হবে এবং শরীরের সব জায়গায় হাত পোঁছাতে হবে"।

৪.৩.৬. মিসরের মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

একুশ হিজরীতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাসনামলে আমর ইবনুল আস (রা) এর নেতৃত্বে মিসর বিজয় হয়। নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন কুরাইশ বংশীয় সাহাবী আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী মুজতাহিদ। ইসলামের বিজয়ের পাশাপাশি তার নেতৃত্বে মিসরে একটি চৌকস মুজতাহিদ জামাত গঠিত হয়। তদুপরি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সযত্ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই জামাত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আরো বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। যথাযথ অনুশীলন ও পরিচর্যার ফলে মিসরে একটি মুজতাহিদ ও ফকীহ শ্রেণির উন্মেষ ঘটে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবিব, বুকাইর ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌নুল আশাজ, লাইস ইব্‌ন সাদ, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবি জাফর। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব, উসমান ইব্‌ন কিনানা ও আশহাব মুজতাহিদ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। এরপর ইমাম শাফিঈ এর শিষ্যদের মধ্যে, মুযানী, বুআইতি, ইব্‌ন আবদিল হাকাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়ূসুফ ও আবু জাফর আত তাহাবী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীব (র)

আবু রাজা ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীব আল আযদী মিসরের একজন প্রখ্যাত তাবিঈ, ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। মিসরের প্রধান মুফতী ও আলিম হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৫৩ হিজরীতে ইয়াযিদ ইব্‌ন মুআবিয়ার খেলাফতকালে ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইব্‌ন জুয আর যুবাইদী, মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল ইয়াযনী ও আবুত তুফাইল (রা) এর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাদের নিকট হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। সুলায়মান আল তাইমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আমর ইব্‌ন হারিস ও ইব্‌ন লাহিয়া তার নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীব ফিক্‌হ ও হাদীসের পাশাপাশি কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য ঘটনাবলি সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। মিসর বিজয় ও এ সংক্রান্ত ঘটনাবলি ছিল তার নখদর্পনে। মিসরের প্রখ্যাত ফকীহ লাইস ইব্‌ন সাদ ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবিবকে মিসরের আলিম ও ফকীহদের সর্দার হিসেব আখ্যায়িত করেন। ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বর্ণনা করেন,

قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ بنُ يُوْنُسَ كَانَ مُفْتِي أَهْلِ مِصْرَ فِي أَيَّامِه وَكَانَ حَلِيْماً عَاقِلاً وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ العِلْمَ بِمِصْرَ وَالكَلاَمَ فِي الحَلاَلِ وَالحَرَامِ وَمَسَائِلَ وَقِيْلَ إِنَّهُم كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَتَحَدَّثُوْنَ بِالفِتَنِ وَالمَلاَحِمِ وَالتَّرغِيبِ في الخير،

"আবু সাইদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন, ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীব ছিলেন সে যুগে মিসরবাসীদের মুফতী। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে ফিক্‌হ শাস্ত্রের দরস প্রদান করেন এবং

হালাল হারাম বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইতোপূর্বে মিসরে ফিতান ও যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা হতো এবং ভালো কাজে উৎসাহমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল”।[৭৬২]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহিয়া (র)

আবু আবদির রহমান আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহিয়া ইব্‌ন (র) উকবা আল হাদরামী ৯৭ হিজরীতে মিসরের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরের উল্লেখযোগ্য মুজতাহিদদের মধ্যে একজন প্রজ্ঞাবান ফকীহ এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস। তিনি আরাজ, আবুয যুবাইর ও ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি হাবীব থেকে শিক্ষা লাভ করেন। আমর ইবনুল হারিস, লাইস ইব্‌ন সাদ ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন।[৭৬৩]

ফিক্‌হ শাস্ত্রে দক্ষতার কারণে খলীফা আবু জাফর মনসুর তাকে মিসরের কাযী পদে নিয়োগ দান করেন। মিসরে খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত তিনিই একমাত্র কাযী। ইতোপূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযী গণ অন্য কাযীদের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। ১৫২ হিজরীতে আবু খুযায়মা ইবরাহীম ইব্‌ন যাইদ এর মৃত্যুর পর তিনি এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মুসলিম বিশ্বের ফকীহ ও মুজতাহিদদের নিকট তিনি অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন। তার ফিকহী প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন তৎকালীন বিশ্বের সকল ফকীহ। মক্কার বিশিষ্ট ফকীহ ইব্‌ন জুরাইজ একবার ইরাকে আগমনের পর খলীফা মনসুর এর নিকট গমন করেন। খলীফা তার নিকট কাযী নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তার পরামর্শক্রমে ইব্‌ন লাহিয়া নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সর্বপ্রথম তার জন্য সরকারী ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তিনি ১৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৭৬৪]

উসাইলা আস সুনাবিহী (র)

আবু আবদিল্লাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন উসাইলা আস সুনাবিহী (র) আল মুরাদী হিময়ার বংশোদ্ভূত একজন মিসরীয় ফহিক ও তাবিঈ। আবু বকর, উমার, মুআজ ইব্‌ন জাবাল, বিলাল ইব্‌ন রাবাহসহ (রা) প্রথম সারির সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আতা ইব্‌ন ইয়াসার, মাকহুলসহ (র) অনেক জলীলুল কদর তাবিঈ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং ফিকহ শাস্ত্রের দরস লাভ করেন। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর শাসনালে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। জীবনীকারদের কোনো গ্রন্থে তার জন্ম ও মুত্যুসাল পাওয়া যায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পর তিনি মদীনা আগমন করেন। ইমাম ইব্‌ন কাসীর (র) (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, উসাইলা আস সুনাবিহী (র) একজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ছিলেন, কুরআন সুন্নাহ ও ফিকহ শাস্ত্রে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হবার কারণে খলীফা আবদুল মালিক তার সঙ্গে একই খাটে বসতেন। ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন, উসাইলা আল সুনাবিহী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে তিনি খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রই ছিল তার প্রতিপাদ্য।[৭৬৫]

---

[৭৬২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২০৭।

[৭৬৩] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৭।

[৭৬৪] সাফাদী, সালাহুদ্দীন খলীল ইব্‌ন আইবেক ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬।

[৭৬৫] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রো: মাওসুআতুত তারাজুম ওয়াল আলাম, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৮২।

কাযী আবদুল হামীদ (র)

কাযী আবদুল হামীদ (র) ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন সাদ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর শামনামলে ইরাকের আনবার শহরে জনগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বনু উমাইয়া শাসকদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জীবনীকার সাফাদি'র (৬৯৬-৭৬৪ হি.) বর্ণনা মতে তিনি ১৩২ হিজরীতে মারওয়ান এর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৭৬৬]

তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ভাষাবিদ। উমাইয়া শাসনামলের একজন কাযী হিসেবে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। বহুমুখী শাস্ত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি বিচারব্যবস্থায় প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কাযী আবদুল হামীদ (র) উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (রহ) এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমার আদালতে এমন একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে নিন্দাবাদ ও গালমন্দ করেছে। আমি তাকে হত্যা করার হুকুম দেয়ার মনস্থির করার পর সে মত পরিত্যাগ করি এবং তাকে গ্রেফতার করি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে মতামত জানার জন্য অপনার নিকট পত্র লিখলাম। উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) কাযীর নিকট উত্তর লিখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কূৎসা রটনা ও গালমন্দ করার অপরাধ ছাড়া অন্য কাউকে এ অপরাধে হত্যা করা জায়েয নয়।

কিন্তু কাযী আবদুল হামীদ (র) এর এ সংক্রান্ত নস জনা থাকা সত্ত্বেও এই মর্মে ইজতিহাদ করেন যে, আমিরুল মুমিনীনকে নিন্দাবাদ করার অপরাধে কাউকে হত্যা করার মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিশাল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এতে মুসলিম সমাজ বড় ধরনের বিশৃংখলা থেকে রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমাজে অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এর প্রতিকার করার লক্ষ্যে নিন্দাকারীরকে হত্যা করা প্রয়োজন। কিন্তু আমিরুল মুমিনীন এর ইজতিহাদ ও চিন্তাধারা হলো, খলীফাতুল মুসলিমিন এর নিন্দাবাদের অপরাধে কাউকে হত্যা করা আল কুরআনের স্পষ্ট নস এর সম্পূর্ণ পরিপন্থি। যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে পরবর্তীতে একজন শাসক ন্যূনতম অপরাধের কারণে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিবে। [৭৬৭]

হিব্বান ইব্‌ন শুরায়হ (র)

হিব্বান ইব্‌ন শুরায়হ (র) মিসরের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্নর। তিনি স্বীয় ইজতিহাদী যোগ্যতাবলে ফিক্‌হ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। প্রয়োজনে তিনি খলীফার নিকট নির্দেশনা তলব করতেন। হিব্বান ইব্‌ন শুরাইহ করারোপ সংক্রান্ত একটি মাসআলায় খলীফা উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের দ্রুত ইসলাম গ্রহণের কারণে সরকারী অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে এবং কর ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তারা কর আদায়ের ভয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। একজন ফকীহ ও মুজতাহিদ হবার সুবাদে তার নিকট এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তার খাতিরে সরকারী তহবিলে নির্দিষ্ট কর আদায় করতে হয়। এই কর কোনো মুসলিম নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট লাঘবের জন্য তিনি খলীফার নিকট স্বীয় ইজতিহাদকৃত মাসআলার শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাইয়ের জন্য পত্রযোগাযোগ করেন।

খলীফা তার চিঠির উত্তরে লিখলেন,

---

[৭৬৬] সাফাদী, সালাহুদ্দীন খলীল ইব্‌ন আইবেক ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত*, সম্পাদনা: আহমাদ আল আরনাউত ও তুর্কী মুস্তফা, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ১৮, পৃ. ৫৩।

[৭৬৭] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রো: মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৩ খ্রি./১৩৬২ হি.), পৃ. ৯২।

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অসংখ্য দরুদ। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের দায়ী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কর আরোপকারী হিসেবে নয়। সুতরাং অমুসলিম নাগরিকেরা যদি সবাই ইসলাম গ্রহণ করে তবে আপনার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছামাত্র যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রেখে রাজধানীতে চলে আসুন'।

এখানে গভর্নরের ইজতিহাদের মর্ম হলো, অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হলো কর আদায় থেকে মুক্তি লাভ করা। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আইন প্রণয়ন করে শাস্তির আওতায় আনা দরকার। কিন্তু উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) গভর্নরকে জানিয়ে দিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের কারণ যাই হোক, কোনো মুসলমানের উপর করারোপ করা যাবে না। তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণটি একটি গোপন বিষয়। কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান না করে তা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।[৭৬৮]

৪.৩.৭. স্পেনের মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

তারিক ইব্ন যিয়াদ এর অধিনায়কত্বে ৯২ হিজরীতে স্পেনে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এতদঞ্চল ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। বিজিত অঞ্চলে ইসলামের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ফিক্হ শাস্ত্র একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরামের সযত্ন তত্ত্বাবধানে গঠিত একদল ফকীহ এখানে ফিক্হচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিকহ্ শাস্ত্রের অগ্রযাত্রা ও বিকাশধারা অব্যাহত থাকে। এ ধারাবাহিকতায় যারা সংযুক্ত হন তাদের ফিকহী কার্যক্রমের কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো। স্পেনের ফকীহদের মধ্যে যারা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তারা হলেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া, আবদুল মালিক ইব্ন হাবিব, বাকি ইব্ন মাখলাদ, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, কাযী মাসলামা ইব্ন আবদুল আযীয, মুনযির ইব্ন সাঈদ, আবু মুহাম্মদ ইব্ন হাযম, মাসউদ ইব্ন সুলায়মান, ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল বার।

ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)

আবু মুহাম্মদ ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন কাসীর আল লাইসী (র) ১৫২ হিজরীতে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ রজব ২৩৪ হিজরীতে কর্ডোভায় ইন্তেকাল করেন ও তথায় সমাহিত হন। তিনি স্পেন এর প্রধান ফকীহ ও মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত ইমাম। ইমাম মালিক প্রণীত মুয়াত্তা কিতাব এর প্রধান রাবী ও তৎকালীন যুগে মালিকী মাযহাবের প্রধান শাইখ। প্রাচ্য-প্রতিচ্যের মুহাদ্দিসগণ তার নিকট থেকে কিতাবটি গ্রহণ করেছেন। তিনি ইয়াহয়া ইব্ন মুদার আল কাইসী (র) থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর প্রাচ্যে ভ্রমন করেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে ইমাম মালিক এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর লাইস ইব্ন সাদ, সুফ্য়ান ইব্ন উয়াইনাসহ অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র) এর দুই সন্তান ইসহাক ও উবাইদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াদ্দাহ তার নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের দরস লাভ করেন। প্রজ্ঞাবান ফকীহ হবার সুবাদে ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ইমাম মালিক (র) এর নিকট ছিলেন খুবই সমাদৃত। ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়াকে তিনি আন্দালুস এর সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ফকীহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন লুবাবা তাকে স্পেনে হাদীস শাস্ত্রের পুরোধা হিসেবে গণ্য করেছেন। উমাইয়া খলীফাদের নিকট তিনি অতি

---

[৭৬৮] শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, (কায়রো: মাতবাআতুল আযহার, ১৩৬২ হি./ ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ৯২।

সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তার অভিজ্ঞতা ও অবদানের এতই কিংবদন্তি ছিল যে, তার পরামর্শ ব্যতীত স্পেনের শাসকগণ কোথাও বিচারক নিয়োগ দিতেন না।[৭৬৯]
ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তার মধ্যে অনেক মহৎ গুণের সমাহার ছিল। অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন ফকীহ হিসেবে তার খ্যাতি ছিল স্পেন এর সর্বত্র। তার পরামর্শে কাযী নিয়োগলাভ করতো, অথচ তিনি কখনো এ পদ অলংকৃত করেননি। তিনি শাসকদের নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বাজায় রাখতেন।
স্পেনের গভর্নর আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম আল মারওয়ানী রমজান মাসে দিনের বেলায় কৃতদাসীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ সঙ্কটের শরয়ী সমাধানের জন্য তিনি দেশের ফকীহদের আমন্ত্রণ করেন। তিনি ফকীহদের উপস্থিতিতে গভর্নর এর জন্য লাগাতার দুই মাস রোযা রাখার ফতোয়া প্রদান করেন। ফতোয়ার মজলিস শেষে অন্যান্য ফকীহগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি আমাদের মালিকী মাযহাব অনুযায়ি গভর্নরের জন্য তিনটি অপসনের (গোলাম আযাদ, মিসকিনকে খাদ্যদান ও রোযা রাখা) মধ্যে কোনা একটি নির্বাচন করার সুযোগ দেননি কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমি এ সুযোগ দিলে তারা প্রতিদিন রোযা রেখে দিনের বেলায় সঙ্গমে লিপ্ত হবে এবং গোলাম আযাদ করে অথবা মিসকিনকে অন্ন দানপূর্বক কৃতকর্মের কাফ্ফারা আদায় করবে। শরীয়তের বিধান খেলনায় পরিণত হবার আশঙ্কায় সহজ পন্থা পরিহার করে কঠিন অপসনে ফতোয়া দিয়েছি।[৭৭০]
মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ ইব্ন আবদিল বার বলেন,

قَدِمَ يَحْيَى بنُ يَحْيَى الأَنْدَلُسَ بِعِلمٍ كَثِيْرٍ فَعَادَتْ فُتْيَا الأَنْدَلُسِ بَعْدَ عِيْسَى بنِ دِيْنَارٍ الفَقِيْهِ عَلَيْهِ وَانْتَهَى السُّلْطَانُ وَالعَامَّةُ إِلَى رَأْيِهِ وَكَانَ فَقِيْهاً حَسَنَ الرَّأْيِ،

"ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ফিক্হ শাস্ত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে স্পেনে আগমন করেন। ঈসা ইব্ন দীনার এর পর ফতোয়া প্রদানে ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ছিলেন সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। কেবলমাত্র বাদশাহই নয়; দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীও তার মতামত নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। ফকীহ হিসেবে তিনি চমৎকার সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতা রাখতেন"।[৭৭১]

৪.৩.৮. ইয়ামেন এর মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

ইসলামের সূচনালগ্নেই ইয়ামেনে ইসলামের বিকাশ ঘটে। মদীনায় ইসলামী হুকুমতের ভিত্তি স্থাপিত হবার পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে আলী ইব্ন আবি তালিব ও মুআয ইব্ন জাবালকে (রা) ইয়েমেনে পাঠানো হয়। মানব মুক্তির এ আহ্বানে এতদঞ্চলের মানুষ সহজেই সাড়া দেয়। পরবর্তীতে এখানে ইসলামের বিজয় সুদৃঢ়ভাবে সম্পন্ন হয়। আলী ও মুআয ইব্ন জাবাল (রা) ছিলেন সাহাবা যুগে ফিক্হ শাস্ত্রের দিকপাল। আলী (রা) ছিলেন জ্ঞানের শহরের প্রধান ফটক। আর মুআয ইব্ন জাবাল (রা) ছিলেন হালাল হারাম সম্পর্কীয় বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। এই দুইজন মহান সাহাবীর সান্নিধ্যে এতদঞ্চলে ফিক্হ শাস্ত্রের একটি মজবুত ঘাঁটি

---

[৭৬৯] ইবনুল ফারজী, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়ূসুফ ইব্ন নাসার আল আযদী, *আল আবার ফী খবারি মান গাবার*, (কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজি, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৮৭।
[৭৭০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫১৮।
[৭৭১] প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১৮।

স্থাপিত হয়। কালের পরিক্রমায় এ পাঠশালায় অনেক যোগ্য ফকীহ ও মুজতাহিদের অভ্যুদয় ঘটে। কাযী মুতাররাফ ইব্ন মাযিন, আবদুর রাযযাক ইবনুল হুমাম, হিশাম ইব্ন ইয়ূসুফ, মুহাম্মদ ইব্ন সাওর, সিমাক ইবনুল ফাজাল প্রমুখ ইয়ামেনের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফকীহ। হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এখানে ফিক্হ শাস্ত্রের যে চর্চা হয়, নিম্নে তার আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

তাউস ইব্ন কায়সান (র)

আবু আবদির রহমান তাউস ইব্ন কায়সান (র) ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের একজন কিংবদন্তি ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা উসমান ইব্ন আফফান (রা) এর খেলাফতকালে তাউস ইব্ন কায়সান ইয়ামেনে জন্মগ্রহণ করেন। মাওয়ালী (আযাদকৃত গোলাম) পরিবারে তার জন্ম । তাউস শব্দের অর্থ ময়ূর। কারীদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় ও কোকিল কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন বলে তাকে তাউস বলা হতো। তিনি প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আয়িশা, আবু হুরায়রা, যাইদ ইব্ন আরকাম, ইব্ন উমার, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হাসান বাসারী এর সমপর্যায়ের ফকীহ এবং নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদদের একজন। ইবাদত, যুহদ, ইলম ও আমল এর অপূর্ব সমাহার ছিল তার মধ্যে। জীবনে তিনি চল্লিশ বার হজ পালন করেন। তিনি প্রায় সময় এই দোয়া করতেন।

اللهم احرمني الولد والمال وارزقني الايمان والعمل،

"হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান ও ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করুন। ঈমান ও আমল দান করুন"।

তিনি শাসকদের দরবার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং খলীফা ও গভর্নরদের উপদেশদানের ব্যাপারে ছিলেন নির্ভিক। বর্ণিত আছে, সুলায়মান ইব্ন আবদিল মালিক একবার হজ করার উদ্দেশে মক্কা গমন করেন। হজ্বের মাসআলা সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধি দলসহ খলীফা তার দরবারে উপস্থিত হন। তিনি খলীফাকে এই মর্মে উপদেশ প্রদান করেন, 'জাহান্নামে এমন একটি গর্ত আছে। যেখানে একটি পাথর সত্তর বছর নিম্নগামী হবার পর স্থির হয়। আপনি কী জানেন এটা কাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে? খলীফা উত্তর দিলেন, না। উত্তরে তাউস বললেন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার স্থলাভিষিক্ত করেন অথচ তারা মানুষের প্রতি জুলুম করে' তাদের জন্য। এ কথা শোনার পর খলীফা কাঁদতে লাগলেন। তিনি ১০৬ হিজরীতে মুযদালিফায় ইন্তেকাল করেন।[৭৭২]

তাবিঈ তাউস ইব্ন কায়সান ও আতা ইব্ন আবী রাবাহ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর শিষ্য হবার সুবাদে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করেন। এই দুইজন মহান মুজতাহিদ তৎকালীন যুগে নিজেদের ইজতিহাদী যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। ইতিকাফ এর ক্ষেত্রে রোযা শর্ত কিনা এ বিষয়ে তাদের ইজতিহাদকৃত একটি মাসআলা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইব্ন হাযম 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবু সুহাইল ইব্ন মালিক ও ইব্ন শিহাব যুহরী (র) একদা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন, আবু সুহাইল বলেন, আমার স্ত্রীর উপর মসজিদে হারামে তিন দিনের ইতিকাফ ওয়াজিব ছিল। এখন তার কি করা উচিৎ? ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন, রোযা রাখা ব্যতীত কোনো ইতিকাফ হতে পারে না। উমার ইব্ন আবদুল আযীয যুহরীকে প্রশ্ন করলেন, এ বিষয়ে কি আপনার নিকট রাসূল এর কোনো সুন্নাহ আছে? তিনি বললেন, না। উমার ইব্ন আবদুল আযীয যুহরীকে আবার প্রশ্ন করলেন, তবে কি আবু বকর (রা) এর কোনো নির্দেশনা আছে? তিনি বললেন, না। তবে কি উমার (রা) এর কোনো নির্দেশনা আছে? তিনি উত্তর দিলেন, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তবে কি উসমান (রা) এর কোনো

[৭৭২] ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন*, (কায়রো: দারুল আদাবিল ইসলামী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৯০।

মতামত আছে? তিনি উত্তর দিলেন, না। আবু সুহাইল বললেন, আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং তাউস ও আতা এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাদের নিকট এ বিষয়ের সমাধান জানতে চাইলাম। তাউস বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইতিকাফকারীর উপর রোযা রাখা বাধ্যতামূলক বলে মনে করতেন না। তবে নিজের উপর কেউ এটি আবশ্যক করে নিলে তা ভিন্ন কথা। আতা বলেন, আমার মতামতও তাই।[৭৭৩]

ইমাম শাফিঈ (র) ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক এর কিছু অনুসারী এ মতের প্রবক্তা। ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে ওয়াজিব ইতিহাফ এর ক্ষেত্রে রোযা শর্ত; নফল এর ক্ষেত্রে নয়। মালিকী মাযহাবে ওয়াজিব হোক বা নফল যে কোনো ইতিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। ইব্‌ন রুশদ সকল মতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসেই ইতিকাফ থাকতেন। যার ফলে রোযা রাখাকে অনেকেই ইতিকাফের শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রধান দলীল হলো, আল্লাহ তায়ালা রোযার আয়াতের সঙ্গে ইতিকাফকে সমন্বয় করে আলোচনা করেছেন। যা দ্বারা ই'তকাফের জন্য রোযা শর্ত হবার প্রমাণ বহন করে। যারা রোযা রাখা 'তিকাফের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেননি তাদের ধারণা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফের সঙ্গে রোযার সংযুক্তি ছিল একটি কাকতালীয় বিষয়। ইতিকাফ রোযার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তবে ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত না হলেও মোসতাহাব হবার ক্ষেত্রে অনেকেই একমত পোষণ করেন।[৭৭৪]

মামার ইব্‌ন রাশেদ (র)

আবু উরওয়া মামার ইব্‌ন রাশেদ ইব্‌ন আবি আমর আল আযদী একজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ৯৫ হিজরীতে বাসারায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইয়ামেনে বসতি স্থাপনপূর্বক ১৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) এর সান্নিধ্য গ্রহণপূর্বক তার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের দরস লাভ করেন। এছাড়াও কাতাদা, আমর ইব্‌ন দীনার, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি কাসীরসহ (র) অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, গুনদুর, ও আবদুর রায্‌যাক প্রমুখ। ইয়ামেনে তিনিই হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র সুবিন্যস্ত করেন এবং গ্রন্থ রচনা করেন। জামি মামার ইব্‌ন রাশেদ তার অনবদ্য কীর্তি। ইব্‌ন নাদিম (র) (মৃ.৩৮৪ হি.) বলেন, মাগাযী বিষয়েও তার একটি গ্রন্থ আছে।[৭৭৫]

ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন শাখায় তার পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন,

عليكم بمعمر فإنه لم يبقَ في زمانه أعلم منه،

"তোমরা মামার এর মূল্যায়ন করো। কেননা সমসাময়িকদের মধ্যে তার চেয়ে বড়ো জ্ঞানী আর কেউ অবশিষ্ট নেই"।[৭৭৬]

---

৭৭৩ ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমদ, *আল মুহাল্লা বিল আসার*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ৪১৪।

৭৭৪ ইব্‌ন রুশদ, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ, *বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাসিদ,* (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৯।

৭৭৫ ইব্‌ন নাদীম, আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ফিহ্‌রিস্ত*, (বৈরুত: দারুল মারিফা, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৩।

৭৭৬ যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি,), খ. ১, পৃ. ১৪২।

ইব্‌ন হিব্বান (র) বলেন,

...وَكَانَ فَقِيها متقنا حَافِظًا ورعا،

"মামার ইব্‌ন রাশেদ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ফকীহ, হাদীসের হাফিজ ও পরহেযগার"।[৭৭৭]

প্রখ্যাত জীবন চরিত প্রণেতা যিরিক্‌লী (র) বর্ণনা করেন,

...فقيه حافظ للحديث متقن ثقة من أهل البصرة،

"মামার ইব্‌ন রাশেদ ছিলেন একজন ফকীহ, তিনি বসারার দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য একজন হাদীসের হাফিজ"।[৭৭৮]

৪.৩.৯. বাগদাদের মুজতাহিদ তাবিঈগণের ইজতিহাদ

আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসে বাগদাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী, প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ও দীর্ঘ পাঁচশত বছরের আব্বাসী খেলাফতের দারুল খিলাফাহ হবার সুবাদে বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ইজতিহাদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরামের পরশধন্য এ অঞ্চল অনেক মুজতাহিদের পদভারে মুখরিত হয়েছে। নিম্নে বাগদাদের মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ সংক্রান্ত কীর্তি আলোচনা করা হলো।

আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র)

আবু উবাইদ আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম ইব্‌ন মিসকীন ইব্‌ন যায়দ আল হারাবী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ভাষাতত্ত্ব ও রিজাল শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম। ফিক্‌হ ও হাদীস ছাড়াও ইসলামী অর্থনীতিতে রচিত গ্রন্থাবলি তার স্বার্থক জীবনের স্মৃতি বহন করে। তিনি ১৫৭ হিজরীতে আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৪ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জনে তিনি ইরাক ভ্রমন করেন এবং তথাকার মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ইমাম শফিঈ, আবু ইয়ূসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী (র) এর নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। আরবী ব্যাকরণবিদ আল কাসায়ী ও আল ফার্‌রা তার অন্যতম শিক্ষক। ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ, ইমাম বুখারী ও দারিমী (র) তার প্রধান প্রধান শিষ্য।[৭৭৯]

এই মহান জ্ঞানতাপস বিজ্ঞ মহলে অপরিসীম মর্যাদার আসন গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন মনীষীর মূল্যায়ন বর্ণনা করে ইমাম যাহাবী (র) আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম সম্পর্কে বলেন,

لقد مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة بالشافعي فَقِه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي عبيد فسَّر غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاهم لذهب الإسلام ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ،

---

[৭৭৭] ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন মুআজ আল বুসতী, *আস সিকাত*, (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৩৩৯ হি./১৯৭৩ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪৮৪।

[৭৭৮] যিরিক্‌লি, খাইরুদ্দীন, ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ফারিস, *আল আলাম*, (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মিলিয়ন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭২।

[৭৭৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৪৯১।

“আল্লাহ তায়ালা চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন। রাসূল এর হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন ইমাম শাফিঈ (র)। হাদীসের জটিল শব্দাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কঠোর সাধনা করেছেন আবু উবাইদ আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র)। জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের মূলোৎপাটন করেছেন ইমাম ইয়াহয়া ইব্‌ন মুইন (র)। ‘কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি’ সংক্রান্ত ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আক্রমণে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) অবিচল থেকে রাসূল এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন। এ সকল মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে ইসলামের সঠিক ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাদের জন্ম না হলে মানুষ মারাত্মক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হতো।[৭৮০]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লামকে ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় চারজন ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করেছেন।

كان للناس أربعة ابْن عَبَّاس في زمانه، والشعبي في زمانه والقاسم بْن معن في زمانه وأبو عُبَيْد القاسم بن سلام في زمانه،

“চারজন ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। সাহাবীদের যুগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), তাবিঈদের যুগে শাবী (র), পরবর্তী যুগে কাসিম ইব্‌ন মাআন (র) ও তৎপরবর্তী যুগে আবু উবাইদ আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র)”।[৭৮১]

আবুল আব্বাস বলেন,

لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبًا،

“আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম বনি ইসরাইলে জন্মগ্রহণ করলে একটি বড় নিদর্শন হয়ে থাকতেন”।[৭৮২]

আবু সাওর আল কালবী (র)

আবু আবদিল্লাহ ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ আবু সাওর আল কালবী (র) ইরাকের অন্যতম মুজতাহিদ ও প্রধান মুফতী । তিনি ১৭০ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের সূচনালগ্নে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন। পরবর্তীতে ইমাম শফিঈ (র) এর প্রধান সহচর ও তার প্রাচীন উক্তিসমূহের বর্ণনাকারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ইজতিহাদের প্রাথমিক স্তরে তিনি একটি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠাতা করেন। ইমাম শাফিঈ (র) এর ইরাক আগমনের পর নিজের মাযহাব ত্যাগ করে ইমাম শাফিঈ (র) এর মাযহাবের তাকলীদ শুরু করেন।[৭৮৩]

আবু সওর ইমাম আহমাদ ও তার শাইখদের নিকট থেকেও হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও ইব্‌ন মাজা (র) তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ২৪৬ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন,

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عَنْهُ فَقَالَ أعْرِفُهُ بِالسُّنَّةِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً وهُوَ عِنْدِي فِي مِسْلاَخِ سُفْيَانَ الثَّوْرِي،

---

[৭৮০] ইয়াফিঈ, আবু মুহাম্মদ আফীফুদ্দীন আবদুল্লাহ, *মিরআতুল জিনান*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৪।

[৭৮১] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪০৮।

[৭৮২] আস সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব তাকিউদ্দীন, *আত তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাতুল কুবরা*, (কায়রোঃ মাকতাবু হাজার লিত তাবাআ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), খ. ২, পৃ. ১৫৫।

[৭৮৩] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬।

"আবু বকর আল আয়ুন বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলকে আবু সওর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি পঞ্চাশ বছর যাবত তাকে সুন্নাহ চর্চা করতে দেখেছি। আমার মতে তিনি সুফ্য়ান সাওরী (র) এর সমপর্যায়ের"।[৭৮৪]

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস করো। অন্যান্য ফকীহ অথবা আবু সওর এর নিকট জিজ্ঞেস করো।

ইমাম ইব্ন হিব্বান (র) বলেন,

...كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً صنف الكتب وفرّع على السنن وذبَّ عنه يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب،

"ফিক্হ, ইলম, বুজুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বে আবু সওর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইমামদের একজন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন মাসায়েল ইসতেম্বাত করেন এবং এর উপর আরোপিত আপত্তির জবাব দেন। তিনি নিজের ইজতিহাদী যোগ্যতার আলোকে ফতোয়া প্রদান করেতেন। যাতে ভুল-ত্রুটির সংমিশ্রণ থাকতো"।

ইব্ন আবদিল বার (র) (৪৬৮-৪৬৩ হি.) বলেন,

له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي في كتابه هذا وفي كتبه كلها،

"তার লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যার সবখানে ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম মালিক (র) এর পারস্পরিক ইখতিলাফ স্থান পেয়েছে"।[৭৮৫]

---

[৭৮৪] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৭৩।

[৭৮৫] প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৭৪।

পঞ্চম অধ্যায়:
মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ইজতিহাদ

পরিচ্ছেদ- ১
প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহের ইমামদের ইজতিহাদ

সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইজতিহাদী কর্মযজ্ঞের পাশপাশি মাযহাবেরও সুপ্ত গোড়াপত্তন হয়। এ যুগে ইজতিহাদে পারদর্শী ও প্রাগ্রসর সাহবায়ে কেরামের নামে মাযহাবের অঘোষিত উদ্ভব ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাহাবাযুগে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার, (রা) আয়িশা, (রা) ও যাইদ ইব্ন সাবিত, (রা) এর মাযহাব এর প্রসিদ্ধ প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে তাদের অনুকরণে তাবিঈ ও তাবউ তাবিঈদের মধ্যে প্রকাশ্যে অনেক মাসলাক ও মাযহাবের আনুষ্ঠানিক বীজ বপন করা হয়। যেমন মদীনার সপ্ত ফকীহ এর মাযহাব ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কূফায় আলকামা, ইবরাহীম নাখায়ী ও হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান (র) এর এর নিজস্ব মাযহাব ছিল। বাসারায় প্রচলিত ছিল হাসান বসরী (র) এর মাযহাব। মক্কায় আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর শিষ্যদের একাধিক মাযহাবের প্রচলন ছিল। তথায় ইকরামা, আতা ইব্ন আবি রাবাহ, তাউস ইব্ন কাইসান, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) এর মতো বিশিষ্ট ইমামদের স্বতন্ত্র মাযহাব এর প্রচলন ছিল। দ্বিতীয় শতকের উষালগ্ন থেকে চতুর্থ হিজরীর মধ্যভাগ ছিল মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ। ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী বলেন,[৭৮৬]

ولقد بدات نواة المذهب في عصر الصحابة كما اشرنا سابقا فكان مثلا مذهب عائشة ومذهب عبد الله بن عمر ومذهب عبد الله بن مسعود وغيرهم،

"সাহাবাযুগেই মাযহাবের সুপ্ত বীজ রোপিত হয়। তখন আয়িশা (রা) এর মাযহাব, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এর মাযহাব ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর মাযহাবের মতো অনেক মাযহাব প্রচলিত ছিল"।

তিনি আরো বলেন,

"হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত যে সকল মুজতাহিদের উন্মেষ ও তাদের মাযহাবের গোড়াপত্তন হয় তা হলো, কূফায় আবু হানীফা নুমান ইব্ন সাবিত (র) এর নামানুসারে হানাফি মাযহাব ও সুফ্য়ান সাওরী (র) এর মাযহাব। মক্কায় সুফ্য়ান ইব্ন উয়াইনা (র), মদীনায় মালিক ইব্ন আনাস (র), বাসারায় হাসান বসরী (র), শামে আওযায়ী (র), মিসরে মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ শাফিঈ (র) ও লাইস ইব্ন সাদ (র) এবং নিশাপুরে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ (র) এর মাযহাব ছিল প্রসিদ্ধ। তবে তাদের অনেকের মাযহাবের বর্ণনা শুধুমাত্র কিতাবের গণ্ডিবদ্ধ ছত্রেই সীমাবদ্ধ। বাস্তব জগতে এ সকল মাযহাবের কোনো অনুসারী পাওয়া যায় না।[৭৮৭]

নিম্নে হিজরী দ্বিতীয় শতকে উদ্ভাবিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাযহাব, মাযহাবসমূহের ইমাম ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

---

[৭৮৬] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৮।

[৭৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৫.১.১. ইমাম আবু হানীফা (র) এর ইজতিহাদ

আবু হানীফা নুমান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন যুতি (র) ছিলেন কূফার একজন ক্ষণজন্মা ও বহুমুখী প্রতিভাধর তাবিঈ। প্রজ্ঞাবান ফকীহ ও সূক্ষ্মদর্শী মুজতাহিদ। তিনি আবু হানীফা উপনামে ও ইমাম আযম অভিধায় বেশ পরিচিত। তিনি আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ, শাবী, আমর ইব্‌ন দীনার, নাফি মাওলা ইব্‌ন উমার, কাতাদাসহ (র) অনেক স্বনামধন্য মনীষী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান ছিলেন (র) তার প্রধান শাইখ।[৭৮৮] তিনি ৮০ হি./৬৯৯ খ্রি. উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এর শাসনামলে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করে তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার পিতা সাবিত ইব্‌ন যুতি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভুত। দাদা ছিলেন কাবুলের অধিবাসী। আরব কর্তৃক কাবুল দখলিকৃত হবার পর তামিম ইব্‌ন সালাবা গোত্রের কৃতদাস হিসেবে তিনি বন্দি হন। পরবর্তীতে মুক্ত হয়ে ঐ গোত্রের মাওলায় (আযাদকৃত গোলাম) পরিণত হন। ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ কৃতদাস ছিলেন না। ইমাম আবু হানীফার জন্মের সময় ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইয়ূসুফ। ইমাম আবু হানীফা (র) ইরাকে হাজ্জাজের নৃশংসতা ও উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয (রহ) এর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। 'নাফসু যাকিয়্যাহ' (র) উপাধিপ্রাপ্ত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ উমাইয়া খলীফা মনসুর এর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ইমাম আবু হানীফা (র) তাতে নফসু যাকিয়্যাহকে সমর্থন দান করেন ।[৭৮৯]

ইমাম আবু হানীফা স্বীয় ইজতিহাদী প্রতিভা দ্বারা অনুমান করে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অনেক মাসআলা ইসতিম্বাত করে তার সমাধান পেশ করেন। যার ফলে তার ইস্তিম্বাতকৃত মাসআলার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এসব মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ এর 'কিতাবুল আসার', 'জামি' আবদির রাযযাক' এবং মুসান্নাফ ইব্‌ন আবি শাইবাসহ বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সাহাবীদের বাণীকে শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাবিঈদের উক্তি ও ইজতিহাদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং বলেন,

آخذ بكتاب الله تعالى فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذاانتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدَّد رجالاً فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا،

"কিতাবুল্লাহই আমার দলীল গ্রহণের প্রধান উৎস। তাতে সমাধান না পেলে সুন্নাতে রাসূলকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করি। তাতেও সমাধান না পেলে সাহাবীদের উক্তি গ্রহণ করি। সাহাবীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতকেই আমি সর্বদা প্রাধান্য দিই। সাহাবা পরবর্তী অন্য কারো মতামত আমি গ্রহণ করি না। ইবরাহীম নাখায়ী, শাবী, ইব্‌ন সিরীন, হাসান বসরী, আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ কিংবা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এর মতো কোনা তাবিঈর মতামত আমার সামনে আসলে আমি তা গ্রহণ করি না। সে ক্ষেত্রে তারা যেভাবে ইজতিহাদ করেছেন, আমিও সেভাবে ইজতিহাদ করি" ।[৭৯০]

---

[৭৮৮] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৯১।

[৭৮৯] আহমাদ আমিন, *দুহাল ইসলাম*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৩৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭৮ ।

[৭৯০] সামীরী, আবু আবদিল্লাহ হুসাইন ইব্‌ন আলী, *আখবারু আবি হানিফাতা ওয়া আসহাবিহি*, (বৈরুত: আলামুল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১০।

ইমাম আবু হানীফা (র) এমন একজন মহা-মনীষী, যার ইলম, আমল ও তাকওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র যবানে তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারেসী (রা) এর দেহে হাত রেখে বললেন,

لو كان الايمان عند الثريا لناله رجل او رجال من هؤلاء،

"ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেরও থাকে, তবুও পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা ছিনিয়ে আনবে"।[৭৯১]

জালালুদ্দীস সিয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি.) বলেন, নিম্নের হাদীসে ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) এর মন্তব্য হলো,

من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة كان أبو حنيفة ممن وُفق له الفقه،

"ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী সকল মুজতাহিদ ইমাম আবু হানীফার পরিবারের সন্তান। ইমাম আবু হানিফাকে আল্লাহ তায়ালা ফিক্হ শাস্ত্র প্রবর্তনের তাওফিক দানে ধন্য করেছেন"।[৭৯২]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত ও আল্লাহপ্রদত্ত প্রজ্ঞার অধিকারী। স্থুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট তার ফিকহী দৃষ্টিকোণ বোধগম্য না হবার কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেছে। এ বিষয়ে ইমাম হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) (১১৭-১৯৪ হি.) বলেন,

كلام أبي حنيفة في الفقه أدقُّ من الشَّعر لا يعيبه إلا جاهلٌ؛

"ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার মতামতসমূহ পশমের চেয়েও সূক্ষ্ম। ইমাম আবু হানীফার সুনিপুণ দূরদৃষ্টি অনুধাবন করতে অপারগ ও মুর্খ ব্যক্তিরাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে"।[৭৯৩]

কুরআন-সুন্নাহ'য় সামাধান পাওয়া না গেলে একজন প্রজ্ঞাবান তাবিঈ হবার সুবাদে তিনি নিজেই এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন। 'খবরে ওয়াহেদ' এর রাবীর আমল স্বীয় বর্ণনার বিপরীত হলে রাবীর বর্ণনার পরিবর্তে তার আমলকেই প্রধান্য দিতেন। খাদ্য গুদামজাতকরণ সম্পর্কীয় হাদীসে রাবী স্বীয় রেওয়ায়াতের বিপরীত আমল করার কারণে ইমাম আবু হানীফা মনে করেন, যদি দেশে দুর্ভিক্ষ না থাকে এবং গুদামজাতের কারণে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে খাদ্য গুদামজাত করা বৈধ। তিনি বলেন, খবরে ওয়াহেদ এর রাবী ফকীহ হলে এবং তার বর্ণনা কিয়াসের বিপরীত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো সাহাবীর উক্তি কিয়াস এর বিপরীত হলে কিয়াস পরিত্যাগ করে সাহাবীর 'আসার' এর উপর আমল করা। যথা- হাদীসে 'মুসাররাত' এ দুধের পরিবর্তে খেজুর ফেরৎদান কিয়াস এর বিপরীত বিধায় তিনি এর উপর আমল করেননি। এছাড়াও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘোড়া এবং ঘোড়ার মালিকের অংশ নির্ধারণ বিষয়ক হাদীসে অশ্বারোহীর চেয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অশ্বের জন্য দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে বলেন, একজন মুমিনের চেয়ে কোনো প্রাণীর অংশ বেশি হবে এটা আমি মানতে পারি না।[৭৯৪]

---

[৭৯১] বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, হাদীস নং- ৪৮৯৭।

[৭৯২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি*, (হায়দারাবাদঃ লাজনাতু ইহয়াইল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩০।

[৭৯৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৪০৩।

[৭৯৪] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ২০০২ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৪০৭।

আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন এক প্রকার সূক্ষ্মজ্ঞান ও দূরদর্শিতা দান করেছেন, যা দ্বারা তিনি কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তর্নিহিত ফলাফল অর্জন করার অসাধারণ ক্ষমতা লালন করতেন। এ বিচক্ষণতার আলোকে তিনি হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে মন্তব্য করে খতীব আল বাগদাদী আলী ইব্‌ন আসিম এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

لو وُزن عقلُ أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجَح بهم،

"ইমাম আবু হানীফার জ্ঞানকে অর্ধ পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হলে তার জ্ঞানের পাল্লা ভারি হবে"।[৭৯৫]

ইলমী মজলিস গঠনের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা ইসলামের দলীল চতুষ্ঠয়কে ফিক্‌হে ইসলামীর অবয়ব দান করেন। প্রতিটি বিষয়ে নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার লক্ষ্যে তিনি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইলমী মজলিস গঠন করেন। কমবেশি প্রায় চল্লিশ সদস্যের বহুমুখী প্রতিভাবান ইমামদের সমন্বয়ে মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবনধারা সুবিন্যস্থ করেন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রবর্তন করেন।

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আসাদ ইব্‌ন ফোরাত (র) (মৃ. ২১৩ হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

"ইমাম আবু হানীফার শাগরিদদের মধ্যে যারা ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলন করেন, তারা ছিলেন চল্লিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদের শীর্ষ দশ জনের মধ্যে ছিলেন, আবু ইয়ূসুফ, যুফার ইব্‌ন হুযাইল , দাউদ তায়ী, আসাদ ইব্‌ন আমার, ইউসুফ ইব্‌ন খালেদ আল সামতী ও ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবি যায়িদা (র)। আর ইনিই অর্থাৎ ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি যায়িদা ত্রিশ বছর যাবত তাদের ফায়সালাগুলো লিখেছেন।[৭৯৬]

ইমাম আবু হানীফা আল কুরআনকে ফিক্‌হ চর্চার প্রথম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে আল কুরআনের المدلولات (নির্দেশাবলি) الاشارات (ইঙ্গিতসমূহ) ও الاستنباط (উদ্ভাবন প্রক্রিয়া) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামের সাথে তার মতবিরোধ ছিল। হাদীস গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও এর রিজাল সম্পর্কে তিনি কঠিন শর্ত আরোপ করেন। যদি অধিক সংখ্যক রাবী অনুরূপ সংখ্যক রাবী হতে হাদীস রেওয়ায়াত করেন কিংবা উক্ত হাদীসের উপর আমল করার বিষয়ে কোন শহরের সকল ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেন, কিংবা কোন সাহাবী অধিক সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে হাদীসটি শোনেন এবং উপস্থিত কেউ এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করেন, তবেই তিনি উক্ত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন।[৭৯৭] হাদীস গ্রহণে এ কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে কিয়াস ও ইসতিহসানের অধিক ব্যবহারে উৎসাহিত করে। ইমাম আবু হানীফার অনুসৃত মূলনীতির আলোকে নিম্নে একটি মাসআলা আলোচনা করা হলো,

ইমাম আবু হানীফার একটি মূলনীতি হলো, যে কারণ পাওয়া গেলে প্রাথমিক অবস্থায় ফরয আদায়ে পরিবর্তন আসে, সে কারণ শেষে পাওয়া গেলেও তাতে পরিবর্তন আসবে। এ মূলনীতির আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, তায়াম্মুম করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর সালাম এর আগে পানি প্রাপ্ত হলে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেভাবে নামায আদায়ের পূর্বে পানি প্রাপ্ত হলে তার নামায ভেঙ্গে যেতো। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার প্রধান দুই শিষ্য এ ক্ষেত্রে স্বীয় শাইখ এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে তার নামায শুদ্ধ হবে।

---

[৭৯৫] প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪। ।

খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪।

[৭৯৬] ইব্‌ন আবিল আওয়াম, *ফাজায়িলু আবি হানিফা*, (মাক্কা আল মুকাররামাহঃ মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

[৭৯৭] আ.ক.ম আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫২।

এই মূলনীতির আলোকে মাসআলা হলো, নামায শুদ্ধ হবার জন্য প্রয়োজনীয় কিরায়াত পাঠে অক্ষম কোনো ব্যক্তি, নামাযের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর সালামের পূর্বক্ষণে নামায শুদ্ধ হবার পরিমাণ কেরায়াত শিখে ফেললে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে ইমাম আবু হানীফা এই মত পোষণ করেন। কিন্তু তার দুই প্রধান শিষ্য তাদের ইমামের সঙ্গে ভিন্ন মত ব্যক্ত করে বলেন, তার নামায ভঙ্গ হবে না।[৭৯৮]

তার শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নিম্নে তার ইজতিহাদকৃত কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করা হলো।

বকরীর যাকাত এর নেসাব প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ،

"কোনো ব্যক্তি চল্লিশটি বকরীর মালিক হলে একটি বকরী যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে"।[৭৯৯]

তেমনিভাবে 'সাদাকাতুল ফিতর' এর নেসাব এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,'এক সা' খেজুর অথবা যব আদায় করতে হবে'। হাদীসে 'মুসাররাত' এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر،

"তোমরা উট ও বকরীর স্তনে দুধ জমা করে বিক্রি করোনা। এমন জন্তু ক্রয় করে দুধ দোহন করার পর ক্রেতার এ বিষয়ে ইখতিয়ার থাকবে যে, সে চাইলে ঐ জন্তু রেখে দিতে পারবে। অথবা ক্রয়কৃত জন্তু ফেরৎ দেবে, এ ক্ষেত্রে তাকে এক সা' খেজুরসহ জন্তুটি ফেরত দিতে হবে"।[৮০০]

এই সকল হাদীসের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এক দল ফকীহ উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করে বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'বকরী' আদায় না করলে ঐ ব্যক্তির যাকাত আদায় হবে না। তেমনিভাবে এক সা' খেজুর অথবা যব আদায় না করলে সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে না। তেমনিভাবে হাদীসে 'মুসাররাত' এ ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে এক সা' খেজুর আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এ ধরনের হাদীস বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগের পরিবর্তে শরীয়ত প্রবর্তকের মূল উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة) বাস্তবায়নে ইজতিহাদ করেন। যাকাত-ফিতরাসহ আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার মূল লক্ষ্য হলো, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকার সাধন করা ও সমাজ থেকে দরিদ্রতা মোচন করা। পণ্যটি হুবহু আদায় করা হোক অথবা তার মূল্য আদায় করা হোক যেভাবে সমাজ থেকে সহজে অভাব দূর করা যায়, সেভাবেই হাদীসের প্রয়োগ করাই শরীয়তের মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে তার মূল্য আদায় করলে শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে। এভাবে হাদীসের প্রয়োগ হবে যথার্থ ।

তেমনিভাবে হাদীসে 'মুসাররাত' এর ক্ষেত্রে হুবহু এক সা' খেজুর আদায় না করে তার মূল্য পরিশোধ করলেও ক্ষতিপূরণ আদায় হয়ে যাবে।[৮০১]

---

[৭৯৮] দাবূসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ১১।

[৭৯৯] দারিমী, আবু আবদিল্লাহ আবদুস সামাদ, *সুনানু দারিমী*, (বৈরুতঃ দারুল বাশায়ির, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০২।

[৮০০] আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার, *ফতহুল বারী*, (বৈরুতঃ দারুল মারিফা, ১৩৭৮ হি.), খ. ৪, প. ৪২৩।

[৮০১] খাল্লাফ, আবদুল ওয়াহ্‌হাব, *খুলাসাতু তারীখিত তাশরিঈল ইসলামী*, (কুয়েতঃ লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী, তা/বি), পৃ. ৭৬।

৫.১.২. আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা (র) এর ইজতিহাদ

আবু আবদির রহমান মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা ১৭ হিজরীতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাসনামলে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের একজন মহান ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। তিনি আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) থেকে জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং কূফায় আবাস গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিচারক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। জলীলুল কদর সাহাবীদের নিকট থেকে উলুমে শরীয়ার জ্ঞান লাভ করেন। তার নিকট থেকে অনেক তাবিঈ শিক্ষা লাভ করেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম ইজলি (র) (১৮২-২৬১) তাকে ইমাম আবু হানীফা এর সমমর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ বলে অভিহিত করে বলেন,

...كان فقيهًا صاحب ابي حنيفة ويعد بمنزلة الإمام سنة، صدوقًا،

“আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা ছিলেন একজন ফকীহ। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফা এর সহচর। সুন্নাহ ও সততার ক্ষেত্রে তাকে ইমাম আবু হানীফা এর সমপর্যায়ের ফকীহ বলে মনে করা হয়”।[৮০২]

বিশর ইবনুল ওয়ালিদ (র) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আবু ইয়ূসুফকে বলতে শুনেছি,

ما ولي القضاء أحد أفقه لدين الله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقول حقًا بالله ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلى،

“আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অধিকতর ফকীহ, কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, সদা সত্য উচ্চারণকারী ও অনুপম দুনিয়াবিরাগীদের মধ্যে যারা বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা থেকে উচ্চাঙ্গের আর কেউ নিযুক্ত হয়নি”।[৮০৩]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন এবং কতিপয় মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদী কর্মধারা অব্যাহত রাখেন। তার প্রণীত মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি হলো, কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে কোনো অধিকার লাভ করার পর তা অন্যের নিকট হস্তান্তর করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। অন্যান্য ইমামের মতে ঐ ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে এ অধিকার সংরক্ষণ করবে না। ক্ষেত্রবিশেষেই তা লাভ করতে পারে। এ মূলনীতির আলোকে কাযী আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা বলেন, কারো নিকট কোনো বস্তু আমানত রাখা হলে, সে অন্য যে কারো নিকট তা জমা রাখার অধিকার সংরক্ষণ করে। অতএব, কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করার অধিকার লাভ করার পর সে অন্য কারো নিকট সে অধিকার হস্তান্তর করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। কিন্তু অন্যান্য ইমামের মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে এ অধিকার লাভ করলেও সর্বক্ষেত্রে সে অধিকারের মালিক হবে না। কেননা যার পক্ষ থেকে সে এ অধিকার লাভ করেছে, সে তার উপর সন্তুষ্ট হয়েই তাকে এ অধিকার প্রদান করেছে। তার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থা বিশ্বাসের কারণেই সে এ অধিকার লাভ করেছে। ভিন্ন ব্যক্তির উপর তার এ বিশ্বাস না থাকাটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তির নিকট অধিকারটি হস্তান্তরিত হলে মূল মালিকের অধিকার খর্ব হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।[৮০৪]

---

[৮০২] www.alukah.net - شبكة الألوكة

[৮০৩] www.alukah.net - شبكة الألوكة

[৮০৪] দাবূসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ১০৩।

৫.১.৩. আবদুর রহমান আল আওযায়ী (র) এর ইজতিহাদ

আবু আমর আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইয়ুহমাদ আল আওযায়ী (র) ৮৮ হিজরীতে দামেস্কের বালাবাক্কু শহরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ ও শামের শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে খলীফা মনসুর এর নিকট তিনি ছিলেন যথেষ্ট সমাদৃত। তিনি আতা ইব্ন আবি রাবাহ, ইব্ন শিহাব আল যুহরী ও মুহাম্মদ আল বাকির (র) থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের দরস গ্রহণ করেন। সুফ্য়ান সাওরী, মালিক ইব্ন আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) এর মতো জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস বলেন, ইমাম আওযায়ী একজন মুজতাহিদ ও স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শাম ও আন্দালুসে (স্পেনে) তার মাযহাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীতে মালিক ইব্ন আনাস এর মাযহাবের প্রভাবে তা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ইয়াকুব আল ফাসাবী বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান আল আওযায়ী সত্তর হাজার মাসআলা ইসতেম্বাত করেন। ইব্ন আসাকির মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

سألت أبا زرعة هل بلغك عن الأوزاعي في كم أجاب من المسائل فقال بلغني انه دون عنه ستين ألف مسألة،

"আমি আবু যুরআকে প্রশ্ন করলাম। আপনার কি এ বিষয়ে অবগতি আছে, আবদুর রহমান আল আওযায়ী কত মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার জানা মতে তিনি ষাট হাজার মাসআলা ইসতেম্বাত করেছেন"।[৮০৫]

ইমাম যাহাবী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

لو قيل لي اختَرْ لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأَوْزاعي ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأَوْزاعي لأنه أرفقُ الرَّجلين؛

"আমাকে যদি বলা হয়, মুসলিম উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠ আলিমদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি নির্বাচন করুন। আমি সুফ্য়ান সাওরী ও আউযায়ীকে নির্বাচন করব। আবার যদি বলা হয়, এই দুইজনের মধ্যে একজনকে বাছাই করুন। আমি আউযায়ীকে বাছাই করব। কেননা তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে ঐ দুইজনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে সহজ পন্থা অবলম্বন করেছেন"।[৮০৬]

নিজস্ব মূলনীতি ও চিন্তাধারার আলোকে আওযায়ী ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহদের ক্ষেত্রে তিনি দৃঢ় মনোবলচিত্ত ও নিজের উপর খুবই আস্থাশীল থাকতেন। নিজের মতের উপর প্রচণ্ড আস্থাশীলতার কারণে তিনি তৎকালীন সময়ের অনেক প্রসিদ্ধ ও গণ্যমান্য ইমামদের সঙ্গে বাহাসে মিলিত হতেন। নামাযে বারবার হাত তোলা (رفع يدين) প্রসঙ্গে তিনি একবার ইমাম সুফ্য়ান সাওরী এর সঙ্গে বাহাসে অবতীর্ণ হন। কুরআন সুন্নাহর নস এর আলোকে উভয়ের যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের এক পর্যায়ে তিনি সুফ্য়ান সাওরীকে সত্যাসত্য নির্ধারণের ব্যাপারে 'মুবাহালার' প্রস্তাব দেন। কিন্তু সুফ্য়ান সাওরী তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম আবু হানীফার সঙ্গেও এ বিষয়ে তার বাহাস এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে।

মক্কায় অবস্থানকালে একবার উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। আওযায়ী ইমাম আবু হানিফাকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনারা রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময় 'রাফে' য়াদাইন' করেন না কেন? ইমাম আবু হানীফা

---

[৮০৫] ইব্ন আসাকির, আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক* (বৈরুত: দারুল ফিক্র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩৫, পৃ. ১৬৩ ।

[৮০৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৩০।

উত্তর দিলেন, এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীস নেই। ইমাম আওযায়ী যুহরী সালিম থেকে তিনি স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত 'রাফে' য়াদাইন' এর সমর্থনপুষ্ট হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হানীফা বলেন, হাম্মাদ ইবরাহীম নাখায়ী থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তারা উভয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর সনদে রাফে য়াদাইন না করা সমর্থিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হানীফার দলীল এর উত্তরে আওযায়ী বলেন, আমার বর্ণিত হাদীসটির (حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) মান আপনার বর্ণিত হাদীসের (حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) মান থেকে উন্নত। এর উত্তরে ইমাম আবু হানীফা বলেন, হাম্মাদ যুহরী থেকে অধিকতর ফকীহ। ইবরাহীম সালিম থেকে ফকীহ। আর ইব্‌ন উমার সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও ফিকহ শাস্ত্রে আলকামাহ'র অবস্থান তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর সঙ্গে কারো তুলনা হতেই পারে না।[৮০৭]

প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে আবদুর রহমান আল আওযায়ী এর অবস্থান কি? ইয়াহয়া ইব্‌ন সাইদ আল কাত্তান (র) এর উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায়। তিনি ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করে বলেন,

اجتمع عندي الأَوْزاعي والثوري وأبو حنيفة فقلت أيهم أرجح؟ قال: الأَوْزاعي؛

"আমার নিকট সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিনিজন ফকীহ আউযায়ী, সাওরী ও ইমাম আবু হানীফা (র) একত্রিত হন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহকে পছন্দ করার কথা বলা হলো। আমি আবদুর রহমান আল আউযায়ীকে তিনজনের মধ্যে প্রাধান্য দিলাম"। [৮০৮]

৫.১.৪. সুফ্য়ান সাওরী (র) এর ইজতিহাদ

আবু আবদিল্লাহ সুফয়ান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরুক আস সাওরী (র) ৯৭ হিজরীতে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক এর খেলাফতকালে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১ হিজরীতে বাসারায় ইন্তেকাল করেন। তিনি শুবা, জাফর সাদিক ও মালিক ইব্‌ন আনাস (র) থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফয়ান ইব্‌ন উয়াইনা ও আবদুর রায্‌যাক সানআনী (র) প্রমুখ। তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের একজন। সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তৎকালীন খলীফা ও প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে সংঘটিত অনেক ঘটনা তার প্রমাণ। প্রধান বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যানের কারণে আব্বাসী খলীফা মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে কারাদণ্ড প্রদান করেন। কারাবন্দি অবস্থায় তার ইন্তেকালের পর খলীফা মনসুর এ পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করেন। সর্বস্তরের আলিমদের পরামর্শক্রমে খলীফা সুফয়ান সাওরী বরাবর লিখিত এক ফরমান জারি করেন এবং তাকে কূফার কাযী পদে নিয়োগদান করেন। তিনি ফরমানটি গ্রহণপূর্বক বেরিয়ে গেলেন এবং

[৮০৭] আল হুমাইদান, হুমাইদান ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *ইখতিলাফু ফুকাহাইত তাবিঈন*, (রিয়াদ: জামিআতুল মালিক সউদ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৬।

[৮০৮] ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১১৯।

এটি দাজলা নদিতে ফেলে দিয়ে আত্মগোপনে চলে যান। আমৃত্যু তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। খলীফা তার সন্ধানে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেন।[৮০৯]

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে মাসআলা ইসতেম্বাতের ক্ষেত্রে তার অবদান তৎকালীন সময়ের ফকীহ ও মজুতাহিদদের নিকট স্বীকৃত। ড. মুহাম্মদ বালতাজি বলেন,

كان لسفيان الثوري مذهبه الفقهي الخاص الذي تبعه جمع من المسلمين مدة طويلة من الزمن، وكان من أتباعه بشر الحافي المتوفي سنة 227 هـ، وبقي له أتباع في خراسان حتى زمن ابن تيمية، ثم اندثر،

"তিনি ছিলেন একটি স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদিন যাবত মুসলমানদের একটি বিশাল জামাত এ মাযহাব অনুসরণ করতেন। তৃতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ও ফকীহ বিশর আল হাফি ছিলেন এ মাযহাবের অনুসারী। ইব্‌ন তাইমিয়ার সময়কাল অবধি এ মাযহাবের অনেক অনুসারী অবশিষ্ট ছিল। সপ্তম হিজরী পর্যন্ত এ মাযহাব অনেকের নিকট ছিল সমাদৃত। পরবর্তীতে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়"।[৮১০]

সহীহ হাদীসের উপর তিনি স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে সুফ্‌য়ান সাওরী এর উচ্চাসন সত্ত্বেও তিনি খেজুর এর নাবিয পান করা জয়েয মনে করতেন।[৮১১]

সুফয়ান সাওরী মুসলিম উম্মাহ'র এমন একজন মনীষী ফিক্‌হ ও ইজতিহাদ ছিল যার মজ্জাগত। আবু নুআইম ইস্পাহানি মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ আল তানাফিসী এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করে বলেন,

لا أذكر سُفْيان الثَّوري إلا وهو يفتي أذكر منذ سبعين سنةً ونحن في الكتَّاب تمر بنا المرأة والرجل فيسترشدوننا إلى سُفْيان ليستفتوه فيفتيهم،

"আমি সুফ্‌য়ান সাওরীকে যতটুকু জানি, তিনি দীর্ঘ ৭০ বছর পর্যন্ত ফতোয়াদানে জড়িত ছিলেন। তখন আমরা মকতবে লেখাপড়া করতাম। অনেক নারী-পুরুষ তার নিকট ফতোয়ার জন্য আগমন করতেন। আর তিনি ফতোয়া দিতেন"।[৮১২]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। অনেক জটিল সমস্যা সহজেই সমাধান করার অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। খলীফা মাহদীর ঘটনাটি তার সূক্ষ্ম ইজতিহাদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। খলীফা একদা তার স্ত্রীকে বললেন, আমি আরেকটি বিয়ে করতে চাই। স্ত্রী বললেন, আমি থাকতে আপনার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা বৈধ হবে না। খলীফা বললেন, অবশ্যই হবে। স্ত্রী বললেন, এ ব্যাপারে আপনি নিজের পছন্দমতো কোনো ফকীহ এর শরণাপন্ন হতে পারেন। খলীফা বললেন, সুফ্‌য়ান সাওরী সম্পর্কে তোমার মত কী? স্ত্রী বললেন, তার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। খলীফা সুফ্‌য়ান সাওরী (র) এর নিকট গিয়ে বললেন, আমার স্ত্রীর ধারণা হলো, তার বর্তমানে আমার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা বৈধ হবে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বলেন, 'তোমরা ইচ্ছেমতো দুই, তিন, কিংবা চারজন পর্যন্ত নারীকে বিয়ে করো'। খলীফার কথা শেষ হবার পর সুফয়ান সাওরী বললেন, আয়াতটি কি এখানেই শেষ? এই বলে তিনি আয়াতের পরবর্তী অংশ তেলাওয়াত করেন। 'তোমরা ন্যায় বিচার

---

[৮০৯] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৯০।

[৮১০] ড. মুহাম্মদ বালতাজী, *মানাহিজিত তাশরীইল ইসলামী*, (মিসরঃ দারুস সালাম লিত তাবাআ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.). খ. ১, পৃ. ৩১৬।

[৮১১] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৬০।

[৮১২] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৫৬।

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশংকা করলে একটিই মাত্র বিয়ে করতে পারো'।[৮১৩] আমার আশঙ্কা হয়, আপনি ন্যায় বিচার করতে পারবেন না। খলীফা তার প্রতুৎপন্নমতিত্বে অবাক হয়ে তার জন্য দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।[৮১৪]

৫.১.৫. ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) এর ইজতিহাদ

মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আবি আমির আল আসবাহী তাবিঈ পরবর্তী যুগে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রধান ইমাম। তিনি 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دار الهجرة) তথা মদীনার ইমাম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ওয়ালিদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এর শাসনকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা হারুনুর রশিদ এর শাসনামলে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। মদীনার প্রতি অধিক মহব্বত ও আকর্ষণের কারণে তিনি সহজে কখনো এ শহর ত্যাগ করতেন না। তিনি উমাইয়া ও আব্বাসিয়া উভয় শাসনামল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ আলিমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। বিশেষত আবদুর রহমান ইব্‌ন হরমুয এর শিষ্যত্ব বরণ করেন। ইব্‌ন উমার এর আযাদকৃত গোলাম নাফি ও ইব্‌ন শিহাব আয যুহরী থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। ফিকহ্ শাস্ত্রে তার প্রধান উস্তায হলেন রবিয়া ইব্‌ন আবদুর রহমার আর রায়। হাদীস ও ফিকহ্ উভয় শাস্ত্রে তার প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। দ্বি-বিধ বিষয়ে ইমাম মালিক এর সংকলিত প্রধান কিতাব হলো 'আল মুয়াত্তা'। তিনি মদীনাবাসীদের আমলকে ইসলামী শরীয়তের একটি উল্লেখযোগ্য দলীল হিসেবে গণ্য করেন। তার দুধরনের শিষ্য রয়েছে। একদল মিসরে অপর দল আফ্রিকা ও স্পেনে। মিসরের শিষ্যগণ হলেন, আবু আবদিল্লাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) ইব্‌ন মুসলিম, আশহাব ইব্‌ন আবদুল আযীয, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম ও আসবাগ ইব্‌ন আল ফারাজ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল ইসকান্দারী। আফ্রিকার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন যিয়াদ, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল কুরতুবী, ঈসা ইব্‌ন দীনার ইত্যাদি।[৮১৫]

ইমাম মালিক ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিবিধ মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। এ মূলনীতির কারণে বিভিন্ন মাসআলায় অন্যান্য ইমামদের সঙ্গে তার মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম মালিক প্রণীত মূলনীতির আলোকে খবরে ওয়াহিদ এর চেয়ে কিয়াসে সহীহ দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, শুকনো বীর্য নখ দিয়ে টোকা দিয়ে ফেলে দিলে পবিত্র হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হহ ও ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এর এক বর্ণনায় এ মত পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমাদ এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী শুকনো বীর্য পবিত্র; তবে থুথু ও শ্লেষ্মার মতো এটা ঘৃণিত। আয়িশা (রা) এর নিকট এক দল নারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

---

[৮১৩] আল কুরআন, ৪: ৩।

[৮১৪] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৯।

[৮১৫] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩২।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি ধৌত করেন নি। আমি তাঁর কাপড় থেকে এটি টোকা দিয়ে ফেলে দিতাম"।[৮১৬]

ইমাম মালিক বলেন, সিক্ত বীর্যের মতো শুকনো বীর্যও অপবিত্র এবং ধোয়ার ক্ষেত্রে একই বিধান। তিনি খবরে ওয়াহেদ এর বিপরীতে বিশুদ্ধ কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ মত প্রকাশ করেন।[৮১৭]

এই মূলনীতির আলোকে ইমাম মালিক আরো বলেন, রোযাদার ব্যক্তি ভুলবশত পানাহার করলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে যেভাবে রোযা ভেঙ্গে যায়, কিয়াস অনুযায়ী ভুলবশত পানাহার করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু জমহুর উলামা খবরে ওয়াহেদ এর আলোকে বলেন, রোযাদার ব্যক্তি ভুলক্রমে পানাহার করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। ভুলক্রমে স্ত্রী সহবাস করলেও একই বিধান। জমহুর ফকীহ নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه،

"যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালাই তাকে পানাহার করিয়েছেন"।[৮১৮]

৫.১.৬. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ শাফিঈ (র) এর ইজতিহাদ

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন শাফি ইব্‌নুস সায়িব বংশগতভাবে কুরাইশী। তিনি একাধারে হাশিমী ও মুত্তালাবী। তার পিতার নাম আব্বাস ও পিতামহের নাম উসমান ইব্‌ন শাফি। তিনি ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের গাযা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মিসরে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল বছরটিই তার জন্মসাল। পিতার ইন্তেকালের দুইবছর পর তার মাতা তাকে নিয়ে মক্কায় মাতুলালয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি এতিম হিসেবে লালিত-পালিত হন।[৮১৯] বাল্যবয়সে তিনি আল কুরআন হিফ্‌জ করেন। পরবর্তীতে আরবের সর্বাধিক শুদ্ধভাষী হুযাইল গোত্রে বসবাস শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি হুযাইল গোত্রের প্রখ্যাত কবিদের রচিত কাব্যসমূহ মুখস্ত করেন এবং আরবী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তৎকালীন মক্কার প্রধান মুফতী মুসলিম ইব্‌ন খালিদ আল জান্‌জী এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠের সূচনা করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি উস্তাযের নিকট থেকে ফতোয়া প্রদানের সার্টিফিকেট অর্জন করেন। অতঃপর মদীনায় গমন করে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা এতো প্রখর ছিল যে, তিনি মাত্র নয় দিনে ইমাম মালিক সংকলিত 'মুয়াত্তা' কিতাবটি মুখস্ত করেন। ইমাম শাফিঈ (র) এর সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার বর্ণনায় ইমাম যাহাবী (র) বলেন,

---

[৮১৬] সানআনী, আবদুর রায্‌যাক আবু বকর, *মুসান্নাফ*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ ৩৬৮, হাদীস নং- ১৪৩৯।

[৮১৭] দাবূসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ৯৯।

[৮১৮] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৮০৯, হাদীস নং- ১৭১।

[৮১৯] *L'Orient de Saladin, l'Art des Ayyoubides*, (cat. exp., Paris, Institut du monde arabe, 2001 – 2002), Paris : Institut du monde arabe/Gallimard, 2001, en particulier p. 82 – 83 et p. 215

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا قَالَ يُوْنُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَتَّى إِنَّه قَالَ: لَوْ جُمِعَتْ أُمَّةٌ لَوَسِعَهُمْ عَقْلُهُ ،

"আবু উবাইদ বলেন, ইমাম শাফিঈ (র) এর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি আমার চোখে পড়েনি। এমন কি ইয়ূনুস ইব্‌ন আবদিল আলা বলেন, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র বিবেকের চেয়ে তার বিবেক আরো প্রশস্ত হবে"।[৮২০]

তিনি সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়াইনা, ফুজাইল ইব্‌ন আয়াজ ও স্বীয় চাচা মুহাম্মদ ইব্‌ন শাফি থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমনের এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদে যাত্রাবিরতি করেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান আশ শায়বানী এর নিকট কূফার বিশিষ্ট ফকীহদের প্রণীত কিতাবাদির পাঠ গ্রহণ করেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ১৮৭ হিজরীতে মক্কায় ও ১৯৫ হিজরীতে বাগদাদে তার সঙ্গে দ্বিতীয় বারের মতো সক্ষাৎ করেন এবং আল কুরআনের নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কীয় বিষয়াদি ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ আয়ত্ত করেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, আমার নিকট এমন অনেক মাসআলা উত্থাপিত হতো, যার সমাধান ছিল আমার নিকট দুর্বোধ্য। এমতাবস্থায় আমি ইমাম শাফিঈ (র) এর উক্তির আলোকে সমাধান দিতাম। কেননা তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশীয় ইমাম। এ বংশের আলিমদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْماً ،

"কুরাইশ বংশের একজন আলিম সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন"।[৮২১]

ইমাম আহমাদ আরো বলেন, "আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত নামাযে ইমাম শাফিঈ (র) এর জন্য দুয়া করতাম। ইমাম আহমাদ এর পুত্র আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা আহমাদকে প্রশ্ন করলেন, বাবা! শাফিঈ কে? যার জন্য আপনি প্রায় সময় দুয়া করেন। উত্তরে তিনি বলেন,

كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس يا بني،

"প্রিয় বৎস! ইমাম শাফিঈ (র) হলেন পৃথিবীর জন্য সূর্যের মতো এবং মানুষের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ"। তিনি আরো বলেন, এমন দুটি মূল্যবান বস্তুর জন্য আমাদের কী করা উচিত? কি বিনিময় হতে পারে আমাদের পক্ষ থেকে?[৮২২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যবানে ইমাম শাফিঈ (র) এর মর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তির জন্য এটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর গুণকীর্তন অপেক্ষা উত্তম। কুরাইশ বংশের আলিমদের ফজিলত বর্ণনায় আবু দাউদ তায়ালিসী রেওয়ায়াত করেন,

لاَ تَسُبُّوا قُرَيْشاً، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْماً،

"তোমরা কুরাইশ বংশের আলিমদের গালমন্দ করো না। কেননা এ বংশের একজন আলিম সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞান দ্বারা ভর্তি করে দেবেন"।[৮২৩]

বাগদাদ থাকাকালীন সময়ে তিনি তার পূর্ব মাযহাব (مذهبه القديم) এর মূলনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি ২০০ হিজরীতে বাগদাদ থেকে মিসর চলে যান। এখানেই তিনি তার নতুন মাযহাব (مذهبه الجديد)

---

[৮২০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৫।

[৮২১] ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), খ. ৯, পৃ. ৬৫।

[৮২২] সালমাসী, আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইব্‌ন ইবরাহীম, *মানাযিলুল আয়িম্মাতিল আরবাআ*, সম্পাদনাঃ মাহমুদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, (জামিয়াতুল মালিক ফাহদঃ মাকতাবাতুল মালিক ফাহদ, ১৪২২ হি./২০০২), পৃ. ২২১।

[৮২৩] তায়ালিসী, আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইবনুল জারূদ, *মুসনাদু আবি দাউদ আত তায়ালিসী*, সম্পাদনা, ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল মুহসিন, (মিসরঃ দারু হাজার, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯৯।

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রজব মাসের শেষ দিবস জুমার দিনে জনৈক আততায়ীর তরবারির আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং ঐদিন আসরের পর তাকে কারাফা নামক শহরে সমাহিত করা হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে তার প্রণীত প্রধান কিতাব হলো 'আর রিসালাহ' এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'আল উম্ম'। তিনি একাধারে ফিক্‌হ, হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হ এর ইমাম। তার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান দুই শহর হিজায ও কূফার ফিক্‌হ শাস্ত্রের সমাহার দেখা যায়। তার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন, দোয়াত-কলম দ্বারা জ্ঞানার্জনকারী সকল শিক্ষিত ব্যক্তির উপর ইমাম শাফিঈ (র) এর অপরিশোধযোগ্য অবদান রয়েছে।[৮২৪]

তিনি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসকে তার মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে সাহাবীদের উক্তি, ইসতিহসান ও মাসালিহ মুরসালাহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র) এর মতে এ তিনটি ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দলীল। তিনি ইমাম মালিক এর মতো মদীনাবাসীদের আমলকে দলীল হিসেবে অগ্রাহ্য করেন। 'আল হুজ্জাহ' নামক রচিত তার প্রাচীন কিতাবটির চারজন শিষ্য বর্ণনা করেন। তারা হলেন, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, আবু সওর, আল যাফরানী ও আল কারাবিসী। নতুন মাযহাবের আলোকে 'আল উম্ম' নামক রচিত কিতাবটিও চারজন শিষ্য বর্ণনা করেন। তারা হলেন, আল মুয়ানী, আল বুয়াইতী, আর রবি আল জীযী ও আল রবি ইব্‌ন সুলায়মান আল মুরাদী।

ইমাম শাফিঈ (র) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কিছু নিজস্ব মূলনীতির অনুসরণ করেছেন। তার প্রণীত মূলনীতিসমূহ অনেক সময় অন্যান্য ইমামের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যার ফলে অন্যান্য ইমামের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাবের আলোকে মুক্তাদির নামায ইমামের নামাযের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ইমামের নামায শুদ্ধ হলে মুক্তাদির নামাযও শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে ইমামের নামায অশুদ্ধ হলে মুক্তাদির নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিম্নের হাদীস দ্বারা এই মূলনীতির পক্ষে সমর্থণ পাওয়া যায়।

الامام ضامن والمؤذن مؤتمن،

"ইমাম হলেন জিম্মাদার আর মুক্তাদি আমানতদার"।[৮২৫]

কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) মুক্তাদির নামায ইমামের নামাযের সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করেন না। এ মূলনীতির ভিন্নতার কারণে অনেক মাসআলায় শাফিঈ মাযহাবের সঙ্গে হানাফী মাযহাবের মতভিন্নতা দেখা যায়। পবিত্রতা অর্জনকারী কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে অপবিত্র ইমামের পেছনে ইকতেদা করলে হানাফী মাযহাবের আলোকে ঐ মুক্তাদির নামায শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে ইমামের নামায শুদ্ধ না হলেও মুক্তাদির নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে জোহরের নামায আদায়কারী কোনো ব্যক্তি আসরের নামায আদায়রত কোনো ইমামের পেছনে ইকতেদা করলে মুক্তাদির নামায শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে মুক্তাদির নামায ইমামের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হবার কারণে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।[৮২৬]

---

[৮২৪] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

[৮২৫] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বলঃ *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি. /২০০১ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৭১৬৯।

[৮২৬] দাবুসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন যাইদুন, তা/বি) পৃ. ১০৩।

৫.১.৭. লাইস ইব্ন সাদ (র) এর ইজতিহাদ

আবুল হারিস লাইস ইব্ন সাদ ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আকাবা আল ফাহমী মিসরের প্রধান ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি মিসরের কালকাসান্দা গ্রামে ৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫ হিজরীতে ফুসতাতে ইন্তেকাল করেন। তিনি আতা ইব্ন আবি রাবাহ, ইব্ন আবি মুলাইকা, নাফি মাওলা ইব্ন উমার, ইব্ন শিহাব আয যুহরী (র) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ থেকে হাদীস ও ফিক্হ এর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, ইব্ন ওয়াহাব, ইবনুল মুবারক, ইব্ন লাহিয়া প্রমুখ।[৮২৭]
লাইস ইব্ন সাদ একটি স্বতন্ত্র মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তৎকালীন সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদের স্বীকৃতি লাভ করেন। তার ইজতিহাদী গুণ-মান চার ইমামের চেয়ে কেনো অংশে কম নয়। লাইস ইব্ন সাদ এর ইজতিহাদকৃত মাসআলাসমূহ সুবিন্যস্থ না থাকা ও অনুসারী স্বল্পতার কারণে মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেনি। তার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ'র মন্তব্য হলো, লাইস ইব্ন সাদ ইমাম মালিক এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তবে তার অনুসারীগণ তাদের ইমামের মাযহাব সংরক্ষণ করেননি।[৮২৮]
লাইস ইব্ন সাদ এর ফিক্হ ও ইজতিহাদী প্রতিভা ছিল দূরদর্শিতাপূর্ণ ও সর্বজনস্বীকৃত। মিসর এর এই ফকীহ ইরাক আগমনের পর তৎকালীন খলীফা স্বীয় মন্ত্রীকে বলেন, এই মহান শাইখকে যথাযথ গুরুত্ব দাও। বর্তমান সময়ে তার চেয়ে বড় আর কোনো ফকীহ নেই। আমার নিকট এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[৮২৯]
লাইস ইব্ন সাদ সম্পর্কে খলীফা আবু জাফর মনসুর এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।
حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا وَدَّعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ أَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَقْلِكَ وَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ فِي رَعِيَّتِي مِثْلَكَ،
"শুআইব ইব্ন লাইস স্বীয় পিতা লাইস ইব্ন সাদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, খলীফা আবু জাফর মনসুরকে বাইতুল মুকাদ্দাসে বিদায় জানানোর প্রাক্কালে আমাকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনার প্রখর বুদ্ধিমত্তা আমাকে অবাক করেছে। সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি, যিনি আমাকে আপনার মতো একজন প্রজা দান করেছেন"।[৮৩০]
ইমাম যাহাবী (র) বলেন, লাইস ইব্ন সাদ হলেন মিসরের ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সর্বোচ্চ সম্মনিত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। যাকে নিয়ে সমগ্র পৃথিবী অহংকার করে। মিসরের গভর্নর, বিচারক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তার ফিকহী সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। তার মতামত ও পরামর্শকে স্বাগত জানায়। খলীফা মনসুর তাকে স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাইলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।[৮৩১]
ইমাম যাহাবী আরো বর্ণনা করেন।

---

[৮২৭] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৩৮।

[৮২৮] আহমাদ আমিন, *দুহাল ইসলাম*, (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহদা আল মিসরিয়্যাহ, সপ্তম সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৮৯।

[৮২৯] খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ৫২৪।

[৮৩০] ফাসাবী, আবু ইয়ূসুফ ইয়াকুব ইব্ন সুফ্য়ান ইব্ন জুয়ান, *আল মারিফাতু ওয়াত তারীখ*, সম্পাদনাঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, (বৈরুতঃ মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭।

[৮৩১] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৪৩।

قال شرحبيل بن جميلٍ أدركت الناس أيام الخليفة هشام بن عبدالملك وكان اللَّيْث بن سعدٍ حدث السن وكان بمصر عبيدالله بن أبي جعفرٍ وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيبٍ وابن هبيرة وإنهم يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه عن حداثة سنه،

"শুরাহবিল ইব্ন জামিল বলেন, হিশাম ইব্ন আবদিল মালিক এর খেলাফতকালে লাইস ইব্ন সাদ ছিলেন অল্পবয়সী। তখন মিসরে উবাইদুল্লাহ ইব্ন জাফর, জাফর ইব্ন রবিয়া, হারিস ইব্ন ইয়াযিদ, ইয়াযিদ ইব্ন আবি হাবীবও ইব্ন হুবায়রা (র) এর মতো শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফকীহ জীবিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লাইস ইব্ন সাদ এর এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তার বুজুর্গি ও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে তার সাধনার স্বীকৃতি প্রদান করতেন"।

৫.১.৮. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) এর ইজতিহাদ

আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হিলাল ইব্ন আসাদ আল যুহালী আশ শায়বানী ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় লালিত-পালিত হন এবং ২৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শহর তথা কূফা, বাসারা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামেন, শাম ও আরব উপদ্বীপ ভ্রমন করেন। ইমাম শাফিঈ (র) এর বাগদাদ আগমনের প্রাক্কালে ইমাম আহমাদ তার নিকট থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) ব্যতীত ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল শতাধিক উস্তায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সুন্নাহ সংকলন ও হিফজকরণকে জীবনের প্রধান মিশন হিসেবে অবলম্বন করেন। তার প্রধান শাইখ হুশাইম ইব্ন বশির ইব্ন আবি হাযিম আল বুখারী (১০৪-১৮৩ হি.) এর বদৌলতে তিনি তৎকালীন সময়ের 'ইমামুল মুহাদ্দিসিন' এর পদ অলংকৃত করেন। তিনি ছিলেন হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম। ইবরাহীম আল হারবী তার সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

كان الله قد جمع له علم الاولين والاخرين،

"মনে হয় আহমাদ ইব্ন হাম্বল এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা পূর্বাপর সকল ইলম একত্র করে দিয়েছেন"।[৮৩২]

ইমাম শাফিঈ (র) এর উস্তায হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় শিষ্যের যে প্রশংসা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

خرجت من بغداد فما خلَّفت بها رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل،

"আমার বাগদাদ ত্যাগের প্রাক্কালে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ফিক্হ শাস্ত্রে পণ্ডিত ও বুজুর্গ কাউকে রেখে আসিনি"।[৮৩৩]

ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন ইমাম আহমাদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

كان في أحمد بن حنبل خصالٌ ما رأيتُها في عالم قط كان محدثًا وكان حافظًا وكان عالمًا وكان ورِعًا وكان زاهدًا وكان عاقلًا،

"আহমাদ ইব্ন হাম্বল এর নিকট এমন কিছু গুণ রয়েছে, যা সামষ্টিকভাবে অন্য কারো নিকট নেই। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, হাফিজ, আলিম, বুজুর্গ, দুনিয়াবিমূখ ও বুদ্ধিমান।[৮৩৪]

---

[৮৩২] আবু যাহরা, মুহাম্মদ, *ইব্ন হাম্বল হাআতুহু ওয়া আসরুহু*, (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরবী, তা/বি), পৃ. ২৯।

[৮৩৩] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৯৫।

[৮৩৪] ইব্ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪০৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৫০।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল আব্বাসী খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক বিল্লাহ এর শাসনামলে বিভিন্নমুখী পরীক্ষার সম্মুখীন হন। 'খালকুল কুরআন' সংক্রান্ত মাসআলায় সত্যের পক্ষে অটল অবস্থানের কারণে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। এমনকি কারাবন্দিও করা হয়। তার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন,

ان الله اعز الاسلام برجلين ابي بكر يوم الردة وابن حنبل يوم المحنة وقال عنه بشر الحافي ان احمد قام مقام الانبياء،

"আল্লাহ তায়ালা দুইজন ব্যক্তির অবদান ও আত্মত্যাগ দ্বারা ইসলামের সম্মান বর্ধিত করেন। ধর্মত্যাগীদের মোকাবেলায় আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর অবদান। 'কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি' বিষয়ক ভ্রান্ত মতবাদের বিপরীতে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এর কঠোর অবস্থান। বিশর আল হাফী বলেন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এ ব্যাপারে নবী-রাসূলদের ভূমিকা পালন করেছেন"।[৮৩৫]

ইমাম শাফিঈ (র) এর শিষ্য হবার সুবাদে ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এর মূলনীতি স্বীয় উস্তাযের কাছাকাছি। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি কোনো কিতাব রচনা করেননি। বিভিন্ন বিষয়ে তার উক্তি, আচরিত কর্মপন্থা ও প্রশ্নের উত্তর থেকে তার শিষ্যগণ হাম্বলী মাযহাবের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তার প্রধান গ্রন্থ হলো 'আল মুসনাদ'। যেখানে তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস সংকলন করেন। তার প্রধান শিষ্যদের তালিকায় রয়েছেন তারই দুই জ্যেষ্ঠ সন্তান সালিহ ইব্‌ন আহমাদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ। তার প্রধান শিষ্যগণ হলেন, আল আসরম, আবদুল মালিক, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, হারব ইব্‌ন ইসমাঈলও ইবরাহীম ইব্‌ন ইসহাক (র)।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল প্রসিদ্ধ মাযহাব চতুষ্ঠয়ের অন্যতম হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুরআন সুন্নাহর নসকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেই স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি রচনা করেন। নস পাওয়া না গেলে সাহাবীদের ফতোয়াকে তিনি দলীল হিসেবে প্রাধান্য দিতেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় মূলনীতির আলোকে তার ইজতিহাদী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বসাধারণের অসুবিধা লাঘব (الذرائع) তার ইজতিহাদী মূলনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মূলনীতির আলোকে তিনি প্রান্তিক চাষিদের বাজারে পৌঁছার পূর্বে তাদের নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া প্রদান করেন। ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি এই বেচা-কেনা অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেন। এক শ্রেণির অসাধু ক্রেতা-চক্র গ্রামের সহজ-সরল চাষিদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে পথে-প্রান্তরে ওঁত পেতে বসে থাকে। তারা সরলপ্রাণ ও সাধারণ চাষিদের বাজারের ন্যায্য দর থেকে কম দামে পণ্য ক্রয় করে তা সাধারণ মানুষের নিকট অধিক দামে বিক্রি করে। এতে প্রান্তিক চাষি ও সাধারণ ক্রেতা দুপক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এর মাযহাব হলো, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক দৃষ্টিকোণে বৈধ হলেও সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতিকর। এতে অবাধ ও স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ হলেও সর্বস্তরের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এ প্রকারের কেনা-বেচায় অনেক ক্রেতার সৎ উদ্দেশ্য ও ঠকানোর মানসিকতা না থাকলেও সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হয়। এই প্রকার কেনা-বেচা তিনি অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে বলেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ক্রয়-বিক্রয়টি অবৈধ হবার প্রমাণ বহন করে।[৮৩৬]

একটি ভিন্নমতে তিনি ক্রেতাগোষ্ঠী জন্য এ ধরনের বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যা চুক্তিটি বিশুদ্ধ হবার ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক থেকে দুটি মত পাওয়া যায়। কারো

---

[৮৩৫] আবু যাহরা, মুহাম্মদ, *ইব্‌ন হাম্বল হায়তুহু ওয়া আসরুহু*, (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরবী, তা/বি), পৃ. ২৯।

[৮৩৬] দাউদ রশীদ হারুন, *দিরাসাহ ফিকহিয়্যাহ*, (স্থান ও তা/বি), পৃ. ২০।

https://ar.wikipedia.org

কারো মতে এ চুক্তি শুদ্ধ হবে না। আবার অনেকের মতে শুদ্ধ হবে। ইব্ন হাযম এর মাযহাব হলো, এখানে মূল বেচা-কেনা শুদ্ধ।[৮৩৭]

তবে হানাফি মালিকী শাফিঈ ও জাহিরী মাযহাব এর জমহুর ফুকাহা এ ধরনের বেচা-কেনা সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৮৩৮]

৫.১.৯. আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ আত তামিমী (র) এর ইজতিহাদ

আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ আল মাকায়িস আল তামিমী খারিজী সম্প্রদায়ের উপদল ইবাদী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইবনুল মারওয়ান এর খেলাফতকালে ৭০৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। এ মাযহাবের চিন্তাধারা তুলনামূলকভাবে খারেজী সম্প্রদায়ের চেয়ে উদার। মৌলিকত্বের দিক থেকে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ এর আক্বিদা-বিশ্বাসের কাছাকাছি। খারেজীদের মতো তারা প্রতিপক্ষদের অমুসলিম মনে করে না। প্রতিপক্ষদের গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে হত্যা করার বৈধতাও স্বীকার করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাদের গোলা-বারুদ, অস্ত্র-সস্ত্র ও ঘোড়া গনীমত হিসেবে লাভ করতে পারে। প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যদান, তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী এবং উল্টরাধিকার সম্পদ লাভ করা বৈধ বলে মনে করে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসই এ মাযহাবের মূল উপজীব্য। তবে ইজমা বলতে তাদের স্বগোত্রীয়দের ইজমাই ধর্তব্য। এ মাযহাবের বিরোধপূর্ণ মাসআলা হলো, নারীদের উপর রজম এর দণ্ড প্রয়োগ অবৈধ। এ মাযহাবের আলাকে মৃত্যুকালীন সময়ে উল্টরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত করা সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতটি মানসুখ নয়। তারা স্ত্রী ও তার ফুফুকে একত্রে বিয়ে করা হারাম মনে করে না। দুধ পান করার কারণে শুধুমাত্র মা ও বোনকেই হারাম বলে মনে করে। তারা এ সকল মাসআলায় আল কুরআনের বাহ্যিক আয়াত অনুযায়ী আমল করে। তারা পাপাচারী ঈমানদারদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের আক্বিদায় বিশ্বাসী। [৮৩৯]

[৮৩৭] ইব্ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্ন আহমদ, *আল মুহাল্লা বিল আসার*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা/বি.), খ. ৭, পৃ. ৩৭৪।

[৮৩৮] কাসানী, আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাসউদ, *বাদায়িউস সানায়িঈ ফী তারতীবিশ শারায়ীঈ* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৩২।

[৮৩৯] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

পরিচ্ছেদ- ২
তাবউ তাবিঈনের যুগে ইজতিহাদ

৫.২.১. ইমাম আবু ইয়ূসুফ (র) এর ইজতিহাদ

আবু ইয়ূসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম ১১২ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। খলীফা হারুনুর রশিদ এর শাসনামলে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। হানাফী মাযহাবের প্রসার ও এর মূল নীতিমালা প্রণয়নে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ইমাম আবু ইয়ূসুফ ছিলেন ইমাম আবু হানিফার প্রধান শিষ্য। তার নিকট থেকেই ইমাম আবু ইয়ূসুফ হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। হিশাম ইব্ন উরওয়া, আমাশ ও আতা ইব্নুস সায়িব (র) থেকেও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আল শায়বানী ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) তার প্রধান দুই শিষ্য। ইমাম আবু ইয়ূসুফ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী বলেন,
"ইমাম আবু ইয়ূসুফ জ্ঞানের জগতে সবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। শরীয়া জ্ঞানে তার উপরে কেউ ছিল না। যার ফলে খলীফা হারুনুর রশিদ তাকে অধিক সম্মান করতেন"।
স্বীয় শিষ্যের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,
مَرِضَ أَبُو يُوسُفَ فَعَادَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: إِنْ يَمُتْ هَذَا الْفَتَى فَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ عَلَيْهَا وَأَوْمَأَ إِلَى الأَرْضِ،
"ইমাম আবু ইয়ূসুফ (র) একবার রোগাক্রান্ত হলে স্বীয় উস্তায ইমাম আবু হানীফা (র) তাকে দেখতে যান। বের হবার পর পৃথিবীর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এ যুবকটি মৃত্যুবরণ করলে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করবেন"।[৮৪০]
হানাফী মাযহাবের আলোকে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাব হলো,
الخراج، الرد على سير الأوزاعي، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، الآثار،
ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন বলে অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় উস্তায এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফার তত্ত্বাবধানে তার ফিকহ শাস্ত্রের পাঠদান শুরু হলেও ইমাম আবু হানীফার অনেক মূলনীতির সঙ্গেই তিনি দ্বিমত পোষণ করেন।
ইয়াহয়া আল বারমাকী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু ইয়ূসুফ যখন এখানে আগমন করেন, তখন এখানে ফিক্হ চর্চা ছিল খুবই সীমিত। তিনি স্বীয় ফিক্হ শাস্ত্র দ্বারা দুই কূল ভাসিয়ে দেন।
ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইয়ূসুফ এর একটি মূলনীতি হলো, 'মৌলিকভাবে কোনো জিনিস শুদ্ধ না হলে ঐ বস্তুর মধ্যস্থিত কোনো বস্তুও শুদ্ধ হবে না'। ইমাম আবু হানীফার মতে মৌলিকভাবে কোনো জিনিস শুদ্ধ না হলেও তার অভ্যন্তরীন কোনো বস্তু শুদ্ধ হবার ক্ষেত্রে এটি অন্তরায় হবে না। এ মূলনীতির কারণে অনেক মাসআলায় উস্তায ও শিষ্যের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোনো নারী এক হাজার দিরহাম মাহর এর বিনিময়ে গোপনে আকদ নিকাহ সম্পন্ন করলো। কিন্তু প্রকাশ্যে আর একটি আকদের ক্ষেত্রে মাহর নির্ধারণ করলো দুই হাজার দিরহাম। ইমাম আবু ইয়ূসুফ (র) এর মতে এ ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় গোপন আকদে নির্ধারিত মাহরই ধর্তব্য হবে। ইমাম আবু ইয়ূসুফ বলেন, প্রকাশ্য আকদে নির্ধারিত মাহর শুদ্ধ হলে দ্বিতীয় আকদের অভ্যন্তরেই শুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ দ্বিতীয় আকদ শুদ্ধ নয়। সুতরাং এই

---

[৮৪০] যাহাবী, শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি*, (হায়দারাবাদ: লাজনাতু ইহয়াইল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৬২।

আকদের মধ্যস্থিত কোনো বিষয় শুদ্ধ হতে পারে না। এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার মত হলো, প্রকাশ্য আকদে নির্ধারিত মাহরই ধর্তব্য হবে। তবে গোপন আকদে নির্ধারিত মাহর এর ব্যাপারে কোনো সাক্ষী থাকলে তাই ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আকদটি লোক দেখানো বলে ধরে নেয়া হবে। ইমাম আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা এর মতে সর্বাবস্থায় প্রকাশ্য আকদে নির্ধারিত মাহরই নির্ধারিত হবে।[৮৪১]

৫.২.২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী (র) এর ইজতিহাদ

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইবনুল ফারকাদ (১৩২-১৮৯) ইরাকের ওয়াসিত জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দামেস্কের অধিবাসী। ইমাম আবু হানীফা এর নিকট তিনি ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষার সূচনা করেন। পরবর্তীতে ইমাম আবু য়ুসূফ এর নিকট এ শাস্ত্রের পাঠ সম্পন্ন করেন। মিসআর ইব্ন কিদাম ও আওযায়ী থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ইমাম মালিক এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ইমাম ইমাম শাফিঈ (র) তাদের মধ্যে অন্যতম। খলীফা হারুনুর রশিদ এর আমলে ইমাম আবু ইয়ূসুফ এর পর তিনি বিচারক নিযুক্ত হন। অনন্য প্রতিভাধর এই ইমাম এর আরবী সাহিত্যশৈলি ও বালাগাত শাস্ত্রে ছিল সবিশেষ দক্ষতা । এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

ولو أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ، لقلت لفصاحته ،

"আমি যদি বলতে চাই, আল কুরআন ইমাম মুহাম্মদ এর ভাষায় নাযিল হয়েছে, তার ভাষাগত প্রাঞ্জলতার জন্য তা হবে খুব সামান্য প্রশংসা"।[৮৪২]

হানাফী মাযহাবের প্রচার-প্রসারে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থাবলি রচনা করেন। যা 'যাহিরুর রিওয়য়াহ' হিসেবে পরিচিত। এ সকল কিতাব হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইমাম আবু হানীফার প্রধান দুই শিষ্যের একজন। তিনি ইমাম আবু ইয়ূসুফ এর সতীর্থ। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার কারণে তিনি স্বীয় উস্তায ও অগ্রজ সতীর্থ ইমাম আবু ইয়ূসুফ এর সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলায় ইখতিলাফ করেছেন। তিনি নিজস্ব মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ করতেন। তার ইজতিহাদের একটি মূলনীতি হলো, 'কোনো ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে কোন কাজ করা নিজের উপর আবশ্যক করে নিলে, কাজটি আলাদাভাবে আদায় করা তার উপর কর্তব্য হয়ে পড়বে। তার উপর পূর্বে ওয়াজিব হয়েছে এমন কোনো কাজ আদায়ের মাধ্যমে তা আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইয়ূসুফ এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ মূলনীতির কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিরোধপূর্ণ একটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো,

কোনো ব্যক্তি নিজের উপর বাইতুল্লাহ যিয়ারত করা ওয়াজিব করে নিল। লোকটি ঐ বছর ফরজ হজ আদায় করলে নিজের জন্য ওয়াজিবকৃত বাইতুল্লাহ যিয়ারতের কর্তব্য থেকে মুক্ত হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইয়ূসুফ এর মতে ফরজ হজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের উপর ওয়াজিবকৃত বাইতুল্লাহ যিয়ারতের দায়িত্ব থেকে সে অব্যাহতি লাভ করবে।[৮৪৩]

---

[৮৪১] দাবুসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ৬৩।

[৮৪২] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১৩৫।

[৮৪৩] দাবুসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুতঃ দারু ইব্ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ৬৮।

মুসলির বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) তার ভূয়সী প্রশংসা করেন, ইবরাহীম আল হারবী বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলকে প্রশ্ন করলাম,

من أين لك هذه المسائل الدقاق قال : من كتب محمد بن الحسن،

"এ সকল সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কীভাবে শিখেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান এর কিতাব থেকে"।[৮৪৪]

৫.২.৩. ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল (র) এর ইজতিহাদ

আবুল হুযাইল যুফার ইবনুল হুযাইল (১১০-১৫৮ হি.) আল আনবারী আত তামিমী ইমাম আবু হানীফার উল্লেখযোগ্য শিষ্য। এই মহান ইমামের জন্ম জ্ঞান–বিজ্ঞানের রাজধানী কূফায়। তিনি সুলায়মান আল আমাশ, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আল আনসারী ও আইয়ুব আস সাখতিয়ানী থেকে হাদীস শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। আবু নুআইম ইসফাহানী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ তার প্রধান শিষ্য। ফিক্হ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ইমাম ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন বলেন,

هُوَ مِنْ بُحُوْرِ الفِقْهِ وَأَذْكِيَاءِ الوَقْت ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ تَفَقَّهَ بِأَبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ تَلاَمِذَتِه وَكَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ وَكَانَ يَدْرِي الحَدِيْثَ وَيُتْقِنُهُ ،

"তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। আমার দৃষ্টিতে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের একটি মহাসমুদ্র। যুগের মেধাবী সন্তান। ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের মধ্যে তিনি সবার শীর্ষস্থানীয়। তার মধ্যে ইলম ও আমলের সমাহার ছিল। হাদীস শাস্ত্রে তার অবস্থান ছিল খুবই মজবুত। [৮৪৫]

ইমাম যুফার এর প্রধান শিষ্য আবু নুআইম ইসফাহানী স্বীয় উস্তায এর হাদীসজ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

كُنْتُ أَعرِضُ الأَحَادِيْثَ عَلَى زُفَرَ فَيَقُوْلُ هَذَا نَاسِخٌ هَذَا مَنْسُوْخٌ هَذَا يُؤْخَذُ بِهِ هَذَا يُرفَضُ،

"আমি ইমাম যুফার এর নিকট বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতাম। তিনি বলতেন, এই হাদীসটি নাসিখ এবং ঐটি মনসূখ। এ হাদীস মতো আমল করা যাবে। ঐটির আমল বর্জিত"। [৮৪৬]

খতীব আল বাগদাদী (র) বর্ণনা করেন,

أن رجلاً قال في حلقة وكيع بن الجراح الحافظ المعروف أخطأ أبو حنيفة فقال وكيع: وكيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في قياسهم واجتهادهم،

"প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ এর দরসে জনৈক ব্যক্তি বলল, 'ইমাম আবু হানীফা ভুল করেছেন'। উত্তরে ওয়াকি বলেন, ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদ ও কিয়াসে ভুল থাকতে পারে না। কেননা তার নিকট ইমাম আবু ইয়ূসুফ, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আল শায়বানী ও ইমাম যুফার এর মতো জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন"।[৮৪৭]

---

844 যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১৩৫।

৮৪৫ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৯।

৮৪৬ প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০।

৮৪৭ খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্ন আলী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১৬ পৃ. ৩৬৫।

তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের অন্যতম। স্বতন্ত্র মুজতাহিদ হিসেবে তার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মূলনীতি লালন করেন। যার মাধ্যমে তিনি স্বীয় উস্তায ও সতীর্থদের সঙ্গে অনেক মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। তার প্রণীত একটি মূলনীতি হলো, হুকুমের ক্ষেত্রে একটি বিষয় অন্য বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত হলে বিষয়টির সকল হুকুম তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রধান ইমামত্রয় এ মূলনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে ঐ বস্তুর উপর সব বিধান প্রযোজ্য হবে না। এ মূলনীতির কারণে অনেক মাসআলায় তার সঙ্গে অন্যান্য ইমামের মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়।[৮৪৮]

ইমাম যুফার (র) স্বীয় শাইখ ইমাম আবু হানীফার প্রতিপক্ষদের অভিযোগের জবাবদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি বলেন,

لا تلتفتوا إلى كلام المخالفين فإنه ما قال إلا من الكتاب أو السنة أو أقاويل الصحابة ثم قاس عليها ولم يكتف بالقول بل قرنه بالعمل فرحل إلى البصرة لينشر مذهب شيخه بما أوتي من حكمة وفهم وسعة صدر ورحابة أفق حتى غدا شيخ البصرة بلا منازع،

"ইমাম আবু হানীফার প্রতিপক্ষ কে কি বললো তার দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। তিনি যা বলেছেন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বলেছেন। অথবা সাহাবীদের উক্তি দ্বারা দলীল দিয়েছেন। এতে কোনো সমাধান না পেলে তিনি কিয়াস করেছেন। যে হাদীসের উপর সাহাবায়ে কেরামের আমল প্রমাণিত নেই, এমন হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহপদত্ত প্রজ্ঞা, মেধা, অন্তরের প্রশস্ততা ও দিগন্তবিস্তৃত উদারতা দ্বারা স্বীয় শাইখ এর মাযহাব এর প্রচার-প্রসারে বাসারা ভ্রমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি বসারার শাইখ হিসেবে পরিগণিত হন। এতে তার কোনো প্রতিদ্বন্ধী ছিল না।

৫.২.৪. ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) এর ইজতিহাদ

আবু আলী হাসান ইব্ন যিয়াদ আল আনসারী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম আবু হানীফা ও তার প্রধান দুই শিষ্য থেকে হাদীস ও ফিক্হ এর দরস লাভ করেন। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন মুহাম্মদ ইব্ন শুজা আস সালজী ও শুআইব ইব্ন আইয়ুব (র) প্রমুখ। ফিকহে হানাফীর অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত রয়েছে। তিনি ফিক্হসম্বলিত হাদীসসমূহ খুবই গুরুত্বসহকারে সংরক্ষণ করতেন। আহমাদ ইব্ন কাযী আবদুল হামীদ (র) আল হারিসী থেকে বর্ণিত, হাসান ইব্ন যিয়াদ থেকে উন্নত চরিত্রবান লোক আমার চোখে পড়েনি। দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। তার বিভিন্নমুখী জ্ঞান ও ফিকহী প্রতিভা ছিল পূণার্ঙ্গ। তাকওয়া-পরহেযগারিতেও তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ইয়াহয়া ইব্ন আদম বলেন, হাসান ইব্ন যিয়াদ থেকে বড় ফকীহ আমি দেখিনি। এ প্রসঙ্গে হাসান ইব্ন যিয়াদ বলেন,

كتبت عن ابن جريجٍ اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء،

[৮৪৮] দাবুসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, (বৈরুত: দারু ইব্ন যাইদুন, তা/বি), পৃ. ৮৯।

"আমি ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বারো হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, যা ফকীহদের জন্য প্রয়োজনীয়।[৮৪৯]

ইমাম আবু ইয়ূসুফ স্বীয় শিষ্য হাসান ইব্ন যিয়াদ সম্পর্কে সু-ধারণা পোষণ করতেন। তার নিকট ফতোয়া তালাশকারীদের তিনি ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ এর নিকট ফতোয়া চাইতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইমাম আবু ইয়ূসুফ (র) বলেন,

بادروه واسألوه وإلا لم تقدروا عليه،

"তোমরা তার নিকট থেকে মাসআলা জানার চেষ্টা করো। অন্যথায় তার সমাধান পাবে না"।[৮৫০]

তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন একজন ফকীহ। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার শিষ্যদের ফিকহী বর্ণনাবলির একজন প্রধান সংরক্ষণকারী। তিনি ১৯৪ হিজরীতে কূফার কাযী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে এ পদে অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর শাগরিদ হবার সুবাদে ফিক্হ শাস্ত্রে তার দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা হলো,[৮৫১]

ادب القاضي، معاني الايمان ، النفقات، الخراج، الفرائض، الوصايا، الامالي،

"ইমাম ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন (র) বলেন, তার চেয়ে উঁচু মাপের ফকীহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি"।

আহমাদ ইব্ন কাযী আবদুল হামীদ (র) বর্ণনা করেন,

হাসান ইব্ন যিয়াদ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তার মধ্যে ফিক্হ ও হাদীসের জ্ঞান ছিল পরিপূর্ণ। তাকওয়া পরহেযগারীতেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। হাসান ইব্ন যিয়াদ জগদ্বিখ্যাত আলীম ও ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কামান তাক করেছে। হাদীস ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে হাদীস বাদ দিয়ে কিয়াস মতো আমল করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। আত তাবাকাত আস সানিয়্যাহ গ্রন্থকার বলেন,

وروى عنه محمد بن شجاع أنه قال وقد سأله رجل أكان زفر قياسياً؟ ما قولك قياسياً!! هذا كلام الجهال كان عالماً،

"মুহাম্মদ ইব্ন শুজা থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল। হাসান ইব্ন যিয়াদ কি কিয়াসপন্থি ছিলেন? কিয়াস অনুযায়ী আমলকারীদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন, কিয়াসী বলতে কি বোঝায়? এ ধরনের কথা মুর্খরাই বলতে পারে। তিনি তো একজন জবরদস্ত আলিম ছিলেন।[৮৫২]

৫.২.৫. দাউদ আত তায়ী (র) এর ইজতিহাদ

আবু সুলায়মান দাউদ ইব্ন নুসাইর আত তায়ী কূফার এজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ১০০ হিজরির পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার যোগ্য শিষ্য, হাসান

---

৮৪৯ তাকিউদ্দীন ইব্ন আবদুল কাদির আত তামীমী আদ দারী, *আত তাবাকাতুস সানিয়্যাহ*, (রিয়াদ: দারুর রিফায়ী, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৫।

৮৫০ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৬।

৮৫১ যিরিক্লি, খাইরুদ্দীন ইব্ন মাহমুদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ফারিস, *আল আলাম*, (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মিলিয়ন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০২), খ. ২, পৃ. ১৯১।

৮৫২ তাকিউদ্দীন ইব্ন আবদুল কাদির আত তামীমী আল দারী, *আত তাবাকাতুস সানিয়্যাহ*, (রিয়াদ: দারুর রিফায়ী, ১৯৮৩ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২২৬।

বসরীর বিশিষ্ট শাগরিদ ও ফিক্হ শাস্ত্রের একজন মহান ইমাম। হিশাম ইব্ন উরওয়া, হামীদ আল তাওয়ীল ও সুলায়মান আল আমাশ (র) থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন ইব্ন উলাইয়া, মুসআব ইব্ন মিকদাম ও আবু নুআইম (র) প্রমুখ। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি পঠন-পাঠন ও ফিক্হ চর্চায় ব্যয় করেন। শেষ জীবনে একাকিত্ব গ্রহণ করেন এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলেন। মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান ফকীহ ও আলিমগণ তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সুফ্য়ান সাওরী তার উস্তায হওয়া সত্ত্বেও দাউদ তায়ীর প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাতেন। তিনি বলেন, দাউদ তায়ী দীনের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (র) বলেন, দাউদ তায়ী নিজের জীবনের সঠিক পন্থাটি নির্বাচন করেছেন। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন,

...وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الفِقْهِ وَالرَّأْيِ بَرَعَ فِي العِلْمِ بِأَبِي حَنِيْفَةَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى شَأْنِهِ وَلَزِمَ الصَّمْتَ وَآثَرَ الخُمُوْلَ وَفَرَّ بِدِيْنِهِ،

"দাউদ তায়ী ছিলেন ফিক্হ শাস্ত্রের একজন মহান ইমাম। ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের মধ্যে তিনি অগ্রগামিতা লাভ করেন। পরবর্তীতে একাকিত্ব বরণ করেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন। নিজের দীন বাঁচানোর জন্য নির্জন জীবনকে প্রাধান্য দেন"। [৮৫৩]

ইব্ন উয়াইনা বলেন, দাউদ তায়ী এমন একজন মহান ব্যক্তি, যিনি ইসলামী শরীয়ত ও ফিক্হ শাস্ত্র খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করেছেন। ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তুখোড়। একদা তাকে উদ্দেশ করে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, হে আবু সুলায়মান! তোমার হাত-মুখ বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। এর পর তিনি কারো প্রশ্নের উত্তর দেননি।

পরিচ্ছেদ- ৩
দ্বিতীয় হিজরীর প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের মুজতাহিদ ইমামগণের তালিকায় যারা শীর্ষ স্থানে রয়েছেন, তারা হলেন ইমাম আবু হানীফা (র) এর শাগরেদগণ। যারা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা থেকে ইজতিহাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। অথবা তাঁর প্রধান শিষ্যগণের নিকট থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের দরস লাভ করেছেন। এ পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানিফার দ্বিতীয় সারির শিষ্যদের ইজতিহাদী কার্যক্রম আলোচনা করা হবে। ইমাম মালিক এর শিষ্যদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় শতকে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের আলোচনাও স্থান পাবে। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইমাম শাফিঈর জন্মের কারণে তাঁর শাগরেদদের অবদান রয়েছে হিজরী তৃতীয় শতকে। দ্বিতীয় শতকে জন্ম লাভ করার কারণে তাদের কয়েকজনের আলোচনা এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে।

---

[৮৫৩] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪২৩।

৫.৩.১. ইমাম আবু হানীফা (র) এর শাগরিদগণের ইজতিহাদ

ইমাম আবু হানীফা (র) ফিক্হ শাস্ত্রের প্রবক্তা। শরীয়তের মূল উৎস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয় ও সর্বাগ্রে। আল্লাহপ্রদত্ত এ যোগ্যতার প্রভাব তাঁর শাগরেদগণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি ইমাম আবু হানীফা (র) এর শাগরেদগণ ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন বিচারালয়ে কাযী পদে নিয়োজিত থাকার সুবাদে মুসলিম বিশ্বে তাদের অবদান রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। নিম্নে ইমাম আবু হানিফার শাগরেদগণের ইজতিহাদী কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবি হানীফা (র)

ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ২১২ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন। তিনি স্বীয় পিতা হাম্মাদ ও হাসান ইব্ন যিয়াদ এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। পিতা থেকে তিনি হাদীস এর দরসও লাভ করেন। তাছাড়া মালিক ইব্ন মিগওয়াল, আমর ইব্ন যার ও কাসিম ইব্ন মান থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে অনেকেই হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফার পরিবারের সদস্য হবার সুবাদে ফিক্হ শাস্ত্র ছিল তার মজ্জাগত। যার ফলে তিনি বাসারা ও রিক্কার কাযী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার ফিকহী প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইমাম কাসিম ইব্ন কুতলূবাগা (র) (৮০২-৮৭৯) বলেন,

...وكان إماما عالما عارفا بصيرا بالقضاء محمود السيرة فيه فقيها عارفا بالأحكام والوقائع دينا صالحا عابدا،

"তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম। বিচার ব্যবস্থায় অত্যন্ত পারদর্শী, দূরদর্শি ও সৎ গুণাবলিসম্পন্ন। তিনি এমন একজন দক্ষ ফকীহ, যিনি শরীয়তের বিধি-বিধান ও অতীতের ঘটনাপঞ্জি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন দীনদার, নেককার ও ইবাদতগোযার।[৮৫৪]

ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তার অনবদ্য গ্রন্থ হলো, الجامع। তিনি স্বীয় পিতামহ ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত ফিকহী মতামতসমূহ এখানে সন্নিবেশ করেন। তার অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে,

كتاب الرد على القدرية وكتاب الإرجاءرسالة إلى البستي،

ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের কাযী হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবি হানীফার চেয়ে যোগ্য কাযী কেউ ছিলেন না। শামসুল আয়িম্মাহ হালওয়ানী (র) (মৃ.৪৪৮হি.) থেকে বর্ণিত, ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইমাম আবু ইয়ূসুফ থেকে ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন মাসআলায় তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। শামসুল আয়িম্মাহ আরো বলেন, ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ যৌবনকালে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন হায়াত লাভ করলে মুসলিম উম্মাহর একজন মহান শাইখ হিসেবে আবির্ভূত হতেন। ফকীহ ও মুজতাহিদগণ তার ফিক্হ দ্বারা অনেক উপকৃত হতেন।[৮৫৫]

---

[৮৫৪] কাসিম ইব্ন কুতলূবাগা, আবুল আদল যাইনুদ্দীন, *তাজুত তারাজুম*, (বৈরুত: দারুল কলম, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৪।

[৮৫৫] তাকিউদ্দীন ইব্ন আবদুল কাদির আত তামীমী আদ দারী, *আত তাবাকাতুস সানিয়্যাহ*, (রিয়াদ: দারুর রিফায়ী, ১৯৮৩ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৭৫।

হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র)

হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ইব্‌ন তালাক ইব্‌ন মুআবিয়া আন নাখায়ী ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ ও হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ১১৭ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম আবু ইয়ূসুফ ও সুফ্য়ান সাওরী সেই তালিকার সর্বশীর্ষে। তার শিষ্যদের তালিকায় রয়েছেন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈন, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ ও আলী ইবনুল মাদিনী এর মতো জগদ্বিখ্যাত ফকীহ, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিস। হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রে তার দক্ষতা ছিল অনন্য। খলীফা হারুনুর রশিদ এর খেলাফতকালে বাগদাদের কাযী হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এ কৃতিত্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে কূফার কাযী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাহযীবুল কামাল গ্রন্থকার আল মিয্‌যী (৬৫৪-৭৪২ হি.) এর বর্ণনা মতে, হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) কূফায় তেরো বছর ও বাগদাদে দুই বছর বিচারকার্য পরিচালনা করেন।[৮৫৬]

ইমাম ইজলি তাকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন, হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ছিলেন 'খাতামুল কাযা' অর্থাৎ ন্যায়বিচার তার হাতে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কূফার সাধারণ মানুষের নিকট তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তার যুগে জনসাধারণের জীবনযাত্রার সতেজভাব ছিল খুবই উন্নত। সর্বস্তরের মানুষের নিকট এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

أَهْلُ الْكُوْفَةِ الْيَوْمَ بِخَيْرِ أَمِيْرُهُم دَاوُدُ بنُ عِيْسَى وَقَاضِيْهِم حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ وَمُحْتَسِبُهُم حَفْصٌ الدَّوْرَقِيُّ،

"কূফার অধিবাসীরা বর্তমানে অত্যন্ত শান্তিতে বসবাস করছে। দাউদ ইব্‌ন ঈসা এর মতো ব্যক্তি তাদের আমির হিসেবে নিয়োজিত আছেন। হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) এর মতো বিচারক কাযী পদে কর্মরত আছেন। আর হিসাব রক্ষক হিসেবে দায়িত্ববান আছেন হাফস আল দাওরাকী"।[৮৫৭]

ইমাম ওয়াকী এর নিকট কোনো বিষয়ে ফতোয়া তালাশ করা হলে তিনি বলতেন।

اذْهَبُوا إِلَى قَاضِيْنَا فَاسْأَلُوْهُ وَكَانَ شَيْخاً عَفِيْفاً مُسْلِماً،

"আমাদের কাযী হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) এর নিকট এর সমাধান তালাশ করো। তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন সৎ ও মহান ইমাম"।[৮৫৮]

আসাদ ইব্‌ন আমর আল বাজালী (র)

আবুল মুনযির আসাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল বাজালী ইমাম আবু হানীফার প্রধান শিষ্য ও শীর্ষস্থানীয় ফকীহ। মুতার্‌রাফ ইব্‌ন তারিফ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাতসহ (র) অনেক জলীলুল কদর ফকীহ থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ও আহমাদ মানি তার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেন,

وكان قد صحب أبا حنيفة وتفقه وكان من أهل الكوفة فقدم بغداد فولى قضاء مدينة الشرقية بعد العوفي وولى أيضا قضاء واسط،

[৮৫৬] মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি, ১৯৮০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৪।

[৮৫৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ২৭।

[৮৫৮] প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৩।

"আসাদ ইব্‌ন আমর আল বাজালী ইমাম আবু হানীফার সান্নিধ্য গ্রহণ করে তার নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কূফা থেকে বাগদাদ আগমন করেন এবং আউফী এর পর পূর্বাঞ্চলের কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ওয়াসিত এর কাযী হিসেবেও কর্মরত ছিলেন"।

ইমাম তাহাবী (র) বর্ণনা করেন, ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনে নিয়োজিত ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। সেই চল্লিশ সদস্যের প্রথম দশ জনের মধ্যে ছিলেন, আবু ইয়ূসুফ, যুফার, দাউদ তায়ী, আসাদ ইব্‌ন আমর, ইয়ূসুফ ইব্‌ন খালিদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবি যায়িদা (র)। [৮৫৯]

ঈসা ইব্‌ন আবান (র)

আবু মূসা ঈসা ইব্‌ন আবান (র) ইব্‌ন সাদাকা হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর বাসারার কাযী পদে নিয়োজিত ছিলেন। হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আল শায়বানী ছিলেন তার প্রধান শাইখ। ঈসা ইব্‌ন আবান (র) ২২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে দক্ষতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন। উসূলে হাদীসের তিনি একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে হানাফী মাযহাবের আলোকে হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা স্থান লাভ করে। গ্রন্থটি রচনার খবর খলীফা মামুন এর নিকট পৌঁছলে তিনি এটির শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাইয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য ফকীহ ও মুজতাহিদদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এতে ব্যর্থতার দায়ে তাদেরকে ফতোয়া প্রদানে নিষিদ্ধ ঘোষণার হুমকি প্রদান করেন। কমিটির সদস্য ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আকসাম ও বিশর ইবনুল ওয়ালিদ (র) চুলছেড়া বিশ্লেষণের পর গ্রন্থটিতে কোনো খুঁত বের করতে পারেননি। এর পর থেকে ঈসা ইব্‌ন আবান (র) এর মর্যাদা খলীফার নিকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং রাজ দরবারের রেজিস্টার্ড ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিন রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত মুজতাহিদদের অধিবেশনে বসার অনুমতিও লাভ করেন। ঈসা ইব্‌ন আবান (র) ফিক্‌হ ও বিচারব্যবস্থায় অত্যন্ত দক্ষহস্ত ছিলেন। জীবনীকার শিরাযী (র) কাযী আবু হাযিম এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

ما رأيت لأهل البصرة حدثاً أذكى من عيسى بن إبان وبشر ابن الوليد ومنهم أبو سليمان،

"আমি বাসারার যুবক ফকীহদের মধ্যে ঈসা ইব্‌ন আবান, বিশর ইবনুল ওয়ালিদ ও আবু সুলায়মান এর চেয়ে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কাউকে দেখিনি"।[৮৬০]

ঈসা ইব্‌ন আবান (র) অত্যন্ত সহজ সরল ব্যক্তি ও দ্রুত বিচার বাস্তবায়নে সক্ষম একজন ন্যায় বিচারক ছিলেন।[৮৬১]

ইমাম তাহাবী (র) বর্ণনা করেন, তৎকালীন সময়ে কর্মরত কাযীদের মধ্যে ঈসা ইব্‌ন আবান (র) এর চেয়ে অধিক ফকীহ আর কোনো কাযী নিয়োজিত ছিলেন না। তিনি আরো বর্ণনা করেন, আমাদের সময়ে এমন দুইজন কাযী ছিলেন, যে দুইজনের কোনো নযির নেই। একজন হলেন ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ। দ্বিতীয়জন ঈসা ইব্‌ন আবান। ইমাম তাহাবীর আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়,

مَا ولى الْبَصْرَة مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَام إِلَى وقتنا هَذَا قَاض أفقه من عِيسَى بن أبان،

---

[৮৫৯] তাকিউদ্দীন ইব্‌ন আবদুল কাদির আত তামীমী আদ দারী, *আত তাবাকাতুস সানিয়্যাহ,* (রিয়াদ: দারুর রিফায়ী, ১৯৮৩ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৬৯।

[৮৬০] শিরাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আলী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, সম্পাদনা: এহসান আব্বাস, (বৈরুত: দারুর রায়িদ আল আরবী, ১৯৭০ খ্রি), খ. ১, পৃ. ১৩৭।

[৮৬১] ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাদায়িন, ১৩৬৬ হি./ ১৯৪৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭০।

"ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বাসারায় নিয়োগপ্রাপ্ত কাযীদের মধ্যে ঈসা ইব্‌ন আবান (র) এর চেয়ে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোনো কাযী নিয়োজিত হননি"।[৮৬২]

হামযা ইব্‌ন হাবীব আয যায়্যাত (র)

হামযা ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন ইসমাঈল আয যায়্যাত (র) কূফার বিশিষ্ট ইমাম ও ইমাম আযম আবু হানীফার ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি ইরাকের হালওয়ান নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আমাশ ছিলেন তার প্রধান শাইখ ও আবুল হাসান আল কাসায়ী তার প্রধান শিষ্য। ইলমে কেরায়াত ও ফারায়েজ শাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম ছিলেন তিনি। হাদীস শাস্ত্রে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তাকে ইলমে কিরায়াত এর সপ্ত ইমাম এর অন্যতম ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض،

"আপনি দুইটি বিষয়ে আমাদের ছাড়িয়ে গেছেন। এই দুটিতে আমরা আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছি। একটি হলো ইলমে কেরায়াত, দ্বিতীয়টি হলো ফারায়েজ শাস্ত্র।

তার বহুমুখী প্রতিভার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনুল জাযরী বলেন,

وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماما حجة ثقة ثبتا رضي قيما بكتاب الله بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث،

"ইমাম আসিম ও আমাশ এর পর কিরায়াত শাস্ত্রের তিনি ছিলেন প্রধান ইমাম। হাদীস বর্ণনার যাবতীয় গুণাবলির সমাহার ছিল তার মধ্যে। আল কুরআনের হুকুম আহকামের উপর সুদৃঢভাবে আমল করতেন। ফারায়েজ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ ও আরবী সাহিত্যে তার ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর। তদুপরি তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিজ"।[৮৬৩]

৫.৩.২. ইমাম মালিক (র) এর শাগরিদগণের ইজতিহাদ

ইমামু দারিল হিজরাহ তথা মদীনার ইমাম হিসেবে মালিক ইব্‌ন আনাস এর খ্যতি বিশ্বব্যাপী। হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। বহুল প্রচলিত একটি মাযহাবের ইমাম হবার সুবাদে প্রচুর ফকীহ-মুজতাহিদ তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। ইমাম মালিক এর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রভাব তার শিষ্যদের কর্মধারার মধ্যে প্রতিভাত হয়। নিম্নে ইমাম মালিক এর প্রধান প্রধান শাগরেদগণের ইজতিহাদী কর্মধারা আলোচনা করা হলা।

আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র)

আবু আবদিল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জুনাদা আল উতাকী ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস এর প্রধান শাগরিদ। তিনি ১৩২ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১ হিজরীতে

862 আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসরুল্লাহ, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, (করাচি: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৪০১।

৮৬৩ ইবনুল জাযরী, আবুল খাইর শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *গায়াতুন নিহায়া ফী তাবাকাতিল কুররা*, (কায়রো: মাকতাবা ইব্‌ন তায়মিয়া, ১৩৫১ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬৩।

ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর ইমাম মালিক এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিসরের ফকীহ লাইস ইব্ন সাদ এর নিকটও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদে মুতলাক। ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া তার সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) ছিলেন ইমাম মালিক এর ইলম এর প্রধান ধারক। ইমাম মালিক তার উপর অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। তিনি মালিকী মাযহাবের প্রধান গ্রন্থ 'আল মুদাওয়ানা' এর পুনঃনীরিক্ষণ করেন। গ্রন্থটির ফিকহী বিন্যাসে প্রধান ভূমিকা পালনকারী সাহনূন (র) তার নিকট থেকে কিতাবটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক তার ব্যাপারে বলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো। তোমার উপর জ্ঞান বিস্তারের বিশাল দায়িত্ব রয়েছে'।[৮৬৪]

ইমাম দারা কুতনি (র) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

...هو من كبار المصريين وفقهائهم رجل صالح مقل صابر متقن حسن الضبط،

"আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। ধৈর্যশীল, প্রজ্ঞাবান ও নেককার ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যে কোনো বিষয় আয়ত্তকরণে সিদ্ধহস্ত"।[৮৬৫]

ইব্ন ফারহুন (৭৯৯ হি.) বর্ণনা করেন, ইব্ন ওয়াহাব আবু সাবিতকে বলেন, ইমাম মালিক (র) এর ফিক্হ রপ্ত করতে চাইলে ইবনুল কাসিম এর নিকট যাও। আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র এটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব (র)

শাইখুল ইসলাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব (র) আল ফিহরী ইমাম মালিক এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তিনি ১২৫ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ইমাম মালিক এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ মাযহাবের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মালিকী মাযহাবের পরিগঠনে তার অবদান অবিস্মরণীয়। ইমাম মালিক এর নিকট তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত সমীহের। তার নিকট পত্র লেখার সময় ইমাম মালিক আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবকে 'মিসরের ফকীহ' ও 'মুফতী ' বলে সম্বোধন করতেন। লাইস ইব্ন সাদ এর নিকটও তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। ফকীহ হবার পাশাপাশি তিনি হাদীস শাস্ত্রের একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তাকে জ্ঞানের রেজিস্টার (ديوان العلم) বলা হতো।[৮৬৬]

ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব (র) অনেক তাবিঈ এর নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তাকে শরীয়া বিষয়ক জ্ঞানের মহাসাগর বলে আখ্যায়িত করা হয়। আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) বলেন,

كَيْفَ لاَ يَكُوْنُ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ وَقَدْ ضَمَّ إِلَى عِلْمِهِ عِلْمَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَيَحْيَى بنِ أَيُّوْبَ وَعَمْرِو بنِ الحَارِثِ وَغَيْرِهِم؟

"হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের একাধিক মহাসাগরে তিনি বিচরণ করতেন। কারণ তার মধ্যে তৎকালীন যুগের অনেক মহা-মনীষীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ছিল। তারা হলেন ইমাম মালিক, লাইস ইব্ন সাদ, ইয়াহয়া ইব্ন আইয়ুব, আমর ইবনুল হারিস (র) প্রমুখ"।

---

[৮৬৪] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্কঃ দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩২।

[৮৬৫] ইব্ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনাঃ ড. মুহাম্মদ আল আহমাদী আবুন নুর, (কায়রোঃ দারুত তুরাস, তা/বি), খ. ১ পৃ. ৪৬৫।

[৮৬৬] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩২।

সাধারণ মানুষের নিকট তিনি ছিলেন খুবই আস্থাভাজন। মিসরের জনগণ ফিকহী মাসআলায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমাধানের জন্য আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব (র) এর অপেক্ষায় থাকতো। তার আগমনের পর জনগণের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ হতো। তৎকালীন খলীফা ইব্ন ওয়াহাবকে কাযী পদে নিয়োগ দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিভৃতে জীবন যাপন করতে লাগলেন। মিসরের প্রসিদ্ধ আলিম রুশদ ইব্ন সাদ (র) এর সাথে একদিন তার সাক্ষাত হলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দেওয়া থেকে আপনি বিরত থাকছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন। আপনার বিবেক কি বিকলাঙ্গ হয়ে গেল? আপনি কি একথা জানেন না? আলিমদের হাশর হবে নবীদের সঙ্গে, আর কাযীদের হাশর হবে রাজা-বাদশাহদে সঙ্গে।

ইমাম মালিক প্রণীত মুয়াত্তা কিতাবের প্রধান বর্ণনাকারীর ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা হলো,[৮৬৭]

مُوَطَّأُ ابْنِ وَهْبٍ الجَامِعِ ، وَكِتَابُ البَيْعَةِ ، وَكِتَابُ المَنَاسِكِ ، وَكِتَابُ المَغَازِي ، وَكِتَابُ الرِّدَّةِ ، وَكِتَابُ تَفْسِيْرِ غَرِيْبِ المُوَطَّأِ،

সাহনূন (র)

আবু সাইদ আবদুস সালাম সাহনূন (র) ইব্ন সাইদ ইব্ন হাবীব আত তানুখী স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রধান ফকীহ। তিনি ১৬০ হিজরীতে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। মিসর, শাম ও হিজায ভ্রমন করে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ২৪০ হিজরী পর্যন্ত আমৃত্যু কাযী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা' রচনা করেন। যেখানে মালিকী মাযহাবের আলোকে ফিকহী মাসআলা দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেন। তিনি বাহ্‌লুল, ইব্ন আবি যায়িদাহ ও আলী ইব্ন যিয়াদ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। আফ্রিকা, স্পেন ও ইরাকে এ মাযহাবের প্রচার-প্রসারে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। জীবনীকার হাজাবী বর্ণনা করেন,

قال ابن القاسم وأشهب وابن أبي الغمر: لم يقدم علينا من إفريقية مَن هو أفقه مِن سحنون،

"ইবনুল কাসিম, আশহাব ও ইব্ন আবিল গাম্‌র বলেন, আমাদের নিকট আফ্রিকা থেকে সাহনূন (র) এর চেয়ে বড় ফকীহ আগমন করেননি"।[৮৬৮]

সাহনূন (র) রচিত 'আল মুদাওয়না' ফিক্‌হ শাস্ত্রের একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এটি মূলত আসাদ ইবনুল ফুরাত কর্তৃক ইবনুল কাসিম এর নিকট কৃত প্রশ্নাবলির জবাব। যা তিনি যুক্তি-প্রমাণসহ সুবিন্যস্ত করেন। এটি আফ্রিকায় ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এ কিতাবের সুবাদে আফ্রিকায় মালিকী মাযহাব ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কায়রোর অধিবাসীরাও এ গ্রন্থের উপর আস্থাশীল ছিলেন। এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি ফকীহদের সংঘবদ্ধ ও চৌকস একটি জামাত তৈরি করতে সক্ষম হন। যা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি।[৮৬৯]

---

[৮৬৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ২২৫।

[৮৬৮] হাজাবী, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইবনুল আরবী আস সাআলবী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ, ১১৮।

[৮৬৯] শিরাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আলী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, সম্পাদনা: এহসান আব্বাস, (বৈরুত: দারুর রায়িদ আল আরবী, ১৯৭০ খ্রি), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

ইব্‌ন আজলান আন্দালুসী এর বরাতে ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন, রাসূলের সাহাবীদের পর অন্য কারো শিষ্য দ্বারা এতো উপকার সাধিত হয়নি, যা সম্ভব হয়েছে সাহনূন (র) এর শিষ্যদের মাধ্যমে। কেননা সাহনূন (র) এর শিষ্যগণই প্রতিটি দেশে ফকীহ ও মুজতাহিদদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।[৮৭০]

কাযী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার পর ইমাম সাহনূন (র) বিচারব্যবস্থায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। তিনি বিচারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবারনীতি, বাজারব্যবস্থা ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করেন। বিচারপতি হবার পরও তিনি মালিকী মাযহাবের প্রচার-প্রসারে সমান অবদান রাখেন। পাশাপাশি ফিক্‌হ শাস্ত্রের দরস প্রদানেও সময় ব্যয় করেন। ড. হুসাইন আল সামাদিহী বলেন, তৎকালীন সময়ে ইমাম সাহনূন (র) এর দরসে সর্বাধিক ছাত্রের মিলনমেলা হতো। সেখানে চারশ শিক্ষার্থী নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতো। সাহনূন (র) এর পরিচিতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পর ২৩৪ হিজরীতে তিনি সমগ্র আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এবার তিনি জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ লাভ করেন। বিভিন্ন এলাকায় বিচারক নিয়োগ কাঠামো, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, মসজিদ ব্যবস্থাপনা ও ইমাম নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেন। বিচারক থাকাকালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন মসজিদে ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে মুরজিয়া, মুশাব্বাহা ও মুতাজিলাদের হালকা (ধর্মীয় সমাবেশ) ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।[৮৭১]

আশহাব ইব্‌ন আবদিল আযীয (র)

আবু আমর আশহাব ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল কাইসী ইমাম মালিক এর একজন বিশ্বস্ত শাগরিদ তিনি ১৫০ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালিক ছাড়াও তিনি ইমাম লাইস ইব্‌ন সাদ এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ইবনুল কাসিম এর পর মিসরে ফিক্‌হ শাস্ত্রের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেন আশহাব। ইমাম মালিক এর ফিকহী মতামত সম্বলিত তার রচিত গ্রন্থটির নাম 'মুদাওয়ানাতু আশহাব'। [৮৭২]

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত ফিকহী মতামতের ব্যাপারে তাকে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। তিনি মিসরের কর বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক ছিলেন। ইমাম মালিক (র) এর শিষ্যদের মধ্যে আশহাব ও আবদুল হাকাম ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে ইমাম শাফিঈ (র) এর সাক্ষাত হয়নি।[৮৭৩]

তার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন,

مَا أَخْرَجَتْ مِصْرُ أَفْقَهَ مِنْ أَشْهَبَ،

"মিসরের ভূমি আশহাব এর চেয়ে উত্তম ফকীহ জন্ম দেয়নি"।

ইব্‌ন আবদিল বার (র) (৩৬৮-৪৬৩) বলেন,

كَانَ فَقِيْهاً، حَسَنَ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ

---

[৮৭০] সাফাদী, সালাহুদ্দীন খলীল ইব্‌ন আইবেক ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত*, সম্পাদনা: আহমাদ আল আরনাউত ও তুর্কী মুস্তফা, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাস, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ২৫৯।

[৮৭১] ইব্‌ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ আল আহমাদী আবুন নুর, (কায়রো: দারুত তুরাস, তা/বি.), খ. ১ পৃ. ৪৬৫।

[৮৭২] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৮৭৩] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪০।

“উৎকৃষ্ট মতামত ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন ফকীহ ছিলেন আশহাব”।[৮৭৪]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র)

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম ১৫৬ হিজরীতে ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালিক (র) এর শাগরেদদের মধ্যে তিনি স্বীয় উস্তাযের মতামতসমূহের ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। তিনি লাইস ইব্‌ন সাদ ও ইমাম শাফিঈ (র) থেকেও ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। আশহাব এর পর মালিকী মাযহাবের নেতৃত্ব তার হাতেই অর্পিত হয়। তিনি মিসরবাসীর শাইখ হিসেবে গণ্য হতেন।[৮৭৫]

ইমাম যাহাবী ‘সিয়ারু আ'লামিন নুবালা’ গ্রন্থে ইজলি এর বরাতে বর্ণনা করেন,

لَمْ أَرَ بِمِصْرَ أَعْقَلَ مِنْهُ، وَمِنْ سَعِيْدِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ،

“মিসরে সাঈদ ইব্‌ন আবু মারয়াম ও আশহাব এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি”।[৮৭৬]

ইমাম ইব্‌ন হিব্বান (র) বলেন,

كَانَ مِمَّنْ عَقَلَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَفَرَّعَ عَلَى أُصُوْلِهِ،

“ইমাম মালিক এর মাযহাব সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (র) প্রণীত মূলনীতির আলোকে ফিকহী মাসআলাসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন”।[৮৭৭]

বিশর ইব্‌ন বকর বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক এর ইন্তেকালের কয়েকদিন পর আমি তাকে স্বপ্ন দেখলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমাদের নিকট একজন জ্ঞানী লোক আছেন, যার নাম ইব্‌ন আবদুল হাকাম। তোমরা তার নিকট জ্ঞান অর্জন করো।[৮৭৮]

আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র)

আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র) ইমাম মালিক এর পরোক্ষ শিষ্যদের একজন। তিনি ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। যুবক বয়সে শিক্ষা গ্রহণের কারণে তিনি ইমাম মালিক এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তবে ইমাম মালিক এর শাগরিদ ইবনুল কাসিম, ইব্‌ন ওয়াহাব ও আশহাব (র) থেকে শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈন, রবি ইব্‌ন সুলায়মান তার নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র) ইমাম মালিক এর মাযহাব ও মাসায়িল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ফকীহ। [৮৭৯]

ইমাম ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈন (র) তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

كَانَ مِنْ أَعْلَمِ خَلَقِ اللهِ بِرَأْيِ مَالِكٍ يَعرِفُهَا مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً مَتَى قَالَهَا مَالِكٌ وَمَنْ خَالَفَهُ فِيْهَا،

---

[৮৭৪] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৫০৩।

[৮৭৫] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৮৭৬] মুস্তাফা মাহমুদ, *ইজামুল আলাম*, (কায়রো: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪।

[৮৭৭] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২২১।

[৮৭৮] সাফাদী, সালাহুদ্দীন খলীল ইব্‌ন আইবেক ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত*, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ১৪২০ হিজরি/২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬।

[৮৭৯] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

"ইমাম মালিক এর ফিকহী মতামত সম্পর্কে তার সাগরেদদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী লোক ছিলেন আসবাগ ইবনুল ফারাজ। তিনি স্বীয় ইমামের প্রতিটি মাসআলা সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। ইমাম মালিক মাসআলাটি কখন বলেছেন অথবা কারা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন তাও তার বোধগম্য ছিল"।[৮৮০]
আসবাগ ছিলেন ছিলেন একজন কৃতদাস। দাসত্ববরণ তার জ্ঞানচর্চায় বাধা সৃষ্টি করেনি; বরং ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে তাকে সফলতার উচ্চ শিখরে সমাসীন করে। মসজিদের খাদেম থাকার সুবাদে এটি তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ বয়ে আনে। গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির এর দরবারে কাযী নিয়োগের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সাইদ ইব্ন উফাইর বিভিন্ন কারণে এগিয়ে থাকায় তার নাম বাদ পড়ে যায়। গভর্নরের মজলিসে কাযী পদের জন্য অনেকের নাম প্রস্তাব করা হয়। এখানে ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর ও ইব্ন দামরা আয যুহরী (র) আসবাগ এর নাম প্রস্তাব করে বলেন,

أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ الفَقِيْهُ العَالِمُ الوَرِعُ،

"ইব্ন দামরা আয যুহরী আমির এর শুভকামনা করে বলেন, আসবাগ ইবনুল ফারাজ (র) একজন মহাজ্ঞানী আলিম ও ফকীহ। তদুপরি তিনি অত্যন্ত পরহেযগার"।
ফকীহ আবু নসর বলেন, আমি মুযানী ও রবি'কে বলতে শুনেছি, ইমাম শাফিঈ (র) এর মিসর আগমনের পূর্বে আমরা উভয়ে তার নিকট গমন করতাম। আমরা তাকে বলতাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা দিয়ে আমাদের ধন্য করুন। মুতার্‌রাফ ইব্ন আবদিল্লাহ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম থেকেও আসবাগ অধিক ফকীহ ছিলেন। খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ রাষ্ট্রীয় কাজে আসবাগকে ডেকে পাঠালে তিনি হালওয়ান শহরে আত্মগোপন করেন। আল বুআইতী (র) থেকে বর্ণিত আছে, ইব্ন তাহির এর দরবারে ফকীহদের কোনো অধিবেশন থাকলে আসবাগ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেন,

هُوَ مِنْ أَوْلاَدِ عَبِيْدِ المَسْجِدِ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يَشْتَرُوْنَ لِلْمَسْجِدِ عَبِيداً يَخْدُمُونَهُ فَأَصْبَغُ مِنْ أَوْلاَدِ أُوْلَئِكَ وَكَانَ مُضْطَلِعاً بِالفِقْهِ وَالنَّظَرِ،

"আসবাগ ছিলেন মসজিদে সেবাদানরত একজন কৃতদাসের সন্তান। উমাইয়া খলীফাগণ মসজিদের খেদমতের জন্য যে সকল খাদেম নিয়োগ করতেন তিনি তাদেরই একজন। ফিক্‌হ ও এ শাস্ত্রে মতামত প্রদানে তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন"।[৮৮১]

আবুল হাসান আলী ইব্ন যিয়াদ (র)

আলী ইব্ন যিয়াদ আফ্রিকা অঞ্চলের ইমাম মালিক এর শাগরেদদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি ১৮৩ হিজরীতে তিউনিসিয়ায় ইন্তেকাল করেন। সুফ্য়ান সাওরী ও লাইস ইব্ন সাদ থেকেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। ফকীহ ও মুজতাহিদ সমাজে তিনি 'আফ্রিকার ফকীহ' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তার নিকট থেকে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন, বাহলুল ইব্ন রাশেদ, আসাদ ইব্ন ফুরাত ও ইমাম মালিক এর প্রসিদ্ধ শিষ্য সাহনূন (র) । তিনিই সর্বপ্রথম ইমাম মালিক এর মুয়াত্তা ও সুফ্য়ান সাওরী এর জামি কিতাব দুটি আফ্রিকায় পরিচিত করে তোলেন এবং ইমাম মালিক এর মাযহাব এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৮৮২]

---

[৮৮০] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৬৫৭।

[৮৮১] প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৫৭।

[৮৮২] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

সাহনূন (র) বলেন, বাহলুল ইব্‌ন রাশেদ আলী ইব্‌ন যিয়াদ এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন এবং তার নিকট বিভিন্ন মাসআলায় ফতোয়া তলব করতেন। কায়রোর অধিবাসীরাও তাদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সমাধানের জন্য তার সাথে পত্র যোগাযোগ রাখতেন। মূলত আলী ইব্‌ন যিয়াদ আফ্রিকায় মালিকী মাযহাবের প্রচার প্রসারে প্রতিষ্ঠাতার ভুমিকা পালন করেন। যা অদ্যাবধি ডালপালা বিস্তার করে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। সাহনূন (র) তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد ولم يكن في عصره أفقه منه ولا أورع ولم يكن سحنون يعدل به أحداً،

"আফ্রিকার ভূখণ্ড আলী ইব্‌ন যিয়াদ এর মতো কোনো ব্যক্তি জন্ম দেয়নি। তার জীবদ্দশায় আলী ইব্‌ন যিয়াদ এর চেয়ে প্রজ্ঞাবান ফকীহ ও পরহেযগার ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি। সাহনূন (র) আলী ইব্‌ন যিয়াদ এর সঙ্গে কারো তুলনা করতেন না"।[৮৮৩]

'তাবাকাতু উলামায়ি আফ্রিকিয়া'র গ্রন্থকার আবুল আরব (র) বলেন,

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيّ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَهْلِ تُونُسَ فَقِيهًا خَيَّارًا مُتَعَبِّدًا، بَارِعًا فِي الْفِقْهِ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا،

"তিউনিসিয়ার অধিবাসী আবুল হাসান আলী ইব্‌ন যিয়াদ একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও বুজুর্গ। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি অনেকের চেয়ে এগিয়ে"।[৮৮৪]

তিউনিসিয়ার গভর্নর রওহ ইব্‌ন হাতিম আলী ইব্‌ন যিয়াদকে কাযী পদে নিয়োগদানের জন্য লোক মারফত ডেকে পাঠান। তিনি গভর্নরের ডাকে সাড়া দিয়ে তার নিকট আগমন করেন। এ খবর শুনে তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ফকীহ বাহলুলসহ অনেক শুভানুধ্যায়ী গভর্নরের গেইটে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আলী ইব্‌ন যিয়াদ অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় কপালের ঘাম মোচতে মোচতে সন্ধ্যা বেলায় গভর্নরের নিকট থেকে বের হলেন। সকলেই তাকে প্রশ্ন করলেন। কাযী নিয়োগের আলোচনা কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। বাহলুল আবার প্রশ্ন করলেন, সিদ্ধান্ত কী হলো? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে আপনি নেতিবাচক বক্তব্যটা দিলেই বিষয়টি সুরাহা হয়ে যেতো। আমি দায়মুক্ত হতাম। গভর্নরও অন্য চিন্তা করার সুযোগ পেতেন।

হাদীস ও ফিক্‌হ ব্যতীত আলী ইব্‌ন যিয়াদ ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যার কারণে বাহলুল এর মতো বিশিষ্ট ফকীহ তার নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য আগমন করতেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতেন। আবুল আরব বর্ণনা করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলী ইব্‌ন যিয়াদ আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

যিয়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান শাবতুন (র)

আবু আবদিল্লাহ যিয়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান শাবতুন ইমাম মালিক এর প্রধান শিষ্যদের একজন। তিনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং স্পেন এর প্রধান ফকীহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৯৩ হিজরীতে স্পেনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালিক থেকে মুয়াত্তা কিতাবের পাঠ গ্রহণ করার পর স্পেন এ মাযহাবটির বিস্তারে সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। লাইস ইব্‌ন সাদ, মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ ও ইয়াহয়া ইব্‌ন আইয়ুবসহ অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্পেনের সর্বত্র তার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। কর্ডোভার গভর্নর হিশাম আল রিজা তাকে কাযী পদে নিয়োগ দিতে চাইলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পালিয়ে মুক্তি লাভ করেন। পরবর্তীতে গভর্নর তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

---

[৮৮৩] ইব্‌ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ আল আহমদী আবুন নুর, (কায়রো: দারুত তুরাস, তা/বি.), খ. ২ পৃ. ৯২।

[৮৮৪] আবুল আরব, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন তামীম আত তামীমী, *তাবাকাতু উলামাই আফ্রীকিয়্যাহ*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল লেবনানী, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৫১।

কর্ডোভায় ফিরে আসার পর হিশাম তার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তার নিকট থেকে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি লাভ করতেন এবং সে অনুয়ায়ী পরিচালিত হবার চেষ্টা করতেন। গভর্নর সর্বদা তার প্রতি সদাচরণ করতেন। কাযী আয়াজ (র) (৪৭৬-৫৪৪) বর্ণনা করেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া বলেন,

زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام ووجوه الفقه والأحكام وهو أول من عرف بالسنة في تحويل الأردية في الاستسقاء،

"যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান সর্বপ্রথম স্পেনে সুন্নাহ ও হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞান প্রবেশ করান। তিনিই সেখানে ফিক্হ শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচলন করেন। ইসতেসকার নামাযে চাদর পরিবর্তনের সুন্নাহসম্মত ধারণাটি মুসলমানদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন"।[৮৮৫]

ফিক্হ শাস্ত্রে যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। জীবনীকার শিরাযী (র) বর্ণনা করেন, মদীনার অধিবাসীগণ যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমানকে 'আন্দালুস এর ফকীহ' হিসেবে জানতেন। তিনি বার্ষিক দুইবার ইমাম মালিক এর নিকট গমন করতেন। একবারের ঘটনা, ইমাম মালিক এর দরবারে ইব্ন কিনানা উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান প্রবেশ করেন। তিনি যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমানকে চিনতে পারেননি। পরিচয় লাভ করার পর ইব্ন কিনানা বলেন, আপনি তো নিজ দেশের প্রধান ফকীহ (فقيه بلدكم)। তিনি উত্তর দিলেন, সাধারণ মানুষ হয়তো তাই মনে করে। ইব্ন কিনানা তার সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে বাহাসে অবতীর্ণ হলেন। তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় ইব্ন কিনানা তাকে কিছুটা কটূক্তি করেন। এটা শুনে ইমাম মালিক (র) বলেন, আপনি তার সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন। পরবর্তীতে ফিক্হ এর অধিবেশন বসার পর যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান প্রতিটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেন জ্ঞানের জোয়ারে সব কিছু ভেসে যাচ্ছে। এবার পূর্বের বিষয়টি তার নিকট খোলাসা হয়ে গেলো যে, পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে প্রথমবার কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছিল।

রাজা-বাদশাহ ও আমির-উমারার নিকট যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান এর অবস্থান ছিল খুবই সমীহপূর্ণ। জ্ঞানের রাজ্যে তার অবাধ বিচরণের কারণে তারা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয় তার নিকট জেনে নিতেন। আবুল আরব বর্ণনা করেন, একদা যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান এর মজলিসে গভর্নরের একটি চিঠি আসে। তিনি চিঠির উত্তর লিখে তা সিল-গালা করে পত্রবাহক দ্বারা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কি জানো এই পত্রের বিষয়বস্তু কি ছিল? আমলনামা পরিমাপক দাঁড়িপাল্লার দুই হাতল কি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে আমার নিকট এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা কি দ্বারা তৈরি? স্বর্ণ না রূপা দ্বারা? আমি তার নিকট এই মর্মে উত্তর দিলাম।

حدثنا مالك عن ابن شهاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه،

"ইমাম মালিক ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের একটি প্রধানতম সুন্দর বৈশিষ্ট্য হলো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জন করা"।[৮৮৬]

আসাদ ইবনুল ফুরাত (র)

আমিরুল মুজাহিদিন আবু আবদিল্লাহ আসাদ ইবনুল ফুরাত ইব্ন সিনান একজন জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তিনি ১৪২ হিজরীতে শামের হারান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অতপর ১৪৪

---

[৮৮৫] কাযী আয়ায, আবুল ফজল ইব্ন মূসা, *তারতীবুল মাদারিক*, সম্পাদনা: আবদুল কাদির আস সাহরাবী, (মরক্কো: মাতবাআতু ফুজালা আল মুহাম্মদিয়্যাহ, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৭।

[৮৮৬] প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০।

হিজরীতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তার পিতা মরক্কো হিজরত করলে তিনিও পিতার সঙ্গে কায়রো আগমন করেন। পরিণত বয়সে আলী ইব্ন যিয়াদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং ইমাম মালিক এর নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য মদীনা গমন করেন। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি সীমাহীন আগ্রহের কারণে তিনি ইমাম মালিক এর দরসে গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন। মুয়াত্তার দরস সমাপ্ত করার পর আসাদ ইবনুল ফুরাত ইরাক ভ্রমন করেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র) এর শিষ্যদের নিকট ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে নব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইমাম আবু ইয়ুসুফ, ইমাম মুহাম্মদসহ হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমামদের নিকট ফিকহে হানাফীর পাঠ গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক এর ইন্তেকালের পর তিনি আবার মদীনায় চলে যান এবং হানাফি ও মালিকী মাযহাবের তুলনামূলক ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি 'আল মুদাওয়ানা' ও 'আল আসাদিয়্যাহ' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এক পর্যায়ে আসাদ ইবনুল ফুরাত স্পেন এর শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম মালিক এর প্রধান শিষ্য ও স্পেন এর বিশিষ্ট ফকীহ সাহনূন (র) আল মুদাওয়ানা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح ورأيه،

"আল মুদাওয়ানা গ্রন্থটি অবশ্যই গ্রহণ করো। এখানে একজন মহান ফকীহ এর সারগর্ভ আলোচনা ও তাঁর ফিকহী অভিমত সন্নিবেশিত হয়েছে"।

তিনি আরো বলেন, ফিক্হ শাস্ত্রে আল মুদাওয়ানার গুরুত্ব নামাযে সূরা ফাতিহার মতো। যা ছাড়া কারো নামায শুদ্ধ হয় না। তেমনিভাবে আল মুদাওয়ানা অধ্যয়ন ব্যতীত ফিক্হ শাস্ত্রে কারো জ্ঞান পরিপক্ক হয় না। এই কিতাব ঐকান্তিকতার সাথে পাঠ করলে শাস্ত্রীয় জ্ঞানে দক্ষতা অর্জিত হয়।[৮৮৭]

ওয়াহবা আয যুহাইলী বলেন, আসাদ ইবনুল ফুরাত সাকালিয়া বিজয়ের লক্ষ্যে সংঘটিত সারকুসা জিহাদে ২১৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ঐ জিহাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।[৮৮৮]

আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব (র)

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব আস সুলামী স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রধান ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি ১৭৪ হিজরীতে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৮ হিজরীতে কর্ডোভায় ইন্তেকাল করেন। আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশুন, আসবাগ ইবনুল ফারাজ ও শাবতুন (র) প্রমুখ ফকীহগণের নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইব্ন হাবীব শেষ বয়সে ইমাম মালিক এর সাক্ষাত লাভ করেছেন মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ফিক্হ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে কর্ডোভার গভর্নর আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম তাকে খুব সমাদর করতেন এবং নিকট জনদের মধ্যে গণ্য করতেন। ফিক্হ শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সমান পারঙ্গম ছিলেন।

ইব্ন আবদিল বার (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া এর ইন্তেকালের পর তিনি আলিমদের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেন। ইব্ন লুবাবা তাকে স্পেনের শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইবনুল মাজিশুন ইব্ন হাবিবকে ইমাম মালিক এর প্রধান শিষ্য সাহনূন (র) এর উপর অগ্রাধিকার দেন।

সাহনূন (র) এর নিকট ইব্ন হাবীব এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার পর তিনি বলেন,

مات عالم الأندلس! بل والله عالم الدنيا،

---

[৮৮৭] ইব্ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ আল আহমাদী আবুন নুর, (কায়রো: দারুত তুরাস, তা/বি.), খ. ১ পৃ. ৩০৬।

[৮৮৮] যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্ন মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌রিল মুআসির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

"স্পেনের মহান আলিম ইন্তেকাল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিমই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন"।

তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে,

فتح الأندلس وكتاب "الواضحة" و"غريب الحديث" و"تفسير الموطأ" و"حروب الإسلام" و"المسجدين" و"سيرة الإمام فيمن أَلْحَد" و"طبقات الفقهاء والتابعين" و"مصابيح الهدى" و"طبقات المحدثين" و"الفرائض" و"مكارم الأخلاق" و"الورع" و"وصف الفردوس" و"مختصر في الطب" و"الغاية والنهاية"، و"الجامع" و"فضائل الصحابة"،

আবদুল মালিক ইব্ন হাবীবা বিরাহ নামক এলাকায় বসবাস করতেন। কর্ডোভার গভর্নর তাকে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বিন্যাস কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া তাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতেন। মূলত তিনি ছিলেন ফিক্হ শাস্ত্রের হাফেজ। ইমাম যাহাবী বলেন,

...وَكَانَ مَوْصُوَفاً بِالحِذْقِ فِي الفِقْهِ كَبِيْرَ الشَّأْنِ بَعِيْدَ الصِّيْتِ كَثِيْرَ التَّصَانِيْفِ،

"তিনি ছিলেন ফিক্হ শাস্ত্রের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কাণ্ডারী। মর্যাদাবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং প্রচুর গ্রন্থ রচনাকারী"।[৮৮৯]

আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন (র)

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনুল ইমাম আবদুল আযীয ইবনুল মাজিশূন (র) মদীনায় মালিকী মাযহাবের প্রধান ফকীহ ও মুজতাহিদ। তার পিতা আবদুল আযীয ছিলেন ইমাম মালিকের সমসাময়িক ফকীহ। ইবনুল মাজিশুন একজন প্রাঞ্জলভাষী ফকীহ ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক ও পিতা আবদুল আযীয থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইব্ন সাদ বর্ণনা করেন, ইবনুল মাজিশুন সমসাময়িক ফকীহদের মধ্যে মদীনাবাসীদের নিকট বিশ্বস্থ ও নির্ভরশীল ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ইয়াহয়া ইব্ন আকসাম বলেন, ইবনুল মাজিশুন এর জ্ঞানের পরিধি এতই বিস্তৃত ছিল যে, মনে হয় তিনি এমন একটি পাত্র, যা সিঞ্চন করলেও শেষ হবে না। ইব্ন আবদিল বার (৩৬৮-৪৬৩ হি.) বলেন,

... كَانَ فَقِيْهاً، فَصِيْحاً دَارَتْ عَلَيْهِ الفُتْيَا فِي زَمَانِهِ وَعَلَى أَبِيْهِ قَبْلَهُ وَكَانَ ضَرِيْراً قِيْلَ: إِنَّهُ عَمِيَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ،

"তিনি একজন প্রাঞ্জলভাষী ফকীহ ছিলেন। তৎকালীন সময়ে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত ছিল। ইতোপূর্বে তার পিতার হাতেই এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন"।[৮৯০]

ইব্ন ফারহুন (মৃ. ৭৯৯ হি.) বলেন, ইবনুল মাজিশুন ও ইমাম শাফিঈ (র) ফিক্হ শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা করতেন, যা অনেকের নিকট ছিল দুর্বোধ্য। মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ সাহনূন (র) ইবনুল মাজিশুন এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই মর্মে তার গুণকীর্তন করেন যে,

وأثنى عليه سحنون وفضله وقال: هممت أن أرحل إليه وأعرض عليه هذه الكتب فما أجاز منها أجزت وما ورد رددت وأثنى عليه بن حبيب كثيرا وكان يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك،

---

[৮৮৯] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১০৩।

[৮৯০] প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৫৯।

"আমার ইচ্ছে হয়, ফিক্‌হ শাস্ত্রের যাতীয় কিতাব তার নিকট পেশ করবো। তিনি যেগুলো অনুমোদন দেবেন আমি তাই মেনে নেবো। তিনি যে মতামত পেশ করবেন তাই গ্রহণ করবো। আবদুল মালিক ইব্‌ন হাবীব তার প্রশংসা করে বলেন, ইমাম মালিক এর শিষ্যদের মধ্যে তিনি ইবনুল মাজিশুনকে সবার উপর প্রাধান্য দিতেন"।[৮৯১]

আহমাদ ইব্‌ন গায়লান (র)

আবুল ফজল আহমাদ ইবনুল মুআজ্জাল ইব্‌ন গায়লান ইবনুল হাকাম আল আবদী বাসারায় জন্মগ্রহণকারী মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। ইবনুল মাজিশুন এর সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও আহমাদ ইব্‌ন গায়লান তার নিকট থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়নি এবং তার নিকট থেকে কোনো বিষয় বর্ণনাও করেননি। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থ প্রণেতা ও বুজুর্গ। তার নিকট থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন কাযী ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক ও ইয়াকুব ইব্‌ন শায়বা। ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুনিপুণ দক্ষতা ও বুজুর্গীর কারণে বসারার অধিবাসীগণ তাকে অত্যন্ত সমীহ করতেন।

لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه ولا أعلى درجة ولا أبصر بمذاهب أهل الحجاز منه،

"ইরাকে মালিকী মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিল না। হিজায এর মাযহাব অনুসরণকারীদের মধ্যে তার চেয়ে দূরদর্শী ও উঁচু মাপের ফিক্‌হবিদ অতিবাহিত হয়নি"। [৮৯২]

তার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, كتاب الرسالة، وكتاب في الحج

আবু বকর আল নাক্কাশ ফিক্‌হ শাস্ত্রে আহমাদ ইব্‌ন গায়লান এর পারঙ্গমতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

أحمدنا يعني ابن المعذّل أفضل من أحمدكم يعني ابن حنبل،

"আমাদের আহমাদ অর্থাৎ ইবনুল মুআজ্জাল তোমাদের আহমাদ অর্থাৎ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এর চেয়ে উত্তম"।[৮৯৩]

৫.৩.৩. ইমাম শাফিঈ (র) এর শাগরিদগণের ইজতিহাদ

ইমাম ইমাম শাফিঈ (র) মুসলিম উম্মাহর এমন একজন অবিসংবাদিত ইমাম, যাকে নতুন করে পরিচয় করানোর প্রয়োজন পড়ে না। হাদীস, ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ তারই নিপুণ হাতে সুবিন্যস্ত ও বলিষ্ঠ। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অপরিসীম অবদানের কারণে বিশ্বব্যাপী তাঁর ভক্ত-অনুরক্তের বিশাল একটি জামাত গড়ে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগরিদগণের মধ্যে কয়েকজনের ইজতিহাদী কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ইয়ূসুফ ইব্‌ন ইয়াহয়া আল বুআইতী (র)

আবু ইয়াকুব ইয়ূসুফ ইব্‌ন ইয়াহয়া আল বুআইতী ইমাম শাফিঈ (র) এর প্রথম স্তরের শিষ্যদের একজন। তিনি মিসরের আসয়ুত প্রদেশের বুআইত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে ইমাম

[৮৯১] ইব্‌ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনাঃ ড. মুহাম্মদ আল আহমাদী আবুন নুর, (কায়রোঃ দারুত তুরাস, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৬।

[৮৯২] কাসিম আলী সাদ, জামহারাতু *তারাজুমিল ফুকাহাইল মালিকিয়্যাহ*, (দুবাইঃ দারুল বুহুস, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮৩।

[৮৯৩] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৩।

মালিক (র) এর শাইখ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম শাফিঈ (র) এর মিসর আগমনের পর তাকেই প্রধান উস্তায হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ফিকহে শাফিঈ এর প্রধান মুখপাত্র ও এ মাযহাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম শাফিঈ (র) এর ইন্তেকালের পর তার প্রধান মুখপাত্র ও প্রতিনিধির আসন অলংকৃত করেন। তিনি ২৩২ হিজরীতে 'খালকে কুরআন' (خلق قران) সম্পর্কীয় ফিতনায় কারা নির্যাতনে ইন্তেকাল করেন।[৮৯৪]

ইমাম শাফিঈ (র) এর ইন্তেকালের পূর্বে তার প্রতিনিধিত্বের দাবিতে অনেকেই সোচ্চার হয়। তার প্রধান তিনজন শিষ্যের মধ্যে এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা হয়। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) আল বুআইতীকেই তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচন করেন। ইমাম শাফিঈকে (র) তার প্রতিনিধি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف ليس أحد في أصحابي أعلم منه،

"আমার স্থলাভিষিক্ত হবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হলো ইয়ূসুফ। আমার শিষ্যদের মধ্যে তার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই"।[৮৯৫]

তিনি ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে যুগের ইমাম। ফিক্‌হ শাস্ত্রই ছিল তার জীবনের প্রধান ধ্যান-জ্ঞান । ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি তিনি ফিক্‌হ চর্চায় অধিক সময় ব্যয় করেন। ইমাম যাহাবী (র) তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

...كَانَ إِمَاماً فِي العِلْمِ قُدْوَةً فِي العَمَلِ زَاهِداً رَبَّانِيّاً مُتَهَجِّداً دَائِمَ الذِّكْرِ وَالعُكُوْفِ عَلَى الفِقْهِ،

"তিনি ছিলেন শরীয়া বিষয়ক জ্ঞানে সকলের ইমাম ও আমলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তি। দুনিয়াবিমূখ, আল্লাহওয়ালা, তাহাজ্জুদগোযার ও নিয়মিত যিক্‌রকারী। তার জীবনের প্রধান মিশন ছিল ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিকাশ"।[৮৯৬]

ইমাম আল বুআইতী জীবনের প্রাথমিককালেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মেধা, দক্ষতা ও ইখলাসের কারণে তিনি স্বীয় শাইখ ইমাম ইমাম শাফিঈ (র) এর নিকট অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্থতার প্রতীক ছিলেন। উস্তাযের অবর্তমানে তার স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি স্বয়ং ইমাম শাফিঈ (র) প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ইব্‌ন খল্লিকান (র) (৬০৮-৫৮১ হি.) বর্ণনা করেন,

وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول له: سل أبا يعقوب فإذا أجابه أخبره فيقول: هو كما قال وقال أيضاً ربما جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي فيوجه أبا يعقوب البويطي ويقول: هذا لساني،

"বিভিন্ন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে ইমাম শাফিঈ (র) বলতেন, আবু ইয়ূসুফ বুআইতী এর নিকট জেনে নিন। তার উত্তরদানের বিষয়টি ইমাম শাফিঈর নিকট আলোচনা হলে তিনি বলতেন, তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। অনেক সময় পুলিশ প্রধানের প্রতিনিধি ইমাম শাফিঈ (র) এর নিকট আগমন করতেন।

[৮৯৪] ইবনুল জাওযী, জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুনতাজাম*, সম্পাদনা: আবদুল কাদির আতা ও মুস্তাফা আবদুল কাদির আতা, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৭৫।

[৮৯৫] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩।

[৮৯৬] যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৫৯।

তিনি আবু ইয়ূসুফ আল বুআইতী এর নিকট তার সমাধান চাইতে বলতেন। ইমাম শাফিঈ (র) আরো বলতেন, তিনি আমার মুখপাত্র"।[৮৯৭]

ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহয়া আল মুযানী (র)

আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন নাহলা ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল মুযানী ১৭৫ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬৪ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র) এর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। একমাত্র তাকেই উস্তায হিসেবে গ্রহণ করে আল মুযানী শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করেন। জগদ্বিখ্যাত একজন ইমামের সান্নিধ্য পাওয়ার কারণে তিনি অন্য কোনো উস্তাযের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ইমাম আবু জাফর তাহাবী ও ইব্‌ন খুযাইমা (র) এর মতো ব্যক্তি তার প্রধান দুই শিষ্য। আল মুযানী ইমাম শাফিঈ (র) এর মাযহাব ও তার ইজতিহাদকৃত মাসআলাসমূহের প্রচার-প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। স্বীয় শিষ্যের প্রতি অতিশয় আস্থা ও নির্ভরতার কারণে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আল মুযানী আমার মাযহাবের প্রধান প্রচারক। ইমাম যাহাবী বলেন,

أخذ عنه خلق من العلماء وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق،

"আলিমদের একটি বিশাল জামাত তার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং এই মুবারক জামাতের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শাফিঈ মাযহাব প্রচার লাভ করে।[৮৯৮]

ইমাম যাহাবী আরো বলেন, ইমাম আল মুযানী (র) অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তার অবগতি ছিল ব্যাপক। বুদ্ধিমত্তা ছিল খুবই প্রখর। অন্য বিষয়ে জ্ঞান চর্চার চেয়ে ফিক্‌হ চর্চার প্রতিই ছিল তার অধিকতর মনোযোগ। হাদীস বর্ণনায় কম সময় ব্যয় করতেন। কিন্তু ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে। ইব্‌ন খল্লিকান (৬০৮-৫৮১ হি.) বলেন,

وكان رحمه الله ذا قدرة فائقة في المحاجة والمناظرة عنه: وكان زاهدًا عالِمًا مجتهدًا محجاجًا غواصًا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه،

"ইমাম আল মুযানী বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে খুবই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি দুনিয়াবিমূখ একজন প্রখ্যাত আলিম ও মুজতাহিদ। ইসলামী শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদির ইসতেম্বাতে খুবই পটু। শাফিঈ মাযহাবের প্রধান ইমাম এবং এ মাযহাবের খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অধিকতর জ্ঞাত। ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণিত উক্তি ও ফতোয়া সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল"।[৮৯৯]

ইমাম আল মুযানী অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তবে শাফিঈ মাযহাবের আলোকে ফিক্‌হ বিষয়ক রচনাই সর্বাধিক। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে,

الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وكتاب الوثائق،

এ সকল রচনারলির মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'আল মুখতাসার'। যা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে এবং তাকেও পরিচিত করেছে। সর্বস্তরের ফকীহ ও মুজতাহিদদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে গ্রন্থটি। ভিন্ন মাযহাবের ফকীহ ও মুতাহিদগণ গ্রন্থটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পৃথিবীর সর্বত্র এ কিতাবের আলোচনা অব্যাহত রয়েছ বিভিন্ন মতের আলিম সমাজে। আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন সুরাইজ বলেন,

---

[৮৯৭] ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩।

[৮৯৮] যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪৯৩।

[৮৯৯] প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৯৩।

وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي رضي الله عنه وعلى مثاله رتبوا ولكلامه فسروا وشرَحوا،

"এটিই শাফিঈ মাযহাবের মূল কিতাব। এটির অনুকরণে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ সব গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র) এর কথারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে"।

ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আল মুযানী এর লিখিত এ গ্রন্থ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ফিক্হী জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে জ্ঞানের প্রবাহে আপ্লুত করেছেন।[৯০০]

---

[৯০০] ইব্ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, ওয়াফয়াতুল আয়ান, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৭।

উপসংহার

হিজরী প্রথম দুই শতক ছিল ইজতিহাদের স্বর্ণযুগ। এই দুই শতক কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। নবীযুগ, সাহাবী যুগ, তাবিঈযুগ, তাদের অনুসারীদের যুগ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ। ইজতিহাদ হলো যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের শরীয়া পালনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল। ইজতিহাদ এর উৎপত্তি মানবেতিহাসের সূচনা থেকেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলই 'নস' এর অবর্তমানে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদী প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছেন। শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বনি আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী স্বত্ত্বা ও প্রধান মুজতাহিদ। তিনি নিজে ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বিশুদ্ধ মূলনীতির আলোকে যে সকল ইজতিহাদ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সত্যায়ন করেছেন। এতে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করেছেন। কোথাও সংযোজন-বিয়োজন বা পরিমার্জন করেছেন। কখনো নীরব থেকে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কখনো মৃদু-মুসকি হেসে সমর্থন দিয়েছেন।

তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা, সাহাবীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে ইজতিহাদের একটি স্বচ্ছ বিকাশধারা উম্মাহর তরে উৎসর্গ করেছেন। ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদের ক্ষেত্র ও পরিধি সুবিস্তৃত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি গণ্ডিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। হিজরী প্রথম দুই শতকে ফকীহ-মুজতাহিদগণ প্রয়োজনের তাগিদে গণ্ডিবদ্ধ পরিমণ্ডলে ইজতিহাদ করে ইসলামী শরীয়াকে বাস্তবে রূপায়ন করেছেন। মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আলোকে একাধিক মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। ইজতিহাদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে যোগ্যতার অভাব হলে দীনের ভিত্তি ধসে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা বলে ইবাদত-বন্দেগী ও দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে সমাজকল্যাণ, রাজনীতি, পররাষ্ট্র ও সমরনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে ইজতিহাদ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর ইজতিহাদে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কাফেলা। ইসলামের প্রধান চার খলীফার ইজতিহাদ পরবর্তী ফকীহ-মুজতাহিদগণের জন্য মাইলফলক। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, মুআয ইব্ন জাবাল, আবু মূসা আশআরী, সাদ ইবন মুআয, যায়দ ইব্ন সাবিত, উবাই ইব্ন কাব এবং আবুদ দারদা (রা) ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও প্রথম সারির মুজতাহিদ। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত হবার পর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক, বিচারক, মুফ্তী ও মুয়াল্লিম হিসেবে নিয়োজিত হন। তারা প্রয়োজনের তাগিদে ও মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদের বিধি-বিধান প্রয়োগ করেন। তাবিঈযুগে মদীনার সাতজন মুজতাহিদ খ্যাতির শীর্ষ অবস্থান লাভ করেন। মুজাহিদ ইব্ন জাব্র ও আতা ইব্ন আবী রাবাহ ছিলেন মক্কার প্রধান দুইজন ফকীহ ও মুজতাহিদ। আলকামা ইব্ন কাইস, ইবরাহীম আন নাখায়ী ও হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান কূফার ফকীহদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়। এছাড়াও শাম, হেজায, ইয়ামেন, ইয়ামামা, মিসর ও স্পেনসহ মুসলিম বিশ্বের বিজিত এলাকায় ফকীহ-মুজতাহিদগণের একটি চৌকস জামাত ইজতিহাদভিত্তিক ফিক্হ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মাজহাবের অঘোষিত গোড়াপত্তন হয়। তখন আয়িশা (রা) এর মাযহাব, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এর মাযহাব ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর মাযহবের মতো অনেক মাযহাবের কিংবদন্তি ছিল। দ্বিতীয় শতকের উষালগ্ন থেকে চতুর্থ হিজরির মধ্যভাগ ছিল মাযহাবভিত্তিক শরীয়াপালনের আনুষ্ঠানিক সূচনাপর্ব। ইমাম আবু হানীফা নুমান ইব্ন সাবিত (র) ছিলেন পৃথিবীর একজন ক্ষণজন্মা ও বহুমুখী প্রতিভাধর তাবিঈ। তিনি সাহাবায়ে কেরামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আলোকে হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম উম্মাহর বহুমুখী কল্যাণ সাধন করেন। পরবর্তীতে ইমাম মালিক

ইব্‌ন আনাস (র) এর মালিকী মাযহাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ শাফিঈ (র) এর নামাঙ্কিত শাফিঈ মাযহাব এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এর শিষ্যদের মাধ্যমে হাম্বলী মাযহাবের উদ্ভব হয়।

ইসলামী শরীয়া একটি গতিশীল ও প্রাণবন্ত জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ পরিসর থেকে আন্তর্জাতিক বলয়ের বিস্তৃত অঙ্গণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সভ্য পৃথিবীর সামাজিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক লেন-দেন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকহারে অনুভূত। চাষাবাদ, শিল্প-কারখানা, বেচা-বিক্রি, ইজারা, কোম্পানী আইন, ভূমি আইন, খনিজ সম্পদসহ বিবিধ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বিকল্প নেই। নব-উদ্ভাবিত বিষয়সমূহে গবেষণার কপাটবদ্ধতা ও চিন্তা-শক্তির বিকলতা মুসলিম জাতির জন্য অশনি সংকেত। তেমনিভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, সামরিক ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনেক মাসআলা এখনো অনুদঘাটিত। দাম্পত্য জীবনের পরিমণ্ডলে বিয়ে-তালাকে প্রযুক্তির ব্যবহার, টেস্ট টিউব বেবি (Test Tube Baby), গর্ভ ভাড়া, মিল্ক ব্যাংক (Milk Bank) ও বীর্য ব্যাংকসহ নানামাত্রিক তথ্যের আদান-প্রদানে ইজতিহাদই মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রধান অবলম্বন। প্রলয়য়ঙ্করী বৈশ্বিক মহামারি (Covid-19) এর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে করোনার টিকা গ্রহণের বৈধতা-অবৈধতা প্রশ্নে শরীয়তসম্মত সমাধান উদ্ভাবন করা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। তথ্য-প্রযুক্তির ডিজিটালাইজেশনের (Digitalization) পাশাপাশি ইজতিহাদের উৎকর্ষতা সাধনে অসাধ্য সাধন করেছেন রাসূলুল্লাহ'র সাহাবী, তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ফকীহ-মুজতাহিদগণ যুগে যুগে ইজতিহাদের বিকাশধারা অব্যাহত রেখেছেন। "ইজতিহাদ এর বিকাশধারা: হিজরী দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত" শিরোনামের অভিসন্ধর্ভে প্রথম দুই শতাব্দীর ইজতিহাদী কর্মযজ্ঞের একটি ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন ও তাফসীর

১.আল কুরআনুল মাজীদ।

২.তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযিদ, *জামিউল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.।

৩.ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ হুসাইন শামসুদ্দীন, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৯১ হি.।

৪.আর রাযী ফখরুদ্দীন, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার, *আত তাফসীরুল কাবীর*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হি.।

৫.সাআলাবী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *তাফসীরুস সআলাবী*, সম্পাদনাঃ আবু মুহাম্মদ ইব্‌ন আশূর, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

৬.আল জাস্‌সাস, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি.।

৭.শাহ ওয়ালিউল্লাহ, মুহাদ্দিসে দেহলাবী, *আল ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর*, আরবী অনুবাদ, সালমান আল হুসাইনী আন নাদাবী, কায়রোঃ দারুস সাহওয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

৮.শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *ফতহুল কাদীর*, বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন কাসীর, ১৪১৪ হি.।

৯.আয যুম্মান, আয়মান বিনতে আবদুর রহমান, *আকওয়ালু আবীদা আস সালমানী ফিত তাফসীর*, সউদী আরবঃ জামিয়া মুহাম্মদ ইব্‌ন সাউদ, ১৪৩৭ হি./ ২০১৬ খ্রি.।

১০.ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, সম্পাদনাঃ আবদুর রায্‌যাক আল মাহদী, বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪২২ হি.।

১১.মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

১২.দাউদী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আহমাদ, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ।

১৩.ইব্‌ন আশূরা, ড. শাইখ মুহাম্মদ তাহির, *আত তাহরীর ওয়াত তানবীর*, (তিউনিসঃ আদ দারুত তিউনিসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.।

১৪.সাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল জাওয়াদ, *আকওয়ালু আতা আল খোরাসানী ফিত তাফসীর*, মক্কাঃ জামিয়া উম্মুল কুরা, ২০১৮ হি.।

হাদীস ও শরহুল হাদীস

১৫.বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী* , বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

১৬.মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী।

১৭.আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরুতঃ মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ।

১৮.নাসায়ী, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব ইব্‌ন আলী আল খোরাসানী, *সুনানু নাসায়ী*, সম্পাদনাঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, হালাবঃ মাকতাবাতুল মাতবুয়া আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.।

১৯.তিরমিযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযী*, বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.।

২০.ইব্‌ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ আল কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, কায়রোঃ দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা।

২১.মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির আল আসবাহী, *মুয়াত্তা*, সম্পাদনাঃ ফুয়াদ আবদুল বাকী, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

২২.আবু আবদিল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

২৩.বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, *আস সুনানুল কুবরা*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবলি ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. ।

২৪.বায়হাকী, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা, *আস সুনানুস সাগীর*, সম্পাদনাঃ আবদুল মুতী, করাচিঃ জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

২৫.তাহাবী, আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা, *শরহু মাআনিল আসার*, মদীনাঃ আলামুল কুতুব, ১৪১৪ হি./১৯৯৪খ্রি. ।

২৬.নিশাপুরী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, জর্দানঃ মারকাযুত তুরাস লি আবহাসিল হাসূবিল আলী, ১৪২১হি./২০০১ খ্রি. ।

২৭.দারিমী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *সুনানু দারিমী*, সৌদি আরবঃ দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১২ হি. /২০০০ খ্রি. ।

২৮.ইব্‌ন আবী শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনাঃ কামাল ইয়ূসুফ আল হূত, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি. ।

২৯.দারা কুতনী, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন উমার আল বাগদাদী, *সুনানু দারা কুতনী*, বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি. ।

৩০.ইব্‌ন খুযায়মা, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, *সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুস্তফা আজমী, বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. ।

৩১.আলী আল মুত্তাকী, আলাউদ্দীন ইব্‌ন হুসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল*, সম্পাদনাঃ বাকরী হায়ানী, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি. ।

৩২.তাবরানী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব, *আল মুজামুল কাবীর*, কায়রোঃ মাকতাবাহ ইব্‌ন তায়মিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি. ।

৩৩.আল বাযযায, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আমর, *মুসনাদুল বাযযায*, মদীনা মুনাওয়ারাঃ মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২০০৯ খ্রি. ।

৩৪.কুরতুবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী বকর, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, সউদি আরব, দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. ।

৩৫.মাকদিসী, জিয়াউদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ, *আল মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীসিল মুখতারাহ*, সম্পাদনাঃ ড. আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন দুহাইশ, বৈরুতঃ দারু খাযির, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি. ।

৩৬.সাঈদ ইব্‌ন মনসূর, *সুনানু সাঈদ ইব্‌ন মনসূর*, সম্পাদনাঃ হাবীবুর রহমান আজমী, ভারতঃ আদ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮২ খ্রি. ।

৩৭.সানআনী, আবু বকর আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন নাফী, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনাঃ হাবীবুর রহমান আজমী, বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি. ।

৩৮.আহমাদ, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *ফাদায়িলুস সাহাবা*, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

৩৯.নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইব্‌ন শরফ, *আল মিনহাজ শারহু সহীহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২ হি.।

৪০.যায়লায়ী, জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়ূসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *নাসবুর রায়াহ*, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাহ আর রাইয়ান, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৪১.আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার, *ফতহুল বারী*, বৈরুতঃ দারুল মারিফাহ, ১৩৭৯ হি.।

৪২.ইব্‌ন আবদিল বার, আবু উমার ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আত তামহীদ,* মরক্কোঃ ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.।

৪৩.বগবী, মুহিউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল ফার্‌রা, *শরহুস সুন্নাহ*, বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১৩/১৯৮৩।

৪৪.তায়ালিসী, আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইবনুল জারুদ, *মুসনাদু আবী দাউদ আত তায়ালিসী*, সম্পাদনাঃ ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মুহসিন তুর্কী, মিসরঃ দারু হাজার, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

৪৫.ইবনুল মুলাক্কিন, সিরাজুদ্দীন, *আল বদরুল মুনীর*, সম্পাদনাঃ মুসতাফা আবুল গাইত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান ও ইয়াসির ইব্‌ন কামাল, রিয়াদঃ দারুল হিজরাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৪৬.আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *মুখতাসারুস সহীহ লিল ইমামিল বুখারী*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

৪৭.মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলান, *দালীলুল ফালিহীন শরহু রিয়াদিস সালিহীন*, বৈরুতঃ দারুল মারিফাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৪৮.মুস্তফা আস সিবায়ী, *আল সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী,* দারুল ওয়ার্‌রাক, তা/বি.।

৪৯.ইবনুল জারূদ, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী, *আল মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ,* সম্পাদনাঃ আবদুল্লাহ উমার আল বারুদী, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুল কিতাবিস সাকাফিয়্যাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

৫০.সুলায়মান আবদুল্লাহ, *মিদাদ, আস সুন্নাতু মাসদারুত তাশরীঈল ইসলামী*, *সংখ্যা. ১৮, প্রকাশনাকাল, ৮.১১.১০০৭।*

ফিক্‌হ

৫১.আশ শাফিঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস, *আর রিসালা*, সম্পাদনাঃ আহমাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন শাকির, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৫৮ হি./ ১৯৩৯ খ্রি.।

৫২.সারাখসী, শামসুল আয়িম্মাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী সাহল, *শরহু সিয়ারিল কাবীর*, কায়রোঃ আশ শিরকাতুশ শারকিয়্যাহ লিল ইলানাত, ১৯৭১ খ্রি.।

৫৩.ইব্‌ন আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আবদিল আযীয, *দুররুল মুখতার*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.।

৫৪.কাসানী, আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মাসউদ, *বাদায়িউস সানায়ীঈ ফি তারতীবিশ শারায়ীঈ*, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

৫৫.ইব্‌ন তায়মিয়া, তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, মাজমুউল ফাতাওয়া, সম্পাদনাঃ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, মদীনা মুনাওয়ারাঃ মাজমাউল মালিক ফাহদ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.।

৫৬.ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাদ, *আল মুহাল্লা বিল আসার*, বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র,তা/বি।

৫৭.মাকদিসী, ইব্‌ন কুদামা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন, আল মুগনী, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./ ১৯৬৮ খ্রি.।

৫৮.ইব্‌ন যানজুওয়াইহ, আবু আহমাদ হামিদ, *আল আমওয়াল*, সউদি আরবঃ মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

৫৯.ইবনুস সালাহ, তাকিউদ্দীন উসমান ইব্‌ন আবদির রহমান, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, সম্পাদনাঃ মুয়াফ্‌ফাক আবদুল্লাহ আবদুর কাদের, মদীনা মুনাওয়ারাঃ মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৬০.দাবুসী, আবু যাইদ আবদুল্লাহ, *তাসীসুন নাযার*, বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন যাইদুন।

৬১. যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

৬২.আল হুমাইদান, হুমাইদান ইব্ন আবদিল্লাহ, *ইখতিলাফু ফুকাহাইত তাবিঈন*, রিয়াদঃ জামিআতুল মালিক সউদ, ১৪১৩ হি.।

৬৩.মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ, আবু আবদিল্লাহ আকমালুদ্দীন, *আল ইনায়া শরহুল হিদায়া*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর।

৬৪.ড. আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, *আল ফাতাওয়া ফিল মুয়াসসাসাতিল মুখতাস্সাহ, আল ইফতা ফী আলামিন মাফতুহিন* প্রসঙ্গ।

৬৫.ড. আলী জুমুআ, *আল ফাতাওয়া ফি আলামিন মাফতুহিন*, তাগাইয়ুরুল ফাতওয়া বি-তাগাইয়ুরি মুজিবাতিহাল আরবাআ প্রসঙ্গ।

৬৬.আল মাজমাউল আলমী লিত তাকরীবি বায়নাল মাযাহিবিল আরবাআ, *রিসালাতুত তাকরীব*, ৩য় সংখ্যা, ১৪১৪ হি. ফিকহুশ শাইখ আস সামী আল গারিযী।

৬৭.জামাল ইউসূফ আল মিসরী, *ফিকহুল ইমাম আয যুহরী*, গাযাঃ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.।

৬৮.ইব্ন আবদিল হাদী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ, *ইখতিয়ারাতু শাইখিল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়া*, সম্পাদনাঃ সামী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জাদুল্লাহ, জিদ্দাঃ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, ১৪২৪ হি.।

৬৯.*মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী*, ওমান, ১৫৩ নং সিদ্ধান্ত, ২৮ জুমাদাল উলা, ২০০৬ খ্রি.।

৭০.*আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়েতিয়্যাহ*, ওয়াযারাতুল আওকাফি ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েতঃ দারুস সালাসিল, ১৪২৯ খ্রি.।

৭১.মোস্তফা শিবলী, *আল মাদখাল ফিল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরুতঃ দারুল জামিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

৭২.শিবলী, মুহাম্মদ মুস্তফা, *তালীলুল আহকাম*, কায়রোঃ মাতবাআতুল আযহার, ১৩৬২ হি/ ১৯৪৩ খ্রি.।

৭৩.হাত্তাব আল রুআঈনী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, *মাওয়াহিবুল জালীল ফী শারহি মুখতাসারিল খলীল*, বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.।

৭৪.শায়খ জাদুল্লাহ আলী জাদুল হক, *বুহুস ওয়া ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ফী কাদায়া মুআসারাহ*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৬ হি,/২০০৬ খ্রি.।

৭৫.মাওলানা আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.।

৭৬.*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৭৭.ড. আ ক ম আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা*, ঢাকাঃ গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বা , ২০০৪ খ্রি.।

৭৮. লেখক মণ্ডলি, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২য় সংসকরণ, ২০১৪ খ্রি.।

৭৯. লেখক মণ্ডলি, *ফতোয়া ও মাসাইল,* ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৮০.ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.।

উসূলুল ফিক্‌হ

৮১.ইব্‌ন রুশদ, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ, *বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাসিদ,* কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৮২.আমীদী, আবুল হাসান সায়্যিদুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবী আলী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, সম্পাদনা আবদুর রায্‌যাক আফীফী, বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, তা/বি.।

৮৩.মাকদিসী, ইব্‌ন কুদামা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন, *রাওদাতুন নাজির ওয়া জান্নাতুল মানাজির,* বৈরুতঃ মাকতাবাতুর রাইয়ান, ২০০২ খ্রি.।

৮৪.ইব্‌ন আমীরুল হাজ, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আত তাকরীর ওয়াত তাহরীর,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

৮৫.গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুসতাসফা*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

৮৬.শাতিবী, ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুয়াফাকাত*, সম্পাদনাঃ আবু উবাইদা মাশহুর, কায়রোঃ দারু ইব্‌ন আফ্‌ফান, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৮৭.আল জুয়াইনী, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়ূসুফ, *আল ইজতিহাদ,* সম্পাদনাঃ কাযী আবদুল হামীদ আবু যানীদ, দামেস্কঃ দারুল কলম।

৮৮.ইব্‌ন হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ, *আল ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম*, সম্পাদনাঃ শাইখ আহমাদ মুহাম্মদ শাকির, বৈরুতঃ দারুল জীল প্রকাশনা, তা/বি.।

৮৯.আর রাযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন আবদুল কাদের, *মুখতারুস সিহাস,* সম্পাদনাঃ মাহমুদ খাতির, বৈরুতঃ মাকতাবাহ লেবনান, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৯০.আবু মুহাম্মদ ইজ্জুদ্দীন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুস সালাম. *কাওয়ায়িদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম*, সম্পাদনাঃ তাহা আবদুর রউফ সাদ, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯১ খ্রি.।

৯১.আল কালবী, আবুল কাসেম মুহাম্মদ আল গারনাতী, *তাকরীবুল ওসূল ইলা ইলমিল উসূল*, কায়রোঃ মাকতাবা ইব্ন তায়মিয়া, ১৪১৪ হি.।

৯২.আবু ইয়ালা, মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন, *আল উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্হ*, রিয়াদঃ জামিয়াতুল মালিক মুহাম্মদ ইব্ন সউদ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

৯৩.যারকাশী, আবু আবদিল্লাহ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *আল বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ,* দারুল কুতবা, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

৯৪.সিয়ুতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর, *তাকরীরুল ইসতিনাদ ফী তাফসীরিল ইজতিহাদ,* সম্পাদনাঃ ফুয়াদ আবদুল মুনয়িম, ইসকান্দরিয়্যাহঃ দারুদ দাওয়া, ১৪০৩ হি.।

৯৫.শানকীতী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আলাবী, *নাসরুল বুনুদ আলা মারাকিস সুউদ,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, মাতবাআ ফুজালা, ২০০০ খ্রি.।

৯৬.তাফতাযানী, সাদুদ্দীন মাসউদ ইব্ন ফখরুদ্দীন উমার ইব্ন আবদুল্লাহ, *শরহুত তালবীহ আলাত তাওযীহ,* মিসরঃ মাকতাবাতুস সাবীহ, তা/বি.।

৯৭.মোল্লা জিউন, *নূরুল আনওয়ার*, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.।

৯৮.বিহারী, মুহিব্বুল্লাহ, *মুসাল্লামুস সুবূত,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.।

৯৯.আল কারাফী, আবুল আব্বাস শরফুদ্দীন, *শারহু তানকীহিল ফুসূল ফী ইখতিসারিল মাহসূল ফিল উসূল,* সম্পাদনা; তাহা আবদুর রউফ সাদ, শিরকাতুত তাবাআতিল ফন্নিয়্যাতিল মুত্তাহিদাহ, ১৩৩৯ হি.।

১০০.রিফায়ী, সাইফুল্লাহ নাসরী সাঈদ, ইজতিহাদুস সাহাবা ফী হায়াতিন নাবিয়্যি, নাবলুসঃ জামিয়াতুন নাজাহিল ওয়াতানিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.।

১০১.আবদুস সালাম আল হুসাইন, *মুযাক্কিরাহ ফী মাবাহিসিল ইজতিহাদ,* আল খাস্সাহ ওয়াল মাহদুদাহ লিন নাশরিল ইলেক্টোনি, ২০২৭ খ্রি.।

১০২.আরিফ ইযযুদ্দীন হাসুনাহ, *মাদা ওজুদিল মুজতাহিদিল মুতলাক ওয়াল মুনতাসাব,* বৈরুতঃ ২০০৭ খ্রি.।

১০৩.আল খাইয়াত, ড. আবদুল আযীয, *শুরূতুল মুজতাহিদ*, কায়রো: দারুস সালাম, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.।

১০৪.আর রাজিহী, শাইখ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *আত তাকলীদ ওয়াল ইফতা ওয়াল ইসতিফতা*, তা/ বি।

১০৫.আন নামলা, ড. আবদুল কারীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুহায্‌যাব ফী ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১০৬.আল কিরনিয, নসর মাহমুদ, *আল ইজতিহাদুল জিমায়ী*, গাযা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

১০৭.খাদিমী, নুরুদ্দীন ইব্‌ন মুখতার, *আল ইজতিহাদুল মাকাসিদী*, কাতার: রিয়াসাতুল মাহাশিমিশ শরঈয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১০৮.আয়াতুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ মাহদী শামসুদ্দীন, বৈরুত: *আল ইজতিহাদ বাইনাত তাসীলি ওয়াত তাজদীদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরুত: আল মুয়াসসাসাহ আদ দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪১৯ হি/১৯৯৯ খ্রি.।

১০৯.সাইফী, সাদ ইসমাঈল, *আল ইজতিহাদুল মাকাসিদী ফী আসরিল খুলাফাইর রাশিদীন*, গাযা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩২ হি./২০১০ খ্রি.।

১১০.খতীব আল বাগদাদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী, *আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, সম্পাদনা: আবু আবদির রহমান আদিল, সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২১ হি.।

১১১.মাজদুদ্দীন আবদুস সালাম ইব্‌ন তায়মিয়া, *আল মুসাওয়াদা*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন কাযী আবদুল হামীদ বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, তা/বি.।

১১২.আবুস সানা শামসুদ্দীন, মাহমুদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, *বায়ানুল মুখতাসার শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব*, সৌদি আরব: ১৪০৪ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

১১৩.আবু মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আবদুর রহীম ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন আলী, *নিহায়াতুস সূল শারহু মিনহাজিল উসূল*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১১৪.আবু যুরআ, ওয়ালিউদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম, *আল গাইসুল হামিঈ শারহু জামঈল জাওয়ামিঈ* সম্পাদনা: মুহাম্মদ তামির হিজাযী, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

১১৫.ইবনুন নাজ্জার, তাকিউদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল ফাতূহী, *শারহুল কাওকাবিল মুনীর*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ যুহাইলী, মাকতাবাতুল আকাবান, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১১৬. যুহাইলী, ড. ওয়াহবা ইব্‌ন মুহাম্মদ মোস্তফা, *ইজতিহাদুত তাবিঈন*, দামেস্কঃ দারুল মাকতাবী, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.।

১১৭.কারযাবী, ইয়ূসুফ, *আল ইজতিহাদ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, স্থান ও তা/বি.।

১১৮.আতিফ ফজল মুহাম্মদ খলীল, *ইসতেসহাবুল হাল বায়না উসূলিল ফিকহী ওয়ান নাহবি*, জর্দানঃ জামিয়াতুল ইসরা, ১৪২৭ হি.।

১১৯.খন্দকার, মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ, *মাকাসিদুশ শরীয়াহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, ঢাকাঃ মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১৫ খ্রি.।

অভিধান ও ব্যাকরণ

১২০. ইবনুল ফারিস, আবুল হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন ফারিস ইব্‌ন যাকারিয়া আল কাযবীনী, *মুজামু মাকায়ীসিল লুগাহ*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৭ খ্রি.।

১২১.ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, আল মুজামুল ওয়াসিত, কায়রোঃ দারুদ দাওয়া, তা/বি.।

১২২.সানিকী, যাকারিয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যাকারিয়া আল আনসারী যাইনুদ্দীন আবু ইয়াহয়া, *আল হুদূদুল আনীকা ওয়াত তারীফাতিদ দাকীকা*, সম্পাদনাঃ মাযিন আল মুবারক, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১১ হি.।

১২৩.রাগিব ইসফাহানী, আবুল কাসিম হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, বৈরুতঃ দারুল কলম, ১৪১২ হি.।

১২৪.সাঈদ আবু হাবীবী, *আল কামূসুল ফিকহী*, দারুল ফিক্‌র, দামেস্ক, ২০০৩ খ্রি.।

১২৫.হামাবী, আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল ফায়ূমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা/বি.।

১২৬. ইবনুল আনবারী, *আল ইগরাব ফী জাদালিল ইরাব*, সম্পাদনাঃ সাঈদ আফগানী, বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খ্রি.।

১২৭.জুরজানী, সায়্যিদ শরীফ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *মুজামুত তারীফাত*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ সিদ্দীক আল মানশাবী, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.।

১২৮.কামালুদ্দীন, *ইলমুন নাহবি ওয়া আহাম্মিয়াতুহূ ফী ইসতিম্বাতিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ*, স্থান ও তারিখবিহীন।

১২৯.ইয়াকুত হামাবী, *মুজামুল বুলদান*, তেহরানঃ সাযমানে মীরাসে ফিরিঙ্গী কিশওয়ার, ১৩৮৩ হি.।

জীবনী ও রিজাল শাস্ত্র

১৩০.আসকালানী, ইব্‌ন হাজার আবুল ফজল আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.।

১৩১.সামিরী, আবু আবদিল্লাহ হুসাইন ইবন আলী, *আখবারু আবী হানীফাতা ওয়া আসহাবিহী*, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

১৩২.ইব্‌ন ফারহুন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আদ দীবাজুল মাযহাব*, সম্পাদনাঃ ড. মুহাম্মদ আল আহমাদী আবুন নুর, কায়রোঃ দারুত তুরাস, তা/বি.।

১৩৩.আবুল আরব, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন তামীম আত তামীমী, *তাবাকাতু উলামায়ি* আফ্রীকিয়্যাহ, বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল লেবনানী, তা/বি.।

১৩৪.আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসরুল্লাহ, *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, করাচিঃ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা/বি.।

১৩৫. ইবনুল জাযরী, আবুল খাইর শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *গায়াতুন নিহায়া ফী তাবাকাতিল কুররা*, কায়রোঃ মাকতাবা ইব্‌ন তায়মিয়া, ১৩৫১ হি.।

১৩৬.ইব্‌ন আবিল আওয়াম, *ফাজায়িলু আবী হানীফা*, মাক্কা আল মুকাররামাহঃ মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, ২০১০ খ্রি.।

১৩৭.আবু যাহরা, মুহাম্মদ, *ইব্‌ন হাম্বল হায়াতুহূ ওয়া আসরুহূ*, কায়রোঃ দারুল ফিকরিল আরবী, তা/বি.।

১৩৮.আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৩৫ খ্রি.।

১৩৯.মুস্তাফা মাহমুদ, *ইজামুল আলাম*, কাইরোঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.।

১৪০.যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ , *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাতা ওয়া সাহিবাইহি*, হায়দারাবাদঃ লাজনাতু ইহয়াইল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৮ হি.।

১৪১.যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ , *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

১৪২.যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ , *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১৪৩.যাহাবী, শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ, *মীযানুল ইতিদাল*, বৈরুতঃ দারুল মারিফা, ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি.।

১৪৪.সাফাদী, সালাহুদ্দীন খলীল ইব্‌ন আইবেক ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত*, বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আবারী, ১৪২০ হিজরি/ ২০০০ খ্রি.।

১৪৫.কাযী আয়ায, আবুল ফজল ইব্‌ন মূসা, *তারতীবুল মাদারিক*, সম্পাদনাঃ আবদুল কাদের আস সাহরাবী, মরক্কোঃ মাতবাআতু ফুজালাইল মুহাম্মদিয়্যাহ, ১৯৭০ খ্রি.।

১৪৬.ইজলী, আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, *মারিফাতুস সিকাত*, মদীনা মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতুদ দার, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

১৪৭.নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইব্‌ন শরফ, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা/বি.।

১৪৮.মিয্‌যী, আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইব্‌ন আবদির রহমান, *তাহযীবুল কামাল*, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।

১৪৯.কাসিম আলী সাদ, জামহারাতু *তারাজুমিল ফুকাহাইল মালিকিয়্যাহ,* দুবাইঃ দারুল বুহূস, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

১৫০.ইব্‌ন আবী হাতিম, আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস, *আল জারহু ওয়াত তাদীল,* ভারতঃ দায়িরাতুল মাআরিফ, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.।

১৫১.সালমাসী, আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইব্‌ন ইবরাহীম, *মানাযিলুল আয়িম্মাতিল আরবাআ*, সম্পাদনাঃ মাহমুদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, জামিয়াতুল মালিক ফাহদঃ মাকতাবাতুল মালিক ফাহদ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

১৫২.আল বাজী, আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইব্‌ন খালাফ, *আল তাদীলু ওয়াল জারহু লিমান খার্‌রাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিঈস সহীহ*, রিয়াদঃ দাবুল লিওয়া লিন নাশরি, সম্পাদনাঃ আবু লুবাবাহ হুসাইন, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

১৫৩.ইব্‌ন আবদিল বার, আবু ইয়ূসুফ উমার ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইসতীআব ফী মারিফাতিল আসহাব,* বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৯২ খ্রি.।

১৫৪.ইব্‌ন খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আয়ান*, বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৯০ খ্রি.।

১৫৫. ইবনুল আসীর আল জাযরী, আবুল হুসাইন ইজ্জুদ্দীন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *উসদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

১৫৬.ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল বুসতী, মাশাহীরু উলামাইল আমসার, আল মানসূরাঃ দারুল ওয়াফা লিত তাবাআ, ১৯৯১ খ্রি.।

১৫৭.যিরিক্‌লী, খাইরুদ্দীন ইব্ন মাহমুদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ফারিস, *আল আলাম*, বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মিলিয়ন, ২০০২ খ্রি.।

১৫৮.আসকালানী, আবুল ফজল আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, *তাহযীবুত তাহযীব*, ভারতঃ মাতবাউ দায়িরাতিল মাআরিফ আন নিজামিয়্যাহ, ১৯৩৬ হি.।

১৫৯.সিয়ূতি, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর, *বুগয়াতুল ওয়াআত*, সম্পাদনাঃ আবুল ফজল ইবরাহীম, লেবাননঃ আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা/বি.।

১৬০.ইব্ন সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আত তাবাকাতুল কুবরা,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

১৬১.ইব্ন হিব্বান আল বুসতী, মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মুআজ, *আস সিকাত*, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ, তা/বি.।

১৬২.দাইনুরী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা, *আল মাআরিফ*, সম্পাদনাঃ সারওয়াত উকাশা, কায়রোঃ আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.।

১৬৩.শিরাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আলী, *তাবাকাতুল ফুকাহা,* বৈরুতঃ দারুর রায়িদিল আরাবী, ১৯৭০ খ্রি.।

১৬৪.সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন আলী, *আত তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাতুল কুবরা*, কায়রোঃ দারু হাজার, ১৯৯২ খ্রি.।

ইতিহাস

১৬৫.তাবারী, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ, *তারীখুত তাবারী*, বৈরুতঃ দারুত তুরাস, ১৩৮৭ হি.।

১৬৬.তাবারী, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ, *তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, দারু হিজরাহ লিত তাবাআহ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

১৬৭.ইয়াফিঈ, আবু মুহাম্মদ আফীফুদ্দীন আবদুল্লাহ, *মিরআতুল জিনান*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১৬৮.ইব্‌ন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, কায়রোঃ দারু হাজার লিত তাবাআ, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.।

১৬৯.যাহাবী, আবু আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ, *তারীখুল ইসলাম*, বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামী, ২০০৩ খ্রি.।

১৭০.ওয়াকী আদ দাব্বী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ, *আখবারুল কুদাত*, মিসরঃ আল মাকতাবতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, সম্পাদনাঃ আবদুল আযীয মুস্তফা আল মারাগী, ১৩৬৬ খ্রি.।

১৭১.বুখারী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, *আত তারীখুল কাবীর*, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মাআরিফ,তা/বি.।

১৭২.ফাসাবী, ইয়াকুব ইব্‌ন সুফ্‌য়ান, *আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ*, সম্পাদনাঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।

১৭৩. ইবনুল ফারজী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়ূসুফ ইব্‌ন নাসার আল আযদী, *আল আবার ফী খবারি মান গাবার*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৪০৮ হি,/ ১৯৮৮ খ্রি.।

১৭৪.খাল্লাফ, আবদুল ওয়াহহাব, *খুলাসাতু তারীখিত তাশরীঈল ইসলামী*, কুয়েতঃ লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী, তা/বি.।

১৭৫.আবুল ফালাহ আবদুল হাই আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, সম্পাদনাঃ মাহমুদ আল আরনাউত, বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন কাসীর, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

১৭৬.ইবনুল মানজুর, জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকার্‌রম, *মুখতাসারু তারীখি দামেস্ক*, দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮৪ খ্রি.।

১৭৭.ইব্‌ন আসাকির, আবুল কাসেম আলী ইব্‌ন হাসান, *তারীখু দামেস্ক*, বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র লিত তাবাআ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৭৮.ইসফাহানী, আবু নুআইম আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.।

১৭৯.ইবনুল আরাবী, কাযী আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ, *আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, রিয়াদঃ ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.।

১৮০.ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*, কায়রোঃ দারুল আদাবিল ইসলামী, ১৯৭৪ খ্রি.।

১৮১. ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, *সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন*, কায়রোঃ দারুল আদাবিল ইসলামী, ১৪১৭ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১৮২.ড. মুহাম্মদ বালতাজী, *মানাহিজুত তাশরীঈল ইসলামী*, মিসরঃ দারুস সালাম লিত তাবাআ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।

১৮৩.আস সায়িস, মুহাম্মদ আলী, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, দামেস্কঃ দারুল ফিক্র, ১৪২৫ হি.।

১৮৪.মাহমুদ শাকের, *আত তারীখুল ইসলামী আল আহদুল উমাবী*, বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী, ৬ষ্ট সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

১৮৫.আবদুল হালীম উয়াইস, *বনু উমাইয়াতা বাইনাল ইনতিহারি ওয়স সুকূত*, কায়রোঃ সুবারলার লিন নাশরি।

১৮৬.আকরাম দায়লামী, *জামউল কুরআন দিরাসাতান তাহলীলিয়্যাতান লি মারবিয়্যাতিহী*, বৈরুতঃ দারুল কুতুলি ইসলামিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.।

১৮৭.আশকার ড. উমার সুলায়মান, *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, কুয়েতঃ মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২হি./১৪০৬ খ্রি,।

১৮৮.আবদুল কারীম যিদান, *আল মাদখাল লি দিরাসাতিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, ইসকান্দারিয়্যাহঃ দারু উমার ইবনুল খাত্তাব, ১৯৯৬ খ্রি.।

১৮৯.ড. মান্না আল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী*, কায়রোঃ মাকতাবাহ ওয়াহবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

১৯০.আল হাজাবী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল আরাবী আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৯১. ইবনুল জাওযী, জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল মুনতাজাম*, সম্পাদনাঃ আবদুল কাদের আতা ও মুস্তাফা আবদুল কাদের আতা, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

বিবিধ বিষয়

১৯২.গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ইহয়াউ উলুমিদ্দীন*, বৈরুতঃ দারু ইব্‌ন হাযম, ১৪২৬ হি.।

১৯৩.ইব্‌ন তায়মিয়া, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, *ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকীম*, সম্পাদনা নাসির আবদুল কারীম, বৈরুতঃ দারু আলামিল কুতুব, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৯৪. ইবনুল জাওযী, জামালুদ্দীন আবুল ফরজ আবদুর রহমান, *সিফাতুস সাফওয়া*, সম্পাদনাঃ আহমাদ ইব্‌ন আলী, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

১৯৫.সারমীনী, মুহাম্মদ আনাস, *আহলিয়্যাতুল মারআতিল মুসলিমাহ*, ইস্তাম্বুলঃ আল কুল্লিয়াতুদ দুওয়ালিয়্যাহ।

১৯৬.ড. ওয়াসফি আশূর আবু যাইদ, *আহাম্মিয়াতুল কুরআনিল কারিম*, কুয়েতঃ ১৪২৯ হি./২০০৯ খ্রি.।

১৯৭.আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরীদী ও অন্যান্য, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ১৯৮৮ খ্রি.।

১৯৮.ড. তারিক রামাদান, *মুসলমানদের জন্য ক্রিটিক্যাল থিংকিং*, অনুবাদঃ তারিকুর রহমান শামীম, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৫ এপ্রিল, শুক্রবার, ২০১৬ ।

১৯৯.মাওলানা সাঈদ আহমাদ, গোলামানে ইসলাম, ঢাকাঃ ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.।